সূচীপত্র

লোকজীবন কথা

কাকে পর্যটক বলব ?

তিনি কি উদ্দেশ্যে পর্যটন করেন ?

পর্যটনের মাধ্যমে তিনি কি লাভ করেন ?

তিনি কি লোকসংস্কৃতিপ্রেমী ?

পর্যটন কাকে বলব—?

স্থান থেকে স্থানান্তর, দেশ থেকে দেশান্তর, নতুন মানব সমাজ—এছাড়া ?

পর্যটন ও লোকসংস্কৃতি প্রেম—পার্থক্য কী ?

এদের মধ্যে মৌল সাদৃশ্য কি ?

এগুলি কি পরস্পরের পরিপূরক ?

পর্যটকের কি লোকসংস্কৃতি-প্রেম থাকা বাঞ্ছনীয় ?

প্রতিটি ভ্রমণ কাহিনীই কি

লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ?

ভ্রমণ কাহিনী কতটা লোকসংস্কৃতি-নির্ভর,

এবং লোকসংস্কৃতি চর্চাই বা কতটা পর্যটন নির্ভর ?

পর্যটন ও লোকসংস্কৃতি-চর্চা

'মূল পার্থক্য হল দৃষ্টিভঙ্গীর।'

যে উদ্দেশ্য নিয়ে পর্যটকের পর্যটন

তার উদ্দেশ্য যদি হয় লোকসংস্কৃতি চর্চা—

তবে তার সাধ ও স্বাদ

হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

লক্ষ্য হবে স্থির—একলব্যের মত।

সঙ্গীতের 'স্থায়ী'-র মত।

উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে লোকসংস্কৃতিপ্রেমী পর্যটকের পর্যটন সাঙ্গ—

তিনি বোঝেন ক্ষেত্রকর্ম।

পর্যটন তাঁর কাছেও আনন্দের কাজ,

তবে সে আনন্দ হয় লক্ষ্যবস্তু পূরণের আনন্দ।

তিনি ক্ষেত্রকর্ম, বা ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে একটি ক্ষেত্রফলের প্রত্যাশী।

তাই এক যাত্রায় হয় দুটি পৃথক ফল,

ভ্রমণকাহিনী নির্মাণ ও লোকসংস্কৃতির তত্ত্ব নির্মাণ।

ভূমিকার পরিবর্তে

সমাজভিত্তিক যে কোন অনুসন্ধানের নিম্নতম একক হল মানুষ। তার নিজস্ব সত্তার গণ্ডি ছাড়িয়ে সে হল একটি পরিবার। তার চৌহদ্দী পেরোলে সেটি হবে একটি পল্লী এবং তারও পরে সীমানা বাড়তে বাড়তে তা হয়ে যাবে গ্রাম এবং গ্রামান্তর। এবং জেলা পেরিয়ে তা যে কোথায় এসে দাঁড়াবে তা একমাত্র বলতে পারেন সেই সমীক্ষক—যিনি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সেই অনুসন্ধানে নেমেছেন।

সমাজবিজ্ঞানী একেই বলেছেন ক্ষেত্রানুসন্ধান—তার সীমানা যত দূরেই হোক না কেন, যেহেতু ক্ষেত্রকর্মের মাধ্যমে সে তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে বলে তাই সেটি অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক উৎস এবং প্রাথমিকভাবে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু 'স্টাডি', বা 'ক্ষেত্রকর্ম' বা ক্ষেত্রানুসন্ধান'—এজন্য যে শব্দই প্রযুক্ত হোক না কেন, মাটির কাছাকাছি না এলে তার তথ্য সংগ্রহ ও পর্যটন সাফল্য লাভ করছে না। তথ্য সংগ্রহের পরবর্তী অংশ অবশ্য এখানে আলোচ্য বিষয় নয়।

ক্ষেত্রানুসন্ধান যদি ব্যক্তি বা স্থান-একক ছাড়িয়ে এককান্তরে যায়, স্থান থেকে স্থানান্তরে যায় এবং পরবর্তীতে যদি তার পরিধি বা বৃত্ত বৃদ্ধি পায়, তবে সেই সব ক্ষেত্রকর্ম সাধনের একটি মাত্র মাধ্যম—তা হল ভ্রমণ বা পর্যটন। ভ্রমণ বা পর্যটনের সঠিক স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁর একটি পাঠ্যপুস্তকে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছিলেন—সেটিকে আদর্শ বলে গ্রহণ করলে বর্ত্তমান আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার পক্ষে তা বিশেষ সুবিধার হয়।

বিদ্যাশৃংখলা চর্চার ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়। অতীতে যা বিশুদ্ধ নৃতত্ত্বের এক বিশেষ শাখা অর্থাৎ সামাজিক নৃতত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজ তারই নবীকৃত বিবর্ধিত পরিমার্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ হল লোকসংস্কৃতি বিদ্যা। তাই লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও ক্ষেত্রানুসন্ধান অতীব প্রয়োজনীয় বলেই তার অন্যতম মাধ্যম রূপে পর্যটনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর বলে মনে করা যায়। এক্ষেত্রে পর্যটনকে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে একাসনে বসালে তত্ত্বগঠনে বিশেষ সুবিধা হয়। উদ্দেশ্যমুখী পর্যটনের অর্থই হল তা একদিকে যেমন ভ্রমণ, অপর দিকে তেমনি ক্ষেত্রকর্ম। যেহেতু তা ক্ষেত্রকর্ম, তাই সেই ক্ষেত্রানুসন্ধানজাত উপকরণকে লোক-সংস্কৃতির যে কোন প্রকরণ সম্বন্ধে উপাদান-সংগ্রহ বলা যেতে পারে।

এ যাবৎ যে ব্যক্তিরা লোকসংস্কৃতি চর্চায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তারা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পর্যটন করে তবে তাঁর সংগৃহীত তথ্য থেকে তত্ত্বগঠন করতে পেরেছেন। কতখানি পর্যটন হলে কতগুলি তত্ত্ব নির্মাণ করা যাবে তা কোন ক্ষেত্রকর্মীই প্রাক-ক্ষেত্রকর্মে বলতে পারেন না। তবে যেহেতু ক্ষেত্রানুসন্ধান একটি

উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া, তাই পর্যটনের ছদ্মবেশে তিনি কি সংগ্রহ করতে চান, তা শুধু তার অন্তরেই গোপন থাকে।

বস্তুতঃ উদ্দেশ্যমুখী পর্যটন আদতে যা কি না মূলতঃ এক বিশদ ক্ষেত্রানুসন্ধান—তার কয়েকটি আদর্শ আমাদের সমাজে আছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিভিন্ন দেশভ্রমণমূলক গ্রন্থগুলি পাঠ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এরই অভিজ্ঞতাগুলি পরবর্তীকালে তাঁর 'লোকসাহিত্য' নামক সুদীর্ঘ ছয় খণ্ডের গ্রন্থমালা রচনায় ভূমিকা রূপে কাজ করেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর সুন্দরী ইন্দোনেশিয়া (১৯৭৬), অজানা অস্ট্রেলিয়া (১৯৭৯), ইরাণে ভ্রমণ (১৯৮০), জাপানের আঙিনায় (১৯৮১), দণ্ডকারণ্যের অন্ধকারে, পুরুলিয়া থেকে প্যারিস, পুরুলিয়া থেকে আমেরিকা প্রভৃতি গ্রন্থের নাম তুলনীয় হতে পারে।

তাঁর 'ইরাণ ভ্রমণ' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লিখিত হয়েছে ঃ 'আমি যে উদ্দেশ্যে যখনই পৃথিবীর যে দেশে গিয়েছি, আমার অন্যান্য কর্তব্যের মধ্যে সে দেশের লোকসংস্কৃতি এবং সাধারণ মানুষের জীবনাচরণ বিষয়ে সর্বদাই অনুসন্ধান করেছি।'

তথ্যরূপে এগুলি পুরাতন বলে মনে হলেও একালের আর দু'জন লোকসংস্কৃতি কর্মীর নাম এখানে উঠতে পারে। শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'দেখা হয় নাই' (১৯৭৩) গ্রন্থটিতে এই একই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তারও পরে আধুনিক কালে শ্রীসুধীর চক্রবর্তী বাংলার লোকধর্মানুসারী মানবসমাজ বিষয়ে ('গভীর নির্জন পথে', 'সাহেবধনী' ও 'বলাহাড়ি' সম্প্রদায়) যে সব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, তারও পদ্ধতি একই প্রকার। ক্ষেত্রানুসন্ধানের প্রতিবেদনই যেন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

প্রসঙ্গতঃ, লোকসংস্কৃতি বিষয়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে যে সকল শিক্ষাকেন্দ্র উচ্চতর বিষয়ের পাঠক্রম প্রচলন করেছেন এবং এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী দানের ব্যবস্থা করেছেন, তার পথিকৃৎ হল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়—এ কথা আজ প্রতিষ্ঠিত। এ সম্বন্ধে ১৯৯৯ সালে ঐ বিভাগে আয়োজিত একটি 'আলোচনা চক্র' উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় বলা হয়েছে ঃ

'১৯৭৮ সালে দশম আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ব বিষষক সম্মেলনের লোকসংস্কৃতি শাখার আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংগঠিত করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। বিশ্ববিদ্যালরের মঞ্জুরী কমিশন ২০. ২. ৮২ সালে যখন স্বকীয় শিক্ষাগত শৃংখলায় লোকসংস্কৃতি বিষয়টিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের স্বীকৃতি দেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে স্থাপিত হয় 'ইনষ্টিটিউট অব ফোকলোর'।...১৯. ৯. ৯৩ সালে মঞ্জুরী কমিশনের পর্যটক দল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র লোকসংস্কৃতি বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করেন।'

একটি বিশ্ববিদালয়ের শিক্ষা-কাঠামোর অন্তর্গত থেকে, এই লোকসংস্কৃতি বিভাগ শিক্ষার তথা চর্চার পূর্ণাঙ্গতার জন্য বরাবরই ক্ষেত্রকর্মের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকৃত শিক্ষানুরাগী ছাত্রের পক্ষে এতে অংশগ্রহণ করার অর্থই হল লোকসমাজ তথা লোকজীবনের আরো নিকট হতে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানার সুযোগ গ্রহণ করা—যা

পরবর্তীতে তাকে এককভাবে ক্ষেত্রানুসন্ধানে ব্রতী করবে। এ ভাবেই তারা বিগত কয়েক বৎসরে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া, দক্ষিণ দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিধিবদ্ধভাবে কর্মশিবির স্থাপন করে ক্ষেত্রকর্ম করেছেন।

অতীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই বিদ্যাশৃংখলায় পর্যটনের আংশিক পরিকাঠামোতেও ক্ষেত্রানুসন্ধানের সুযোগ রাখা হয়েছিল। সে সময়ে কিংবা বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে প্রতিষ্ঠানিক লোকসংস্কৃতি চর্চার যুগে এগুলি নিপুণ ভাবে পরিচালিত হত ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মাধ্যমে। তার বহু প্রতিবেদন পরবর্তীতে মুদ্রিত রূপে (১৯৬৬-৬৭) তাঁর সম্পাদিত 'লোকশ্রুতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে আজও তৎকালীন ক্ষেত্রানুসন্ধানের একটি অন্যতম আদর্শ-রূপ আমাদের সমাজে নথিবদ্ধ হয়ে আছে।

প্রকারান্তরে বলা যায়, শুধু বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের উচ্চতর ডিগ্রীপ্রাপ্তির জন্যই নয়, যে কোন সাধারণ লোকসংস্কৃতিপ্রেমী মানুষকেও এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যটন বা দেশভ্রমণ করতেই হবে। এবং এ কথা বলা বাহুল্য যে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পরে পরোক্ষ প্রক্রিয়াগুলি ব্যবহার করতে পারা যায়—কিন্তু শুধুমাত্র পরোক্ষ প্রক্রিয়াগুলির প্রতি নির্ভর করলে সেই বিশেষ উদ্দেশ্যমুখী ক্ষেত্রকর্ম সফল না হতেও পারে।

তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে পর্যটনের কাহিনী মাত্রই লোকসংস্কৃতি চর্চা নয়। অবশ্য বিশুদ্ধ পর্যটন ও বিশুদ্ধ ক্ষেত্রানুসন্ধান—উভয়ের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য সব সময়েই থাকে– সেটি হল উদ্দেশ্যের স্বাতন্ত্র্য। দেশভ্রমণ যদি শুধু হৃদয়ানুভূতি ও দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুর উপর নির্ভরশীল হয়, যদি তা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করতে না পারে—তবে তা লোকসংস্কৃতি চর্চাকারীর কাছে ততটা উপকারে না লাগতেও পারে। কেননা লোকসংস্কৃতি চর্চাকারী জানেন. দুটি কাজ তাকে একসঙ্গে করতে হবে এবং তা যত বেশী তিনি করতে পারবেন, পরবর্তীকালে সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে নির্মিত তার তত্ত্বটি তত বেশী গ্রহণযোগ্য হবে।

ভ্রমণসঞ্জাত সংগৃহীত তথ্যের বিন্যাস পরবর্তীতে দু'ভাবে রূপায়িত হতে পারে। প্রথমতঃ তা তত্ত্বনির্মাণের বা গঠনের বাসনায় না গিয়ে পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণকাহিনীরূপে লিখিত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ তা কাহিনীর আবরণ ভেদ করে বা বিস্মৃত হয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কেবলমাত্র তত্ত্বগুলিকে নির্মাণ করে বিশ্লেষণাদি প্রক্রিয়ায় তাকে পূর্ণাঙ্গ করা যেতে পারে। প্রথম রূপটি সাধারণ ভ্রমণপ্রিয় পাঠকের কাছে এবং দ্বিতীয় রূপটি লোকসংস্কৃতিপ্রিয় ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এ কথা সত্য যে দুটি রূপ দুজনের মানসিকতার কাছে মূল্যবান হলেও, লোকসংস্কৃতিপ্রেমী ভ্রমণ কাহিনীর মধ্য থেকেও তার প্রার্থিত তথ্যটি সন্ধান করে নিতে পারেন আর তখনই এ' জাতীয় ভ্রমণকাহিনী হয়ে ওঠে লোকসংস্কৃতিচর্চার সত্যকার পরিপূরক। পর্যটন ও তত্ত্বানুসন্ধান—উভয়ের অর্ধবৃত্তে নির্মিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ বৃত্ত। ☐

শুরুর আগেও একটা 'সূচনা' থাকে।
সূচনার ইঙ্গিতেই বোঝা যায়
পরবর্তী কর্মপ্রসঙ্গ।
যে কোন পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক বা অন্য
কোন কর্মোদ্যোগের পক্ষেই এটা প্রযোজ্য—
এমনকি নিত্যদিনের জীবনযাত্রায়ও।
উৎসবের যেমন একটি নিজস্ব ভূমিকা আছে,
তাকে কেউ অপ্রয়োজনীয় বা অতি-প্রয়োজনীয়
বলতে পারবে না।
তাই 'প্রয়োজনীয়' শব্দেই উৎসবের রূপ বিশিষ্ট—
বিশিষ্ট, কিন্তু সীমিত নয়।
তাই উৎসবের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে
পারিবারিক, সামাজিক আর্থিক বা সাংস্কৃতিক জীবনেই শুধু নয়,
'দিনের পর দিন' গণনাতেও।

লোক উৎসব-১

দিন গণনার অনেক রীতি।
সে রীতি যত প্রাচীন, সংস্কারাচ্ছন্ন বা বিজ্ঞানসম্মত হোক না কেন,
তার অপর নাম হল আনন্দ-অর্জন।
প্রতিটি উৎসবের লক্ষ্য যদি হয় 'আনন্দ'
তবে তার একটা উপলক্ষ তো থাকবেই!
সব উৎসবেরই পটভূমিতে বা নেপথ্যে থাকে একটা বোধন,
উৎসবান্তে হয় একটা বিসর্জন,
শুরু হয় সাধারণ জীবন।
তাই চৈত্র-সংক্রান্তি যদি হয় একটা বিশাল কালপ্রবাহের বিসর্জন,
তবে তার বোধন হয় কখন?
এই প্রতীকী বিসর্জন তাই
রূপক-সজ্জায় সেজে বোধন রূপে উপস্থিত হয়
আগামী দিনের নবপ্রভাতেই।
সেই দিনটিই তাই হয়ে ওঠে নববর্ষের নববোধন উৎসব।

পয়লা বৈশাখের সুন্দরবন

বাসের পর বাস পাল্টে চলেছি তো চলেইছি।

প্রথমে ঠাকুরপুকুর থেকে বাসে এলাম ডায়মণ্ডহারবার। তখনও লোক বলত ডায়মনহারবার—আর এখন বলে শুধু 'ডায়মন'। হাতে সময় আছে, মনটাও তেজী আছে—সবে তো সকাল নটা-সাড়ে নটা। আবার বাস পাল্টে কাকদ্বীপ—যা আদৌ কোন দ্বীপ নয়। সেখানে নেমে খোঁজ পেলাম আরো দূরে যাওয়া যায় বাসপথেই।

তার সন্ধানে বেরোলাম তখন। একটা বাসস্ট্যাণ্ড গোছের পেয়েও গেলাম—এ বাস নিয়ে যাবে রায়দীঘি, একেবারে স্থলভাগের শেষ। তারপর আর বাস পথ নেই, শুধু জলপথ।

জলপথ মানে? সে জল কোথাকার। কোথায় কোথায় যাওয়া যায় সেখান দিয়ে? সে জলপথেই যায় কারা? সেখানে থাকে কারা?

সোজা কথায় রায়দীঘি হল সুন্দরবনের আর একটি প্রবেশদ্বার। এই 'প্রবেশদ্বার' বললেই আমার এক শহুরে বন্ধুর কথা মনে পড়ে যায়—যে আমায় বলেছিল: 'কত করে টিকিট লাগে সুন্দরবনে ঢুকতে?'

প্রশ্ন শুনে মনে হয়েছিল যে তার বোধহয় এমন কোন ধারণা মনে তৈরী যে, সুন্দরবন একটি বিশাল প্রমোদ উদ্যান—যেমন সে দেখেছে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনকে। তখন তাকে বুঝিয়ে বলতে হয়েছিল সুন্দরবনের ভৌগোলিক তাৎপর্য। সেখানকার জনমানুষের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য, সুন্দরী গরান গাছের বন, বনবিবি-দক্ষিণ রায়ের কথা, বাঘ-সাপের কথা—এসব। শুনে তার রোমাণ্টিক মন কতটা আহত হয়েছিল তা বোঝার আগেই কথায় কথায় টেনে এনেছিলাম তার মনের মত একটা হিন্দী সিনেমার গল্প।

আসলে সুন্দরবন এলাকায় প্রবেশের জন্য যে কটি পথ আছে, তা এবারে সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। এসব আজ থেকে পঁচিশ বছরেরও বেশী পূর্বের কথা। তখন কলকাতা থেকে সরাসরি রায়দীঘি বাস যেত না। রায়দীঘি যেমন একটা প্রবেশদ্বার, তেমনি একটি হল ডায়মণ্ডহারবার পেরিয়ে কাকদ্বীপ। ওদিকে আছে বসিরহাট, হাসনাবাদ ইত্যাদি সরাসরি বাস যায় সেখানে। আর রেলপথে ক্যানিং পৌছালে তো সুন্দরবনেই প্রবেশ হয়ে গেল। এই পথটা বেশ প্রাচীন। এখনও, এই এতদিন পরেও সুন্দরবন এলাকায় যাবার জন্য স্থলপথে অন্য কোন রুট প্রচলন হয়নি। আর কাকদ্বীপ থেকে সাগরদ্বীপে যাবার পথটি যে আগের থেকে অনেক সহজ হয়েছে—তা তো সবার জানা!

যে সময়ের কথা বলছি, তখন ক্যানিং ছাড়া আর কোথাও রাত্রিবাসের জন্য যাত্রীর মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। এখনও যে খুব একটা ভাল ব্যবস্থা হয়েছে তা নয়, তবু বিপদে পড়লে—

সত্যি কথা বলি, রায়দীঘিতে সে রকম কোন ব্যবস্থা আছে কি না—সে সংবাদ না নিয়েই বেরিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম পয়লা বৈশাখের দিনটা সারা দিন ঘুরে ঘুরে রাত্তিরবেলায় ফিরে আসব নিজের ঠিকানায়। কিন্তু কি করে সে সব হিসাব উল্টো-পাল্টা হয়ে গেল—সে কথার জন্যই এই ভূমিকা।

রায়দীঘিতে তখন প্রথম দুপুর বলা যায়।

সে সময়ের রায়দীঘির সঙ্গে আজকের ঝকঝকে রায়দীঘির কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে শুধু অনুসন্ধান করে রাখতে হল কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় তথ্য: ১. সন্ধ্যাবেলা শেষ বাস কখন ছাড়বে এবং সেখান থেকে কাকদ্বীপ-ডায়মণ্ডহারবার হয়ে কলকাতা ফেরা যাবে কি না। ২. প্রয়োজনে যদি এখানে রাত্রিবাস করতে হয়, তবে তা কি করে সম্ভব করা যায়। ৩. রায়দীঘি থেকে আর কোথায় কোথায় যাওয়া যেতে পারে।

শেষ প্রশ্নের উত্তরটা আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় বলে মনে হল। কেননা, এখান থেকে জলপথে যেসব দ্বীপে যাতায়াত করা যায় তার মধ্যে অন্যতম হল, পাথরপ্রতিমা, কেদারপুর, কুয়েমুড়ি প্রভৃতি স্থান। সুন্দরবনের বিভিন্ন 'লাটে' যাবার পথও এই জলপথেই। লঞ্চ বিশেষ যায় না, এখন তো শুধু ভুটভুটি সম্বল। মানে মোটর বসানো নৌকা আর কি!

সেই প্রথম জানা হয়েছিল এসব দ্বীপের কথা। পরে অবশ্য ঐ সব স্থানে নানা অবকাশে যাবার সুযোগ হয়েছিল। বিশেষ করে পাথরপ্রতিমা থেকে সুন্দরবনের 'ষষ্ঠীপালা'-র যাত্রা কাহিনী সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম বলে আর পাখিরালায় 'দুখেপালা'-র সংবাদ পেয়েছিলাম বলে সে দুটি নাম আজও আমার স্মরণে আছে।

সবগুলি প্রশ্নের যে খুব একটা সদুত্তর পেলাম এমন নয়—তবু সামনে এখন অনেক সময় আছে। যা যা দেখবার দেখে নিয়ে -তাড়াতাড়ি সন্ধ্যার শেষ বাসের আগেই যদি --

আর তখনই বাধল গোল!

এদিক-ওদিক ঘুর ঘুর করে সব তথ্য নিয়ে জানা গেল যে, আজ রায়দীঘির এই সব অঞ্চল খুবই আনন্দ মুখর—বেশ উৎসবের মেজাজে আছে সবাই।

ভেবে বেশ অবাক হলাম। আমার শহর-ঘেঁষা মন। আজ পয়লা বৈশাখের দিনে কলকাতা শহরের চেহারাটা কি রকম হয়—তা ভালভাবেই জানা। হালখাতা, মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, গণেশ পুজা, সংবাদপত্রের বিশেষ ক্রোড়পত্র, যাত্রাদলের বায়না, মন্দিরে ভীড়, নতুন পোষাক, রেডিওতে প্রোগ্রাম, পাড়ার অনুষ্ঠান—এ সব তথ্য তো জানিই। বলতে গেলে এ সব দেখতে দেখতেই তো এতদিন কাটল।

কিন্তু কলকাতা শহরের বাইরে এ দিনটায় গ্রাম-বাংলার চেহারা কেমন হয়, তা কোনদিনও জানার সুযোগ হয়নি। আজ এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি স্থানটি সুন্দরবনের অংশ, কেউ কেউ তাকে বনাঞ্চল ও দ্বীপময় সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার বলেন।

প্রসঙ্গ কথা

বছরের প্রথম দিনটি নানা উৎসব-আনন্দ-লোকাচারের মাধ্যমে পালন করা বিশ্বের প্রায় সকল সমাজেরই একটি বিশেষ সংস্কৃতি। এই বৎসর গণনা চান্দ্র বা সৌর মাস—যেভাবেই গণিত হোক না কেন, বছরের অন্যান্য দিন থেকে তা যে একটু ভিন্নধর্মী, তা তাদের নানারূপ রীতি-প্রথা দেখেই বোঝা যায়।

প্রাচীন পারস্যে এজন্য পালিত হয় নওরোজ উৎসব। নববর্ষের ঠিক দ্বি-প্রহরে সূর্যের মহাবিষুবরেখা পার হবার মুহূর্তে প্রতিটি পরিবারের সদস্যরা পরিজনবর্গ এবং উপস্থিত আত্মীয়-বন্ধু প্রতিবেশীরা পরস্পরের হাতে সাতটি 'স' অক্ষর দিয়ে সুরু খাদ্যবস্তু দান করে শুভকামনা দান করতেন। বর্তমানে এটি ২১ মার্চ পালিত হয়। 'নওরোজ' অর্থাৎ নতুন দিনের উৎসবের বর্ণনা পারস্য উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আরো ভাল করে পাওয়া যাবে।

চান্দ্রমাস অনুযায়ী চীনদেশেও বসন্তকালে 'য়ুয়ান দান' বা 'নববর্ষের প্রথম ভোর'-এর প্রাক্কালে সম্বৎসরের ঋণশোধ, প্রতীকী চিত্র টাঙানো, নানাবিধ সুখাদ্য, নতুন চায়ের পাতার পানীয়, গৃহস্থালীর কাজেও ছুরি ব্যবহার না করা—প্রভৃতি লোকপ্রথা মান্য করা হয়। এ দেশে একদা পুরানো বছরের প্রতীক রূপে কাগজের ড্রাগন পুড়িয়ে পুরাতন বর্ষের পাপ বিদায় করে নববর্ষকে গ্রহণ করার রীতি ছিল। কলকাতার ট্যাংরা অঞ্চলের চীনা পল্লীতে এ উৎসব প্রতি বৎসর বেশ জাঁকজমক করে প্রতিপালিত হয়—সংবাদপত্রে তার বিবরণ বেরোয়।

জাপানে এই দিনটিকে উর্বরতার প্রতীক রূপে গণ্য করে নারী ও পুরুষের আদলে দুটি বড় পিঠা তৈরী করা হয়। এগুলি যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্যকে উৎসর্গ করা হয়। উত্তর ইওরোপের বিভিন্ন দেশে নতুন শস্য দিয়ে শুকরের অনুকৃতিতে একটি পিঠা তৈরী করে তাকে নববর্ষের দিন আনুষ্ঠানিকভাবে 'কেটে হত্যা' করা হয়। ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা নববর্ষের পূর্বেই তাদের কোমর বন্ধনীর সামনে নতুন শস্যের পিঠে গড়ে ঝুলিয়ে দেয়—সম্ভবতঃ এর পিছনেও কোনভাবে উর্বরতার প্রতীক কাজ করছে।

ইহুদীদের বৎসরের প্রথম মাস হল আবিব বা নিশান। এ মাসে এই সমাজের বড় উৎসব হল নিস্তারপর্ব (Pass over)—এটি ভারতীয় পঞ্জী অনুসারে মার্চ-এপ্রিল ধরা হয়। বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' বা 'পুরাতন নিয়ম' অংশে এই উৎসবের বিশদ বিবরণ বর্ণিত হয়েছে।

নেপালে কার্তিকী পূর্ণিমার পর দিন থেকে নববর্ষ গণনা করা হয়। ভারতে উত্তরাঞ্চলের অনেক স্থানে হোলিকে নববর্ষ রূপে গ্রহণ করা হয়। কেরল ও আসামে যথাক্রমে শরৎকালের এক বিশেষ দিনে ও 'বোহগ বিহু'-র দিন নববর্ষ পালিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ খ্রীষ্টধর্মী ও ইংরাজীভাষী দেশগুলিতে যে ১ জানুয়ারী নববর্ষ রূপে পালিত হয় তা সবাই জানেন। ইদানীং এই দিনটি সকল সমাজেই প্রায় আনন্দের দিন রূপে নানা আনন্দময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয়—তার মধ্যে সমাজসেবা প্রভৃতিও থাকে।

সর্বোপরি এখানেই মূল ভূখণ্ড শেষ। সুতরাং জনজীবন পর্যবেক্ষণের পক্ষে স্থানটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হল।

এখানে আজ কোন শহুরে প্রোগ্রাম হবার সম্ভাবনা নেই। তাই প্রথামত এখানে নাটকের মত অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হতে পারে। এমনই একটা দিন, যা হয়তো ক্ষণকাল পরেই লোকউৎসবের মর্যাদায় চিহ্নিত হয়ে যাবে।

ততক্ষণে মনে মনে একটা প্ল্যান ছকে নিয়েছি। যেটুকু সময় এখানে থাকব, তার প্রতিটি মুহূর্ত সযত্নে ব্যবহার করতে হবে। আমার অনভ্যস্ত চোখে আজকের দিনটিকে ক্যামেরার মত করে মনের পর্দায় তুলে নিতে হবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে দুপুর গড়িয়ে চলেছে। শুধু একটাই চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরছে—শহর কলকাতা থেকে আমি এখন কত দূরে। শেষ বাস ধরে সময় মত ফিরতে পারব তো? দুপুরে যে দোকানে ভাত খেয়েছিলাম, সে দোকানী আমার এই চিন্তা দেখে বলেছিল: 'সে যা হয় একটা কিছু হয়ে যাবে।'

•

ভাতের হোটেলের মালিকের নাম দিলাম না হয় রতন। আমার খাওয়ার ধরন দেখে, এই স্থান সম্বন্ধে এত কৌতূহল দেখে সে আমার প্রতি বেশ আকর্ষিত হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল: 'রাত্রে এখানেই খাবেন তো?'

তার কথায় আমি বিস্মিত হয়েছিলাম: 'আমি তো এখানকার লোক নই—ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি। এসে যা সব কাণ্ড শুনছি—'

আমার মন বুঝেই বোধহয় সে বলেছিল: 'দেখেই যান তাহলে সব কিছু। কলকাতার লোকদের এসব মেলা ভাল লাগবেই। আজকেই তো সুরু—শেষ হতে এখন ছ' সাতদিন তো বটেই।'

কথাবার্তার মাঝখানে একটা নোনা জলের মাছভাজা সে আমার পাতে দিল। তার একটা অন্য রকম স্বাদ।...রতন বোধহয় আমার মুড পরীক্ষা করছিল। নিজের আসনে বসে বলেছিল: 'রাতে মিঠে জলের মাছ খাওয়াব, এদিককার মাছ।'

রতন আমাকে যেভাবেই হোক কব্জা করতে চাইছে। ও চাইছে আমি যেন মেলা-টেলা সব দেখে রাত কাবার করে কাল ভোরে কলকাতা ফিরি। আমার অস্বস্তিটা কোথায়, তা তাকে জানাতেই হল—একটু ইশারায়। উত্তরে সে কোন কথা না বলে সোজা আঙুল দিয়ে ঐ ঘরের কোণায় একটা কাঠের মই দেখিয়ে দিল। বলল: 'উপরে উঠে সোজা শুয়ে পড়বেন—যান। সব্বোক্ষণ মাদুর পাতাই আছে। অনেকেই থাকবে ওখানে।'

চমৎকার!

তখন খেয়াল করলাম, ওর হোটেলঘরের ছাদটি কাঠের। তারও একটি তাহলে ওপরতলা আছে—তার ছাদটি কিসের কে জানে! আর জেনে আমার লাভই বা কি?

এরপর আর দ্বিধা নয়। রতন নিজের গরজে আমাকে একটা পান খাওয়ালে। তারপর রেডিওর ধারাবিবরণীর মত বলতে লাগল:

'এখান থেকে ঐ নাক-বরাবর রাস্তা দিয়ে সোজা হেঁটে যান। সেখানে পড়বে কাছারী বাড়ীর মাঠ। ঐ মাঠের ধারে কোন একটা চায়ের দোকানে চুপ করে বসে থাকবেন। এদিক-ওদিক করবেন না—করলেই মুস্কিল। কেউ না কেউ সে জায়গা কেড়ে নেবে। ওখানেই মেলা বসবে। মেলা চলবে গভীর রাত পর্যন্ত, তবে প্রথম রাত তো, জমতে একটু হয়তো দেরী-ই হবে। তবে বাবু, আমার এখানে তারই মধ্যে এক সময়ে এসে দেখা করে যাবেন। আপনাদের সেবা-যত্ন করে দিয়ে তারপরে আমার ছুটি—আমিও যাবো মেলায়। প্রথম দিনের গানটা বরাবরই ভাল হয়।'

রতনের নির্দেশটা একেবারে ঠিক ঠিক। এখানে দুপুরের ভাত না খেলে এত কথা জানা যেত না। রাত্রিবাসের সুব্যবস্থা হত না। ওর কথা থেকে মনে হচ্ছে, শুধু আমি নয়—মেলা শেষে আমি কেন, আমারই মত বহিরাগত আরো যাত্রীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারব ঐ 'মাদুর পাতা' ঘরে।

ধীরে ধীরে সব জেনে নিলাম রতনের কাছ থেকে। মেলায় যদি কষ্ট করেও সারারাত জেগে কাটাতে পারি, তবে ধীরে ধীরে চোখে পড়বে পুতুল নাচ, চড়ক গাছ, সং, যাত্রা, বাজি পোড়ানো, সংকীর্তন, রাধাকৃষ্ণ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি শতেক ব্যাপার। তার সঙ্গে মেলার দোকান তো আছেই। তবে ভীড় হবে খুব। যেহেতু আমি একা মানুষ, তাই লোকজনের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়ার কোন ভয়ই নেই!

দুপুর শেষ হতে না হতেই মেলাপ্রাঙ্গণের চারিদিক মেলার দোকানে ভরে গেল। গেল। রতন যেমন বলে দিয়েছিল আমাকে, সেইমত এখন শুধু পর্যবেক্ষণ করে যাওয়ার পালা। কাছারীবাড়ীর প্রাঙ্গণটা বেশ বড়। তবে ক্রমেই যে জনসমাবেশের জন্য স্থানটি সংকীর্ণ হয়ে উঠবে, তা বুঝতে পারলাম।

দোকানগুলিকে দেখলাম, প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলটি খালি রেখে দোকান বসাতে। এটাই চিরাচরিত রীতি—এখানে খবরদারি করবার কোন লোক দেখলাম না।

দোকানগুলির ঠিক পিছনেই একটা বিশাল দীঘি—তার ধারে পোঁতা আছে চড়ক গাছ। পুতুল নাচের ছোট তাঁবু পড়েছে ঐ অঙ্গনেরই একধারে। অন্যান্যবার আসে নাগরদোলা—এবার এখনও পর্যন্ত তার সাক্ষাৎ নেই।

প্রাঙ্গণের অপর ধারে হল কাছারী বাড়ীর বারান্দা। সমস্ত অনুষ্ঠান যেন ঐ দিকে মুখ করেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থানে মাটি দিয়ে কিঞ্চিৎ উঁচু একটা প্ল্যাটফর্ম মত করা হয়েছে। সেটাই হল পয়লা বৈশাখের মেলার জন্য নির্মিত যাত্রানুষ্ঠানের মঞ্চ।

বিদ্যুতের তেমন সমারোহ নেই, তাই অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের দ্বারা স্থানটি আলোকিত করার প্রচেষ্টা দেখা গেল। এখন পড়ন্ত বিকেলে জেনারেটর চালিয়ে তার একটি পরীক্ষা হচ্ছে। অবশ্য ছোট ছোট দোকানগুলির নিজস্ব হ্যারিকেন হ্যাজাক বাতি তো আছেই।

আঁধার একটু নামতেই মেলা প্রাঙ্গণের চেহারাই বদলে গেল। কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গণটি

লোকে লোকে ভীড হয়ে গেল। দোকানগুলিতে কেনাবেচা সুরু হয়ে গেল জোর কদমে। যারা দূর গ্রামের যাত্রী তারা আগে আগে মেলা দেখে বাড়ী ফিরবে। পুতুল নাচের আসরেও তাই—মাইকের চড়া শব্দে তাদের প্রোগ্রামের নাম ঘোষিত হচ্ছে। অবশ্য এর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে বাজছে যে চটুল হিন্দী গানের সুর, তা তো বলাই বাহুল্য।

আমার পরিচয় এখন একটাই—প্রতিবেদক, সমীক্ষক, দর্শক বা পর্যবেক্ষক।

লক্ষ্য করছি, এই ভীডেব মধ্যে মেলা প্রাঙ্গণটি এখন বেশ চিহ্নিত হয়ে এসেছে। এটি যে ঘণ্টা দুয়েক পূর্বেও ছিল কাছারী বাড়ীর খোলা প্রাঙ্গণ – তা এখন চিনতেও পারা যাচ্ছে না।

এই ভীড়ের মধ্যে প্রাঙ্গণের প্রধান প্রবেশ পথ দিয়ে এবার প্রবেশ করতে সুরু করল সং-এর দল। সং-এর দল সম্বন্ধে একটা পূর্ব ধারণা ছিল—বই পড়ে এবং চোখে দেখে, তবে সে সব অন্য স্থানে। আর এখানে যে সং-এর দল আসে তা বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও জনপ্রিয়, তা চাযের দোকানেই শুনেছিলাম।

চমকে উঠলাম। জনতাও সতর্ক হল—ভীড ঠেলে এগিয়ে আসছে এক বিশাল বিদেশী পাখী—পেলিক্যান। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে পেলিক্যান? পেলিক্যান কি এত বেশী পরিযায়ী পাখী যে এই ভরা গ্রীষ্মেও সুন্দরবনে এসে হাজির হযেছে? শামুকখোল-কাস্তেচরা-মানিকজোড়-গাংচিল দেশের লোকেরা তাহলে এ পাখীর সঙ্গেও নিশ্চয়ই পূর্ব হতে পরিচিত!

ভাল করে তাকিযে দেখি, প্রথম দৃষ্টিতে যাকে পেলিক্যান বলে মনে হয়েছিল, আসলে সেটা একটা বড-সড বকের মত, তবে পেলিক্যান জাতীয় পাখী বলে হঠাৎ দেখে ভুল হতে পারে। তার মুখটা ও ডানাটা ক্রমাগত খুলছে ও বন্ধ হচ্ছে।

না, পেলিক্যান নয়। তার মত।

বাখারি ও মোটা তারের ফ্রেমে কাপড়ের ডানা ও কার্ডবোর্ডের তৈরী ঠোঁট দিয়ে এই সং তৈরী হয়েছিল সে বছর। অবশ্য মধ্যে যে মানুষ আছেই—তা বলাই বাহুল্য। তবে শিশুরা যে সেই ডানা নাড়ানো মুখ নাডানো বককে দেখে প্রচুর আনন্দ পায়—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমার পর্যটক-মন যেন স্মরণ করতে পারল, কলকাতার উপকণ্ঠে তিলজলা-ট্যাংরা অঞ্চলের চীনেপাড়ায় তাদের নববর্ষ উৎসব উদযাপনের জন্য যে বৃহদায়তন ড্রাগন তৈরী হয—এ যেন প্রায় তারই মত। তবে একটা ড্রাগন তৈরীতে বাইরের সাজপোষাক ছাড়া আরো প্রায় পাঁচ-ছয় জন লোক থাকে—এক্ষেত্রে তা মাত্র দুজন দিয়েই হয়ে যায়। তবে চীনেপাড়ার ড্রাগন যত ঝলমলে—ও বাস্তবানুগ হয়, তার তুলনায় সুন্দরবনের পেলিক্যান যেন—

না, আমি এখন পর্যবেক্ষক মাত্র, বিশ্লেষক নয়।

সম্বিত ফিরতেই দেখি রণ-পা পায়ে বেঁধে হাঁটতে হাঁটতে ডাকাতের মত বেশভুষা করে চলে যাচ্ছে একদল লোক। সকলেই তাদের মাথা উঁচু করে দেখছে। একদা

বাংলাদেশে এরা ছিল, এখন প্রায় লুপ্ত প্রজাতির মধ্যে পড়ে,—হয়েছে গল্পকথার বিষয়বস্তু। ছোটোরা তাই তাদের গল্পকথার চরিত্রকে একবার স্বচক্ষে দেখে নেয়।

আমার মন বলে : 'বাপু, তুমিও তো একবার কাটোয়া শহরের কাছে সুদপুরে গাজনপর্বের সময়ে 'রণ পা' বোলান দেখার সুযোগ পেয়েছিলে—মনে নেই !'

সত্যিই তো ! রণ পা আজ এমন একটি রঙ্গ, যা নানা বিনোদন অনুষ্ঠানে আজ নিজের জায়গা করে নিচ্ছে।

দৃশ্য পাল্টে যাচ্ছে ক্রমাগত। সংকীর্ণ স্থান, প্রত্যেকের গায়ে গায়ে ধাক্কা, কোলাহল—তবু সব মিলিয়ে আনন্দ। আনন্দই তো—নববর্ষের আনন্দ !

এইভাবে পর্যায়ক্রমে আসরে প্রবেশ করে থুরথুরে বুড়ো-বুড়ি, বীর হনুমান, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ইত্যাদি। বুড়ো-বুড়ীর নির্বাক রঙ্গ-বিনোদন মুহূর্তের মধ্যে আসরে বইয়ে দিল কৌতুক প্রবাহ, আর বীর হনুমান তার লম্ফ-ঝম্প দিয়ে বাজীমাৎ করবার জন্য উঠে-পড়ে লাগে। মনে রাখতে হবে তখন 'দূরদর্শনের যুগ' নয়, আসেইনি বাজারে। তাং অংশগ্রহণকারীরা যে টিভি দেখে অনুকরণ করেছিলেন তা বলা যাবে না। তবে রাম-লক্ষ্মণ শুধু যেন তাদের কাব্যচরিত্রের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপনের জন্যই হাজির হয়েছিল।

আবার মেতে উঠল মহিষমর্দিনীর আবির্ভাবে। এই রঙ্গের তিন ভাগ : প্রথমে মহিষাসুর—তার বীররসের আস্ফালন, ছায়া যুদ্ধ। তার পরে সিংহের প্রবেশ। তার সঙ্গে মহিষাসুরের লড়াই, দুর্দান্ত লড়াই। সবশেষে দেবী দুর্গা। তার সঙ্গে প্রথমোক্তদ্বয়ের খানিক যুদ্ধ। তারপরই দেবীর অকালবোধনের মূর্তি নির্মাণ হয়ে গেল সবার চোখের সামনে। মুহূর্ত মধ্যে কোথা থেকে যেন ঢাক-ঢোল বেজে উঠল, বেজে উঠল শঙ্খধ্বনি ! বৈশাখেই অকালবোধন।

অন্তরে কে যেন স্মরণ করিয়ে দেয় ; 'তুমি তো বাপু ইদানীংকালে পুরুলিয়ার ছো নাচে মহিষাসুরমর্দিনী কতবার দেখেছো—এমনকি কলকাতার মাঠেও, তবে এসব দেখে এত কেতরে পড়লে কেন ?'

আবার মনই বলে : 'না বাপু, এ সব যে স্থানের ঘটনা, সেখানকার লোক কখনও পুরুলিয়ার ছো দেখেনি যে, তার অনুকরণ করে এসব করবে। আসলে এটি হল অন্তরের ব্যাপার। মনের টানে টানে হয়।'

সং-এর আনন্দ এক বিচিত্র আনন্দ। সেকালে সুন্দরবন অঞ্চলে এই ধরনের সং হত। তবে বৌবাজারে জেলেপাড়ার সমাজ-ভিত্তিক সংও বেশ নাম করেছিল—সেটা অবশ্য মূলতঃ সামাজিক দুর্নীতির বিষয়ে মূর্তি নির্মাণ করে করা হত, তবে পৌরাণিক বিষয়ও গুরুত্ব পেত। বার বার হুতোমের বইটার কথা মনে পড়ল। তারপর ইদানীং কালে তো দেখেছি লাইটের খেলায় কত রকমের সং। ডাইনোসর, প্রদীপ কুণ্ডলিয়ার বাড়ী ভেঙ্গে পড়া, রেল দুর্ঘটনা, যুদ্ধ দৃশ্য, বন্যার দৃশ্য, গণেশের দুধ খাওয়া, মাদার টেরেজার কাহিনী, সুকুমার রায় ইত্যাদির হাজারো বৈচিত্র্য।

মানুষ দিয়ে, প্রতিভা দিয়ে, লাইট দিয়ে কে জানে আরো কত রঙ্গ আসবে আগামী দিনে আমাদের জন্য !

তবে একশো-সোয়াশো বছর আগে শহর কলকাতার সং যে আজও সুন্দরবনে টিকে আছে—তা দেখে বড়ই ভাল লাগল। কে জানে, এর পরে এমন বিনোদন হয়তো সরতে সরতে শেষে বঙ্গোপসাগরে ঠাঁই নেবে !

সং দেখতে দেখতে ঘড়ি দেখতে যে ভুলে গেছিলাম, সেকথা স্বীকার না করে বরং বলা ভাল যে, অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানই তখন হয়ে চলেছিল—তা ও যেন দেখতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল। তার দু'-একটার কথা বলি এবার।

সংকীর্তনের দল প্রাঙ্গণের প্রধান পথ দিয়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে কখন, তা টের পাইনি। আমি তো পয়লা বৈশাখের সুন্দরবনে নতুন, কিন্তু যারা নিয়মিত দর্শক, তারা কিন্তু বহুক্ষণ আগেই সং-এর থেকে চোখ সরিয়ে কীর্তনগানে কান ও চোখ নিবেশ করেছে।

এদের দলের গান ধর্মবিষয়ক—ভক্তিভাবের। তাদের সঙ্গে বাদ্যভাণ্ড আছে নানা প্রকার। সবই দেশীয় ও প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র অর্থাৎ খোল, করতাল, মৃদঙ্গ ইত্যাদি। তখন সেদেশে কলকাতার বাদ্যযন্ত্র অনুপ্রবেশ করেনি। কীর্তনগান আগেও খালি গলাতে শোনা হয়েছে, তবে এই মেলায় পরিবেশের জন্য যেন তা একটু ভিন্নধর্মী হয়ে উঠল আমার কানে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ সব কীর্তনগানে নববর্ষ বিষয়ক কোন কথাই ছিল না।

এই সংকীর্তন দলের পিছে পিছে আসছে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ। সিংহাসনে বসানো এই যুগল-মূর্তি প্রত্যেকে মাথায় করে নিয়ে আসছে। তার—আগে গান পিছে গান। পরিবেশটি বেশ ভক্তিমূলক হয়ে উঠেছে। মনে হয় বাইরের মাইকে এখন বোধহয় হিন্দী গানের বিরতি চলছে। লক্ষ্য করি, সিংহাসনটি আসল না নকল ফুল দিয়ে সাজানো। আবার অতি উৎসাহী ব্যক্তি কেউ কেউ দেখছি সিংহাসনের ভিতরে টুনি আলোর ব্যবস্থা করেছেন।

'এখানে কি এত রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে ?' পার্শ্ববর্তী দর্শককে তার পরিচয় না নিয়েই প্রশ্ন করেছিলাম।

'না না, তা কেন ! এখানে যে সব গৃহে নিয়মিত রাধাকৃষ্ণের পুজার্চ্চনা হয়—তাদের বাড়ির বিগ্রহ এসব।' সেই লোকটি বলেছে আমায়। তার মানে উত্তরদাতা এ অঞ্চলের পুরাতন বাসিন্দা এবং সম্ভবতঃ বৈষ্ণবও।

সেই সব গৃহস্থ বছরে একবার করে এই যুগলমূর্তি বাইরে বের করে আনেন এই পয়লা বৈশাখে। এই অনুষ্ঠানের শেষে কাছারী বাড়ীর বারান্দায় জনসাধারণ্যে তা প্রদর্শিত হয়। স্থানীয় নামী-দামী লোকেরা তা পর্যবেক্ষণ করে বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ করেন। এর পর সাতদিন সেগুলি এখানে থাকে তারপর অনুষ্ঠান শেষে যে যার গৃহে ফিরে যান। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য

এবং একসঙ্গে এতগুলি নামী পরিবারের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি দেখবার জন্য শুধু সুন্দরবনই নয়, দূর-দূরান্ত গ্রাম থেকেও জনসমাগম হয়।

সং দেখা হল, শোনা হল সংকীর্তন, দেখা হল রাধাকৃষ্ণ। এ যেন একটি মঞ্চে দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনয় হয়ে চলেছে।

এদিকে প্রাঙ্গণের মধ্যস্থান তখন আরেক উত্তেজনার জন্য তৈরী হচ্ছে। এক বিরাট তিনতলা বাড়ীর সমান বাঁশ পোতা হয়েছে সেখানে। তার গায়ে নানা ধরণের বাঁশ-বাখারি এড়োএড়ি বাঁধা। দেখতে হয়েছে যেন এক গাছের মত। নকল গাছ হলেও সে এক বিচিত্র বাহার!

সত্যিই কিন্তু ওটা গাছ নয়—ওটা হচ্ছে আতসবাজী পোড়াবার একটা কাঠামো। যে সব বাঁশ-বাখারী গাছের আকারে বাঁধা হয়েছে,—যেন ঠিক গাছের শাখা-প্রশাখা, ওগুলিতেই বাঁধা আছে নানারকম আতসবাজি। বাঁধবার কৌশলে আসল প্রক্রিয়ার সময়ে তা হয়ে উঠবে অভিনব।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাজী পোড়াবার প্রাথমিক উদ্যোগ পর্ব শেষ হল। সমবেত জনতা চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালো। এদিকে কাছারী বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ তখন ফাঁকা। আমাকেও তখন একটু স্থান বদল করে বসতে হল যেন এই অনুষ্ঠানটিও ভাল করে দেখতে পারি। এই মেলার ভীড়ের চরিত্র ততক্ষণে আমার অনুভব করা হয়ে গেছে—তাই এবার আর কোন অসুবিধা হল না।

সহসা কোথা থেকে যেন একটা উড়ন তুবড়ীর খোল ঐ জায়গায় এস পড়ল। অর্থাৎ অন্য কোন স্থান থেকে কেউ ওটা আকাশে উড়িয়েছিল—এরা তা দেখতে পায়নি। আসলে এটা হল ইঙ্গিত যে, এবারে এদেরও ঐ অনুষ্ঠান সুরু করতে হবে। তাহলে কি এটা একটা প্রতিযোগিতা হচ্ছে?

মুহূর্তের মধ্যে রাতের কালো আকাশে হাউইয়ের লড়াই সুরু হয়ে গেল। সমস্ত আকাশ চিরে ফালা-ফালা করে হাউইগুলো যেন সেদিন গগন-সম্রাটের মত আচরণ করল। তার মহিমা শেষ হতে না হতে আর দুটো উড়ন তুবড়ী সবেগে সশব্দে এদিক-ওদিক করে চলে গেল আকাশে আলোর রেখা রচনা করে। তারপর সেগুলি আকাশ থেকে খসে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে, তার থেকে প্যারাসুট বেরুল, তার সঙ্গে একটা মিনি-মানুষ! সে এক অভিনব দৃশ্য, ফূর্তির চূড়ান্ত! অপর একটা উড়ন্ত তুবড়ী আকাশে সবেগে উঠে সশব্দে ফেটে গেল এবং পর মুহূর্তে ছটা আলোর বল তা থেকে বেরিয়ে এল এবং সেগুলো পরস্পর সংযুক্ত হয়ে মালার মত আকাশে দুলতে দুলতে বাতাসের টানে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

সবার মন তখন ভরপুর।

তারপর গাছবাজীর কথা। এমন অভিনব বাজী-সজ্জার কথা লিখতে গেলে এ প্রতিবেদন আরো দীর্ঘ হয়ে যাবে। পরিবর্তে এ সম্বন্ধে যারা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চান তাদের প্রতি পরামর্শ, বর্দ্ধমান জেলার মেমারী স্টেশন থেকে বিটরাগামী বাসে চলে গেলে সেই গ্রামটায় একই দিনে এই দৃশ্য খুব সমারোহের সঙ্গে দেখতে

পারেন। অথবা কাটোয়া শহরের নিকটে মোস্তাফাপুর গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসে মাদার পীরের উৎসবে গেলেও কিংবা ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে মুর্শিদাবাদে লালবাগে গেলে কিংবা—

না থাক, তালিকা বৃদ্ধি করে লাভ নেই। তার থেকে এইসব বাজী নির্মাতাদের সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ পেলাম—তাই বলি এবার।

যারা বাজি পোড়ালেন, এরাই তার কারিগর। সুন্দরবনের এ সব অঞ্চলে বেশ কিছু নামী-দামী কারিগর আছে, এরা শহরাঞ্চলে যান না। স্থানীয় উৎসবাদিতে বাজী তৈরী করে পোড়ান। তবে এটাই তাদের একমাত্র জীবিকা নয়। এরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী বা সূত্রধর জীবিকা-নির্ভর। এ সব গ্রাম-দেশে দু' তিন মাইল তফাতে তফাতে নববর্ষের উৎসব হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠানটি করেন—তাতে এ সব শিল্পের বেশ চাহিদা আছে। তবে উপযুক্ত ও আধুনিকভাবে প্রচার করতে না পারলে চাহিদা হবে কেন?

এখানে আজ যেসব অনুষ্ঠান হচ্ছে, তার কোনটিই বহুদূর থেকে দেখা বা শোনা যায় না। যেহেতু সমগ্র অনুষ্ঠানটিই হয় রাতের অন্ধকারে, তাই একমাত্র বাজী পোড়ানোর অনুষ্ঠানটি বহু দূর থেকে দেখা যায়। হঠাৎ আকাশে ছুটে যায় তার আলোর রেখা। হাউই ও তুবড়ি তৈরীর কৌশল তো খুবই উন্নতমানের।

রাত বাড়ছে। আশেপাশের সমগ্র অঞ্চল যেন নিশুত হয়ে যাচ্ছে, জেগে আছে শুধু এই মেলাস্থলটা।

জনতা কি কমে যাচ্ছে? তারাও কি ধীরে ধীরে ঘুম-কাতুরে হয়ে পড়ছে? হতেও পারে! এতক্ষণে হয়তো অনেকেই দূরের গ্রামের লোকেরা যে যার ঘরে ফিরেছে। কেউ বা হয়তো রতনের দোকানে ভাত খেয়ে ওখানেই গড়িয়ে নিচ্ছে একটু। আমার মত ভবঘুরে যে এ মেলায় কিছু আছে—তা টের পাচ্ছি ক্রমেই।

কিন্তু না, হিসাবে ভুল আমারই।

বেশ ভাল সংখ্যক দর্শক তারা গিয়ে আড্ডা জমিয়েছে যাত্রার আসরে আর পুতুল নাচের তাঁবুতে—তাই মূল প্রাঙ্গণটা একটু ফাঁকা লাগছে।

পুতুল নাচের পালা? হতেও পারে। প্রচলিত চীৎপুরী যাত্রার কোন পুতুল সংস্করণ। ইদানীং তো মা-মাটি-মানুষের জয়-জয়কারটা বেশী। অচল পয়সাও প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই পাল্লা দেয়। লায়লা-মজনুর গল্প তো সব সময়েই জনপ্রিয়। একবার নাকি এসেছিল কপালকুণ্ডলা।

এবারে সুধন্য পরামাণিকের দল। এদের বাড়ী কাছেই—বকুলতলা। সেখানে সরকারীভাবে খনিজ তৈল অনুসন্ধানের শিবির বসেছিল। সেই বকুলতলার কাছে করালীচক গ্রামে সুধন্যর বাস। তার কোম্পানীর নাম—'কমলা পুতুল নাচ কোম্পানি'—কাপড়ের ফেস্টুনটা তাঁবুর বাইরে টাঙ্গানো।

চোখে তখন ঢুলুনি এসেছে। ইচ্ছা থাকলেও আর পুতুল নাচের তাঁবুতে

ঢোকা হল না। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে শুনলাম সখী নৃত্যের গান। ওদের সাজ-পোষাক, নৃত্য-ভঙ্গিমা সব দেখতে পাই কল্পনেত্রে—ঘোষপাড়ার সতীমার মেলায় যে ফি বছর বগুলার পুতুল নাচ পার্টির প্রোগ্রাম দেখতে হয় আমাকে।

আর দেখা হল না যাত্রার অনুষ্ঠান। তখন সেখানে জমিয়ে চলছে পালাগান—বোধহয় কোন সামাজিক পালা হচ্ছে আজ। হয়তো তার নাম 'শাঁখা দিও না ভেঙ্গে' বা 'বিধবার বিয়ে' জাতীয় পালা। তার গান শোনা যাচ্ছে মেলা প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত। এরাও সবাই স্থানীয় দল। এটাই যে এদের একমাত্র জীবিকা নয়—তা সবাই জানে।

আজকে রাত এক সময়ে শেষ হবে। তারাও বাড়ী যাবে। যে যার মাঠে নেমে পড়বে লাঙ্গল নিয়ে, দোকান খুলে বসবে যার যেমন ব্যবসা। তবু পয়লা বৈশাখের এদিনকার যেটুকু অতিরিক্ত আনন্দ, যা এরা দেয় বা পায় স্বতস্ফূর্তভাবে, তা দিয়েই এদের চালাতে হয় সারা বছর।

এখন আমার একমাত্র ঠিকানা রতনের দোকান।

রাত এখন কত, তা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে না। ঠাণ্ডা ভাত আর মিঠা জলের মাছ হয়তো পাওয়া যাবে, তবে কাঠের মাচার বিছানায় সেই খেজুর পাতার চাটাই আর তেলচিটে বালিশ আর একটাও খালি আছে কি না জানি না। অনেকেই তো আছে এখন সেখানে!

সেক্ষেত্রে আমার কাঁধের ঝোলাব্যাগটাই হবে আমার আজকের রাতের বালিশ! অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে হয়তো বছরের প্রথম দিনটি! □

মৃৎশিল্পই সম্ভবতঃ
মানুষের আদিম শিল্পকলার
একটি অন্যতম প্রধান ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।
প্রয়োজনীয়তার স্তর ছাড়িয়ে
তা যেদিন চলে এল অপ্রয়োজনীয়তার স্তরে এবং
কালক্রমেও তাকেও ছাড়িয়ে উন্নীত হল
এক প্রয়োজনীয় নান্দনিকতার স্তরে—
তখন সে শিল্পশাস্ত্রীর নজরে হয়ে উঠল যথার্থই এক শিল্প।
টেরাকোটা-বিজ্ঞান তাকে এ বিষয়ে করে
তুলল আরো স্থায়ী শিল্প।
'কাঁচায় তুলতুল পাকায় সিঁদুর'
বাংলা হেঁয়ালীর এই রূপটি যেদিন সে আবিষ্কার করল
সেদিনই সে নান্দনিকতার চর্চায় এগিয়ে
গেল যেন বেশ কয়েক ধাপ।

লোকশিল্প-১

তাই অতি প্রয়োজনীয় বস্তু
হাঁড়ি, সরা, টব, থালা, পিলসুজ, ঘট, পিদিম
তারই আঙুলের চাপে
রূপায়িত হয়ে উঠল শিল্পরূপে।
এভাবেই শিশুতোষ খেলনা
একদিন রূপায়িত হয়েছে সত্যকার শিল্প নৈপুণ্য।
তাই, পাঁচমুড়ার মাটির ঘোড়া একদিন পরিণত হল
নয়নসুন্দর শিল্পকলায়—
গাছতলায় দেবতার থান থেকে
তা সরাসরি চলে এল 'অভিজাত' অভিজাতের ঘরে।
এভাবে নিত্য কত শিল্প প্রয়োজনীয়তার উর্ধে
উঠে প্রকৃত শিল্পে পরিণত হচ্ছে—
আর তখনই এগিয়ে আসেন পর্যবেক্ষক ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য।

বাবুইজোড়ের হাতী-ঘোড়া

রাস্তার বাঁ পাশে পড়ল একটা সিজ মনসার গাছ।

এই গাছটাকে আমি এতদিন বলতাম কাঁটা মনসার গাছ, ফণিমনসার থেকে এটা খানিকটা পৃথক দেখতে। গ্রাম দেশে এটা বরাবর সিজ নামেই পরিচিত।

সিজ গাছের নীচে খানিকটা অংশ মাটি দিয়ে উঁচু করে বেদী করা হয়েছে।

প্রাক-মধ্যাহ্নকালের আলোয় ঐ ক্ষুদ্র স্থানটি বেশ আলোকিত। চোখে পড়ল, সেখানে ছড়ানো শুকনো বাসি ফুল, সিঁদুরের ফোঁটা, ছেঁড়া মালা, ধূপ-দীপ— দেবী-পূজার নানা সরঞ্জাম। আরো কিছু চোখে পড়ল সেখানে—যার পরিচয় তখনও আমার অজানা।

'কি দেখছেন অমন করে?' নরেশ আমার হাত ধরে টান দিল: 'ছায়ায় এসে দাঁড়ান। মাথায় রোদ লাগবে।'

নরেশের কথা মানলাম—এটা ওদের গ্রাম, এখানে আমি বেড়াতে এসেছি। সকালে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ওরই সঙ্গে গ্রাম-পরিক্রমা করেছি। তখন চোখে পড়েছে এ গ্রামের নানা খুঁটিনাটি। তবে এ গ্রামে হিন্দু-মুসলমান প্রায় পাশাপাশি অবস্থান দেখে মনের মধ্যে অজানিতে একটা অস্বস্তি তৈরী হল। মসজিদ-দরগা সবই আছে। সে সমাজের পাল-পার্বণও হয়—সে সম্বন্ধেও পরে কিছু শুনেছি।

যাকগে, ফিরে আসি নিজের কথায়; তারপরে নরেশ বলেছিল: 'এ একটা সাধারণ গ্রাম। রোদে রোদে ঘুরে করবেন কি! তার চেয়ে বরং ঘরে বসে—'

ইত্যাদি যা হোক একটা প্রস্তাব। পরিবর্তে এখানে, এই সিজ-মনসার নীচে একটি দেবস্থানে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করি তাকে: 'এখানে কি হয়?'

'অমুক ঠাকুরের পুজো।' ও খুব নিরাসক্ত ভাবে উত্তর দেয়, যেন এ গ্রামের ও জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে ওর কোন কৌতূহলই নেই। অথচ ও কিন্তু মাস্টার, এখান থেকে দুটো গ্রাম পেরিয়ে একটা স্কুলে কাজ করে। সম্পর্কে আমার ছাত্র, তাই একদা কথাচ্ছলে বলেই ফেলেছিল যে সে এ গ্রামের যত খবর রাখে অত খবর কেউ দিতে পারবে না।

এসব বহু পুরাতন কথা। অন্ততঃ বছর কুড়ি তো হবেই।

গ্রামটির নাম বাবুইজোড়। বীরভূমের সিউড়ি হতে বাসে প্রায় ঘণ্টাখানেকের মত সময় লাগে। মানচিত্রে খয়রাশোল থানার অন্তর্গত। সে সব দিনে এ গ্রাম অবধি বাস আসতো না। অন্য পথে হিংলা নদীর বাঁধ-পথ দিয়ে যেতে হত হাঁটা পথে। বিহারের প্রায়-সীমান্তে এই গ্রাম। এখন অবশ্য বাস এসে থামছে বাবুইজোড়ের হাটের মধ্যে।

'ঠাকুরের থান যদি, তবে ঠাকুর কই?'

বেশ কৌতূহলী চোখে থানটি দেখতে দেখতে আত্মগত ভাবে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করি আমি ; নরেশ কিন্তু তেমনই নিরুত্তর। আমার অভিজ্ঞ চোখে সেখানে কোন প্রতিমা চোখে পড়ল না। আছে অনেক ছোট-বড় মানতের ঘোড়া—আর পাঁচ জায়গায় যেমন দেখা যায় আর কি।

'ঐ তো সামনেই—'

বলে, অঙ্গুলি সংকেতে নরেশ যা দেখালো ঐ ঠাকুরের থানে—তা হল দুটি বড়া-বড়ো মৃৎমূর্তি—হাতী ও ঘোড়া। কারুকার্যময় পোড়ামাটির মৃৎশিল্প নিদর্শন। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখতে হয় এর শিল্পসুষমা। সাদামাটা কাজ হলেও অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত।

এগুলি কোথায় তৈরী হয়? এ গ্রামেই কি? কারা এগুলি তৈরী করে? এগুলি দেখতে তো অনেকটা বাঁকুড়ার বিখ্যাত হাতী-ঘোড়ার মতই তবে কি এগুলি তারই আদলে নির্মিত? এর উৎপাদন স্থান কি তবে বাঁকুড়াই—এরা শুধু এখানে কিনে নিয়ে এসেছে? এটা কোন ঠাকুর? স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে গেরাম ঠাকুর তাই কি?

বেশ বিমূঢ় হয়ে বোধহয় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম আমি এইসব ভাবতে ভাবতে। নরেশ আমাকে দেখে বলল, : 'এ ধরনের হাতী-ঘোড়া আর কোথায় দেখেছেন বলুন তো?'

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে আমার উত্তরটা ওর জানা বলেই প্রশ্নটা করল। তাই পরের মুহূর্তেই বলল : 'এসব কিন্তু এ গ্রামেই তৈরী হয়।'

আমার হৃদপিণ্ড প্রায় লাফিয়ে উঠতে চাইল শরীরের ঐ বদ্ধ সীমিত স্থানের মধ্যেও : 'তুমি তাদের চেনো? তাহলে ভাই আমাকে একবার নিয়ে চলো তাদের কাছে। এলামই যখন তোমাদের গ্রামে, একটা কিছু তবু—

'কি, কিছু কিনবেন? কিনতে হবে না, এমনই পাইয়ে দেবো'খন।'

কথাটা বলেই ও সুর পাল্টালো : 'সে তো পালেদের পাড়ায়—অতদূর যেতে পারবেন কি আপনি?' বলতে বলতে কেমন যেন অপরিচিতের মতো আমার পানে তাকাল নরেশ। যে আমি অণ্ডালে নেমে কত কাঠ-খড় পুড়িয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ দিয়ে পাণ্ডবেশ্বর বা ঐ জাতীয় একটি ষ্টেশনে নেমে লোককে জিগ্যেস করে হিংলো নদীর বাঁধ ধরে রোদ আর বৃষ্টি দুটিই সহ্য করে এই বাবুইজোড় গ্রামে এসেছি—সেই আমি, গ্রামেরই অন্য পাড়ায় একটি সুন্দর মৃৎশিল্পের সন্ধান পেয়েও সেখানে যাবো না—ও ভাবল কি করে?

অথচ এ গ্রামের নাম আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। অন্য সূত্রে ও গাঁয়ের নাম জেনেছি একটি ছড়াগান থেকে। গ্রামটি যে নিতান্ত ছোটখাটো নয়, তা গ্রাম পরিক্রমার সময়েই বুঝতে পেরেছি। যে কারণে এই গাঁয়ের নাম বইয়ে

উঠেছিল একদা, তার কারণ এই হাতী-ঘোড়া ঘটিত ব্যাপার নয়—বন্যার জন্য। ১২৩০ বঙ্গাব্দে দামোদর নদে যে বিধ্বংসী বন্যা এসেছিল, সে সংবাদ জানিয়েছেন আমাদের তৎকালের লোককবিরা। তখন তো আর সংবাদপত্র ছিল না, তাই এইসব লোককবিরাই তাই নিয়ে ছড়া বেঁধে লোকের কাছে প্রচার করতেন। গ্রামের লোকেরা তা থেকে এসব কথা টের পেত, জানিয়ে দিত অন্যান্য সকলকে। সেই রকম একটি গানের বর্ণনায় আছে এ গাঁয়ের নাম :

ভাঙ্গলো আদগাঁভাড়া

ভাঙ্গলো আদগাঁভাড়া গোপের পাড়া ভাঙ্গলো বাবুইজোড়

তারপর ভাঙ্গিল যে নপুর বল্লভপুর—প্রভৃতি।

আজ কতদিন আগে পড়েছিলাম এই দীর্ঘ ছড়াটি—তাতে অনেক গ্রামের নাম আছে। বন্যার জল চারদিকের গ্রাম ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে কীভাবে এগিয়ে আসছে, তার এক চিত্রময় বিবরণ ছিল সেটা। বোধহয় গৌরীহর মিত্রের 'বীরভূমের ইতিহাস' গ্রন্থে আছে এই ছড়াটা। লেখক নিজেও ছিলেন বীরভূমেরই কৃতী সন্তান। পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতিবিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এই ছড়াটি ব্যবহার করেছিলেন তার 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (পৃ. ৬৫৮)।

নরেশের সঙ্গে এ গ্রামের পালপাড়ায় যেতে যেতে এসব কথা মনে হচ্ছিল তখন। অবশ্য নরেশও একদা জানিয়েছিল আমায়, হিংলা নদীতে বাঁধ দেবার আগে পর্যন্ত দামোদরের বান এখানে খুবই পরিচিত ছিল। তাই বাবুইজোড় গ্রামের আজকের ছেলেরাও জানে অতীতের সেই দামোদরের বন্যার কথা। এখনও যে হয় না তা নয়। তবে সংবাদপত্রে সে সংবাদ থাকে। এখন তো আর লোককবির দিন নেই!

সেদিন ছিল বিজয়া দশমীর পরের দিন। বাবুইজোড় গ্রামের সব পাড়াতেই সেদিন সব বস্তির লোকেরই একটু বিশ্রামের দিন। লোক-লৌকিকতা, সামাজিকতা আত্মীয় কুটুম্বের দিন। ও দিনটায় এসব শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে আমার এই অনুসন্ধান পর্বটি বোধহয় ঠিক হল না।

এই অনিশ্চিত মন নিয়েই চলে এসেছি কুমোর পাড়ার কাছাকাছি। মাত্র পনেরো কুড়ি ঘর তো ছিল সর্বসাকুল্যে তখন—এখন কত হয়েছে তা বলতে পারিনে। সব গ্রামেতেই দেখেছি, তাঁতীপাড়ায় ঢুকবার আগে তাঁতের ঠক-ঠক-ঠক শব্দ পাওয়া যায়। বেতের ধামা-কুলো পাড়ায় দেখেছি শিল্পের পরিত্যক্ত বা বর্জিত অংশগুলো কাছাকাছিই কোথাও পড়ে থাকতে—আর নাকে আসে কাঁচা বাঁশের গন্ধ। তেমনি পালেদের পাড়ায় ঢুকতে গেলেই চোখে পড়ে পথের ধারে ধারে যেখানে যেটুকু ঠাঁই পেয়েছে মাটির তৈরী নতুন পাত্রগুলি রোদে শুকোতে দেওয়া।

'এরা সাধারণত রোজকার প্রয়োজনের হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদিই তৈরী করে'—যেতে যেতে বলছিল নরেশ : 'হাতী-ঘোড়া তৈরীর ব্যাপারটা একেবারেই গৌণ। কুম্ভকার হলেও এখন প্রধান জীবিকা হল চাষবাস। হয় নিজের জমিতে নয়, পরের ক্ষেতে।'

আসলে, তাদের গ্রামের এক সুন্দর শিল্পকর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছি বলে নরেশ এতক্ষণ পরে যেন আমার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু গুরুত্ব দিল বিষয়টায়।

পোড়া মাটির নানা বস্তু নির্মাণে বঙ্গীয় শিল্পীদের দক্ষতার নানা কথা জানেন সবাই। সব কথাই যে আজ সবার সামনে সমান ভাবে এসেছে এমন নয়। হয়তো আরো অনেক বস্তু আছে এখনও এমন সঙ্গোপনে, যাকে অনুসন্ধান করে প্রকাশ করার কাজ আজও বাকী।

নরেশ এখন আমার গ্রাম ভ্রমণের সঙ্গী হলেও, আমি একটু মনভোলা ভাবে প্রায় স্বতন্ত্র হয়ে পথ হাঁটছি এবং সে যাত্রাপথে তার গ্রামের নানা লোকের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সামাজিক-আর্থিক কথাবার্তা সেরে নিচ্ছে। তবে লক্ষ্য করলাম মানিক পাল নামক ব্যক্তিটিকে এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে কি না —সে বিষয়েও দু' একজনকে প্রশ্ন করছে। সত্যিই তো —তারও তো একটা জীবন আছে!

পুরুলিয়ার ছৌ নাচ রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যাবার পর একদল লোক-সংস্কৃতিপ্রেমী ভেবেছিলেন হয়তো আরো কিছু লুপ্ত রত্ন রয়ে গেছে এ দেশে এখনও, যার পূর্ণ পরিচয় জানি না আজও। তাই তারা হাওড়া জেলার কালিকাপাতারি নাচের সম্বন্ধে বেশ কিছুদিন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেছিলেন—এই চিন্তা মাথায় নিয়েই অবশেষে এসে দাঁড়ালাম গ্রামের এক প্রান্তদেশে মাণিক পালের বাড়ী।

ওর ঘরের সামনের দাওয়াটাই হল ফ্যাক্টরী, স্টুডিও, ওয়ার্কশপ, ল্যাবরেটরী এবং সব। একটি কুমোরের কর্মশালায় যা যা দেখেছি এ যাবৎ—তা সবই আছে এখানে। কোন প্রকার আধুনিকতার চিহ্ন নেই এখানে।

উঠানে পেঁপে গাছের বড় বড় পাতা বেশ ছায়া বিস্তার করেছিল। তার মায়া কাটিয়ে মাণিক পালের অনুরোধে তার কর্মশালার দাওয়াতেই উঠে আসতে হল। তখনও তার সঙ্গে আমার মৌখিক আলাপ হয়নি—তবু মনে হল, এ গ্রামে একটি নতুন লোক এসেছে এবং সে হয়তো তার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে, এ সংবাদ কোনভাবে অগ্রিম পেয়েছিল। কথাটা মনে হতেই নরেশের দিকে তখন একবার অন্যভাবে তাকিয়েছিলাম। তাহলে হয়তো আমি এতক্ষণে আমার উদ্দেশ্য নিয়ে ওর কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পেরেছি।

কথাবার্তায় মাণিক পাল মোটেই শহরমনস্ক নয়, তবে নিজের ভাব ও গুণ সম্বন্ধে বেশ সচেতন। তার ওয়ার্কশপের একধারে সদ্য তৈরী হওয়া একটি হাতী ও ঘোড়া দেখতে পাচ্ছি—বেশ কাঁচা আছে এখনও। আজ ঘটনাচক্রে আকাশটা বিশেষ পরিষ্কার নয়, তাই —

'কি করব বলুন—এ ভাবে তো বাইরে শুকুতে দেওয়া যায় না।'

নিজে থেকেই বলল সে, অবশ্য তার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মূর্তিগুলির

প্রসঙ্গ কথা

কোন কোন স্থান বিশেষ ধরণের শিল্পোৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠার রেওয়াজ নতুন নয়। সমগ্র ভারতের কথা বাদ দিলেও বঙ্গদেশে বস্ত্রবয়নের কৌলিন্য মিষ্টান্ন প্রস্তুতের মনোহারিত্ব, নানাবিধ হস্তশিল্প উৎপাদনের চমৎকারিত্ব ও অন্যান্য নানাবিধ কারণে এ দেশের বহু স্থান বহুদিন ধরে বিশিষ্ট হয়ে আছে।

বাঁকুড়া জেলার পোড়ামাটির হাতী-ঘোড়ার প্রসিদ্ধি প্রায় এই ধরনেরই। গৃহ সজ্জার উপকরণরূপে এদেশের সর্বত্র তো বটেই এমন কি বিদেশেও তা যথেষ্ট সমাদৃত হচ্ছে। অথচ এগুলির উৎপাদনের মূল উপাদান কীই বা এমন! পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পের সৌন্দর্য আজ প্রায় প্রবাদতুল্য হয়ে উঠেছে। ঠিক কবে থেকে এই পাঁচমুড়া জনসমক্ষে এসেছে, তা আজ গবেষণার বিষয় হলেও,—কার শিল্প-সম্ভারের জন্য আজ তার বিশ্বজোড়া নাম। পশ্চিমের সকল উন্নত দেশেই নাকি বিমান যোগে যাতায়াত করে বাঁকুড়ার হাতীঘোড়া। কাগজে কাগজে তার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ যে কতবার হয়েছে—তাও বোধহয় বর্ণনাতীত।

কিন্তু প্রায় সময়েই দেখা যায় এ জাতীয় খ্যাতি কতগুলি প্রাকৃতিক ও আর্থিক কার্যকারণের যোগফলের জন্যই কোন বিশেষ ক্ষেত্রের ভাগ্যে জোটে। তাই সেগুলি ক্রমেই বিখ্যাত হয়ে যায়। হয়তো অন্যত্রও ঐ জাতীয় শিল্প ইত্যাদির চর্চা হয়। কিন্তু প্রতিকূল প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের এবং সর্বোপরি গণমাধ্যমের জন্য তা লোকসমাজে এতটা ঠাঁই পায় না।

বাবুইজোড় গ্রামের মাটির হাতী-ঘোড়া শিল্প সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করা যেতে পারে। এখান থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে বিহারের সাঁওতাল পরগণা। এ গ্রামের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ রক্ষার মত কয়েকটি উপায় থাকলেও—একদা প্রায়-ক্ষেত্রেই কমপক্ষে তিন-চার মাইল পথ হেঁটে এই গ্রামে ঢুকতে হত। তখন পূর্ব রেলপথের অণ্ডাল-সাঁইথিয়া লাইনের পাণ্ডবেশ্বর ষ্টেশনে নেমে পশ্চিমে আর একটি শাখা লাইনে আঠারো কিমি গিয়ে বহড়া ষ্টেশন। সেখান থেকে কিঞ্চিদধিক চার মাইল গেলে এই গ্রাম। ট্রেন পথে দুবরাজপুর নেমে সগরভাঙ্গাগামী বাসে এসে হিংলোবাঁধের ধার দিয়ে হেঁটে তিন মাইল গেলেও আসা যায়। এখন অবশ্য সিউড়ী থেকে সরাসরি বাস যায় এই গ্রামে। বর্তমান সমীক্ষক কিন্তু এখানে পুরাতন দিনের অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করেছেন।

এই সব মৃৎশিল্পীদের প্রধান আর্থিক জীবিকা কৃষিকাজ হলেও বংশগতভাবে এরা কুম্ভকার শ্রেণীর বলে কৌলিক বৃত্তি সম্বন্ধে কিছুটা নিয়ম-নিষ্ঠা বজায় রাখার চেষ্টা করে। সারা বৈশাখ মাসে এরা মৃৎশিল্পের কাজ করে না। উক্ত সময়ে গ্রাম সমাজে কুম্ভকার উৎপাদিত গৌণ উৎপাদনগুলির চাহিদার কম থাকে। মাটি থাকে জেঠ চৌচির। তাই প্রাকৃতিক কারণেই তারা এ কাজ বন্ধ রেখে চাষের কাজে মন দেয়। চাষের কাজের অবসরে এই বৃত্তি।

গঠন কৌশল দেখা হয়ে গেছে আমার। এ ছাড়া আর যে সব গৃহস্থভোগ্য সামগ্রী তৈরী হয়ে আশ পাশে ছিল, সেদিকেও চোখ গেল :

'ওগুলো আজই সাঁঝের বেলা পোনে তুলব। হাটের দিন যাবে, সব বিক্রি হবে, বলল সে : 'বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ও মাস্টার, দাও না একটু ব্যবস্থা করে।'

নরেশের করার কিছুই ছিল না। কোথা থেকে দু-চারখান থানা ইট জুটিয়ে নিয়ে এসে তার ওপর নিজের হাতের খবরের কাগজটা পেতে দিয়ে আমাকে সেখানে বসার ইঙ্গিত করল। এত সব দেখে আর শুনেও আমার মন ভরছে না। আমি অস্বস্তিতে পড়ে বললাম :

'সবই তো দেখছি। তবে এই হাতী ঘোড়া নিয়ে আমার আগ্রহটা বেশী—তা তো বুঝছেন। আচ্ছা, ওটা তৈরী করবেন কি করে? ছাঁচ আছে নাকি?—

আমার প্রশ্নে অবাক হয়ে তাকায় মাণিক পাল। এসব জিনিস যে ছাঁচে হয় না —মানে করাই যায় না, এ জ্ঞান আমার নেই দেখে বোধহয় বিস্মিত হল! তবু মুখে ভদ্রতা করে বলল : 'সবে পুজোর দিন কটা সেরে উঠলাম। এখন ঘরে কাজ করতে ইচ্ছা করে—বলুন?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিই : 'এই তো একটা হাতী তৈরী করেছেন সদ্য-সদ্য—তাহলে?'

'একটা জরুরী অর্ডার পেলাম যে,—বেশী টাকা দেবে। বললে দু-জোড়া লাগবে হাতী ঘোড়া। তাই হাত দিলুম।'

'এ গাঁয়ে আর কেউ এ কাজ করে না?'

'করে তো অনেকেই। তবে আমার কাজটাই অনেকে পছন্দ করে বলে প্রথমে আমার ঘরেই আসে। আর যদি বলেন তো আপনারা—'

এবার নরেশ মুখ খোলে : 'আচ্ছা মানিকদা, তুমি তো অর্ডারী মাল তৈরী করবেই—এখনও তার কাজ বাকী আছে। তাহলে একটা হাতী না হয় এখন তৈরী করতে সুরু করে দাও। উনি দেখবেন বসে বসে।'

অনুরোধে কাজ হল। মাণিক পাল ঘরের কোণে ভেজানো বস্তা চাপা দেওয়া মাটির স্তূপ এবারে খুলল। তারপরের কাজগুলো হল এরকম : নরেশ কোথায় যেন বেরিয়ে গেল মুহূর্তের জন্য, ফিরে এল এক প্যাকেট বিড়ি নিয়ে, মাণিক পাল চাকে মাটি বসালো, ডাণ্ডা দিয়ে চাকাটা ঘোরাতে সুরু করল, আমি ইঁটের রাজাসন ছেড়ে দিয়ে তার চাকার ঠিক এক ফুট দূরে হাঁটু গেড়ে বসলাম, মাণিক পাল বিড়ির প্যাকেট দেখে স্মিত হাস্যে একটা বিড়ি ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তার সদ্য তৈরী করা একটা হাতী খুব সন্তর্পণে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল—অর্থাৎ কোথাও কোন খুঁত হয়েছে কি না, নরেশ পুনরায় মাণিকপালের চোখের ইসারায় তার ঘরের বোধহয় অন্দরমহলে গেল এক মিনিটের জন্য, আবার বেরিয়ে এল।

কুমোরের চাকের সামনে বসে কাজ দেখার কৌতূহল আমায় আজও মিটল না :

এত দিন দেখেছি হাঁড়ি, কলশী, ভাঁড়, থালা, সরা প্রভৃতি তৈরী করতে। আর আজ বসে আছি অন্য একপ্রকার শিল্পদ্রব্য উৎপাদন হবার আশায়—যা এর আগে অন্যত্র কোথাও দেখা হয়নি।

বেশ বুঝতে পারছি খুব একটা কিছু অভিনব কিন্তু এখানে আমার দেখা হবে না। কেন না আমি দেখছি মাণিক পালের দক্ষ আঙুলের চাপে তৈরী হচ্ছে পিলসুজের মত চারটি বস্তু—তবে পিলসুজ নয়। তারপরে সেগুলি পাশে সরিয়ে রেখে সে তৈরী করল পিলসুজের চেয়ে অধিক ব্যাস বিশিষ্ট একটি চোঙা—সেটা কেন করল তা বুঝলাম না। তারপর তৈরী করল একটি বড় ভাঁড় আকৃতির বস্তু—তবে ভাঁড় নয়। কেননা বিশেষ কয়েক জায়গায় চাপ দিতেই সেটা একটা ভিন্নরূপ ধারণ করল।

ঠিক এই দর্শনটি যখন প্রতিবেদন নির্মাণে ব্যবহৃত হবে, তখন তার চেহারা নেবে হয়তো এ রকম: 'ফাঁপা পা, ফাঁপা পেট ও ফাঁপা মুণ্ডু - তিনটি হল এই জাতীয় হাতী ঘোড়ার প্রধান অংশ। তিনটিই পৃথকভাবে তৈরী হয়। পা পেট তৈরী হয় চাকের মাটিতে আঙুলের চাপ দিয়ে অবিকল পিলসুজ তৈরীর নিয়মে—শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাসার্ধ ও দৈর্ঘ্য কম বা বেশী করা। লম্বা ও সরু ধরনের চোঙাগুলি হবে পা এবং অপেক্ষাকৃত মোটাগুলি হয় পেটের মধ্যাংশ। মুণ্ডু তৈরী হয় অবিকল ভাঁড় তৈরীর নিয়মে—তবে একটু বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করতে হয় আঙুলের চাপ দিয়ে।'

সবশেষে তিনটি পৃথক অংশকে জুড়ে দিলেই হল। পায়ের গোড়ালিতে, পিঠে ও মাথায় বেশ সহজ মাটির অলংকরণ। হাতীর ক্ষেত্রে শুঁড় বা কানগুলিতে পৃথক কোন বৈশিষ্ট্য নেই, তবে কান তৈরীতে ভাঁড় তৈরীর কৌশল কাজে লাগে। লেজ তৈরীর বিশেষ কৌশল নেই। অবশ্য শেষাবধি সব পার্টসগুলি জোড়া দেওয়া হয়ে গেলেও প্রয়োজনীয় চাপ দিয়ে তাকে ধীরে ধীরে হাতীর মতো করে তুলতে হয়।

এত সরল পদ্ধতি! নিজেদের ঐতিহ্যগত পদ্ধতিকে কত বুদ্ধিপূর্বক প্রয়োগ করে তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী শিল্পকর্ম তৈরী করছে এরা। ঐ একই কৌশলে তৈরী হচ্ছে এখানে তিন ধরণের ঘোড়া—সবচেয়ে ছোটটি ব্যবহৃত হয় মানসিকে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হিন্দু-মুসলমান সমাজে এই জাতীয় ঘোড়া অতি সুপরিচিত। এগুলি যে রকমই হোক না কেন, ওরা তাকে ঘোড়াই বলবে। মানসিক নিবেদন প্রথায় ঘোড়ার ব্যাপক ব্যবহার থাকলেও হাতীর তেমন কোন লৌকিক ব্যবহার নেই। ওর হাতের কৌশলে তৈরী বড় ঘোড়াগুলি উন্নতশীর্ষ বলে এর উচ্চতা হয় দেড় ফুট পর্যন্ত, তবে হাতীগুলি এক ফুট উচ্চতার হলেও দেখতে তত খারাপ লাগে না।

যে উদ্দেশ্যে বড় ও মাঝারি আকারের ঘোড়াগুলি তৈরী করা হয়, তা মূলতঃ পূজার জন্য। চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষের পূর্ণিমায় এ গ্রামে ব্রহ্মচারী পূজা হয় এবং ঐ মাসের অমাবস্যায় হয় রক্ষাকালী পূজা। এ দুটি দিনেই এদের চাহিদা বেড়ে যায়।

যদিও অনেক কিছুই জানা বাকী রইল—তখন দেখি মাণিক পালের বৌ অন্দর থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। তার সঙ্গে আছে সাত বছরের ছেলেটি। সে এতক্ষণ কোথায় ছিল দেখিনি—হয়তো বাইরেই খেলায় মত্ত ছিল। তবে দেখে মনে হল না যে সে পরবর্তীকালে তার বাপের নেশায় এসে লাগবে। এরপর তার সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হল সেগুলি প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে সাজিয়ে দিলেই ভাল লাগবে :

—এগুলি তৈরীর জন্য মাটি কোথা থেকে আনা হয় ? □ হিংলা নদীর ধার থেকে। দেখতে কালচে ও নীলচে। এ মাটির দোষ হল, তা দিয়ে যা কিছুই করা হোক না কেন, তা একটু ভারী হবেই।

—পোড়ানো হয় কি ভাবে ? □ কয়লা খুব খারাপ। তাই পোড়াবার পরে বেশ চকচকে ভাবটা আসে না।

—সে কয়লা আসে কোথা থেকে ? □ রাণীগঞ্জের কয়লাও ভাল, চুরুলিয়ার কয়লাও ভাল। তবে আনার খুব অসুবিধে। বিস্তর দাম পড়ে যায়।

—তাহলে সমস্যা মেটে কি করে ? □ কাছেই একটা খনি আছে—সগরভাঙ্গা। তা, সে কয়লা এত নীচু জাতের যে তাতে কাজ হয়, কাজের জাত থাকে না।

—সারা বছরই কি এসব কাজ করা হয় ? □ বৈশাখ মাসে আমরা শুধু মাঠের কাজ করি। তখন চাক বন্ধ থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসে কোন ভাল দিন দেখে কাজ সুরু হয়।

—তাতেই সবার চাহিদা মেটানো যায় ? □ না, বলতে পারব না। তবে সত্যি বলতে কি পুজোর পরে দিন পনেরো এসব কাজে আমরা হাত দিই না। নেহাৎ বড়ো-সড়ো অর্ডার না পেলে। আর আপনি হলেন আমাদের নরেশ মাষ্টারের—

—আপনাদের তৈরী এই সুন্দর হাতী-ঘোড়া আর কোথায় কোথায় যায় ? □ যাবে আর কতদূর ! গাড়ী-ঘোড়ার অসুবিধে। তবে কদমডাঙা, পিছালী, আঁধারশোল, ভীমপুর তো যায়ই। তার চেয়ে দূরে যায় কিনা জানি না।

—এ গ্রামে আর কারা কারা এই ধরনের কাজ করেন ? □ আমাদেরই সব জ্ঞাতিগুষ্টি, খুঁজে নিলেই পাবেন। তবে নিত্যানন্দ পাল, কমল পাল, হারাধন পাল—এদের নামটাও লিখে নিন।

—এরা কোথায় কাজ শিখেছে ? □ দেখুন এসব কাজ তো ইস্কুলে কলেজে পড়ানো হয় না। বাড়ীতে থেকে থেকে বাপ ঠাকুর্দাকে দেখে দেখে এসব শিখতে হয়। আমিও তো এভাবেই শিখেছি।

—এ গ্রামে এখন যারা যুবক বা একটু লেখাপড়া শিখেছে—তারা কি এ কাজে এগিয়ে আসছে বা আসবে বলে মনে হয় ? □ মনে হয় না। এ কাজে পয়সা কোথায় ? সারা বছরের রুজি তো এতে হয় না। আর চাষের কাজ তো করতেই হবে নিজের হাতে। সেখানে লোক লাগিয়ে তো তা করা যাবে না।

বলা বাহুল্য যে, এইসব কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে মাণিক পালের বৌ-এর দেওয়া সাজানো রেকাবিও ধীরে ধীরে শেষ করেছি। পুজোর মরশুম। তাই জলখাবারের

জন্য মুড়ির মোয়া, তিলের নাড়ু, নারকেলের তৈরী দু'রকম নাড়ু—সবই সাজিয়ে দিয়েছিল। দুটো কলাও ছিল, বলেছিল বাড়ীর গাছের।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে এখানে বসে আছি। একদিকে কুমোর নিজে, তার আশে পাশে তার তৈরী জালা, হাঁড়ি, কলসী, পিদিম, পিলসুজ, ভাঁড়, গেলাস—সব দেখতে পাচ্ছি। ভিজানো মাটি, চাক, ছেঁড়া খড়, জলের গামলা, ছেঁড়া মাটিমাখা ন্যাতা—সব চোখে পড়ছে। বারান্দার ওদিকটায় ছাদ অবধি উঁচু করা মালসা, হাঁড়ি, জালা, সরা। হয়তো আগামী কোনদিনে তা ধীরে ধীরে হাটে চলে যাবে।

মনে হল আমি যেন 'ওমর খৈয়ামের' 'কুজানামা' পড়ছি।

খৈয়াম একবার এক কুম্ভকার পাড়ায় বেড়াতে বেড়াতে চলে গেছিলেন। তাঁর দার্শনিক মন সেখানে গিয়েও পেয়েছিল চিন্তার খোরাক। তাই নিয়েও তিনি লিখেছিলেন বারোটি রুবাই—হয়তো তার কমবেশীও হতে পারে।

'চলতি পথে কুমার শালে দেখনু কোন কুম্ভকার,
ঠেসছে কাদা মাটির তালে শক্ত নিঠুর হস্তে তার—
মাটির মুখে ফুটল ভাষা করুণ সে স্বর কম্পমান,
বললে দাদা 'আরজি আমার আস্তে পেষো মেহেরবান'।

কুমোর কি মাটির ব্যাথায় কর্ণপাত করেছিল? কেননা মাটি তখনও বলছে:

'হাতটি সরাও কুমোর তব—নিঠুর কেন হচ্ছ ভাই,
দীন মানুষের কাদার দেহ এমন করে পিষতে নাই,
ঠেসছ যে এই চাকায় তোমার, আমার দেহ মৃত্তিকায়
হয়তো তুমি কৈখসরুর দ'লছ হৃদয় পিণ্ডটায়!'

খৈয়াম তখন শুনছেন, আরেক কুম্ভ বলছে তার অপর কুম্ভ সঙ্গীকে:

অন্য আর এক কুম্ভ কোন বললে বৃথায় নয় ভায়া
তুচ্ছ ধুলো মৃত্তিকাতে তৈরী মোদের নয় কায়া;
কৌশলী যে নিপুণ হাতে গড়ল আমার অঙ্গখান—
সেই কি পুনঃ মাটির সাথে মিশিয়ে মোবে করবে ম্লান।'

শুধু খৈয়াম নয়, এখন আমিও যেন শুনতে পাচ্ছি ওদের মনের ব্যাথা:

'আর এক জনা বললে 'ভায়া, মজার কথা চমৎকার,
মূর্তিধারী পাপ যে হেথা নরক-ধূমে মুখটা কার
কৃষ্ণবরণ, কলংকী যে যাচাই করে সেই মোদের—
বলছে—'কুমোর মন্দ ত নয় জিনিষ খাঁটি মিলবে এর!'

কারা বলছে এ সব তো জানি—কিন্তু কাকে বলছে?

মনে হল সবই যেন বলা হচ্ছে আমাদের সামনে বসা মাণিক পালকে। মাণিক পাল কি ওদের কথা শুনতে পায়? বোধহয় পায় না।

হয়তো মৃত্তিকার বেদনা থেকেই জন্ম নেবে নিত্য নতুন সুন্দর মৃৎপ্রতিমা। □

'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় ;
উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।'
উলুখাগড়া মানে 'প্রজা'—কথাটা কিন্তু সত্যই !
একটা রাজা বা রাজবংশ শেষ হয়ে গেলেও
প্রজাবংশ কিন্তু সংখ্যাধিক্যের জন্য কখনই শেষ হয় না।
রাজাকে বাঁচিয়ে রাখে কে ?—প্রজা।
রাজার মৃত্যু হলেও প্রজারাই তাকে বাঁচিয়ে রাখে।
রাজার গল্পে, রাজার গানে, রাজার ছড়ায়।
রাজার প্রাসাদ, রাজার সব কিছুই তাই হয়ে থাকে স্মরণীয়।
ইতিহাস শেষ হয়ে গেলেও
রাজার রাজত্ব বাঁচিয়ে রাখায় তাদের কী আনন্দ !
তার ভগ্নাংশ নিয়ে ও
তার সঙ্গে রঙীন কল্পনা মিশিয়ে
গড়ে ওঠে সে এক ইতিহাস-বহির্ভূত নতুন ইতিহাস।

লোকসাহিত্য-১

ঐতিহাসিক তখন সরে দাঁড়ান।
ইতিহাস যখন শেষ হয়ে যায়
তখন সামনে এসে দাঁড়ায় রঙিন কিম্বদন্তী।
কিম্বদন্তীও যে সাহিত্যের একটি উপকরণ
তার প্রমাণ দিয়েছেন স্বয়ং
রবীন্দ্রনাথই ;
আরো কতজন যে হেঁটেছেন এ পথে
সাহিত্যের ইতিহাসে ; হয়তো তা-ও লেখা আছে।
কিন্তু
সব কিম্বদন্তীই কি আজ যথার্থ সংগৃহীত হয়েছে ?
সব কিম্বদন্তীই কি আজ যথার্থই
সাহিত্যে পরিণত হয়েছে ?
সে কাজ সম্পূর্ণ হতে এখনও অনেক বাকী—
আর হয়তো সেদিনই তবে যথার্থই সমৃদ্ধ হবে লোকসাহিত্য।

লালবাগের পথে পথে

গল্প জানে বটে শওকত আলি!

মুর্শিদাবাদে মানে লালবাগের নবাবী এলাকায় এ রকম শওকত আলি আরো কত যে আছে কে জানে! একজনই যখন এত, তখন সব কজন শওকত আলির গপ্পো শুনলে তো মনে হয় একটা রীতিমত 'অ্যারাবিয়ান নাইটস' হয়ে যেতে পারে।

শওকত আলির বয়স হয়েছে—সেদিন রিক্সা স্ট্যান্ডে সে ছাড়া আরো অনেকেই ছিল অপেক্ষাকৃত কম বয়সী। আমার কিন্তু বরাবর এইসব ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানে এলে বুড়ো বুড়ো লোকদের সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা করে—তা সে চায়ের দোকানীই হোক বা রিক্সা চালকই হোক।

এদের কাছে অনেক গল্প শোনা যায়। হোক না তা সত্য-মিথ্যায় মেলানো। এইসব শুনতেই তো এসেছি! দু চোখে যা দেখতে পাচ্ছি সে তো সবাই দেখেছে—খাঁটি বর্তমান। এর পিছনে যে সব ইতিহাস আজ হারিয়ে যাচ্ছে, যা গেছে তার গল্প ইতিহাস বইয়ে যা আছে তা আছে। কিন্তু এইসব স্থানীয় লোক কীভাবে তা দিয়ে আসর জমাচ্ছে—তা শুনতেও নেহাৎ খারাপ লাগে না।

অথচ সবাই যে এ রকম গল্প বলায় পারদর্শী—তা নয়। প্রত্যেকেই চায় নতুন নতুন গপ্পো খদ্দেরকে তুষ্ট করতে। তাই তাকে হয়তো আবো একটু-আধটু রং লাগাতে হয়। তা লাগাক—এইসব না শুনলে ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ যেন সম্পূর্ণ হয় না।

অবশ্যি শওকত আলি যে পেশাদার গাইড নয়—তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পর্যটককে মুগ্ধ করার মত এত গল্প তার জানা আছে যে তাতে খদ্দের মুগ্ধ হবেই। তার সাইকেল রিক্সায় ভ্রমণ করতে চুক্তির চেয়ে বেশী সময় লাগবেই।

'এসব গল্প সে কোথা থেকে সংগ্রহ করল'—এ প্রশ্নের উত্তরে সে হয়তো আপনার কাছেও বলবে নিজের কপাল দেখিয়ে আর উর্ধপানে আঙ্গুল তুলে। যার অর্থ হল যে 'নসীব' ও 'আল্লা'! কোনটা সঠিক তা বিশ্লেষণ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে তার গল্প শুনে শুনে লালবাগ ভ্রমণ করলে এই পুরাতন স্থানটি ভ্রমণের একটা আলাদা মেজাজ আসবে মনে হয়।

যেমন ধরি, এই এখনই আমরা এলাম মহিমাপুর ফাঁড়ি। এখানেই আছে মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যা আজিমুন্নেশা বেগমের সমাধি। কথাটি শোনা মাত্র শওকতের রিক্সা থেকে নেমেছিলাম, পায়ে পায়ে গিয়ে দেখে এসেছিলাম সেই ঐতিহাসিক সমাধি। ইতিহাসে এই বেগম সাহেবার যে কাহিনী আছে তা থাক, তবে শওকত যে কাহিনী বলল—তা বড় বিচিত্র।

এই বেগমের নাম হয়েছিল কলিজাখাকী বেগম। এই বীভৎস নামকরণ

পৃথিবীর ইতিহাসে আর কারো হয়েছে কিনা জানা নেই। না, আজিমুন্নেশা ডাইনী নিশ্চয়ই নয়। তার নাকি এক অদ্ভুত রোগ হয়েছিল—সেই নবাবী যুগের কাহিনী এসব। তাই নবাব বাড়ীর চিকিৎসক তার বিধান দিয়েছিলেন প্রতিদিন একটি তাজা শিশুর কলিজা খেতে হবে—তাহলে সেই কন্যার স্বাস্থ্যোন্নতি হবে।

রোগ নিরাময়ের জন্য কোন চিকিৎসা গ্রন্থে এই বিধান আছে জানি না। তবে শওকত আলির কথা শুনলে মনে হবে হয়তো আছে। এই কলিজাখাকীর গল্প এতদিন পরেও যখন চালু আছে, তখন সেখানে সেই ঘটনার সময়ে তা কত তীব্র ছিল—তা ভাবুন।

অথচ ইতিহাস বলে অন্য কথা!

ঐ কন্যার এক চরিত্র দোষ দেখা দিয়েছিল। নবাববাড়ীর কেলেংকারী—তাকে চাপা দেওয়া যায় কী করে! নিজেদের পারিবারিক কেচ্ছা চাপা দেবার জন্য এই গপ্পো তৈরী করে ছড়াতে হলো বাজারে; হয়তো এজন্য দু'একটা শিশু হত্যা করা হয়েও থাকতে পারে। কিন্তু তাতে সুফল হল যে মূল কেচ্ছা চাপা পড়ে গেল এবং ঐ বীভৎস কাহিনীটাই মুখে মুখে প্রচারিত হল বেশী। আর সেটাই তো নবাবদের মনোগত অভিপ্রায় ছিল।

আজিমুন্নেসা বেগমের কাহিনী কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। অন্য কোন দ্রষ্টব্য দেখতে যাবার ব্যস্ততা না দেখালে শওকত-এর পরে বলবে: 'এই যে পাপ করেছিলেন সেই বেগম, তা তার সারা জীবন মনে ছিল। তাই তার মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছিলেন, তার মৃত্যুব পর সবাই যেন তার সমাধি মাড়িয়ে মাড়িয়ে যায়। তবেই হবে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।'

এ গল্প আপনি কোথাও পাবেন না—এইসব শওকত আলি ছাড়া। ব্যাপারটা পরখ করে দেখুন একবার—মসজিদ প্রাঙ্গণটা কীভাবে তৈরী হয়েছে। মসজিদটা দোতলায়—সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় এবং একতলায় সেই সমাধি। সুতরাং লোককে পরোক্ষভাবে বেগম সাহেবার কবর মাড়িয়েই ওপরে উঠতে হচ্ছে। এ এক বিচিত্র আলংকারিক সত্য।

অথচ বর্তমান নবাব বাড়ীর এক বেগম সাহেবার লেখা একটি গাইড বইয়ে লেখা আছে সম্পূর্ণ ভিন্ন তথ্য: আজিমুন্নেসার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল নবাব সুজা খানের। মসজিদটি অবশ্য কোন মহিলাই নির্মাণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন করুণাপ্রবণ ও উদারচেতা মহিলা। ইতিহাস বলে তিনি নবাব সুজার মৃত্যুর পরেও বেঁচে ছিলেন। সুতরাং—

সুতরাং কিম্বদন্তী তার লাইনে চলুক এবং ইতিহাস চলুক তার নিজের লাইনে। আপনি অর্থটা অনুধাবন করে যান।

ঠিক এরকমই একটা কাহিনী হয়তো শওকত শোনাবে কাটরা মসজিদে গেলেও। এই মসজিদটা হল রেললাইনের ওপারে। মুর্শিদাবাদ রেলস্টেশন থেকে জেলখানার

প্রসঙ্গ কথা

লালবাগের পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে আরো যে সব কিম্বদন্তী কাহিনী শোনা যেতে পারে, তার দু' একটি খণ্ড হল :

মদিনা ॥ ভাগীরথীর তীরে সিরাজের মদিনা—হলুদ রঙের মসজিদ বা জরদ মসজিদ। এটি সিরাজের নির্মিত। মদিনা ও কাঠের পূর্বতন ইমামবাড়া একই সময়ে নির্মিত। মক্কা থেকে মাটি এনে মদিনার ভিত্তি স্থাপনের সময় ছয় ফুট নীচে সিরাজ-উদ-দৌলা স্বয়ং মাটি দিয়েছিলেন। চুন-সরকীর গাঁথুনীযুক্ত এই মদিনাটি অষ্টাদশ শতকের মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন। মদিনার থামগুলিতে ছিল সোনা রূপা ও কাঁচের কাজ। মহরমের সময়ে এখনও এখানে চলে কোরাণ পাঠ।

বাচ্চাওয়ালী তোপ ॥ এটি লম্বায় ১৮ ফুট এবং বেড় ৫ ফুট। এটি আছে হাজার দুয়ারী প্যালেস ও ইমামবাড়ার মধ্যস্থলের মাঠে। এই তোপটি তৈরী করেছিলেন 'জাহানকোষা' নির্মাতা জনার্দন কর্মকার। যাতায়াতের পথে কোন সময় এটি ভাগীরথীতে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। পরে নবাব হুমায়ুনজার সময় একে নদীগর্ভ থেকে উদ্ধার করে এখানে স্থাপন করা হয়। এই কামান দাগতে প্রায় ১৭ কেজি মশলা লাগত। একবারই নাকি কামানটি দাগা হয়। তখন এর শব্দে বিস্তীর্ণ এলাকার বহু গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হওয়ার পর এর নামকরণ হয় 'বাচ্চাওয়ালী তোপ'।

রাধামাধব ॥ মতিঝিলের পূর্বতীরে কুমারপাড়া নামক স্থানে এই মন্দির অবস্থিত। কষ্টিপাথরের এই দেবমূর্তি বৃন্দাবন থেকে আনীত। এ সম্বন্ধে কাহিনী হল : মন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দে নামাজের ব্যাঘাত হত মনে করে নৌজেস মহম্মদ মন্দিরের সেবাইতকে জব্দ ও বিতাড়িত করবার জন্য এক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। নিজের কর্মচারীর দ্বারা একটি পাত্রে হিন্দুদের নিষিদ্ধ মাংস পুষ্পের দ্বারা আবৃত করে পূজার জন্য সেবাইতের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেবাইত সরল মনে দেবতাকে তা নিবেদন করেন এবং কর্মচারীকে প্রসাদ নিয়ে খেতে ইঙ্গিত করেন। কর্মচারী আবরণ খুলে দেখে সেখানে মাংসের পরিবর্তে কয়েকটি জুঁই ফুল। নবাব কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন এবং কিছু নিষ্কর জমি মন্দিরের সেবার জন্য দান করেন।

মতিঝিল ॥ মুর্শিদাবাদ শহরের দক্ষিণে এক মাইল দূরে এই ঝিল অবস্থিত। আলিবর্দীর জামাতা নওয়াজেস মহম্মদ তার পত্নী ঘসেটি বেগমের জন্য এই বিলাস-বহুল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এর অনুকরণে নদীর এপারে সিরাজ করেন 'হীরাঝিল'। এখানে চারিদিক বন্ধ দরজা-জানালাহীন একটি বড় ঘর আছে, তার প্রবেশ পথ নেই। কিম্বদন্তী হল, এই কক্ষে ঘসেটি বেগমের বিপুল ধনরত্ন লুকানো আছে। কোন সাহেব গোপনে এই গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য খননকার্য সুরু করেন, অল্পক্ষণের মধ্যে রক্তবমি করে তার মৃত্যু হয়।

নিকটে এসে উত্তরের পথ ধরে কিছুটা অগ্রসর হলেই চোখে পড়ে এই কাটরা মসজিদ। এখানেই হল মুর্শিদকুলি খাঁর সমাধি।

মসজিদের দুই প্রান্তে ৭০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট দুটি গম্বুজ আছে—এখন অবশ্য ভগ্ন দশা। এই গম্বুজের ওপরে উঠলে মুর্শিদাবাদ নগরীর অনেক অংশ দেখা যায়। মসজিদের ভিতরের চত্বরের চারিদিকে ছোট ছোট অনেক প্রকোষ্ঠ—এখন অবশ্য ভগ্নদশা। প্রাচীনকালে ভক্তজন এখানে বসে কোরাণ পাঠ করতেন। নবাবের ইচ্ছানুসারে এখানে একটি বাজার স্থাপন করা হয়—'কাটরা' শব্দের অর্থ গঞ্জ বা বাজার। তাই এই মসজিদের নাম কাটরা মসজিদ।

কাটরা মসজিদ সম্বন্ধে স্থানীয় গাইড বাবু লিখেছেন:

'মুর্শিদকুলি খাঁ বার্ধক্য দশায় উপনীত হইয়া মসজিদ সংলগ্ন নিজের একটি সমাধি ভবন নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই মসজিদ নির্মাণ করিবার সম্পূর্ণ ভার তাহার বিশ্বস্ত অনুচর ফরাস খাঁ র উপর অর্পণ করেন। ফরাস খাঁ অত্যন্ত হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি হিন্দুদিগের দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া সেই সকল মাল-মশলা দ্বারা মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে (১৭২৩—১৭২৪) এই মসজিদের নির্মাণ কার্য সমাধা করেন।'

মসজিদ নির্মাণের কাহিনী যদি ইতিহাস হয়, তবে তার সম্বন্ধে উপরোক্ত কাহিনীর মত এক কিম্বদন্তীও শুনতে হবে আপনাকে। গাইড বই লিখছে:

'ইহার অল্পকালের মধ্যে মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হয়। দুষ্কর্মের জন্য শেষ দিকে তিনি খুবই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। সাধুজনের পদধূলি তাহার পাপ দূর করিবে মনে করিয়া সোপান শ্রেণীর নিম্নে সমাধি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পর তাহার ইচ্ছানুসারে উক্ত প্রকোষ্ঠে তাহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল।'

অর্থাৎ পিতা-পুত্রী উভয়ের মৃত্যুকালীন মনোবাসনা এক হওয়ায় উভয়েই চেয়েছিলেন, তাদের সমাধি মাড়িয়ে মাড়িয়ে লোকে উপরে উঠুক। কেননা তারা পাপ করেছিলেন··· ইত্যাদি।

শওকত আলী যা জানে না তা হল, সে সময়ে নবাবী আভিজাত্যের একটা স্টাইল হল যে, ঐ প্রকার সমাধি তৈরী করা। এটা তৎকালীন স্থাপত্যক্রিয়ার একটি নিদর্শন মাত্র। কেমন সুন্দর একটা মহৎ কাহিনী তৈরী করে নবাবদের মহিমান্বিত করার চেষ্টা! সবার অলক্ষ্যে এ ভাবেই তৈরী হয়ে যায় কত ইতিহাস—যা থেকে তৈরী হয় কত লোকবিশ্বাস আর কিম্বদন্তী।

মনে হচ্ছে এবারে কাটরা মসজিদের নিকটে অবস্থিত কদম শরীফের কথাও। এখানে এলে চোখে যা দেখবার তা তো সবাই দেখে, কিন্তু শওকত আলী তার সঙ্গে যে গল্পটা উপহার দিল সেটাই আগে বলি।

মনে পড়ছে, এখানে বসে রিক্সা থামিয়ে একটা দোকানে বসে দুজনে চা খেয়েছিলাম আর শওকতকে বিড়ি খাইয়েছিলাম—যেন ওর বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া

পৌঁছে যায়। সে প্রতিদানে জানিয়েছিল যে কাহিনীটি তার নায়ক অবশ্য মুর্শিদকুলী খাঁ নন, তবে তার এক প্রধান খোজাকে নিয়ে। সেটা হল এই রকম :

একদা মুর্শিদকুলী খাঁ বেগম মহলের প্রধান খোজা কদম শরীফের কাছে কিছু অর্থ ঋণ নিয়েছিলেন। সেকালে নবাবরা যে কোন অর্থশালী লোকের নিকট থেকে নাকি ঋণ নিতেন। তা সে ধনকুবের জগৎশেঠ বা নবাবাশ্রিত খোজা—যেই হোক না কেন! এটা অবশ্য ইতিহাসের সত্য।

যথাকালে নবাব সে টাকা নিজ পুত্রের হাত দিয়ে ফেরত পাঠান খোজা কদম শরীফের নিকট। নবাব পুত্র সেই টাকার থলি নিয়ে পথে বেরিয়ে এক দরিদ্র ভিখারীকে দেখে দায় বশতঃ তাকে একটি মুদ্রা দান করেন। ফলে ঐ থলির টাকায় একটি মুদ্রা হিসাবে কম হয়ে যায়। এদিকে কদম শরীফকে জিগ্যেস করে নবাব জানতে পারেন যে সে টাকা পেয়েছে, তবে গণনায় একটি মুদ্রা কম। সংবাদ পেয়ে নবাবের মেজাজ উঠল সপ্তমে।

একমাত্র পুত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রকৃত সত্য তিনি জেনে নিলেন এবং কদম শরীফের কাছে এই সামান্য টাকার জন্য পুত্রের দ্বারা এভাবে অপমানিত হয়েছেন—এই ভেবে দুঃখে তিনি পুত্রের মাথা কেটে ফেলে সেটি এক থালায় সাজালেন। সেই ছিন্ন মুণ্ডের কপালে একটি মুদ্রা আটকে দিলেন। অতঃপর লাল কাপড়ে সেই থালা ঢেকে তা পাঠিয়ে দিলেন কদম শরীফের নিকট।

একেবারে অসকার ওয়াইডের 'সালো ম' নাটকের মত গপ্পো। সেই যে হিরোইন রাজকন্যা পিতার নিকট আবেদন করেছেন সেন্ট জনের কাটামুণ্ডু পেতে, কেননা সেন্ট জন সে নাটকে রাজকন্যার প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তারপর কি হল ?

শওকত আলীর গল্পটা সুন্দর, বলার ভঙ্গীটা আবো সুন্দর। তবে গপ্পোটা সবটা যেন সত্য নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে একটু পরে। তবে দোষ শওকত আলীর নয়, নিজের বিস্মৃতিকে ঢাকার জন্য সে একটু রং দিয়েছিল মাত্র। প্রকৃত সত্য হল এ রকম :

মুর্শিদকুলী খাঁ তার পুত্র সৌকত জংকে দিল্লী পাঠাচ্ছিলেন নবাবী খাজনার দেয় অংশ দিল্লীতে পাঠানোর জন্য। তার পরবর্তী ঘটনা মোটামুটি সত্য। তাহলে শওকত আলীর গল্পের কদম শরীফ বা বেগম মহলের প্রধান খোজা এর সঙ্গে জুড়ে গেল কী করে ?

এবার তাহলে স্থানীয় ইতিহাসের শরণ নিতে হয়। ইতিহাস বলছে তোপখানা থেকে কিছু দূরে শইরা মসজিদের কিছু দক্ষিণে বড় সড়কের উপর আছে 'কদম শরীফ'। নবাব মীরজাফরের সময়ে বসন্ত আলী নামে একজন খোজা এখানে মুসলমানদের সুবিধার্থে মসজিদ, লঙ্গরখানা ও অন্যান্য উৎসব পালনের জন্য তাঁর সম্পত্তি দান করে যান। এখানে তার সমাধিও আছে। কদম শরীফের দক্ষিণে কিছুদূরে গেলেই হুমায়ুন মঞ্জিলের অংশবিশেষ দেখা যায়—যার অপর নাম

মোবারক মঞ্জিল। কদম শরীফের ভিতরে ছিল একটি মসজিদ ও ইমামবাড়া। এখন অবশ্যই এ সমস্ত হয়ত পরিত্যক্ত ভগ্নস্তূপ মাত্র।

শওকতের গপ্পো থেকে জানা গেল যে এটি বর্তমানে এক গোয়ালঘরে পরিণত হয়েছে। তার ঐ কথা শুনে আমার যেন আর রিক্সা থেকে নামতেও ইচ্ছা হল না।

তাছাড়া কদম শরীফের 'শরীফ' শব্দের অর্থ 'সচিত্র'। তাকে একটি ব্যক্তিনামে পরিণত করে কি ভাবে যে গল্প তৈরী করেছে! অবশ্য এতে তার দোষ নেই। আমার মত বহু পর্যটকের কাছে এজন্য সে বাহবা পাচ্ছে—তাতেই তার আনন্দ। এটাও তার রিক্সা চালানোর একটা পদ্ধতি হয়তো।

শওকত রিক্সা চালানোর ফাঁকে ফাঁকে আরো অনেক বিচিত্র কাহিনী বলেছিল আমায়—তার সবগুলি আজ আর ভাল করে মনেও নেই। সেসব গল্পের কতটা সত্য কতটা কল্পনা—তা নিয়ে তখন ভাবিনি। পরে মনে হয়েছে, লালবাগের ইতিহাসের গল্পের চেয়ে শওকতের 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে' যে সব গল্প শুনেছি, সেটাই বোধহয় প্রকৃত ইতিহাস।

আমার মন কিম্বদন্তী-প্রিয়। তাই ইতিহাসের বাইরে কোথাও কোন কিম্বদন্তীর আঘ্রাণ পেলেই, মন প্রফুল্ল হয়। ইতিহাস তো যে কোন যদুনাথ সরকার ঘাঁটলেই পেয়ে যাবো—কিন্তু শওকত আলিদের পাবো কোথায়!

তবু কানে কানে বলি, যদুনাথ সরকারদের নিয়েও আজকাল অনেকে সন্দেহ করেন—হয়তো আমিও। তারাও যে বহু সময়ে নানা লোকশ্রুতি তাদের তৈরী করা ইতিহাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন—এ সব কথা নাকি আজকের বুদ্ধিজীবীরাও বলা শুরু করেছেন!

যাক গে, তার চেয়ে বরং শওকত আলির গল্প বলি।

হাজারদুয়ারীর প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এসে তার গাড়ীর গতি থামিয়ে সে আমায় বেশ কিছু গল্প শুনিয়েছিল—তার দু' একটা বলি এবারে। একদিকে এই নবাবী প্যালেস আর মাঠের অপর প্রান্তে ইমামবাড়ার বিশাল ভবন। মাঝে উন্মুক্ত সবুজ ঘাসের প্রাঙ্গণ। এই দুটি প্রাসাদ নিয়ে নাকি অনেক গল্প প্রচলিত আছে। প্রাঙ্গণের মধ্যে আছে বাচ্চাওয়ালী তোপ আর মদিনা।

হাজারদুয়ারীর নাম নিয়ে একটা গল্প আছে—গল্প নয়, সেটা সত্যই। এর ভিতর-বাইরে সত্যই হাজারটা দরজা আছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, কোন পর্যটক আজ পর্যন্ত তা গণনা করে সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। কারণটা হল এই: সেকালে দস্যু-ডাকাত ইত্যাদির আক্রমণ ঠেকাবার জন্য রাজাদের প্রাসাদবাড়ীতে অনেক নকল দরজা তৈরী হত—যেগুলি বাড়ীর লোকেরা জানত যে ঐ স্থান দিয়ে পলায়ন করা যাবে না। কিন্তু আক্রমণকারী ঐ দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে গেলে নিজেরাই গৃহস্বামীর দ্বারা আক্রমিত হত। সত্যি কথা বলতে কি, একটু পর্যবেক্ষকের মনোভাব নিয়ে দেখলে, হাজারদুয়ারী প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঘুরলে

এ রকম অনেক দরজাই মানে নকল দরজাই দেখা যাবে। স্থাপত্যরীতির এই কৌশলটা খাঁটি বিদেশী কিনা জানি না, পরে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের বর্ধিষ্ণু পরিবারের গৃহেও এ জাতীয় নকল দরজা তৈরী হত। কিংবা হতে পারে – তখন তা দাঁড়িয়েছিল একটা স্টাইল মাত্র।

আমার মনে হয় অনুসন্ধান করলে হাজারদুয়ারী নিয়ে আরো কিছু চমকপ্রদ কিম্বদন্তী বা জনশ্রুতি শোনা যাবে – যার মধ্যে একটি হল ঃ

এই প্যালেস তৈরী হবার পর সেকাল থেকে আজ অবধি কোন লোকই এখানে বসবাসের কাজে এটি ব্যবহার করেনি। এ সংবাদ শওকত যে ভাষায় দিয়েছিল আমাকে—তা একটু গুছিয়ে লিখলাম এখানে। যে কোন পর্যটকই এ কথা শুনে অবাক হয়ে যাবেন। এর স্থাপত্য, এর সংগ্রহশালা, এর সংরক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে এত এত বই লেখা হয়েছে, কিন্তু লোকমুখে প্রচারিত কাহিনী হল, হুমায়ুন জা-র সময়ে নির্মিত এই প্রাসাদের নির্মাণ-কার্য হয়েছিল বৃটিশ স্থপতিদের দ্বারা। সব কাজ শেষ হলে নবাব বলেছিলেন, এখানে 'বেগম মহল' বলে অংশ নেই—তাই নবাব তার পরিবার নিয়ে এখানে বসবাস করবেন কি করে! তদবধি এই প্রাসাদ অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে আর নবাব একটি সাধারণ মানের প্রাসাদ তৈরী করেন সপরিবারে সেখানে বসবাস করার জন্য।

হাজারদুয়ারীর আরেকটা গল্প বলতে গেলে আমাকে যেতে হবে তালগাছি আর বড়সাগর নামক দুটি গ্রামে। আমার সেখানে যাওয়া হয়নি সময়ের অভাবে। তবে এই দুটি স্থানে যে বিশাল দুটি জলাশয় আছে, তার সৃষ্টি কাহিনী হল, হাজার-দুয়ারী প্যালেস নির্মাণের জন্য যে ইট তৈরী করা হয়েছিল, তা এই দুটি স্থান থেকে। তালগাছিতে ইট তৈরী হয়েছিল ১৩,২৯,৯৩৫টি এবং এর জন্য খরচ হয় ৩,১৯,২২০ টাকা আর বড়সাগরে ইট তৈরী হয় ৮,৭৯,৭০০টি এবং তার জন্য নির্মাণ ব্যয় হয় ২,৪৯,৩১৯ টাকা।

শওকত আলির আর একটা গপ্পো শুনিয়ে তারপর শোনাবো গঙ্গার ওপারের অনেক কিম্বদন্তি। আজ মাত্র দু' ঘন্টার পুঁজিতে শওকতের রিক্সা ভাড়া করে শহর ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। মহিমাগঞ্জ, জাফরাগঞ্জ, কাঠগোলা, নশীপুর এমনকি লাইনের ওপারে কাটরা মসজিদ এলাকা—এসব ঘুরতে ঘুরতে সেই দু ঘন্টা কখন পেরিয়ে গেছে—তার হদিস করিনি। শেষ পর্যন্ত ও কত ভাড়া চাইবে কে জানে!

তবুও তার গল্প শোনার একটা মজা আছে। যেমন বলেছিল ও জাহানকোষা কামান সম্বন্ধে। আজ সারাদিন রিক্সায় ঘুরতে ঘুরতে ঠিক কোন স্থানে এই কামানটি দেখেছিলাম মনে পড়ছে না—তবে মনে হয় কাটরা মসজিদের আশে-পাশে কোথাও। সেখানেই কোথাও নাকি একদা এটি সুরক্ষিত ভাবে নবাবের অস্ত্র-শালায় ছিল—যার স্থানীয় নাম হল তোপখানা।

জাহানকোষা শব্দের অর্থ—'জগৎজয়ী'। এটি দৈর্ঘে বারো হাত, বেড় তিন

হাতেরও বেশী। মুখের পরিধি এক হাতের বেশী হবে। অগ্নি সংযোগের ছিদ্রটির ব্যাস দেড় ইঞ্চি, ওজন দুশো মণ এবং এটি দাগতে আঠারো সের বারুদ লাগত। বাচ্চাওয়ালী তোপ এবং এর নির্মাতা একই ব্যক্তি—জনার্দন কর্মকার।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর এ সম্বন্ধে গল্পটি হল ঃ কিছুদিন পূর্বেও এটি বটগাছের শিকড়ের সঙ্গে আটকে—সবার চোখের প্রায় আড়ালে চলে গেছিল। বর্তমানে তাকে শিকড়-মুক্ত করে নতুন করে স্থাপন করা হয়েছে এবং তার ফলে এটি আবার পর্যটকদের নজরে এসেছে—তাই গল্পকথারও প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ইতিহাস যা বলে বলুক, এখানে শওকত আলির বক্তব্যই বেশী আকর্ষণ করে একশ্রেণীর পর্যটককে। তাই এ সম্বন্ধে গল্পের আধুনিক রূপে জানা যায়, আদতে এটি হিন্দু কারিগরের তৈরী—যার নির্মাণ হয় ঢাকায়। রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থাপিত হবার পর সেটি কোন অলৌকিক উপায়ে গঙ্গায় ভেসে ভেসে এখানে এসে ওঠে। তারপর তার চারিদিকে বটগাছের শিকড়ের জাল বিস্তৃত হয় এবং কালক্রমে শিকড়ের জালে কামানটি প্রায় চারফুট শূন্যে ঝুলতে থাকে।

কাহিনীর এই পর্যন্ত এসে শওকত আলী বেশ শ্রদ্ধাবনত হয়ে বলে ঃ 'ইনি খুব জাগ্রত ছিলেন। স্থানীয় লোকে তাঁকে পূজো করত।'

ওর এই বিনম্র বিবৃতি শুনে রিক্সা থেকে নেমে ঐ জাহানকোষার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। সত্যই তখন চোখে পড়েছিল, কামানের বিস্ফোরণের দিকটায় সিঁদুর লেপা, মোমের দাগ, ধূপকাঠির ভগ্নাংশ, শুকনো ফুল ইত্যাদি। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় জনমনে এটি দেবতা সদৃশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—বিশেষতঃ যতই কামানটি শূন্য অবস্থায় ছিল—ততই।

কী ভাবে এই বিশ্বাস জন্ম নিল, তার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন হল ঃ কোন এক প্রতিভার ফলে কোন এক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি দেখতে পান কামানের মুখ দিয়ে জল পড়ছে। ভক্ত চিত্তে তিনি কামানের মুখটিকে কামানের চোখ বলে মনে করলেন—তাই প্রচারিত হল কাহিনী যে কামানের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

সেই থেকেই জাহানকোষার দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হল স্থানীয় জনমনে। তাই অধুনা এই কামানটিকে যখন বটের শিকড়ের জটা থেকে মুক্ত করে নতুন বেদীতে পুনঃস্থাপন করা হল সরকারীভাবে এবং এ কাজ সুষ্ঠু ভাবে করবার জন্য শেষ পর্যন্ত ঐ বটগাছটিকেই নস্যাৎ করা হল—তখন স্থানীয় জনগণ তা ভাল ভাবে মেনে নিতে পারেনি। তারা মনে করেছিল যে এতে কোন অমঙ্গল নিশ্চয়ই ঘনিয়ে আসবে। অবশ্য তাদের আপত্তিতে কোন ফল হয়নি এবং পুনঃস্থাপনের পর আজ অবধি এখানে কোন অমঙ্গলের ঘটনাও ঘটে নি।

শওকত আলীকে এবারে ছেড়ে দিতে হবে—তাকে যে ভাবেই হোক খুশী করে করে দিতে হবে। এতগুলি কাহিনীর সন্ধান দিয়েছে সে আমাকে, অন্ততঃ শুধু সেজন্যও।

কিন্তু আমারও যেন ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে কিছু কাহিনী উপহার দিই। তবে সে কাহিনী অবশ্যই তার মত কল্পনার রঙে রঙীন হত না—হত বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্য। সব কাহিনী শেষ হয়ে গেলে সত্য তো একটু থেকেই যায়, তবু দ্বিধা হয়।

ওকে কি বলব আজকের নবাবের বর্তমান অবস্থাটা? নিজামত কেল্লার একটি ঘরে গতকাল যে তারই ব্যক্তিগত কামরায় বসে এক পেয়ালা চা খেয়ে এসেছি, নিয়ে এসেছি তাঁর নাম স্বাক্ষর করা একটি পুস্তিকা—যেটা তাঁর বেগমের রচিত, আমাকে দিয়েছেন তিনি উপহার হিসাবে—

এসব কথা কি বলা যায়! নবাবের খাস কামরায় বসে গল্প—এসব শুনে সে হয়তো আমাকেই অবিশ্বাস করে বসবে। ভাববে, আমি এতক্ষণ তার সঙ্গে অভিনয় করছিলাম।

আসলে নবাবী আমল চলে গেলেও, সেই স্মৃতিটাকে মনে মনে ধরে রাখতে শুধু শওকত আলি নয়, এখানকার সবাই বেশ উদগ্রীব। সেই স্বপ্ন নিয়েই চলে ওদের জীবন। তাদের স্বপ্নের নবাব বা নবাবের বংশধর যে আজ ওয়াসেফ মঞ্জিলের গেটে বসে দর্শকদের হাতের টিকিট পরীক্ষা করে—এ তথ্য তো তাকে জানানো যাবে না। নবাবী নেই, তাই নবাবের বংশধরকেও আজ গতর খাটিয়ে খেতে হয়।

হ্যাঁ, এ সবই সত্যি কথা। কিন্তু তাকে বলা যাবে না।

তবুও নদীর ওপারে যাওয়া এখনও বাকী রইল। সেখানে খোসবাগ, মতিঝিল হীরাঝিল প্রভৃতি নবাবী আমলের কত স্মৃতিচিহ্ন জাগ্রত—আধা-জাগ্রত অবস্থায় আছে। অনুসন্ধান করলে আজও সেখান থেকে হয়তো কোন গল্প শুনতে পাওয়া যাবে। আর শওকত আলীরা নদীর ওপারেও কি নেই? আছে নিশ্চয়, খুঁজে নিতে হবে একটু কষ্ট করে। □

গল্প শোনা একপ্রকার বিনোদন,
গল্প শোনানোও তদ্রূপ।
ভাল গল্প বলিয়ে এবং ভাল শ্রোতা
যদি পাওয়া যায়, তবে তারা হয় উৎকৃষ্ট পরিপূরক।
তাদের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে জন্ম নেয়
নিত্য-নতুন কথা-কাহিনী।
শুধু পরিবেশনের অভিনবত্বের জন্য অতি পুরাতন
কাহিনীও বলার গুণে হয়ে ওঠে নিত্য-নতুন।
বিনোদনের এ পদ্ধতি এ দেশে অতি পুরাতন।
তাই, লোকসমাজে শুধু ঠাকুমা-মা প্রভৃতি নারীসমাজ নয়,
একদা 'গল্প বলিয়েরা'
গ্রামবাংলার জনসমাজে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।
আসলে 'কথকতা'-ও তো এক প্রকার গল্প বলা—
তবে তার উদ্দেশ্য হল
ভক্তিরসের উন্মোচন। আর গল্প বলার যে ভঙ্গি,

লোকবিনোদন-১

তা এক প্রকার কথকতা হলেও, তা বরাবরই বিনোদনের
পর্যায়ে থাকে। সার্থক কথকতা সর্বক্ষেত্রেই
বাঞ্ছিত ফল ফলাতে পারে। যেখানে শ্রোতা
নিরক্ষর বক্তা শ্রুতিধর—
সেখানে এই পদ্ধতিই
যে এক উৎকৃষ্ট বিনোদন—
এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।
লোকবিনোদনের এ প্রথা অতি প্রাচীন কালের।
গল্প-বলা-বুড়ো পৃথিবীর সব দেশেই আছে—
প্রাচীন 'কথাসরিৎসাগরে' যেমন তার
উল্লেখ আছে, তেমনি একালের
'ফ্যান্টম' কাহিনীতেও সে আজও সসম্মানে বিরাজিত।
তাই কোন-না-কোন ভাবে তারা বেঁচে থাকেই।

কথকের কাহিনী

ময়লা ধুতি বা লুঙ্গি পরা, উর্ধাঙ্গ প্রায় অনাবৃত, কাঁধে একটা অনুরূপ মামানসই গামছা—এই হল তার পরনের বেশবাস।

চেহারাটা বেশ ভেঙ্গে এসেছে, গাল দুটো বসে গেছে। বয়সটা ষাট-পঁয়ষট্টির কাছাকাছি হতে পারে। বেশ কালো গায়ের রং। দাঁড়ালে বেশ লম্বা দেখায়। তবে এককালে যে লোকটি বেশ সবল-পেশীবহুল ছিল, তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

সব মিলিয়ে এই হল তারাদাস হাজরা। নতিডাঙ্গার তারাদাস—নদীয়া জেলার করিমপুর থানার উত্তর দিকের গ্রাম নতিডাঙ্গার তারাদাস হাজরা।

শহর কলিকাতার পরিমাপে গ্রামটি বেশ দূরেই বলতে হবে। নচেৎ তার নাম এখানে নিশ্চয়ই ছড়িয়ে পড়ত—চাই কি কাগজেও উঠে যেতে পারত। কিংবা উৎসাহী ব্যক্তির হাতে পড়ে 'তারাদাস সন্ধ্যা' জাতীয় প্রোগ্রামও হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু কিছুই হয়তো হবে না শেষ পর্যন্ত। কারণ—

নতিডাঙ্গা যাবার পথটা এখান থেকে বেশ দূর। শিয়ালদা থেকে ট্রেনপথে কৃষ্ণনগর নামতে হবে। কৃষ্ণনগর লোকাল ছাড়াও লালগোলা লাইনের গাড়ীগুলোও থামবে এখানে। তারপর ষ্টেশনের বাইরে এসে হয়তো সামনেই পাওয়া যাবে করিমপুরের মিনিবাস কিংবা বাসষ্ট্যাণ্ডে যাবার শহর-বাস। মিনিবাস ষ্টেশন থেকে না পেলে রিক্সায় বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে করিমপুরের বাস ধরতে হবে। ঘণ্টা আড়াই পরে চাপড়া, বড় আন্দুলিয়া, বেতাই পেরিয়ে নাজিরপুর। ওখানে দাঁড়িয়ে নতিডাঙ্গার বাস ধরলেই হবে—আর যদি কৃষ্ণনগর বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে নতিডাঙ্গার সরাসরি বাস পাওয়া যায় তো কোন অসুবিধাই নেই।

কিন্তু কেন আপনি আসবেন নতিডাঙ্গায় তারাদাস হাজরার কাছে—সে কারণটা না বললে তো সবটা বলা হল না। কারণ লোকটার তো আসলে কোন পরিচয়ই নেই। জমি-জমা নেই, আছে অগুণতি ছেলেমেয়ে। তিন ছেলে—বড়টি উনিশে পা দিয়েছে আর ছোটটি বারো-তেরো। আর মেয়ে হল চারটি। এইমাত্র কদিন আগে শেষ মেয়েটির বিয়ে দিয়েছে—অর্থাৎ চার-চার জামাই ওর।

শুনলে অবাক হতে হবে যে, তারাদাসের খবর একদা সংবাদ পত্রে বেরিয়েছিল। সে পরের জমিতে খাটে, মুনিষের যত রকম কাজ আছে সব সে করতে পারে। বিশেষ কোন হাতের কাজে সে তেমন উল্লেখযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, তবে চাষ-বাসের কাজটাই ভাল বোঝে সে।

তা-ও পরের জমিতে।

নিজের জমি কোথায়? এককালে নাকি অনেক ছিল। ওর ভাষায় শুনেছি—একে-ওকে-তাকে বিলিয়ে দিয়েছে—গ্রামের সৎ কাজে ব্যয় হবে বলে। দলিলপত্র

মিলিয়ে দেখলে হয়তো তারাদাসের কথার সত্যতা বোঝা যেত। কিন্তু তার কাছে গিয়ে জমি-জমার গল্প শুনে সময় নষ্ট করতে চায় না কেউ।

রাজমিস্ত্রীর কাজ জানে ভালই। ঘরের দরজা-জানালা রং করতে পারে—এখন মানে তেরো শ' চুরাশির ফাগুনে সে ঐ কাজই করছিল।

কিন্তু এ সবই হল তারাদাসের পটভূমি। পরিচয় তার এটা নয়। তার আসল পরিচয় হল—থাক সে কথা। কথায় কথায় সে কথা আপনিই এসে পড়বে।

বাল্যকালের কথা সে মাঝে মাঝে মনে করে। তখন এসে যায় তার জ্যাঠামশাই পাঁচু হাজরার কথা। আরেক পাঁচু হাজরা হল তার মামা। তার পিসেমশাই বিল্টু হাজরার কথাও তাকে মনে করতে হয়। কারণ এদের কাছেই সে সবচেয়ে বেশী গল্প শুনেছিল। সময় কাটানোর গল্প, দুষ্টুমি থামানোর গল্প, ঘুম পাড়ানির গল্প। এরা সবাই ছিল ওরই মত মুনিষ—অবস্থা তার চেয়ে একটুও উন্নত নয়। অথচ এত গল্প যে ওরা কোথা থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিল সেটাও তারাদাসের কাছে বিস্ময়ের বিষয়।

ঠাকুমাকে বাল্যকালে পায়নি তারাদাস। তাই ওই জ্যাঠা-পিসে-মামা-র দলই তাকে শুনিয়েছিল অজস্র গল্প।

আর তাই শুনে শুনে তারাদাসেরও এক অদ্ভুত ক্ষমতা হয়েছিল। বয়স তখন তার মাত্র দশ। যা সে শুনত, তাই মনে করে রাখতে পারত—যাকে বলে একেবারে শ্রুতিধর। মনে রাখার বোধহয় একটা অতিরিক্ত ক্ষমতা ছিল বালক তারাদাসের। শুধু তাই নয়, যতক্ষণ না সেটা কাউকে বলতে না পারছে, ততক্ষণ যেন স্বস্তি নেই। এ ভাবেই অনুশীলন হত—বলার পর বলা চলত।

পদ্ধতিটা যে একান্ত ভাবেই মনোবিজ্ঞানসম্মত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; বার বার বলতে বলতে প্রায় মুখস্থ হয়ে যেত সেটা।

তবে মজার ব্যাপার হল, দ্বিতীয় বার বলতে গেলে সেটা একটু বেড়ে যেত, তৃতীয় বারে আরো—এইভাবে গল্পের আয়তন ক্রমেই দীর্ঘায়িতন হত। তবে এই অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যটা হতো তার নিজস্ব দক্ষতার দ্বারাই।

এইভাবে বাল্যকালে যে অভ্যাস সে রপ্ত করল অর্থাৎ গল্প শোনার আগ্রহ, গল্প শোনানোর আগ্রহ এবং প্রয়োজনমত দৈর্ঘ্য কমানো-বাড়ানোর দক্ষতা—পরবর্তীকালে তা-ই তাকে করে তুলল এক সার্থক গল্পবলিয়ে।

আজ তারাদাসের স্মৃতির ভাঁড়ারে গল্পের সংখ্যা হল একশো আট। এই সংখ্যাটা সম্বন্ধে সে কখনো দ্বিমত হয় না। যদিও সব গল্প তার মনেও নেই আজ। সংখ্যাটা একশো সাত বললেও সে আপত্তি জানাবে, আবার একশো নয় বললেও মানতে চাইবে না সে কথা।

সংখ্যা সম্বন্ধে তার এই দৃঢ়তা দেখে মনে হয়, এই সংখ্যাটা তার ধর্মবিশ্বাসের মত হয়ে গেছে। এমনিতে সে ধর্মভীরু, দেব-দ্বিজে ভক্তি করে। শ্রীকৃষ্ণের, শিবের

এবং অন্যান্য দেবদেবীর অষ্টোত্তর শতনামের সংখ্যাটা তার মনে এতই দৃঢ় যে এক্ষেত্রেও যেন তার গল্পের সংখ্যা একশো আটেই থেমে আছে।

তার গল্প বলার পদ্ধতি সম্বন্ধে আরো কিছু বলার আছে। যে কোন গল্পকে শ্রোতার সময় অনুযায়ী সে বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে—এ' কথা আগেই বলা হয়েছে। এ ভাবে তার ভাঁড়ারে আছে আধ ঘণ্টা থেকে তিনঘণ্টা দৈর্ঘ্যের গল্প এবং এদের সবচেয়ে ক্ষুদ্র হল পাঁচ মিনিটের গল্প—তবে সংখ্যায় তা' খুব কম। কেননা, শ্রোতারা প্রায়ই দীর্ঘ গল্প শুনতে ভালবাসে—তবে তিন ঘণ্টার বেশী গল্প বলতে সে নিজেই হাঁপিয়ে ওঠে—বয়স তো হচ্ছে!

এমনও হয়েছে যে, গল্প বলা শেষ হয়েছে অথচ শ্রোতার সময় আছে তখনও—তখন সে কৌশলে অন্য একটা গল্প জুড়ে দেয় তার সঙ্গে।

এ কৌশলটা তাকে আরেকবার প্রয়োগ করতে হয়—যখন সে দেখে শ্রোতাকে ঠিক ভালভাবে আকর্ষণ করতে পারছে না বা শ্রোতার কাছে গল্পটা পুরানো—তখন। কাজেই শ্রোতার হাতে কত সময়—এটা সে জেনে নেয় সুবুতেই।

এভাবে হিসেব করলে এবং হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে সে মাত্র বারো-তেরোটা গল্পের নাম মনে করতে পারে—তবে গল্প বলতে বলতেই তার অন্যান্য গল্পের নামগুলো বেশী মনে পড়ে যায়। যেমন:

'পরচিত্র' বলতে সময় লাগে এক ঘণ্টা। এই সময়ের মাপের আর কয়েকটা গল্প হল—বিজলী, হঠাৎ বাবু, চীনরাজা ইত্যাদি। দুই ঘণ্টা মাপের গল্প হল হরিদাস। তার চেয়েও ছোট গল্প আছে তার ভাঁড়ারে—আনন্দ আর নন্দ, বাগাল কৃষ্ণ—এগুলি সব ঘণ্টা খানেকের মাপের। শ্রোতার সময় যদি হয় মাত্র আধ ঘণ্টা, তবে সে শোনাবে এক ব্রাহ্মণ, কর্মফল, যাকে রাখি সেই রাখে, ডুবরাজ কালু খাঁ প্রভৃতি গল্প।

নিতান্তই যদি হাতে সময় না থাকে তবে পাঁচ মিনিটেও সে গল্প শুনিয়ে দিতে পারে।

এইসব গল্পের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগে তার কোন গল্পটা? এই প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়: 'পরচিত্র'।

আমার-আপনার কাছে ঐ শব্দটার যে অর্থই হোক না কেন, তারাদাসের কাছে পরচিত্র হল একটি মেয়ের নাম—নাকি তার কাহিনীর নায়িকার নাম। রূপকথার গল্পে ঐ ধরনের নাম কখনও শোনা যায়নি। এ' গল্পটা ভাল লাগার কারণ হল—এখানে আছে চোর-ডাকাত, ঠাকুর-দেবতা, সৎ-অসৎ ইত্যাদি নানাবিধ মানবিক গুণের সমাবেশ। সৎ পথে চলার পরামর্শ তো আছেই।

তিনঘণ্টার গল্প শোনানো তখন সম্ভব নয় বলে খুব সংক্ষেপে জানালো এর সারমর্ম:

দুই ভাই—একজন হরিভক্ত, অপরজন ডাকাত। যে ভাই ডাকাত, সে ডাকাতি

করেই জীবনে উন্নতি করেছে। হরিভক্ত খুব কষ্টে থাকত। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই-ই ভগবানের কৃপায় রাজা হল এবং অন্য ডাকাত ভাইকে সৎ পথে আসার পরামর্শ দিল। সে ডাকাতি বন্ধ করল এবং হরিভক্ত রাজা ভাই তার সংসারের ভরণপোষণের ভার নিল।

গল্পের শেষ অংশটা অন্য রকম। সেখানে গুরু শিষ্যের সংলাপের দ্বারা এর নীতি-কথাটা ব্যক্ত করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় যে, তার গল্প সুরু হয় স্বাভাবিক নিয়মেই—'এক যে ছিল' জাতীয় শব্দগুচ্ছ দিয়ে। গল্পটা অবশ্যই রাজা-রানী, চাষা-চাষী, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, পশুপাখী ইত্যাদি ঐতিহ্যসম্মত পাত্র-পাত্রী দিয়েই। কিন্তু শেষ করার সময়ে বা বা শেষ হয়ে গেলে সে কিন্তু ঐতিহ্যসম্মত ভাবে বলে না: 'আমার কথাটি ফুরলো' ইত্যাদি—কাহিনী শেষ হলে গল্পও শেষ হয়, তার সঙ্গে অতিরিক্ত আর কিছু সংযোগ করে না।

তার নিজের বিশেষ পছন্দ 'পবচিত্র' নামক গল্পটি হলেও, শ্রোতাদের বিশেষ পছন্দের কথা তারাদাস জানে না। তার মনে হয়, তার সব গল্পই শ্রোতাদের ভাল লাগে—কোন কাহিনীর প্রতি তাদের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। শ্রোতাদের ইচ্ছাই সব, কিন্তু একটা ব্যাপারে তার নীতিবোধ ভীষণ টনটনে। সে যে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে এবং বাস্তবে তার কোন অস্তিত্বই নেই—এ' সম্বন্ধে সে বেশ সচেতন। কিন্তু তার বাকচাতুর্য—হোক তা' গ্রাম্যতাযুক্ত—তা' এতই নিপুণ যে—শ্রোতাকে শেষ অবধি সে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

সে নিজে এই গল্প সম্বন্ধে বলে যে এগুলি হল উপন্যাস বা মিথ্যে কথা। কথাটা ঠিক—আধুনিক শ্রোতা এখানে উপন্যাসের সঙ্গে মিথ্যে কথার সম্বন্ধ নিয়ে চিন্তায় না বসেন! এবং যেহেতু তারাদাস এই দক্ষতা অর্জনের জন্য কোন মূলধন বিনিয়োগ করেনি - অথচ সহজেই জন-মনোরঞ্জনের দায় বহন করতে পারা যায়, তাই সে তার গল্পবলার দক্ষতাকে বলে 'বিনি পয়সার পুঁজি'।

তার বিনি পয়সার পুঁজির একটা ছোট্ট নমুনা শোনানো যাক:

পুরাকালে এক রাজা ছিলেন। সভাকক্ষে তিনি বসে আছেন রানীর পাশে। কোন একটা ব্যাপারে রাজা বিরক্ত হয়ে বলছেন: 'চাষা নিয়ে ঘর করা'। শুনে রানী মন্তব্য করেন: 'কেন রাজা, চৈত্র মাসে এসব ঝামেলা কেন?'

রাজা কোন উত্তর না দিয়ে নীরব থাকেন। রানী তখন সরল প্রশ্ন করেন: 'হুজুর, চাষা কেমন?' এ প্রশ্নে রাজা চমকে উঠলেন: 'চাষা দেখবে?'

রানীর সম্মতি পেয়ে রাজা এক চাষাকে আনবার ব্যবস্থা করলেন।

এদিকে এক চাষা আসছিল তার ছেলেকে নিয়ে—রাজার সঙ্গে কোন ব্যাপারে দেখা করবে বলে। প্রাসাদের তোরণে এসে তার সঙ্গে দ্বারীর কথা হচ্ছিল। রাজার প্রতিহারী তাকে ডেকে নিয়ে গেল সভাকক্ষে রাজা-রানীর সামনে।

গল্প কথকের স্থান শুধু গ্রামীণ জনসাধারণের কাছে নয়, সমাজের প্রায় সর্ব-স্তরেই এর স্বীকৃতি। মোগল যুগের পর হিন্দুযুগেও রাজসভায় গল্প কথকদের নানা নামে দেখা গেছে—ভাঁড় বা বিদূষক যে তারই একটা অংশ নয়—তা কে বলবে?

সংস্কৃত সাহিত্যের যতগুলি মহাগ্রন্থ আজ অবধি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেচে—তার সর্বত্র যে রীতি গ্রহণ করে রচিত হয়েছে—তা হল একজন গল্প বলে যাচ্ছেন এবং অন্যরা তা শুনছে। 'কথাসরিৎসাগর' হল এ জাতীয় বৃহত্তম গ্রন্থ। এটি স্থায়ীভাবে সংকলিত হবার পূর্বে যে টুকরো কাহিনী রূপে দেশে প্রচলিত ছিল—তা জানিয়েছেন পণ্ডিতরা। অনুরূপ ভাবে পঞ্চতন্ত্র নামে পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত সংস্কৃত গল্পগুচ্ছের নামও মনে আসতে পারে। আর একটি নাম হল 'বৃহৎকথা মঞ্জরী'। কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক কাহিনীই একাধিক গ্রন্থে দেখা যায়—অর্থাৎ যে যেমন শুনেছে সেই মত সংকলন করেছে।

এমনকি রামায়ণ-মহাভারত নামে যে দুটি মহাকাব্য আজও সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং ভারতের মহাকাব্য বলে স্বীকৃতি পেয়েছে, তার শাখা কাহিনীগুলি বহু পূর্ব হতেই এদেশে প্রচলিত ছিল এবং বাল্মীকী ও বেদব্যাস সেগুলি সংকলন করে একত্রিত করেছেন মাত্র।

একজন সার্থক গল্প-বলিয়ের উল্লেখ করেছিলেন রেভারেন্ড লালবিহারী দে তাঁর 'ফোকটেলস অব বেঙ্গল' গ্রন্থে। শম্ভুর মা-এর গল্পগুলিই পরে তিনি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করে গ্রন্থবদ্ধ করেন। বাংলার লোককথার অজস্র সম্পদ মা-ঠাকুমার মধ্য দিয়ে পরবর্তী-পরবর্তী-পরবর্তী প্রজন্ম অবধি পৌঁছে—শেষে তা লিপিবদ্ধ রূপে স্থায়ী সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। সেগুলিই আজ লোকসাহিত্যের অন্যতম সম্পদরূপে বিবেচিত। অবশ্য এ সত্য দেশ-বিদেশের সকল লোককথার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মধ্যপ্রাচ্যের আরব-তুরস্ক-ইরাক-ইরান-পারস্য প্রভৃতি দেশের জনসাধারণ গল্প শুনতে ভালবাসত। তাদের গল্পে রোমাণ্টিকতা ও জীবনধর্মীতা এত শিল্পসম্মত ভাবে মিশে থাকত যে প্রাপ্তবয়স্ক শ্রোতাও তা শুনে যথেষ্ট আনন্দ পেত। শুধু জনসাধারণ নয়, রাজা-বাদশারাও যে এ জাতীয় কাহিনী শুনবার জন্য প্রভূত আগ্রহী ছিলেন—আরব্যোপন্যাসের পৃষ্ঠায় তার প্রমাণ আছে।

প্রসঙ্গতঃ, শুধু মনোরঞ্জন বা লোকবিনোদন নয়, নীতিকথা প্রচারের জন্যও যে কথক ঠাকুরের বলা গল্প মানুষকে অভিভূত করত ও একপ্রকার ধর্মশিক্ষা পেত তারা এভাবেই—এ দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যে তার অজস্র প্রমাণ আছে। বৌদ্ধ-সাহিত্যের জাতক কাহিনীগুলি স্বয়ং বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত কাহিনীর সংকলন মাত্র। যীশুখ্রীষ্ট যে ভাবে তার শিষ্যদের এবং জনগণকে নীতিশিক্ষা দিতেন—তারও মাধ্যম ছিল 'প্যারাবেল'—যা আজ উৎকৃষ্ট সাহিত্য রূপে সম্মানিত।

তার চেহারা চাষার মতই—নিতান্তই দীন। তার পা কেটে গেছে—'পা নাই' [কাটা পা], এক পা দিয়েই সে চাষ করে।

দু'জনে অন্দরে প্রবেশ করে। তারা দেখছে, তাদের সামনে চেয়ারে বসা রাজা, তার পাশে রানী। চাষী এল বরকন্দাজের সঙ্গে। রাজা বলেন রানীকে : 'ঐ দেখ, চাষা এসেছে। যদি কোন প্রশ্ন থাকে—করো।'

রানী বলল চাষাকে : 'ওটা তোমার কে' ?

চাষা বলল : 'ওটা আমার হাঁটানে ব্যাটা।'

রানী বলল : 'হাঁটানে ব্যাটা কেমন।'

রাজা সেটা ব্যাখ্যা করে দিয়ে বলেন : 'দেখলে তো চাষা কাকে বলে'। এরপর চাষাকে দশ টাকা দিয়ে বিদায় করা হল।

এখানেই শেষ হল তারাদাসের গল্প—এটা হল পাঁচ মিনিটের গল্প। ঠিক যে ভাষায় সে বলেছিল, হুবহু সেই ভাষায় তা' লেখা গেল না। তবে 'হাঁটানে ব্যাটা' সম্বন্ধে তারাদাস পৃথক ভাবে যা বলেছিল, তা' এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মুসলমান সমাজে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রীতি আছে—এক স্ত্রী জীবিত থাকলেও, চাষাটির সঙ্গে যে ছেলেটি এসেছিল সেটি তার স্ত্রীর আগের স্বামীর ছেলে। অর্থাৎ চাষাটি এক সপুত্রক স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছে। মনুষ্য সমাজে এ' জাতীয় বিবাহ-প্রথা চালু নেই। নেহাৎ সে চাষা বলেই বোধহয় সপুত্রক স্ত্রীলোক বিবাহ করেছে। শুধু সপুত্রক নয়, যথেষ্ট বড়, হাঁটতে চলতে পারে—তাই সে হাঁটানে ছেলে।

এ' গল্পটার নাম বলার সময়ে সে একটু ভেবে বলেছিল : 'একটি চাষা'। প্রকৃতপক্ষে এ' নামটি বোধহয় সঠিক নির্বাচন হয়নি—'চাষার বুদ্ধি' হলেই আরো বুদ্ধিদীপ্ত হত।

এই গল্পটা থেকে বোঝা যায় কয়েকটি কথা : প্রথমতঃ, 'পুরাকালে' শব্দটা সে সব সময়েই ব্যবহার করে। যদিও এ গল্পের সঙ্গে পুরাকালের কোন সংবন্ধই নেই। দ্বিতীয়তঃ, সভাকক্ষে রাজার সঙ্গে রানী থাকেন না—থাকে পারিষদবর্গ। এটা তারাদাসের জানবার কথা নয়—হয়তো সে এভাবেই শুনেছে তার মামা-জ্যাঠাদের মুখে। তৃতীয়তঃ, রানী যখন রাজাকে সম্বোধন করেন, তখন তার ভাষা হুজুর হয় না, হয় মহারাজ বা এই জাতীয়। এই শব্দ নির্বাচনেও তারাদাসের নিজের অভিজ্ঞতার প্রকাশ হয়েছে। চতুর্থতঃ, ঠিক এক নিয়মেই তার গল্পের রাজারানী চেয়ারে বসে থাকে, সিংহাসনে নয়। পঞ্চমতঃ, তা সত্ত্বেও সে অন্দর মহল, বরকন্দাজ প্রভৃতি সুন্দর শব্দ ব্যবহার করতে ভালবাসে, সেইসঙ্গে জানাই 'পা নাই' 'হাঁটানে ছেলে' প্রভৃতি খাঁটি দেশজ শব্দ ব্যবহার করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

এত গল্প জানা আছে তার, গল্প-বলিয়ে হিসাবে খ্যাতিও যথেষ্ট, অথচ দুঃখের বিষয় হল, এ বিষয়ে তার কোন উত্তরাধিকার নেই। নিতান্ত দারিদ্র্যের জন্যই তার

ও মা দীর্ঘদিন পরে ফিরে এসেছে বাড়ীতে—তাদের সঙ্গে দুই পাত্র। তারা জানালো যে পাত্র খুঁজতে খুঁজতে তাদের এত দেরী হল।

যাহোক, এবার তিন পাত্রই এই মেয়েকে বিয়ে করতে চাইল। পিতা চাইল তার পাত্রের সঙ্গে, মাতা চাইল তার পাত্রের সঙ্গে এবং ছেলে চাইল তার পাত্রের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হোক। প্রত্যেকেই নিজের পক্ষে যুক্তি দেখাতে লাগল। এই নিয়ে এক কলহের সৃষ্টি হল। ইতিমধ্যে মেয়েটি সর্পাঘাতে মারা গেল। তখন তাকে দাহ করতে হবে।

তিন পাত্র বলল: 'আমরা যখন তাকে বিয়ে করতে এসেছিলাম, তখন আমরা তার স্বামী। সুতরাং তাকে দাহ করার ভার আমাদের। তার মৃত শরীর এখন আমাদের হাতে দেওয়া হোক। এ ব্যাপারে তোমরা কোন কথা বলবে না।'

তারা সেই মেয়ের মৃতদেহ নিয়ে এল নদীর ধারে। সেখানে তারা কাঠের পর কাঠ দিয়ে চিতা সাজাল। তারপর মৃতদেহটা চিতায় তুলে একজন পাত্র তার মুখে আগুন দিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

সেই মৃতদেহ যখন পুড়ে ছাই হল, তখন দ্বিতীয় জন সেই পোড়া চুলের ছাই নিয়ে চলে গেল। বলল: 'সে তো নেই, তার এই স্মৃতিটুকু নিয়ে যাই।' তৃতীয় জন ভাবল: 'কি হবে আর কোথাও গিয়ে। এখানেই বরং বসে থাকি।' এই বলে সে চিতা আগলে বসে রইল শ্মশানেই।

এদিকে সেই ব্রাহ্মণপুত্র যে ছাই নিয়ে শ্মশান ছেড়ে চলে এসেছিল—সে ঘুরতে ঘুরতে আরেক দেশে এল। অনেক খুঁজে খুঁজে আর এক ব্রাহ্মণের বাড়ী রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করল। সেখানে থাকে এক ব্রাহ্মণ, এক ব্রাহ্মণী ও তাদের ছয় মাসের শিশু। হঠাৎ অসময়ে অতিথি এসে পড়ায় ব্রাহ্মণ দোকানে গিয়ে চাল-ডাল ইত্যাদি খরিদ করে নিয়ে এল। তারপর ব্রাহ্মণী রান্নায় বসল। সে সময়ে ব্রাহ্মণ পাত্র এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল:

ব্রাহ্মণীর শিশু সন্তানটি দুষ্টুমি করে তার রান্নার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। তাই দেখে ব্রাহ্মণী তাকে মুচড়ে উনানের কাঠের মধ্যে পুরে দিল। আগুনের কাঠের সঙ্গে সেটা জ্বলতে জ্বলতে ছাই হয়ে গেল।

এদিকে রান্না শেষ। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তখন ব্রাহ্মণ পাত্রকে খেতে বসতে অনুরোধ করল। ব্রাহ্মণ পাত্র বলল: 'আমি খাবো না।' এ' কথা শুনে ব্রাহ্মণ গৃহস্থ খুব রেগে গেল। একে সে দরিদ্র, তায় অতিথি সেবার জন্য ধারে সব জিনিস পত্র কিনে আনল—আর এখন কি না ব্রাহ্মণ পাত্র বলছে যে সে খাবে না!

ব্রাহ্মণ পাত্র তখন কারণ দেখালো—ব্রাহ্মণের অশৌচ। কেননা, তার সন্তান এইমাত্র মারা গেছে। ব্রাহ্মণ চমকে উঠল এই কথা শুনে। সে তার কাছ থেকে সব কথা শুনে বলল: 'ওঃ! এই কথা।' বলে সে উনান থেকে এক মুঠো ছাই বের করে হাতে নিয়ে ফুঁ দিল। তাতে ব্রাহ্মণের মৃত সন্তান বেঁচে উঠল।

এ সব দেখে অতিথি ব্রাহ্মণ পাত্র তার কোঁচার খুঁট থেকে ঐ মৃত কন্যার চুলের

ছাই বের করে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের হাতে দিল এবং তাকে অনুরোধ করল, যেন সে ঐ ছাইকে জীবন দান করে দেয়। গৃহস্থ তখন সেই ছাইয়ে ফুঁ দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করল। তখনই সেই কন্যা বেঁচে উঠল। সেই নবজীবিত ব্রাহ্মণকন্যাকে নিয়ে সেই ব্রাহ্মণপুত্র শ্মশানের দিকে যাত্রা করল।

এদিকে সেই প্রথম ব্রাহ্মণপুত্র, যে মৃত কন্যার মুখে আগুন দিয়েই চিতা ছেড়ে চলে গেছিল, সে হঠাৎ ভাবল : 'তাই তো, আগুন তো মুখে দিয়ে এলাম, দেহটি পুড়ল কি না—তা তো দেখা হল না। একবার দেখে আসি।' এই ভেবে সে পুনরায় ঐ শ্মশানের দিকে যাত্রা করল।

যথাসময়ে মুখে আগুন দেওয়া ব্যক্তি, চিতা আগলে থাকা ব্যক্তি এবং নবজীবন্ত কন্যাকে নিয়ে আসা ব্যক্তি—তিনজনেই শ্মশানে একত্র হল—পরস্পরের দেখা পেল। এবারে কে তাকে বিয়ে করবে এই নিয়ে দারুণ সমস্যা দেখা দিল—কেন না কন্যা যখন জীবন্ত রয়েছে, তখন তাকে বিয়ের জন্য তিনজনেই দাবীদার।

মেয়ের বাবা সেই ব্রাহ্মণ তখন এই কলহ থেকে সবাইকে মুক্ত করার জন্য অনেক ভেবেচিন্তে বিচার করল। নচেৎ তিনজনের সঙ্গে তো মেয়ের বিয়ে হতে পারে না।

তারপর সে বলল : 'যে কন্যার মুখে আগুন দিয়ে চলে গেছে—সে পুত্রের কাজ করেছে। কেননা সন্তানই পিতা-মাতার মুখাগ্নি করে। যে তার মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার করেছে—সে পিতার কাজ করেছে। সুতরাং এ' দুজনের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হতেই পারে না। যে চিতা আগলে বসেছিল সে যথার্থই কাজ করেছে। তার দুঃখ বেদনা দিয়ে সে মৃতদেহ ঘিরে বসে থেকে প্রমাণ করেছে যে যথার্থ ভাল সেই তাকে বাসে। সুতরাং স্বামীর কাজ করেছে সে। সুতরাং ঐ ব্যক্তিই তার মেয়ের সহধর্মিনী। তারপর শুভদিনে শুভক্ষণে ঐ ব্রাহ্মণ পুত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণকন্যার বিয়ে হল।

তারাদাসের গল্পও শেষ হল।

তারাদাস এই গল্পটা শুনেছিল তার শ্বশুর জ্যোতিষ মণ্ডলের কাছে। সে-ও অল্প অল্প গল্প বলতে পারত। শ্বশুর জামাইকে এই গল্পটা শুনিয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল—'এই গল্পের অর্থ কি ;' এর উত্তরে জ্যোতিষ এই গল্পটি বলে।

তারাদাসের ধারণা এ' গল্প বা তার বলা যে কোন গল্পই কারুর জানা নেই। এটা হল আধ ঘণ্টার গল্প।

এ গল্পের নামও সে প্রথমে বলেনি। দু' লাইন সুরু করে তারপর নামটা বলে দেয়। তবে তার গল্পের ভাষা সব সময়েই গদ্য—কোথাও পয়ার ছন্দ নেই বা সুর নেই। মুখের দু' একটা দাঁত পড়ে গেছে, তাই শব্দ বেরিয়ে যায়—তার জন্য সে শ্রোতাদের নিকট দুঃখ প্রার্থনা করে।

কাকে যে সে গল্প বলে না—তার যেমন কোন ঠিক-ঠিকানা নেই—তেমনি কোথায় যে সে গল্প বলে না—তারও কোনে ঠিক নেই।

বাসে চেপে কোন স্থানে যাত্রা করলে সে জুড়ে দেয় গল্প—ছোট পাঁচ-দশ মিনিটের গল্প। আবার যখন নদীতে নৌকা-বাইতে হয় তখনও সে জুড়ে দেয় গল্প। এমন কি ট্রেনেও সে চুপ করে থাকে না। তার মেয়ের শ্বশুর বাড়ী হল দাদপুর—স্থানটি হল মুর্শিদাবাদ জিলায়—রেজিনগর ষ্টেশন নেমে যেতে হয়। বেলডাঙ্গা থেকে রেজিনগর—এই কয়টি ষ্টেশনের মধ্যেই সে গল্প জুড়ে দেয় সহযাত্রীদের সঙ্গে।

তবে সবচেয়ে ভাল লাগে তার মাঠে নিড়ান দেবার সময় গল্প করতে। হাতে সময় থাকে অফুরন্ত, শ্রোতাও পায়। তাই মাথার উপর সূর্য থাকলেও সে ক্লান্তি বোধ করে না। তার ধারণা, কথা বলতে বলতে কাজ করলে তাতে কাজের গতি বেড়ে যায়। তবে কাজ বন্ধ করে গল্প করা—এটা তার পছন্দ নয়। কেন না, তাতে কাজের ক্ষতি হয়। কিন্তু তারাদাস জানে না, যে তার গল্প শুনতে-শুনতে অন্যদের কাজের গতি ধীর হয়ে যায়।

আশ্চর্য এক বিদ্যা অর্জন করেছে তারাদাস হাজরা। এখন কতদিন যে চালিয়ে যেতে পারবে ঐ ১০৮ গল্প নিয়ে যোগ-বিয়োগ করে কে জানে! হয়তো তার যোগ্য উত্তরাধিকারী রূপে পুত্র ধনঞ্জয়কে তৈরী করতেও পারবে—কিংবা পারবে না।

আর একজন লোকের নাম সে জানালো—এই গ্রামেই থাকে। তার নাম লোকমান শেখ। সে-ও গল্প বলতে পারে—তবে তার এত খ্যাতি নেই। সে কষাই-এর কাজ করে মাঝে মধ্যে—তবুও মূলতঃ সে মুনিষ।

ঠাকুমা দিদিমাদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন এসেছে তারাদাসের যুগ। এটাও হয়তো একদিন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের মধ্যে সাক্ষরতা সেদিন এত বাড়বে না। বই পড়াতেও তার এত আগ্রহ হবে না। অবসর বিনোদনের জন্য সহজে যাত্রা-সিনেমা-দূরদর্শন ইত্যাদি দেখতেও পারবে না—সামাজিক বা আর্থিক কারণের জন্য।

তারাদাসের পর এই সব জনসমাজকে কে শোনাবে গল্প? তার শ্রোতারা কি তাকে স্মরণ করে এ সব গল্প বাঁচিয়ে রাখতে পারবে?

তার শেষ গল্পটা—যেটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, অনুসন্ধানী ব্যক্তি তার মধ্যে হয়তো বিক্রমাদিত্যের তাল-বেতাল কাহিনীর ছায়া খুঁজে পাবেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও তার মুখে এ কাহিনী এক নতুন রূপ নিয়েছে।

লোকসাহিত্যের নিজস্ব নিয়মে এ ভাবেই গল্প পাল্টে পাল্টে এক নতুন চেহারা নিচ্ছে আমাদের অগোচরে। তার জন্য যে কৃতিত্ব, সেটা সবটাই তো তারাদাসের প্রাপ্য। কিন্তু গল্পকথক রূপে কে তাকে মনে রাখবে আর!

লোকসাহিত্যের আদর্শ ধারক তারাদাস হাজরাকে কেউ যদি বলে: 'মুনিষের কাজের পরিবর্তে যদি গল্প বলার কাজ তাকে দেওয়া হয়—তবে সে কি রাজী হবে?' উত্তরে সে সভয়ে পিছিয়ে আসবে। মিথ্যা কথা বলে জীবিকা অর্জন করতে সে কখনই রাজী হবে না! □

ভারতের পুর্বাঞ্চসীমার লোকসংস্কৃতির
কোন্ লোকনৃত্য বা লোকনাট্য বা লোকনৃত্যনাট্য
বিদেশে পাড়ি দিয়েছে ?
কোন বিশেষ লোকনৃত্যনাট্য
বার বার বিদেশে গিয়ে সমাদৃত হচ্ছে ?
কোন লোকনৃত্যনাট্য আজ
বিনোদনের বাইরেও সাধারণ মানুষের কাছে জীবিকা-তুল্য
বলে গৃহীত হচ্ছে ?
বলাবাহুল্য প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর হবে
পুরুলিয়ার ছো নাচ।
ছো একটি নৃত্য, ছো একটি নাট্য—
এ নিয়ে পণ্ডিতেরা যত তাত্ত্বিক বিতর্কই করুন,
অর্জিত ধারনার পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি বিশুদ্ধ লোকনৃত্যনাট্যই—
যেটি একান্তই পুরুষকেন্দ্রিক।

লোকনৃত্য-১

এই নৃত্যের উদ্ভব, বিকাশ-সমৃদ্ধি
ইত্যাদি বিষয়ে
দীর্ঘদিন ধরে বিশেষজ্ঞদের নানা আলোচনা
শুনে থাকলেও,
এই বিশুদ্ধ বিনোদন মাধ্যমটি যে আজ
মানভূমির এলাকা ছেড়ে নিতান্ত
শহরবাসীকেও যথেষ্ট বিনোদিত করছে—
নানা মাধ্যমে এ সংবাদ ছড়িয়ে গেছে মানভূম অঞ্চলের সর্বত্র।
শহরের অভিজাত সমাজে
এত বিপুল আয়োজনের বিনোদন-পদ্ধতি
প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও
কী ভাবে যে এই বর্ণাঢ্য, বীররসাত্মক পুরুষনির্ভর
নৃত্যনাট্যপ্রকরণটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে,
তার সফলতার ফল শহরবাসী নয়, সরকারও জানেন।

পুরুলিয়ার ছৌ নাচ পার্টি

শ্রীশ্রীহর্ষ মল্লিক

আজ অনেকদিন পরে মনে পড়ল কালোসোনার কথা।

এখন তার বয়স কত হল কে জানে। এতদিনে হয়তো সিধু কলেজ থেকে তার হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে কলেজে প্রবেশ হয়ে গেছে। হয়তো এখন সে একটু একটু করে আকৃতি প্রকৃতিতে পাল্টে যাচ্ছে। সে যে পুরুলিয়ার গ্রামের ছেলে, তা হয়তো ভুলে যাবে ধীরে ধীরে।

তাহলে সে কি এখন আর ছৌ নাচ করে না? তার বাপ সদানন্দ মাহাতোর কি মনে কখনও ইচ্ছা হয়নি, তার ছেলেও তারই মতো ছৌ নাচে নাম করুক? তার চেয়েও খ্যাতিতে ছড়িয়ে থাক?

কে জানে! কবে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে। তখন সে কি মনে রাখতে পারবে—একদিন, পৌষ-সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যায় সে কল্যাণীর মত ঝকঝকে শহরে তার নাম-ঠিকানা লেখা ছোট একটি চিরকুট এগিয়ে দিয়েছিল আমার হাতে। বলেছিল, আমার নামটাও লিখে নেবেন আপনার খাতায়।

কোথায় পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি থানার ডাভা পোষ্টাপিসের অন্তর্গত বোড়াং গ্রাম—আর কোথায় এই ঝকঝকে সাজানো কল্যাণী শহর!

তার বাড়ীর ঠিকানার সঙ্গে 'নপাড়া মজদুর সমিতি ছৌ নৃত্য পার্টি', থানা পুঞ্চা, পুরুলিয়া, স্থাপিত ১৯৬৪'—সংস্থার সম্পর্ক যে বড়ই দূরের। পৈতৃক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সে বিভিন্ন দলের সঙ্গে ছৌ নাচ নাচতে যাচ্ছে, সেই করতে করতে সে এসে পড়েছে এই কল্যাণীতে।

এই তো কিছুক্ষণ আগেই কল্যাণী টাউন ক্লাবের বড় হলঘরটায় প্রায় আধ ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে নপাড়ার ছৌ নাচ পার্টি'র ২২-২৩ জন লোকের সঙ্গে কথা বলে এলাম—তাহলে সে কোথায় ছিল?

হয়তো ছিল, নাচের মুখোস গাড়ী থেকে নামানোর কাজে ব্যস্ত, বা নাচের পোষাকগুলো গুনে গুনে ঠিক হিসাব করতে মগ্ন। কেন না ও তো জানত যে বাদল সহিস বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। দেখা গেল সে ব্যক্তিটি এই কল্যাণীতে প্রোগ্রাম করতে আসা এই নপাড়ার ছৌ নাচ পার্টি'র অধিকর্তা গোছের ব্যক্তি।

বাদলবাবু—হ্যাঁ, তাকে বাদলবাবুই বলা ভাল। কেন না, সমগ্র দলটিতে সেই-ই একমাত্র সরকারী চাকুরে। পুঞ্চা পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কর্মরত। নাম ঠিকানা বিনিময়ের সময়ে দেখেছিলাম তার ইংরোজী হাতের লেখাটিও বেশ অফিসের লোকের মতই। কথাবার্তা তো বটেই। নিজে সে আর নাচ করে না, তবে দলের

সঙ্গে থাকে—পরিচালনা ব্যাপারটা দেখে। বিশেষতঃ পুরুলিয়া জেলার বাইরে কোথাও গেলে, প্রধানতঃ তাকেই যেতে হয়।

পুরুলিয়া জেলার বাইরে? হ্যাঁ, তাও গিয়েছে বৈকি এরা। নিকটবর্তী বাঁকুড়া, বর্ধমানে তো বটেই। অবশ্য পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানা এলাকাটাও যে বাঁকুড়া জেলার একেবারে সংলগ্ন—সেটাও এখানে বলে রাখা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে বিহারে-উড়িষ্যায়—এমন কি সুদূর কেরল পর্যন্ত এই দল।

এদের নাচের দল গেছে বারাসতে—'কৃষ্ণের অষ্টসখী' নাচ নিয়ে। বিষয়টা ছৌ নাচের লাইনের একটু বাইরে বলে মনে হয়—তবে এটা ইদানীং প্রায় সব ছৌ নাচ পার্টিতে হচ্ছে। পৌরাণিক বা ট্রাডিশনাল বিষয়গুলি সব আছে—যা ছিল বরাবর।

এদের দল ঐ 'কৃষ্ণর অষ্টসখী' যেমন করেছে বারাসতে, তেমনি কলিকাতার গড়িয়াহাটে করেছে 'গঙ্গানারায়ণের ফাঁসি'—এ বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত তথ্য দিলেন বাদল বাবু, প'রে যথাস্থানে বলা যাবে। এরপর এরা শিলিগুড়িতে 'মহিষাসুর বধ,' এবং ঐ স্থানেই 'হুল দিবস' উপলক্ষে 'সিধু-কানহু' করেছে। তবে যাদবপুরে যে এরা 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' বিষয়ে একটি নাচ করেছে—তা বলতেও ভুল করব না,—সেই সঙ্গে 'নীলবিদ্রোহ' বিষয়ক নাচ। এগুলিতে যুদ্ধ সৈনা-সামন্ত প্রভৃতি থাকে বলে নাচের দলে অনেক লোক লাগে। হুগলীর চন্দননগর আর দ. চব্বিশ পরগণার রায়দীঘিতে 'মহিষাসুর বধ' করে এরা সুনাম অর্জন করেছে—২ দিন ধরে অনুষ্ঠান, সঙ্গে ছিল 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'। শিলিগুড়িতে আরেকবার আমন্ত্রণ পেয়েছিল—বৃষ্টির জন্য ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয় বীরভূমে বোলপুরের নিকটে আর এক দুর্গাপুর গ্রাম আছে—সেখানেও নেচেছে এরা 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ও 'মহিষাসুর বধ'। কলিকাতার প্রোগ্রামগুলো হাল আমলের নয়, ৬।৭ বৎসর পূর্বের। তবে সুন্দরবনের রায়দীঘিতে গেছিল ১৯৯৬ সালেই।

কথায় কথায় জানা গেল ৯২-৯৩ সালে এরা গেছিল কেরালার পালঘাটে—সেখানে ভিক্টোরিয়া কলেজ ময়দানে মঞ্চের উপর নাচ হয়েছিল 'কৃষ্ণলীলা' আর 'মহিষাসুর বধ'। সেবারে গেছিল ২২ জনের দল—যারা এখন কল্যাণীতে এসেছে তারাই ছিল সে দলে।

এসব কথা বলতে বলতে বাদলবাবু বা তার সঙ্গী-সাথীরা সপ্রশ্ন হয়ে কাকে যেন খুঁজছিল। বুঝতে পারলাম—সেই আদিম প্রশ্নের সমাধান হয়নি এখনও। ঘড়িতে সময় তখন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা হলেও এবং কর্তাব্যক্তিরা এদের উপস্থিতি টের পেলেও সামান্য কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা এখনও হয়নি এদের জন্য,—তাই ছটফট করছে। শুধু তাই নয়, আজ ক'টার সময় তাদের প্রোগ্রাম—তা'ও সঠিক জানে না এরা। কর্তারা কেউ বলেছেন আটটা, কেউবা সাড়ে আটটা।

এদিকে মিনিবাসের ছাদ থেকে সন্তর্পণে নামিয়ে আনা হয়েছে মহিষাসুর বধের

প্রসঙ্গ কথা

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি উন্নয়নের জন্য পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে ছৌ-নাচ চর্চা এখন একটি সহজীবিকার পথ বলতে পারা যায়। অর্থনীতির নিয়মে বৃহত্তর ক্ষেত্রে কৃষিকাজ বা কৃষিভিত্তিক জীবিকা বলতে কি বোঝায়, তা সকলেই জানেন। সেই তালিকায় ছৌ-নাচের নাম অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কি না—তা ভাববার বিষয়। কেননা, যাকে অবলম্বন করে প্রধানতঃ কৃষিজীবি সমাজ বেঁচে থাকতে চাইছে—তা একদা হয়তো নিছক বিনোদন রূপে পরিচিত হত, কিন্তু তা অর্থনৈতিক সংকটের জন্য ধীরে ধীরে জীবিকার অন্যতম সহযোগী মাধ্যমরূপে গৃহীত হচ্ছে। বর্তমান প্রতিবেদনটি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করা বোধহয় ভাল।

এ কথা ঠিক যে, মানভূম সংস্কৃতির এই দেশীয় লোকনৃত্যটি যেদিন থেকে বৃহৎবঙ্গে জনপ্রিয়তা অর্জন করল এবং তার পথ ধরে তা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হল ভারতের অন্যান্য স্থানেও, সেদিন থেকেই এই নৃত্যকলার একটি বাণিজ্যিক দিক যেন নতুন করে আবিষ্কৃত হল। শহরাঞ্চলে বিনোদনকে কেন্দ্র করে যে বাণিজ্য হয়, এটি ঠিক সে জাতীয় বাণিজ্য না হলেও, আগামী দিনে তার প্রবণতা যে সে দিকেই ধাবিত হতে পারে—তা কে বলবে।

পুরুলিয়া শহরের মুখোশ বিক্রীর দোকানগুলিতে বসে যদি কেউ একটি সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান করেন মাত্র একদিনের জন্য, তবে দেখবেন যে সমগ্র পুরুলিয়া জেলায় আজ কতগুলি ছৌ নাচের দল। তাদের সঙ্গে ক্রমাগত প্রাথমিক পরিচয়ের পর জানা যাবে যে, ১. তারা প্রত্যেক্যেই নিজ নিজ দলের জন্য অন্য কোন স্থান নয়, পুরুলিয়ার বাজার থেকে মুখোশ কিনতে আসেন, ২. চোড়িদা ছাড়াও অন্যত্র এখন বেশ ভাল সংখ্যায় মুখোশ তৈরীর কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, ৩. ছো নাচের দল সংখ্যায় ক্রমাগত বেড়ে চলার কারণ হল, এর দ্বারা সামান্য কিছু অর্থাগমের সূচনা হয়েছে, ৪. বলরামপুরের মত অন্যত্রও যদি ছো-নাচ ট্রেনিং সেণ্টার হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে এই নৃত্যের একটি অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আছে বলেই এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

এর ফলে, পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে আজ বাস রাস্তার ধারে ধারে অসংখ্য ছৌ-নাচ প্রশিক্ষণের সাইন বোর্ড দেখা যাবে—তাদের বিকাশ দেখে বোঝা যাবে তারা সকলেই যেন কোন প্রমোটারের অপেক্ষায় বসে আছে বাইরে-দূরে কোথাও দল নিয়ে যাবার জন্য। পুরুলিয়ার অতি-নামী দল অপেক্ষা সাধারণ গ্রামীণ দলগুলি আজ তাই এই নৃত্যকে অন্য চোখে দেখছে।

অথচ যারা এভাবে দল নিয়ে বাইরে-দূরে ভ্রমণ করছে এবং একটি নির্দিষ্ট জনসমাজকে আনন্দদান করছে, তারা আর্থিক বিষয়ে কতটা লাভবান হচ্ছে—সেটা আজ গভীরভাবে ভাববার দিন এসেছে। সেই সঙ্গে, শুধু সরকারী প্রোগ্রামে নয়, যে সব উদ্যোক্তা তাদের ডেকে নিয়ে বাইরে-দূরে যান—তারাও যে এদের প্রতি কতটা সহানুভূতি সম্পন্ন—সে বিষয়েও জানা প্রয়োজন।

দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্র—আজ বোধহয় এই পালাটাই এদের প্রধান আকর্ষণ।

একদল দেখি নতুন ভাবে সাজবার দায়িত্বে লেগে গেল। প্রতিটি অলংকার বস্তু সঙ্গে নিয়ে এসেছে—ছুঁচ-সুতো সেফটিপিন পর্যন্ত। চোখের সামনে ধীরে ধীরে সুসজ্জিত হয়ে উঠছে দুর্গাপ্রতিমার পিছনের চালচিত্রটি—ঠিক যেমন দেখা যায় আসল দুর্গাপ্রতিমায়। ক্লাবঘরের মধ্যস্থানের আলোর কঠিন রশ্মি এই চালচিত্রে পড়ে ম্লান আলোকেও তা মহিমাময় করে তুলেছিল।

একটা ব্যাপারে বোঝা গেল যে, এদের দলে সবাই সব কিছু পারে। প্রতিটি নাচের সব পার্ট'ই সবার জানা। ব্যবস্থাপনার নানা কাজ—মেকাপ, পেন্ট, পোষাকের হিসাব, মুখোশের দেখাশোনা, এমনকি বাদ্যযন্ত্র বাজানো—সবাই সব জানে, মানে জানতে হয়।

আরো জানলাম, এসব পোষাক এরা প্রয়োজনে ভাড়া করে আনে—পুরুলিয়া শহরে এইসব ঝলমলে বাহারি পোষাক তৈরী হয় ও বহু ভাড়া দেওয়ার কোম্পানি আছে। এরা এনেছে 'মহাদেব ড্রেস ঘর' থেকে। তবে কোন কোন দলের নিজস্ব কিছু পোষাক থাকে—বা এদল ওদল আদান-প্রদান করেও চালায়।

এখন এ দলের ওস্তাদ হলেন শ্যামকান্ত মাহাতো। তবে দল-প্রতিষ্ঠা যাকে দিয়ে হয়েছিল তিনি হলেন লক্ষ্মণ সরদার। তিনি এখন অথর্ব, তেমন মাথা দেন না এসব ব্যাপারে। বর্তমান ওস্তাদও আসেননি, কেননা এরা এতবার বাইরে গেছে যে, সবাই সব পারে। অবশ্য সব দলেই একজন থাকে ওস্তাদ—কখনওবা তাকে মাষ্টার মশাইও বলা হয়।

প্রশ্ন করি বাদলবাবুকে—'আমরা এই প্রোগ্রামগুলিকে কি বলব? যাত্রা গানের মত গান বা পালাগান বা যাত্রা?'

বাদলবাবু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন—'না না, শুধু নৃত্য—নাচ, ছৌ নাচ পার্টি'র মহিষাসুর বধ নাচ। আর কিছু নয়।'

'তাহলে আর কি কি নাচ তৈরী করা আছে আপনাদের?'—তথ্য সংগ্রহের জন্য আমার পরবর্তী প্রশ্ন।

'শুধু আমাদের নয়, পুরুলিয়ার সব দলই যে সব নাচ বেশী করে তৈরী করে সেগুলি প্রায়ই একই বিষয়ে—নিন লিখে তাদের নাম। পৌরাণিক পালার মধ্যে তারকাসুর বধ ও তার পরবর্তী কাহিনী সীতার বিবাহ, মহিষাসুর বধ, কিরাতার্জুন, অভিমন্যু বধ, খাণ্ডবদাহন, কৃষ্ণের অষ্টসখী—এইসব।

'তাহলে "গঙ্গানারায়ণের ফাঁস" গল্পটা কি রকম?'

'এটা হল পুরুলিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের বিষয় নিয়ে। গঙ্গানারায়ণ নামে এক রাজাকে বৃটিশরা তার প্রভাব-প্রতিপত্তি-জনপ্রিয়তার জন্য ফাঁসী দিয়েছিল—সেই পাপ। এটা আধুনিক কালে তৈরী হয়েছে।'

'এই লাইন ছাড়া আধুনিক নাচ আর কি কি আছে আপনাদের?' প্রশ্নটা এসেই যায় আমার মুখে। কিন্তু উত্তর শুনে আমি তো থ!

'কেন সাক্ষরতা অভিযান নিয়ে নাচ করছি আমরা।'

'নাচ? সাক্ষরতা নিয়ে?' বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই আমি।

'না, কথা-পার্ট দিয়ে—ওতে মুখোশ থাকে না।'

'তার মানে যাত্রাপালার মত। তবে এটা আপনাদের কি নিজেদের ইচ্ছামত হয়েছে?' নিজেই বিমর্ষ হয়ে পড়ি এসব শুনে।

জানা গেল, কখনও কখনও সরকারী ইচ্ছাতেও এ ধরনের দু' চারটি প্রোগ্রাম করতে হয়। সম্ভবতঃ এর সঙ্গে আর্থিক কোন ব্যাপার আছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ বা সিধু কানহু নাচের ব্যাপারটাও মনে হল সেই ধরনের কোন উদ্যোগ। মুশকিল হল, পুরুলিয়ার গ্রামেগঞ্জে এ' জাতীয় নাচ চালানো খুব সমস্যা।

অর্থাৎ, পুরুলিয়ার নানা অঞ্চলেই এরা নাচ করতে যান, তা জানা গেল এই কথার সূত্রে। তবে সেটা হল নিছক আনন্দের জন্য। বৈশাখ মাসে গোটা পুরুলিয়া জেলা মেতে ওঠে ছৌ নাচের উৎসবে। যে যেমন পারে দলকে সাজিয়ে নিয়ে নিজের গাঁয়ে পরের গাঁয়ে বেরিয়ে পড়ে। সব গাঁয়েই বলতে গেলে দল আছে।

দীননাথ পোষাকগুলো একে একে মিলিয়ে তুলছিল আর আমার দিকে একবার তুলে ধরছিল। যাত্রার আসরে যে সব রাজকীয় পোষাক দেখি, এ যেন তার থেকেও ঝলমলে। হতই হোক, এ যে নাচের পোষাক! রাতের অন্ধকারে এর গায়ে আলোর ছটা পড়লে গোটা আসর যেন ঝলমলিয়ে ওঠে।

কত তার বাহার। দেখলাম কিরাতার্জুনের বরাহ, আর এক নাচের সাপের ফণা ও সাপের দেহ, তাড়কা রাক্ষুসীর বিচিত্র পোষাক—তার সঙ্গে বহুমূল্য রাজকীয় কৃষ্ণের পোষাক। থরে থরে সাজানো হচ্ছে—হনুমান ও বাঁদর সেনার পোষাক—জানিনা, আজকে এগুলি কাজে লাগবে কিনা। এ সবই তৈরী হয় এই পুরুলিয়া শহরে—যেমন মুখোশ তৈরী হয় চোড়িদাতে। মুখোশের কথা পরে বলব। সে আর এক অভিজ্ঞতা!

গাজন-চড়কের মরশুমে এরা যে গাঁয়ে-গঞ্জে বেরিয়ে পড়ে তা তো আগেই বলেছি। আসরে কেউ আমন্ত্রণ জানিয়ে বা ভাড়া করেও নিয়ে যায়। তার জন্য এরা নেয় মাত্র এক হাজার টাকা। নিজেদের পকেটে নয়, সে টাকা, নিছকই 'মেনটেন্যান্স কস্ট'। তবে গাড়ীভাড়া আর খাওয়া তাদের—যারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দলটিকে। এ প্রথা পুরুলিয়ার সর্বত্র চালু। নিছক আনন্দের জন্যই এই নৃত্যানুষ্ঠান।

অর্থনীতির বিষয়ে, কৃষিজীবী শ্রেণীই এই সংস্কৃতি পালন করে আসছে। সারা বছর চাষের বা চাষ সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকলেও, বছরের একটা সময়ে এরা এই সব নিয়ে মেতে ওঠে—শুধু আনন্দের জন্য। বর্ষায় একদম বন্ধ।

এরা বংশ পরম্পরায় এ নাচ জানে, বাবার থেকে ছেলে পায় এর উত্তরাধিকার—একেবারে বিশুদ্ধ গুরুমুখী বিদ্যা। তাই বড় বেশী অকৃত্রিম আর আন্তরিক এদের অনুষ্ঠান। কলকাতার কোন সৌখীন দল যদি এ নাচ শিক্ষা করে, আর

তাতে যে এই আন্তরিকতা থাকবে না—তা বলাই বাহুল্য।

লেখাপড়া এরা কবে শিখেছিল, তা মনেও নেই। তাই গান মনে রাখাটাই এদের সব। এদের কথাও পরে বলতে হবে। স্মৃতিশক্তি তাই এদের প্রখর হয়ে উঠেছে। তাই এখনও এটা বোধহয় বিশুদ্ধ 'লোকসংস্কৃতি'।

কল্যাণীতে এদের দলের ২৬ জন এসেছে—৩ জন হল গাড়ীর লোক। তবে দলে আছে প্রায় ৪০।৪২ জন লোক। দলটি ১৯৮৪ সালের হলেও এবং পুরোনো দিনের সদস্যরা এখন অনেকেই বিগত হলেও, এই আধুনিক কালেও সব আকর্ষণ এড়িয়ে এ দলে সদস্য সংখ্যা এখনও বাড়তির দিকে। টিভি ইত্যাদি এদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

একজন কনিষ্ঠ শিল্পী—আমাকে দেখাচ্ছে মুখোশগুলি—কোনটা কোন চরিত্রের। স্বভাবতই দুর্গা, শ্রীকৃষ্ণ জাতীয় মুখোশগুলি বেশি সাজানো—ঝলমলে। এমনকি গণেশের সৌন্দর্যেও কম নয়। যমদূত, তারকাসুর তত অলংকৃত নয়। তবে চরিত্রমুখী। দেখলাম হনুমান, বানর, বরাহ, সাপ ইত্যাদিও। তবে সাপেরটা মুখোশ নয়—তার দেহটা কালো ছোপ ছোপ কাপড় দিয়ে তৈরী।

এ সবই চোড়িদ্যা থেকে আনা। আমাকে হাতে তুলে পরীক্ষা করতে বললে দেখলাম—হালকা, তবে সেটা তাদের পক্ষে। যদি আমাদের তা মুখে পরে নাচতে হয়, বেশ ভারী মনে হবে। আসলে ওরা করে করে অভ্যস্থ হয়ে গেছে—তাই ভারী বোধ করে না।

এ বছরে এখানে আসার আগে গণেশটা কেনা হয়েছে, দাম নিয়েছে বারোশ টাকা। এদের দলে সবচেয়ে দামী মুখোশ হল শ্রীকৃষ্ণের—পনেরোশো টাকা। এসব মুখোশে অলংকরণ এত বেশী থাকে যে তাতেই দাম বেড়ে যায়। তেমনি তারকাসুর, হনুমান, বরাহ জাতীয় মুখোশগুলি দুশ—তিনশ টাকায় হয়ে যায়। শুনলাম, রামায়ণের বানর সেনার মুখোশ ১০০—১৫০ টাকাতেও পাওয়া যায়।

সাজপোষাক ভাড়া করে আনে বটে, তবে মুখোশ নিজেরাই কিনে নেয় চোড়িদগার বাজার থেকে। সেখানে প্রচলিত সব নাচের মুখোশ রেডিমেড পাওয়া যায়।

সাজপোষাক এক পার্টি অপর পার্টিকে কখনও কখনও ধার দেয় বটে, তবে মুখোশ কখনই নয়। যদি ভেঙে যায়, তবে ক্ষতিপূরণ দেবে কে? তাছাড়া একই মুখোশের বিভিন্ন রকম দাম হয় তো! অর্থাৎ গণেশের মুখোশের দাম সব দোকানে যে একই রকম হবে, তার কোন স্থিরতা নেই।

এদিকে আর একজন শিল্পী নাচে ব্যবহৃত নানা বাদ্যযন্ত্র ঝেড়ে-মুছে রাখছে। এদের দলে আছে দুটি ধামসা, যার গাত্রাবরণ টিনের চাদর দিয়ে তৈরী। দুটি ঢোল, যার চামড়া হল কাঁড়ার, দুটি বাঁশি—ইদানীং ম্যারাকাস ব্যবহার হচ্ছে। সহিস বাবু জানালেন, বছর ৫।৬ আগেও এর প্রচলন ছিল না, তখন করতাল ব্যবহার হত। এর সঙ্গে আছে কনসার্ট বাজানোর উপযোগী নানা বাদ্যযন্ত্র। এগুলি সব এই

দলেরই সম্পত্তি। প্রতিটি দলই নাকি নিজের নিজের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নাচতে যায়। বছরের অন্য সময়ে এগুলি তাদের ক্লাব ঘরে যত্ন করে কাপড় মুড়ে রাখা থাকে।

এই সব বাদ্যযন্ত্র দেখতে দেখতে একটা প্রশ্ন মনে হল। শুধালাম সহিসবাবুকে ঃ 'বাজনার তালে তালে এই যে নাচ, এতে যদি তালের কোন ভুল হয় ?'

'বাজনার তালেই শুধু নয়, আমাদের নাচ হয় গানের সঙ্গে'—বেশ সপ্রতিভ উত্তর দিলেন বাদল সহিস।

'গান ? সে তো আমরা শুনতেই পাই না।' সবিস্ময়ে বলি আমি ঃ 'আসলে এত জোরে বাদ্যযন্ত্রগুলো বাজে যে গানের সুর বা কথা কিছুই আমাদের কানে আসে না। আচ্ছা, এতে কোন ডায়লগ বা কথা থাকে না ?

'একেবারে না। তাছাড়া যারা নাচে, তারা শুধু নাচেই, গায় না'—বললেন বাদলবাবু।

'তাহলে গায় কারা ?'

বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি লোককে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন বাদলবাবু। তারা নিতান্তই সাধারণ চেহারার, গায়ক বলে তাকে মনেই হয় না। তারা নাচও করে প্রয়োজন পড়লে—তবে গায়ক চরিত্রটাই মুখ্য। এরা হলেন লক্ষ্মণ মাহাতো, ভগবান মাহাতো আর শিবপ্রসাদ সরদার। একজনকে শুধাই ঃ 'সব গান আপনি একাই গান ?'

মাথা নেড়ে বলে লোকটি ঃ 'হ্যাঁ' এবং আরো অবাক হই তার কথা শুনে, এর কোন লিখিত রূপ তার সঙ্গে নেই। সব গান তার মুখস্থ আছে—সুর সহ। মনে হল, নিরক্ষর মানুষ বলেই হয়তো স্মৃতিটা এত তীব্র। তাছাড়া গদ্য ভাষার চেয়ে কবিতার ভাষা এবং কাব্য ভাষার চেয়ে সুরেলা ভাষায় যে মনে রাখা সহজ এ তো শিক্ষাবিজ্ঞানেরই তত্ত্ব। এ যেন একেবারে তারই সঠিক ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখছি এই ছৌ নাচের দলের সঙ্গে বসে।

গানের সুরের প্রসঙ্গে জানা গেল, ইদানীং কালের অন্যান্য লোকনাট্যের মত এরা সিনেমার বা রেকর্ডের গানের সুর নকল করে না। প্রচলিত ধারায় তার সুর নির্মাণ হয়। কেউ বা উড়িষ্যার বা সেরাইকেলার ছৌ নাচ দেখে এতে তার সুরটা ভাল হলে গ্রহণ করে অনায়াসে।

'এখানে যেমন মঞ্চে নৃত্য হবে, গ্রামাঞ্চলে এভাবে মঞ্চের ওপর নাচ করেন ?' এরপর আমার পরবর্তী প্রশ্ন।

'দেখুন, এ নাচ স্টেজের জন্য নয়।' বললেন সহিসবাবু ঃ 'যদিও এখানে আমাদের জন্য স্টেজ করা আছে, আমরা কিন্তু তা খোলা মাঠে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে করতে চাই। দেখি, সে সুবিধা পাওয়া যায় কি না।' একটু থেমে বলেন—'তাছাড়া খালি পেটে কি নাচ করা সম্ভব—আপনিই বলুন।'

বলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শুধু সহিসবাবু নয়, দলের প্রায় সকলেই তাকালেন

আমার দিকে। এতক্ষণ কথাবার্তার মাঝে তাদের এই মৌলিক প্রশ্নটা ভুলেই গেছিলাম। তবে এখানকার উদ্যোক্তারা যে এখনও তাদের জন্য সে ব্যবস্থা করতে পারেননি—তাও বুঝতে পারলাম।

আমার আরো কিছু প্রশ্ন করার ছিল—কিন্তু কিভাবে সে প্রসঙ্গ আসব ভাবছিলাম। এমন সময়ে একজন এসে সংবাদ দিল যে উদ্যোক্তারা জানতে চেয়েছেন যে দলে মোট কতজন আছেন এবং মিনিট পনেরোর মধ্যে তারা যেন অমুকস্থানে চলে যান—তাদের খাবার প্রায় প্রস্তুত।

মনে মনে আমিও প্রসন্ন হলাম। অতি দ্রুত আর কয়েকটা প্রশ্ন করে নিয়ে এদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করতে হবে ও মেলার মঞ্চের দিকে এগোতে হবে। তারপর এরা খেয়ে নিয়ে সাজগোজের জন্য প্রস্তুত হবে।

এসব ভেবে পরবর্তী কথাবার্তাগুলি মোটামুটি মনে মনে গুছিয়ে নিলাম। কি বিচিত্র এই দলটির ভিতরের কথাগুলো !

আরো বহু তথ্য জানবার ছিল তাদের এই নৃত্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে। সহিসবাবুকে সে কথা জানাতে তিনি আমাকে কয়েকটা ঠিকানা দিলেন : 'এগুলি লিখে নিন। পরে এদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে অনেক সংবাদ পাবেন, তবে উত্তর পাবেন মোটামুটি প্রায় একই রকম।'

পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে এরকম অসংখ্য দল আছে। তার কোন সরকারী সুমারি আছে কি না জানিনা। প্রত্যেক দলের একটি নির্দিষ্ট নাম-ঠিকানা থাকলেও, দল পরিচিত হয় প্রধানতঃ ওস্তাদের নামেই। গ্রামের নাম সেখানে নেহাৎই সৌখীন—নিজেদের প্রচারের জন্যই বোধহয়।

একটি দলের ঠিকানা তো এখানেই পেলাম। আর দু একটি দলের পরিচয় হল : ১. ভূতাম ছৌ নাচ পার্টি। দলপতি—কৃত্তিবাস মাহাতো। ডাক · গ্রাম : ভূতাম, পুরুলিয়া। ২. বঘমুণ্ডি বীনাপাণি ছৌ নাচ পার্টি। ওস্তাদ কালোসোনা মাহাতো, C o, সদানন্দ মাহাতো ইত্যাদি।

আবার মনে পড়ে গেল কালোসোনার কথা—তার নাম ঠিকানা এখানে তালিকাবদ্ধ করতে গিয়ে। কেন যে সে পৃথকভাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল, তা বুঝলাম এতক্ষণে।

কালোসোনা আমাকে কথা দিয়েছে সে পরে আমার জন্য মহিষাসুর বধের গানগুলি লিখে পাঠিয়ে দেবে। বাদল সহিসও রাজী হয়েছে। তাদের বড় কৌতূহল আমার এই জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্যান্বেষণ দেখে। তারা নিশ্চয়ই কথা রাখবে আমার। ওরা যেন 'ডাকঘরে'-র 'সুধা'-র মতই আছে এখনও !

আজ এতদিন পরে কালোসোনার গল্প লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে পুরুলিয়ার বলরামপুর গান্ধীরাম মাহাতোর কথা। সেখানে একটা ছৌ নাচ ট্রেনিং সেণ্টার আছে—সে সেখানে মাষ্টার না হলেও, তদারকিতে আছে। তারই সহযোগিতায়

১৯৯৮ সালের প্রথম গ্রীষ্মকালে ওদের কাজকর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে যেভাবে ছো নাচ প্রত্যক্ষ করেছিলাম—সে কথা মনে হল।

কল্যাণীর এই প্রেক্ষাগৃহে যে নাচ দেখেছি, তার সঙ্গে ঐ ট্রেনিং সেন্টারের নাচের কত পার্থক্য। যতই হোক সেটা তো ট্রেনিং সেন্টার!

সন্ধ্যারাতের অন্ধকারে একটা বিশেষ ধরণের বিদ্যুৎ বাতির আলোয় কালো আকাশের নীচে সবুজ ঘাসের উপরে সেই সব বালকগুলি যে সব টুকরো টুকরো নাচ দেখিয়েছিল—তাদের কারুকার্য কি ভুলবার! তাদের কেউ সাজ-সজ্জায় ছিল, কেউ বা ছিল নিজের পোষাকে। কিন্তু তাদের দক্ষতা বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। তখন তাদের ট্রেনিং পিরিয়ড—তাই নাচ শেখার উৎসাহ স্বভাবতই বেশী। যত রকম মুদ্রা আছে · সব কটির প্রয়োগ কীভাবে আমাদের মত দর্শককে দেখাবে—তাতেই তাদের আগ্রহ বেশী।

এদের যদি কোনদিন এইভাবে অন্য কোন কল্যাণীতে এসে অর্ভারী নাচ নাচতে হয়—তবে সেটা কেমন হবে কে জানে! তাদের যে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে নিজের অঞ্চলে, সেটা কতটা থাকবে শহরের লোকদের জন্য—এসব ভাবতে ভাবতে পুনরায় মনের পর্দায় ভেসে উঠল কালোসোনার মুখ।

…তারপর কালোসোনা একদিন হয়তো নিজেই দল গঠন করবে। তাই, নিজে ভিন্ন গ্রামের অধিবাসী হয়েও এবং অন্য দলের সদস্য হয়েও শুধু অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যই এদের সঙ্গে কল্যাণী শহরে এসেছে।

মনে মনে প্রশ্ন হল, সে যখন আরো শিক্ষিত হবে, আরো বয়স বাড়বে, প্রচার বাড়বে—তখন সে কি ছো-নাচের ধারাটাই পাল্টে দেবার চেষ্টা করবে? সে কি সাক্ষরতা, বনসৃজন, পরিকল্পনা, এড্‌স্, শিল্পায়ন এ সব নিয়েও ছো নাচ করতে শুরু করবে—যেমন ইদানীং কেউ কেউ করছে।

কালোসোনা তো শিক্ষিত যুবক। সে কি বুঝবে না, ছো নাচ কিসের জন্য, কাদের জন্য? সে কি এর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে চেষ্টা করবে না?

এ সব কথার উত্তর আগামী দিন পাওয়া যাবে হয়তো—ওরই কোনও পত্র থেকে। তাই, এখন শুধু তার পত্রের প্রতীক্ষায় বসে থাকা। কালোসোনা নামক এক নবীন ছো নাচ শিল্পীর পত্র। □

লোকউৎসবের প্রকাশ হয় আনন্দে।
এ দেশ বহুধর্মের দেশ
তাই লোকউৎসবের বৈচিত্র্যও নানা রকম।
'নানা ভাষা নানা মত'—বৃহত্তর সমাজের অসংখ্য উৎসব যখন লোকউৎসবের
বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত,
তখন সংখ্যালঘু সমাজের উৎসবও হয়তো
প্রকাশভঙ্গির সর্বজনীনতায় হয়ে উঠে লোকউৎসব।
কেননা সে আনন্দও ছড়িয়ে যায়
'শক-হূণ দল পাঠান মোগল' বৃহত্তর সমাজে।
আনন্দ আর উৎসবের অন্যতম অভিব্যক্তি হল খাদ্য—
সেই খাদ্য সেই ভোজন,
যা নিত্যকার ভোজন তালিকায়
যা থেকে নিজেকে করে তোলে লোভনীয়।

লোকপ্রথা—১

এদেশের খ্রীষ্ট জনসমাজে
তাই বড়দিনের সময়ে প্রধান
আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে হয়ে যে খাদ্যটি
তার নাম এখন শুধু বৃহত্তর
সমাজে নয়—সমাজের সকল স্তরে সাদরে সমাদৃত।
সে সুখাদ্য নির্মাণের কৌশলও
একদা এ দেশের সংরক্ষণশীল পাকশালায় ছিল বিদেশী।
কিন্তু সেটিই আজ হয়ে উঠেছে বড়দিন উৎসব পালনের
যেন প্রধান উপহার।
বড়দিন উৎসব পালনের জন্য 'খ্রীষ্ট প্রণাম' না হোক ক্ষতি নেই,
কিন্তু সাগরপারের গন্ধ বয়ে আনা সেই সুখাদ্য—চাই-ই।
এমনই তার আকর্ষণ।
এখন যেন তার স্থান হয়ে গেছে এক লোকপ্রথায়।
তার নাম কেক।

নাসিরদের বেকারীতে কিছুক্ষণ

বড়দিনের মরশুম চলছে তখন।

'মরশুম' বলতে খ্রীষ্টানরা বড়দিন থেকে নববর্ষ পর্যন্ত সময়কেই ভাবেন। কেননা শীতের ঐ সময়ে একটানা সাতদিন ছুটিতে সমগ্র শহুরে সমাজই যেন আনন্দে মেতে ওঠে। কেক-পেস্ট্রি পিকনিকের নানান পসরা।

হ্যাঁ, ঐ কেকের সন্ধান করতে করতেই চলে গেছিলাম নাসিরের কাছে। নাসির আমার স্কুলের বন্ধু, পড়াশুনায় বেশিদূর এগোতে পারেনি। তাই স্কুলের শেষ পরীক্ষার অনেক আগেই সে ঢুকে প'ড়ছে তার জাত-ব্যবসা বেকারীতে এবং মনে হয় আজও তারই দৌলতে সে জীবন চালিয়ে যাচ্ছে।

পুরানো দিনের পথ মনে করে করে এগিয়ে চলেছি—কিন্তু কিছুই চিনতে পারছি না। বাস থেকে নামবার সময়ে ঠাকুরপুকুর মিশনবাড়ীর স্টপেজ ঠিক চিনতে পেরেছিলাম। তবে চোখে পড়েছিল, প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর পূর্বের সেই চার্চটারও যেন বেশ পরিবর্তন হয়েছে। সামনের দেয়ালটায় রেভারেড জেমস লং-এর সম্বন্ধে একটি বিশাল পাথর-ফলক বসেছে। তাতে তাঁর কর্মজীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি উৎকীর্ণ হয়েছে। তিনি যে তার যাজকীয় কর্মের প্রায় ২১ বৎসর এখানে কাটিয়েছেন—তা তো সকলেই জানেন। তাঁর নামেই এখন এখানে একটা দীর্ঘ রাজপথ হয়েছে। চার্চ কম্পাউণ্ডটা চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা হয়েছে। ওপাশের কবর স্থানটি বেশ পরিমার্জিত, যত্নের ছাপ আছে সেখানে। অবশ্য নভেম্বরের প্রথম দিকে 'অল সোলস্ ডে' উৎসব উপলক্ষে সমগ্র সমাধি স্থানটিই যে আগাছা-ঝোপ পরিষ্কার করা হয় তা মনে পড়ল তখন।

মিশনের মাঠের মধ্য দিয়ে নয়, চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা। তার পাশ দিয়ে যে পায়ে হাঁটা রাস্তাটা ছিল—সেটা অবশ্য আছে, তবে একটু চওড়া হয় তার গ্রাম্যতা পরিত্যাগ করে পীচ ঢাকা সরু পথ হয়েছে।

সেই পথ দিয়ে মিস্ত্রিপাড়ার মধ্য দিয়ে যাবার সময় মনে পড়ল, কোথায় ছিল নগেন মিস্ত্রির বাড়ী, তার ভাই পচা মিস্ত্রির ঘর। পচা মিস্ত্রিকে চিনতাম ভাল করে—ঘর-গেরস্থ কাজ চালানো গোছের কাঠের কাজ করতেন ভদ্রলোক। তবে তার সবচেয়ে উপকারীতা ছিল কফিন বানানোর সময়ে।

মনে পড়ল নয়নের মায়ের কথা। তার ছেলে নয়নদার কথা। তাদের বাড়ীটা খুঁজেই পেলাম না—সেই বাঁশঝাড়টাও আজ ক্ষীণ হতে হতে প্রায় শেষ হবার যোগাড়। পুরানো দিনের কোন চিহ্নই খুঁজে পেলাম না।

এর পরেই ছিল একটা ফাঁকা মাঠ—তারপরে একটা পুকুরের ধার দিয়ে গেলে মুসলমান পাড়ার শুরু। অবশ্য ঐ পুকুরটায় যে স্থানীয় খ্রীষ্টান ও মুসলমান

উভয় সম্প্রদায়ই ব্যবহার করত—তা বলাই বাহুল্য। আজ কিন্তু ঐ ফাঁকা মাঠটা আর ফাঁকা পেলাম না। কালের নিয়মে সব জমি বাড়িতে পূর্ণ হয়েছে।

ঠাকুরপুকুরের প্রাচীন রূপটা ছিল এ রকমই। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান—সবাই গা লাগিয়ে বসবাস করত। সকলেরই আর্থিক অবস্থা প্রায় একই স্তরের। এ সব বলছি সেই ১৯৫৫-৫৬ সালের কথা।

তারপরে পেঁছিলাম নাসিরের বেকারীতে। তার চেহারাটাও পাল্টে গেছে। সেই দরমার বেড়া দেওয়া বেকারী ঘর, দস্তুর মত পাকা দেওয়াল, টালির ছাদ ঢাকা। বেকারীর চিমনীটা আরো উঁচু হয়েছে—এখন তা বহুদূর থেকে দেখা যায়। হবেই তো—ঘর বাড়ী ক্রমাগত বেড়ে চললে বেকারীর চিমনী আরো উঁচু করতেই তো হয়!

বড়দিন এগিয়ে এসেছে। মুসলমান পাড়ার সঙ্গে বড়দিনের সম্বন্ধ তেমন নয়। কিন্তু তাহলে নাসিরের বেকারীর সামনে এত ভিড় কেন?

নাসিরদের বেকারীতে আগে তেমন বৈচিত্র্য ছিল না। কিন্তু এখন—ঠাকুরপুকুরের চায়ের দোকানগুলিতেই শুধু নয়, আশেপাশের অনেক দূর পর্যন্ত তাদের প্রোডক্ট চলে যায়। তাদের তৈরী কেক-রুটি-বিস্কুটের নাম আছে। তাদের বেকারী প্রোডাক্টের অনেক 'আইটেম' এখন। বিশেষতঃ বড়দিনের মরশুমে তো বটেই!

বেকারীর বাইরে অনেক লোকই দেখলাম হাতে রেশনের ব্যাগ নিয়ে এদিক-ওদিক বসে আছে—তার মানে বেকারীর মধ্যে বসবার স্থান অকুলান। অর্থাৎ এত লোক আজ জমায়েত হয়েছে যে তারা বাইরে এসে অপেক্ষা করছে।

এর অর্থটা আমি জানি।

আমার মনে পড়ল বহু পুরাতন দিনের কথা। তখন এদিককার খ্রীষ্টানদের অতটা অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, তবে অন্তরটা বড় ছিল। তখন তারা বাজারের কেক কেনা অপেক্ষা এখানে তুলনায় অল্প পয়সায় অনেক কেক তৈরী করতে আনত। নিজেরা মাল-মশলা কিনে নিয়ে আসত। তারপর সে সব প্রসেসিং করে নাসিরদের বেকারীতে এসে কেক তৈরী করে নিয়ে বাড়ী ফিরতো।

কেক তৈরীর দিনটা তাদের অনেকক্ষণ থাকতে হত বেকারীতে। বড়দিনের ৫।৭ দিন আগে বেকারীতে গেলে তবে এ কাজ তাড়াতাড়ি করে শেষ করা যেত। যত বড়দিনের দিন এগিয়ে আসত—তত লোকের ভীড় বাড়ত। সবারই যেন তখন মনে পড়ত, এবার কেক তৈরী করিয়ে আনতে হবে।

আর তার ফলে এই মরশুমে শুধু নাসির নয়, যে কোন বেকারীর সামনে গেলে সেই অঞ্চলের সকল খ্রীষ্টান পরিবারের সঙ্গেই প্রায় একবার দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যায়। যে বাড়ীতে দু-তিনটি পুরুষ মানুষ আছে, তাদের একজন সকালবেলায় গিয়ে কাঁচামালগুলি জমা করে দিয়ে এল। অর্থাৎ লাইনে নাম রেখে এল। আরো তিন-চার ঘণ্টা পরে অপর একজন গিয়ে কেক তৈরীর আসল কাজটা করে,—অর্থাৎ কাঁচামালগুলি অনুপাত অনুযায়ী মিশ্রণ করে বেকারীতে ঢুকিয়ে দিল। আরো

তিন-চার ঘণ্টা পরে আর একজন এসে বেকারী থেকে তৈরী মাল নিয়ে বাড়ী চলে গেল। কারণ বেকারীতে একটানা বসে থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

এ' ক'দিন বেকারীতে রুটি-বিস্কুটের উৎপাদনটা একটু কমই হয়। বাজারী কেক, পরিবারের তৈরী কেক—এই সব করতে মন দেয় এরা বছরেরর এ সময়টা, একটু উপরি আয় হয় আর কি।

বেকারীর মধ্যে তখন বেশ ভীড়।

এ ভীড় অন্যান্য দিনের মত নয়। বেকারীর কর্মীদের আজ তখন অন্য চেহারা। অন্যদিন যাদের মুখে অপশব্দের খই ফোটে, আজ তারা মামা-মাসী-কাকা কাকী-খুড়ী-দাদা-বৌদি ইত্যাদি সম্বোধনে খ্রীষ্টান পাড়ার লোকগুলোকে সম্বোধন করছে। তাদের কেক তৈরীর তদ্বির করছে।

নাসির আমাকে দেখেছিল অনেকক্ষণ আগে। তাকে সংবাদ দেওয়া ছিল যে আসব। দীর্ঘদিন পরে সাক্ষাৎ হবে আমাদের। হয়তো বয়স বেড়ে যাবার জন্য ভাল করে চিনতে পারছে না আমাকে।

তবু গরজ আমার। তাই বেকারীর মধ্যে সম্ভবত জনতাকে ডিঙিয়ে আজ এক অন্য রকম নাসিরকে দেখলাম আমি। তার বয়সটাও বেশ ভারী হয়েছে। একটা কর্তা-কর্তা ভাব এসেছে। দারুণ সংসারী হলে মানুষ যেমন অকালে বুড়িয়ে যায়, নাসিরও তেমনি হয়েছে। তবে তার মুখের গঠন তেমনই আছে।

বোস—কী দেখছিস কী?' সহাস্যে বলল আমাকে নাসির।

'বসতে তো আসিনি ভাই, দেখতে এসেছি এই বেকারীর কাণ্ডকারখানা।' চারিদিকে চোখ চালিয়ে বলি: 'তা এত লোক, সবাই তোর পরিচিত?'

'ঐ এক রকম। এক ব্যক্তির হাত থেকে ডিমের ব্যাগ নিতে নিতে বলল নাসির: 'দু' একটা ডিম নষ্ট হয়ে গেলে তেমন লাভক্ষতি হবে না মিণ্টুদা। সে আমি পুষিয়ে দেবো খন। বৌদি কেমন আছে? ছেলের তো আর মাধ্যমিক দেওয়া হল না?' তারপর হাতের ব্যাগটা আন্দাজে মাপতে মাপতে বলল: 'তা মাল এবারে এত কম কেন?'

মিণ্টুদা বললেন: 'না রে, এবারে একটু কমই হবে? তোর বৌদি—'

মনের মধ্যে প্রশ্ন জমে উঠছে অনেক। নাসিরকে একটু একা পেয়ে বসতে হবে, নচেৎ সে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। এ সময়টা যে ইণ্টারভিউ নেবার সময় নয়, তা আমি জানি। কিন্তু আমারও যে সময় কম। এতবড় একটা প্রাচীন খ্রীষ্টান জনবসতি আছে এখানে। তাদের এক বিশিষ্ট লোকপ্রথা সম্বন্ধে যদি এই মরশুমে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে নিতে না পারি, তবে পরে কি আর পারব।

তখন মনে পড়ল আরেকটা কথা। এ কথাটা নাসিরকে জিগ্যেস না করলেও ক্ষতি নেই। কেননা রান্নার একটা পুরাতন বইতে সেটা পেয়ে গেছি। বেশ পুরাতন বই—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের 'মিষ্টান্ন পাক' প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগে বেরিয়েছিল,

সে বইয়ে পড়া 'পর্তুগীজ কেক'-এর কথা মনে পড়ল এখন। অতীতে খ্রীণ্টান সমাজে এ' জাতীয় কেক তৈরীর প্রচলন ছিল কি না জানি না। তবে সেই 'ব্রাহ্মণ' পাচক এ বিষয়ে তথ্য পেলেন কোথা থেকে? সে কালের আর কোন রান্নার বইয়ে এ জাতীয় আর কি কি তথ্য ছিল কে জানে!

'কেক একপ্রকার পিণ্টক বিশেষ। আমাদের দেশে পোষ সংক্রান্তির সময় যেমন নানাপ্রকার পিণ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া আহারাদির নিয়ম আছে, ইয়োরোপে সেইরূপ বড়দিনের সময় নানাপ্রকার কেক প্রস্তুতের নিয়ম প্রচলিত দেখা যায়। উপকরণ ও পরিমাণঃ ডিম চারিটি, ময়দা (ডিমের ওজন অনুসারে প্রত্যেক দ্রব্যের ওজন হইবে), মাখন, চিনি, গোলাপজল, বড় এক চামচ লেবুর রস দশ ফোঁটা।'

তখনই আমার মনে হয়েছিল—এর মধ্যে পর্তুগীজ সংস্কৃতিও কি আছে?

আজ এতদিন পরে বুঝতে পারছি, বিপ্রদাসবাবুর গ্রন্থের প্রাচীনত্ব বিচার করলে বা তাঁর সামাজিক অবস্থানের কথা ভাবলে মনে হয়, যা কিছু বিদেশী খাদ্য প্রণালী—তা সবই ছিল সেকালে হয় স্পেনীয় না হয় ইংলণ্ডীয় বা ঐ জাতীয় কিছু। এখন যুগ পাল্টেছে—বিদেশী খাদ্যবস্তুর আর বোধহয় এত পৃথক পরিচয় নেই। অবশ্য, আমার জানা নেই বিপ্রদাসবাবুর জীবিকা কি ছিল—তবে আন্দাজ করতে পারি।

পুরানো দিনের বেকিং সিস্টেমই চালু আছে এখনো। ওভেনে প্রায় সাত-আট জনের কেকের মাল-মশলা ঢুকিয়ে দিয়ে একটু হাত খালি হল নাসিরের। ওর বেকারীতে গতকাল তৈরী একটা কেকের দুটি স্লাইস আমাকে খেতে দিল—সঙ্গে ভিতর থেকে চা-ও এনে দিল।

কেক সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ নই বা আমার তত কেকপ্রিয়তাও নেই। তবু বলি, এই মফঃস্বলী কেক,—চৌরঙ্গী পাড়ার অনেক কেকের থেকেই উৎকৃষ্ট হতে পারে। তাহলে সবাই ক্যাথলিন, ফ্লুরী বা ঐ জাতীয় সৌখীন দোকানে যায় কেন?

নাসিরের কাছে শোনা গেল কিছু তথ্য। আমার কেকের মশলা 'প্রসেসিং' সম্বন্ধে কিছু জানবার ছিল। ও সেটা সরল করে বলল: 'বাজার থেকে সব কিনে আনলেই তো কেক তৈরী হল না। ময়দা, চিনি, আর মাখন যে সম-পরিমাণ—তা তো জানিসই। তার সঙ্গে নানা ধরনের শুকনো ফল দিলে আরো মজাদার। একটু বেকিং পাউডার আর দু' এক ফোঁটা ভ্যানিলা—এই তো মূল মশলা।'

'আচ্ছা মাখনের তো অনেক দাম—' আমি এ বিষয়ে একটা অনুচ্ছেদ বলতে যাচ্ছিলাম। তার উত্তরে ও জানালো:

'মাখন দেবার প্রয়োজন হয় না। তাতে যা দাম পড়বে, তাতে বাণিজ্য করা যায় না। সবাই দেয় মার্জারিন। মানে ঐ আমুল্যা, আমুল লাইট, স্প্রেড ইট জাতীয়। তবে কেউ কেউ ডালডা, ঘি জাতীয় বস্তু দেয় বটে—তাতে ভাল হয় না। অনেকে আবার ময়দার সঙ্গে আটা মিশেল করতে চায়—দাম কমাবার জন্য। কিন্তু তা একটু রেখে খেলেই ধরা যায় এই ফাঁকিবাজীটা।'

নাসির এতক্ষণ যা বলছিল, তার উদ্দেশ্য হল বাজারী কেকের সম্বন্ধে। কিন্তু

রন্ধনবিদ্যায় সমগ্র ভারতবাসীর কথা বাদ দিলেও, বঙ্গীয় জনসমাজ যে অতি পারদর্শী, এ দেশের লোকপ্রচলিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। উৎকৃষ্ট ভোজ্য সামগ্রীতে কী না কাজ হয়! বাঙালী রমণী তাই কুমারী বা কিশোরী অবস্থা থেকেই রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শী হবার অনুশীলন করে।

বৃটিশ জাতি এদেশে এসে দীর্ঘদিন ধরে থাকার জন্য তাদের সংস্কৃতির বেশ কিছু অংশ এ দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত আটপৌরে সমাজের পাকশালায় একদিকে যেমন ছিল চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় অপরদিকে ছিল নানা মিষ্টান্ন প্রকরণ। কিন্তু সেই পাক-পদ্ধতির প্রধান মাধ্যম ছিল –সিদ্ধ, ভাজা, পোড়া, ভাপে সিদ্ধ প্রভৃতি। এর বাইরেরও যে অন্যবিধ রন্ধনপদ্ধতি আছে, তার প্রণালী তত বেশী অনুসৃত হত না।

এর আগে দীর্ঘ দিন ধরে মোগল যুগের কল্যাণে এ দেশের হেঁসেলে নানাবিধ মোগলাই খানা ঠাঁই করে নিয়েছে। বিচিত্র তার স্বাদ-প্রকরণ-আর কৌশল। মোগলরা চলে গেলেও, তাদের বিচিত্র রন্ধন পদ্ধতি যে বিলীন হয়ে গেছে—এ কথা বলা যাবে না। শহর কলকাতার কয়েকটি হোটেলেই যে সে সব ব্যঞ্জন সীমিত তা নয়, বৃহত্তর সমাজও তাকে নিজের মত করে গ্রহণ করে নিয়েছে। তবু বলব—

একপ্রকার মানসিক রক্ষণশীলতার জন্যই বৃহত্তর সমাজে শুধু ভোজ্যবস্তু কোন, নতুন কোন প্রকরণই সহজে প্রবেশাধিকার পায় না। পরন্তু তা যদি হয় সামান্যতম বিদেশী ধাঁচের অর্থাৎ মুসলমানী বা সাহেবী—তবে তা হত নিতান্ত যাবনিক। তাই রন্ধনবিদ্যার অন্যতম মাধ্যম যে 'বেকিং'—এ তথ্য তাদের জানা থাকলেও, তা তত জনপ্রিয় ছিল না।

অবশ্য বৃটিশরা আসার পরে বেকিং পদ্ধতির রন্ধনপ্রণালী এ দেশে সমাজের একটি বিশেষ স্তরে জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। এভাবে তা ধীরে ধীরে সাহেব মহল ছেড়ে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে এবং তার অনেক পরে আধুনিক কালে তা একটি সর্বজনীন পদ্ধতিতে গৃহীত হয়েছে। তাই বেকারী নামক সংস্থার উদ্ভব ও জনস্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনের একটি দিগন্ত যেন উন্মোচিত হল।

পাউরুটি-বিস্কুটের জগৎ পেরিয়ে যেদিন বৃহত্তর সমাজ 'কেক' নামক সুস্বাদু ভোজ্যবস্তুর আস্বাদ পেল, সেদিন তারা নিশ্চয়ই সাহেবি খাওয়ায় 'জাত' গেল কি না—এ নিয়ে গবেষণা করে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেকারী বা বেকারী-জাত কেক আজ বৃহত্তর জনসমাজের হার্দিক জনপ্রিয়তায় এ দেশের রন্ধন পদ্ধতিতে এক স্বীকৃতি মাধ্যমরূপে গৃহীত হয়েছে—যার সব সেরা উৎপাদন হল কেক।

অথচ একদা কেক তৈরীর পদ্ধতিতে দেশি ওভেনস-এর মাধ্যমে নানাবিধ পিঠের তৈরী করতো ঠাকুমারা—সে পদ্ধতি আজও হয়তো অপবিস্তর প্রচলিত আছে। তবে অভিনব 'মিষ্টান্ন' রূপে কেকের একটা নির্দিষ্ট আসন তৈরী হয়েছে।

আমার জ্ঞাতব্য হল, সাধারণ গৃহস্থ তো নিজের পরিবারের জন্য কেক তৈরী করতে এসেছে। সে এত ফাঁকীবাজি করবে কেন? সে তো চাইবে, ভাল জিনিষ দিয়ে ভাল কেক তৈরী করি—তাদের জন্য কি বিধান?

নাসির আমার কথার মর্মার্থ বুঝতে পারল—আমার সামনে থেকে সরে গেল একবার। ওর এক কর্মচারী ওভেন থেকে বড় বাঁশের হাতায় একটি কেকের মিশ্রণ বের করে আনল। দেখলাম, খুব পণ্ডিতের মত সেটি পর্যবেক্ষণ করতে করতে একটি সরু কাঠি ঐ কেকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পরক্ষণেই বের করে আনল বাইরে। তারপর বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সেই কাঠির গাত্রদেশ পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

'তার মানে কেকটা এখনও ভাল তৈরী হয়নি।' আমার দিকে তাকিয়ে বলল ও: 'যদি কেক পুরোপুরি বেকড্ হয়ে যেত, তবে প্রতিটি মশলা পৃথক ভাবে দেখা যেত না। অন্য একটা সুগন্ধ আসত ঐ কাঠির গা থেকে। কিন্তু পরিবর্তে দেখলাম, যে কাঠির গায়ে এখনও ডিম-মাখনের গদগদে ভাব। তাই বললাম।'

নাসির আমার পূর্ববর্তী প্রশ্নের যে উত্তর দিল, তা এবার নিজের মত করে মনের মধ্যে গুছিয়ে নিই।

খ্রীষ্টানরা আর্থিক দিক থেকে তুলনায় গরীব। তারা বড়দিনের মরশুমে কেক তত বেশী কিনতে পারে না। যাদের একটু স্বচ্ছলতা আছে তারা কেকের মশলা-গুলি কিনে এনে বেকারীতে ঢুকে পড়ে। আর, ঘরেতেই যখন তৈরী হচ্ছে তখন দু'-চার পাউণ্ড বেশী হলে ক্ষতি কি? কেননা এই মরশুমে খ্রীষ্টানদের বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া মানেই কেক পাওয়া। শুধু এক রকম নয়, ঐ একই উপকরণ—তার অনুপাত কমিয়ে-বাড়িয়ে অনেক প্রকরণ তৈরী হয়। তারই মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা থাকে বেকারী আর গৃহস্থের মধ্যে।

'তাহলে নিউমার্কেটের আশেপাশের নামী দামী দোকানে এত ভীড় কেন হয় কেক কিনবার জন্য?'

'সে সব তো বড়লোকদের জন্য। ওরা বেশীর ভাগই খ্রীষ্টান নয়। ঐ সব কেকে আরো অতিরিক্ত কিছু থাকে সত্য—যেমন কোনোটায় ওয়াইন—কিন্তু সে সব কেনার সামর্থ্য কোথায় খ্রীষ্টানদের!' নাসির বেশ স্পষ্ট উত্তর দিল আমাকে।

'ও রকম কেক তোমরাও তো তৈরী করতে পারো।'

'পারি, কিন্তু করিনা—কী হবে করে? কিনবে কে?' তাছাড়া, দু' চারটে বড়লোকী কেক তৈরী করে কয়েক ডজন খদ্দেরকে হাটিয়ে লাভ কী আমার?'

ব্যবসায়ী নাসির, গরীব দরদী নাসির—দু' জনকেই দেখলাম আমি। ওর প্রতিটি কথাই সত্য। বেকারী ওদের জাত ব্যবসা, ক' পুরুষের তা জানি না। এ দেশে বেকারী ব্যবসা প্রায় পুরোটাই মুসলমান সমাজে আবদ্ধ। ইদানীং তো মিষ্টির দোকানেও একটা ব্রাণ্ড দেখা যাচ্ছে 'কনফেকশনারী'—সে সব কেক কাদের হাতের তৈরী তা জানা নেই নাসিরদের। তবে তার মতে, ও সব কেক এখন প্রায়

মিষ্টান্নের পর্যায়ে উঠে গেছে। আসলে ওর মধ্যে ডিম থাকে বলে—তা যত মুখরোচকই হোক, ছানার মিষ্টির দোকানে তাকে তো আর একাসনে বসানো যাবে না! তাহলে তো হাজার মিষ্টির জাত যাবে—ছানা যে সর্বদা নিরামিষ!

নাসিরের কথার ধরনে শুধু আমি নয়, বেকারীর উপস্থিত অনেক গেরস্থই একটু সামনে ফিরে তাকালো আমাদের দিকে।

বেকারীর মধ্যকার চিত্রটা তখন আমার বেশ গা-সওয়া হয়ে গেছে। কোন লোক তখনও শীতের মাখন দু' হাতের তেলো দিয়ে রগড়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে—এ কাজটা নাকি হাত দিয়েই করতে হয়। কেউ ডিমের হলুদ আর সাদা অংশ পৃথক করে রাখতে ব্যস্ত। বেকারীর কর্মচারীরা গৃহস্থদের আনা ময়দা-চিনি দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে সঠিক ভাবে মেপে নিচ্ছে। কেউ হয়তো কর্মচারীদের কাছে মোরব্বা, চেরী, কিসমিস ভাল করে রোদে শুকানো হয়নি বলে বকুনি খাচ্ছে। কেউ কেকের ছাঁচে মাখন মাখানো কাগজ পেতে দিচ্ছে। কেউ ছাঁচের মধ্যে মণ্ড ঢেলে দেবার পর তার ওপর নিজের নামের কাগজ বসিয়ে দিচ্ছে—কেননা চুল্লী থেকে বেরোলে নিজেরটা চিনে নিতে হবে তো!

সে এক বিচিত্র কর্মযজ্ঞ। তারই মধ্যে কান খাড়া করে শুনি কত বিচিত্র সব গল্প—ঐ সব আগতদের মুখ থেকে বেরুচ্ছে।

'বড় কিপ্টে অমুকবাবুরা। মাখনটা কিছুতেই ঠিকমত দেবে না।'

'এত ফলকুচি ঐ টুকু কেকে কেউ দেয় কখনো?'

'পয়সা আছে বটে, তাই এক সিজনে কুড়ি পাউণ্ড কেক তৈরী করে।'

'দেখলে, আমাদের লাইনটা সরিয়ে দিয়ে ওদের আগে করে দিল!'

'কী কাকীমা, এবারেও আপনাকে আসতে হল—ছেলেরা কোথায়?'

'দাদু, এবারে কিন্তু আপনাদের কেক দিয়েই বড়দিন ওপেন করব।'

'ওরা কোন কোম্পানীর ভ্যানিলা দেয় কে জানে! এত সুবাস বেরোয়।'

মন্দ লাগছিল না এসব দেখতে আর শুনতে। একদা এ পাড়াতেই তো ছিলাম—সেই বহুদিন আগে। তখন এত সব খুঁটিয়ে দেখা হয়নি এই বিশাল কর্মযজ্ঞ! আজ মনে হচ্ছে অনেকদিন পরে বাংলার মিষ্টান্ন প্রকরণ নিয়ে কেউ লিখতে বসলে হয়তো এ সব কাহিনীও তাতে যুক্ত হবে।

বেশ মনে পড়ে যায় বুলুর মায়ের কথা। তিনি প্রতি বৎসর পিঠে-পার্বণের দিনে আমাকে এক ডিস নানা রকমের পিঠে পুলি করে দিতেন আর বলতেন, 'অনেক রকম কেক তো খেয়েছেন, এবার দেখুন, আমাদের কেক খেতে কেমন।'

আশ্চর্য লাগে, অভিধানে কোনদিন কেন যে লেখা হয়েছিল কেক মানে পিঠা—তা ভেবে পাই না। এটা কি ঈশ্বর গুপ্তের কীর্তি? তাঁর নামটা মনে হতেই তাঁর সেই বিখ্যাত 'পৌষ-পার্বণ' আর 'বড়দিন' কবিতা দুটির কথা মনে পড়ে যায়। 'পৌষ-পার্বণ' কবিতায় তিনি এই উৎসবের কত সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। আবার তিনি যখন 'বড়দিন' কবিতা লেখেন, তাতে যেন একটা চাপা ব্যঙ্গের পরিচয় পাওয়া

যায়। সে সময়ে খ্রীষ্টান বলতে তো সাহেবরা আর সদ্য কনভার্ট হওয়া কিছু শিক্ষিত বাঙালী সমাজ। তার কবিতায় সেই চিত্র ফুটে উঠলেও, কেক খাওয়ার কোন প্রসঙ্গ সেখানে নেই।

নাসিরের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছিল। এই বেকারী ঘরের এক দিকে একটু কৌশলে আড়াল করে একটা পর্দা ঝোলানো আছে—পর্দার আড়ালে কী আছে তা জানবার কৌতূহল আমার কোনদিনই নেই। তবে ঐ পর্দার আবরণটা চট্ করে সামনে থেকে বোঝা যায় না।

সহসা ঐ পর্দার আড়ালে শিকলের আকস্মিক ঝনঝনি শুনে নাসির সচমকে তাকালো আমার দিকে: 'চল ভিতরে, আমার বৌ তোকে কেক খাওয়াবে।'

'সে কিরে, বড়দিনের আগেই কেক খাওয়াবি?' আমি আসর ছেড়ে উঠতে উঠতে এবং ঐ রহস্যময় পর্দার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলি ওকে।

'সে তো খ্রীষ্টানদের নিয়ম। আমরা কী খ্রীষ্টান নাকি। আমরা ইচ্ছে হ'লেই কেক বানাই আর খাই।' বলতে বলতে পর্দা সরিয়ে ওপরে ঢুকে গিয়েছি। পর্দার খুব নিকটেই চেয়ার-টেবিল সাজিয়েছে ওর বৌ, ওপরে সদ্য পাতা টেবিল ক্লথ। মনে হল আমারই জন্য এসব গুছিয়েছে—এখনই। যতই হোক স্বামীর বন্ধু হলেও, বাইরের লোক তো বটে! তাকে কি একেবারে বাড়ীর অন্দরে—

এক পিস কেক মুখে দিয়ে চমকে উঠি: 'দেখ নাসির, যে সব কেক তোর বেকারীতে এতক্ষণ তৈরী হচ্ছে, এটা যে তার মত নয়, তা স্বাদেই মালুম হচ্ছে। চৌরঙ্গীর কোন দোকানের এটা?' আমার এই প্রশ্নে নাসির আহত হল না। পরিবর্তে স্মিত হাস্যে বলল: 'আমার বৌ-এর সখ হল নানা রকম কেক তৈরী করা—অবশ্যি এটা করে শুধু আমাদের জন্য। মাঝে মাঝে করে, একটু মুখ বদল হয়। প্রয়োজনে, ভাল খদ্দের পেলে তাদের গছাবার চেষ্টা করি।'

আমি খাচ্ছি আর তারিফ করছি আর নাসির কথা বলছে।

খেতে খেতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ইতিমধ্যে আবার চা এসেছিল টেবিলে। সহসা সে অন্দর থেকে ফিরে এল আমার সামনে। সে কখন এখান থেকে চলে গেছিল, খেয়াল করিনি। এবারে যখন এল, দেখলাম তার হাতে কতগুলি বই —রান্নার বই।

সর্বোনাশ! এখন কি ও আমাকে রান্নার ক্লাশ করাবে এখানে বসে? আমার এ অনুভূতির ও তেমন কোন মূল্য দিল না। বইগুলি টেবিলে বিছিয়ে বলল: 'এগুলো দ্যাখ, অনেক খবর জানতে পারবি কেক তৈরীর।'

আশ্চর্য নয়, অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! বাঙালী সমাজে যে কেক এখন এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তা ঐ বইগুলি না দেখলে বুঝতে পারতাম না। এত রকম কেক যে হতে পারে—সেটাই তো একটা বিশেষ তথ্য। দেখলাম ১৩৮৯ সালে প্রকাশিত বেলা দে মানে আকাশবাণীর সেই 'বেলাদি'—তিনি দিয়েছেন প্লাম কেক, প্লেন ফ্রুট কেক,

পেস্তা কেক তৈরীর পদ্ধতি ছাড়াও, ফ্যান্সী নারিকেল কেক, দু' রকম রানী কেক, তার মধ্যে একটা আবার নিরামিষ ধরনের—এ সব নানা তথ্য। শুধু তাই নয় কেকের সঙ্গে ক্রিসমাস পুডিং, আর দু' ধরনের পুডিং তৈরীর পদ্ধতি দিয়েছেন। সেই তিনিই আবার ১৩৯২ সালে তার আর একটি বইয়ে দিয়েছেন ক্রিসমাস পুডিং আর পেস্তার কেক তৈরীর পদ্ধতি। জনৈকা সুরূপা দেবীর বইটি ১৪০১ সালে প্রকাশিত— তিনিও বার্থ ডে কেক, টি কেক, টিফিন কেক, ক্রিসমাস কেক, আলুর কেক, প্লাই কেক নামে নানা ধরনের কেক তৈরীর পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। আরো কতজন কত রকম কেক তৈরীর ফর্মুলা দিয়েছেন কে জানে!

পথে বেরিয়ে মনে পড়ছিল, কেক সম্বন্ধে সাধারণ বৃহত্তর সমাজের কথা। শুধু খ্রীষ্টানরাই নয়, আজ বৃহত্তর সমাজও এই কেক শিল্পের শরিক হয়েছেন। একদা যারা বলতেন 'কেক না খেলে বড়দিন হয় না'—তারাই অ জ সাহেব পাড়ার সৌখীন কেকের প্রকৃত ক্রেতা। তারাই বেশী করে ক্রিসমাস-সান্টাক্লজ দিয়ে ঘর সাজান—বাঙালী খ্রীষ্টানের অত পয়সা কোথায়!

এখন তো কত শত রান্নার বই বেরিয়েছে—তার কটার নামই বা এখানে দেব! তাতে দেশ-বিদেশের কত সব পদ্ধতি আর নাম আছে কেক তৈরীর। সে সব খ্রীষ্টানদের জন্য নয়। তাদের জন্য আছে নাসির আর নাসিরদের বেকারী।

মনে পড়ল মুক্তেশের কথা। সেই কতদিন আগে, ও তখন কলেজের ছাত্র ছিল। কোন এক বড়দিনের মরশুমে যখন ওকে এক টুকরো কেক খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম—ও ব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বলছিল, 'দাঁড়ান চট করে একটা কোট গায়ে দিয়ে আসি।'

১৯৭২-৭৩ তখন। তখনও বোধহয় মুক্তেশদের এই বিশ্বাস ছিল যে, কোট গায়ে দিয়ে কেক খেতে হয়। এটাই বোধহয় প্রথা। □

নিম্নবিত্ত অর্থনীতির সীমানায় লোকউৎসব প্রধানতঃ উপলক্ষ-নির্ভর।
কিন্তু উপলক্ষ যে সব সময়ে অন্তিম লক্ষ্য—
তা না হতেও পারে।
'উৎসবের জন্য উৎসব—'
এটি অবশ্য একটি ধারণা হতে পারে, তবে সেই
ধারণার পিছনেও থাকে পারিবারিক বা সামাজিক প্রথা,
আর থাকে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পটভূমিও।
চাহিদা ও যোগানের নীতি অনুযায়ী
শুধু জীবন নয়, লোকউৎসবের চরিত্রও
অনেকাংশে নির্ণীত হয়।
আপাতদৃষ্টিতে লোকউৎসব পালন জীবনের পক্ষে অপচয়
বা ঝলমলে হলেও, এই অপচয়ও যে জীবনের
পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়
তা রবীন্দ্র-জীবনদর্শনেও প্রতিফলিত।

লোকউৎসব-২

মহামানব—
তিনি ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা কাল্পনিক
যেই হোন না কেন,
লোকউৎসব উদ্ভবের উৎস রূপে তিনিও যে কতকাংশে
প্রভাবশালী—এ কথাও তো সবার জানা।
সেই ইতিহাস বা ব্যক্তির কাল্পনিকতা
অথবা পৌরাণিকতা নিয়ে যত দ্বন্দ্বই থাক না কেন
—সেটিও হয়তো কালক্রমে লোকউৎসব প্রচলনের কেন্দ্র
হয়ে উঠতে পারে।
ব্যক্তি বা ঘটনা বা ইতিহাস—সবই
যদি দ্বন্দ্বময় হয়ে ওঠে, তাতেও কোন ক্ষতি নেই।
শুধু কিম্বদন্তীই জন্ম
দিতে পারে কোন উপযুক্ত উৎসের।
আর কিম্বদন্তীই তো লোকউৎসবের মাহাত্ম্যের অনেকখানি!

অপরাধ ভঞ্জনের মেলায়

কাঁচরাপাড়া স্টেশনে নেমে ভুল করলাম।

সাতাশের-এ বাসস্ট্যান্ডে এসে জানলাম, গয়েশপুরগামী এ বাস কদাপি কুলিয়ার পাটে যায় না। এটি এ অঞ্চলের এক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ—কিন্তু কাঁচরাপাড়া দিয়ে গেলে যে কোন আরোহীকে কমপক্ষে দশ টাকা রিক্সাভাড়া দিয়ে অত্যন্ত বিশ্রী খানাখন্দযুক্ত পিচের পথ দিয়ে মেলায় পেঁছাতে হবে।

এ মেলা বসে পৌষ মাসের হাড়-কাঁপানো শীতের কৃষ্ণা একাদশীতে। বেশ প্রাচীন মেলা—এত প্রাচীন যে, শহুরে গল্পকার তাকে নিয়ে গল্প লিখতে পারেন, যেমন এর আগে সাগরমেলা, জয়দেবের মেলা, সাতই পৌষের মেলা নিয়ে বিস্তর গল্প লেখা হয়েছে। তবে দুঃখ লাগে, তিনি পৌষ মাসের মেলাটা নিয়ে যান অঘ্রাণ মাসে আর তাই শীতের বদলে হেমন্ত হয় তার কাহিনীর পটভূমি।

রিক্সচালক তবু বুদ্ধিমান বলতে হবে—বয়সে সে বেশ প্রৌঢ়। খানাখন্দ রাস্তায় রিক্সা করে যেতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল—তা সে বুঝেছিল। তাই গল্পের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়ে সে যেন আমার শ্রম কিছুটা লাঘব করতে চাইল। গল্পও আছে বটে তার ঝুলিতে!

চৈতন্য মহাপ্রভু নাকি ভারত পরিক্রমার সময়ে এ স্থানে এসেছিলেন। কাঁচরা-পাড়ার নিকটেই আছে চৈতন্য ডোবা—সেটিও তাঁর স্মৃতি বিজড়িত। এখানে এই কুলিয়া গ্রামে চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন দেবানন্দ গোস্বামী। তাঁর কাছেই অতিথি হয়েছিলেন তিনি। গোঁসাই ঠাকুর নাকি চৈতন্যের এই অবাধ প্রেম বিতরণ নীতি তাঁকে বুঝিয়ে ছিলেন। সমাজের সর্বস্তরের জন্য এই হরিনাম বিতরণ—এতে নাকি হরিনামের যথেচ্ছাচার হয়। জাত পাত সব লোপ করে দেবার এ প্রচেষ্টা তাই গোঁসাই ঠাকুরের কাছে নিন্দনীয় হয়। এ সবই হল জনশ্রুতি।

আপন ভক্তের মুখে নিজের কাজের এই সমালোচনা শুনে চৈতন্যদেব ভক্তকে বোঝালেন, যে দেবানন্দ গোস্বামী কত বড় ভুল করেছে। যুক্তি-তর্ক দিয়ে তিনি গোঁসাইকে বোঝালেন যে গোঁসাই ঠাকুর এক প্রকার অপরাধ করেছে। এতে চৈতন্যের ভক্তিবাদকে ভিন্ন বা অপব্যাখ্যা করা হয়েছে—যা বৈষ্ণব ধর্মের পক্ষে নয়। এখন, দেবানন্দ গোস্বামী যদি প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং এখানে একটি ধর্মসম্মিলনের ব্যবস্থা করেন, তবে তার অপরাধ ভঞ্জন হবে। তদবধি এ মেলা নাকি অপরাধ ভঞ্জনের মেলা নামে বিখ্যাত। স্থানটি কাঁচরাপাড়ার বিখ্যাত সুদীর্ঘ কুলিয়ার বিলের ধারে, তাই এর নাম হল কুলিয়ার পাট বা ক্ষেত্র। মনে পড়ল, শুধু কাঁচরাপাড়া নয়, কল্যাণী শহরেও দেখেছি বটে কুলিয়ার পাটে অপরাধ ভঞ্জনের মেলার পোস্টার।

আজকাল এই এক হয়েছে ফ্যাশন। বিজ্ঞাপন দিয়ে না জানানো হলে কেউ যেন কিছু জানতে পারে না। আচ্ছা, বাংলাদেশের সব গ্রামমেলা এবং ট্রাডিশনাল মেলার ক্ষেত্রেই কি আজকাল এই হাল হয়েছে? আমার জানা নেই সে কথা!

পথ চলছি তো চলছিই। রিক্সায় বসে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গায়ে ব্যথা।

কুলিয়ার বিল না চলে আজ এই উৎসবের দিনটায় সবাই যেন বেশী করে বলছে কুলিয়ার পাট। 'পাট' শব্দের কি যে অর্থ বুঝিনে। তবে মানি, চৈতন্যদেব জড়িত যে সব স্থান এদেশে বা সংলগ্ন বিহার-উড়িষ্যায় আছে, সেই স্থান শ্রীধাম, শ্রীক্ষেত্র নচেৎ শ্রীপাট নামে পরিচিত হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর যারা প্রধান শিষ্য, তাঁদের সঙ্গে জড়িত যে সকল স্থান, সেগুলিও হল শ্রীপাট। বাংলাদেশেও আছে অনেকগুলি শ্রীপাট—দেশ তো কদিন মাত্র বিভাগ হল! আগে সব একই ছিল।

শ্রীপাট সম্বন্ধে এত কথা জানা ছিল না—যদি না গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা আগে ঘাঁটাঘাঁটি করা না থাকত। এখন সে পঞ্জিকায় সে সব তথ্য থাকে কি না জানি না। অবশ্য ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের পঞ্জিকাতে যাবতীয় বৈষ্ণব তীর্থ ও উৎসবগুলির সাল-তারিখ-মাস-উপলক্ষ্য সহ এক দীর্ঘ তালিকা দেওয়া আছে। সেইটা খুঁটিয়ে পড়লেই জানা যায়, এদেশে এজাতীয় ক্ষেত্র আছে কতগুলি।

আসলে এ সব কথা ভাববার এখন মোটেই সময় নয়। এ যেন 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাওয়ার মত অবস্থা। তবে পায়ের ব্যথা আর যাত্রার একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য যেন এসব ভেবে নিজেকে ভুলিয়ে রাখছি।

চৈতন্যদেব বা তার শিষ্য-পার্ষদদের কেন্দ্র করে এত উৎসব হয় এ দেশে? শুধু পুজার্চনা নয়, মহোৎসব-মেলা সব কিছু। প্রতিটি মেলাই তিন চার দিন থেকে আট-দশ দিন অবধি স্থায়ী হয়। সেদিনও যেমন হত আজও তেমন হয়।

এই যে এখন কাঁচরাপাড়ার কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছি—এর চারিপাশে তিন-চার মাইল বৃত্তের পরিধি আঁকলে কতগুলি যে বৈষ্ণব শ্রীপাট আছে—তার হদিশ নেই। চাকদা, মদনপুর, পালপাড়া অঞ্চলে একাধিক শ্রীপাট আছে—তা তো জানলাম ঐ 'গুপ্তপ্রেস' থেকেই। আবার পানিহাটি, শ্যামনগর, হালিশহর প্রভৃতি অঞ্চলও আছে। শহর কলকাতার বরাহনগর যে একটি বিখ্যাত শ্রীপাট—তার খোঁজ রাখেন কজন?

এসব ভাবতে ভাবতে পথ অনেকটা এগিয়ে যাওয়া গেল।

মেলা প্রাঙ্গণটি কিন্তু বেশ ছোটই।

মন্দিরে উঠবার প্রথম ধাপটি বেশ প্রশস্ত সেখানে জুতো পরেই মূল মন্দিরের গৌর-নিতাই দর্শন করা যায়, বেশ ভাল করেই। তবে যারা পুজা দিচ্ছেন, দ্বিতীয় ধাপে জুতো খুলে উঠে ক্রিয়াকর্ম সারেন তারা।

মেলা চলছে—তাই মন্দির গৃহটি সুন্দর ভাবে রং করা হয়েছে—উপরের চুড়া

অবধি। বিদ্যুতের আলোয় শুধু মন্দির গৃহ বা মন্দির প্রাঙ্গণই নয়—সারা মেলা-ক্ষেত্রই আলোয় আলোকিত।

মূল মন্দিরের বাঁ দিকেই 'বাঞ্ছাপূরণ কল্পতরু'—যেমন আর পাঁচটি মেলাতে থাকে। গাছটির নামও গায়ে লেখা আছে। ভক্তরা বিশেষতঃ যুবক-যুবতীরা সেখানে ঢেলা বেঁধেই চলেছেন—আগে থেকেও কত যে বাঁধা আছে। গাছটি ধীরে ধীরে নুয়েছে তার ভারে। কিন্তু অস্পষ্ট আলোয় গাছটিকে চিনতে পারলাম না। ভক্তরা সে বিষয়ে সপ্রশ্ন বলেও মনে হল না।

তার বাঁ দিকে দেবানন্দ বাবাজীর সমাধি—তেমনই ঝকঝকে রং করা। তাঁকে দিয়েই এই মেলার পত্তন, তবে তাঁর সমাধিতে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান হয়েছে বলে মনে হল না। ভক্তরা গৌর-নিতাইকে নিয়েই সন্তুষ্ট।

তার বাঁ পাশে আরেক বাবাজীর সমাধি।

ব্যাস্, এই হল মেলার ধর্মস্থান। তাকে কেন্দ্র করে মেলার চারিপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য দোকানপাতি—সব মেলায় যেমন হয়। এই দোকানগুলিকেই আপনি দেখেছেন হয়তো ঘোষপাড়ার সতী মা'র মেলার, নয়তো শ্যামনগরের মেলায় কিংবা ঠাকুরনগরের মেলায়।

গ্রাম্য দরিদ্র মেলা, দেখেই বুঝতে পারা যায়, কারা এর পৃষ্ঠপোষক। অবশ্য মাইক, গান, ঘোষণা, আলো ইত্যাদিতে এই গ্রাম্য মেলা প্রাঙ্গণ যথারীতি সরগরম।

রাস্তার অপরদিকে রয়েছে নাগরদোলা, মেরী গো রাউণ্ড—নিতান্ত স্বল্পাকারে। মেলায় যে পরিমাণ যাত্রী এসেছে, সাইকেল রাখার স্ট্যাণ্ডে তার পাঁচগুণ লোকের সাইকেল রাখার ব্যবস্থা আছে। এ থেকে মেলার আর্থিক অবস্থাটা ভেবে দেখা যায়।

মেলায় মার্কসবাদী সাহিত্যের স্টল হয়েছে, কিন্তু হাজার খুঁজেও বৈষ্ণব সাহিত্যের কোন দোকান পেলাম না। ইচ্ছা ছিল, অপরাধ ভঞ্জনের কিম্বদন্তী নিয়ে লেখা কোন গ্রাম্যকবির পাঁচালী জাতীয় পুস্তিকা সংগ্রহ করব—অনেক খুঁজেও পেলাম না।

সেই যে গল্পটার কথা বলেছিলাম, একদা 'দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল (২৮. ১২. ৯৬), যার লেখক ছিলেন মিহির মুখোপাধ্যায়, তার কথাটা এবার বলা দরকার। তাঁর গল্পের মেলায় মাস আর আমার দেখা মেলায় মাস—এ দুইয়ের মধ্যে ধন্দ পড়েই এ সব কথা বলছি। তার ঐ বিরাট গল্প থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করে দিই এখানে—

'গিয়েছিলাম পাটের মেলা দেখতে কুলিয়ায়। কল্যাণীর কাছে, কুলিয়া গ্রামে গৌর-নিতাইর মন্দির। সেখানে মন্দির ঘিরে এই মেলা। অঘ্রাণ মাসে কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে এই মেলা বসে তিনদিনের জন্য। শোনা যায় স্বয়ং চৈতন্যদেব নাকি এই কুলিয়া গ্রামে এসে বৈষ্ণবনিন্দক পণ্ডিত দেবানন্দের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করে-ছিলেন। ভক্তজনের বিশ্বাস, ওই তিথিতে এখানে, এই মন্দিরে এসে, পুজো দিলে

সব পাপ দূর হয়।

মেলা প্রাঙ্গণটি তেমন বিস্তৃত নয়। ..গৌর-নিতাই মন্দিরটি ছোট কিন্তু পরিচ্ছন্ন। সামান্য কিছু ভক্তজনের সমাগম হলেও তেমন ভিড় নেই।

হেমন্তের বিকেলে নিরিবিলি, ছিমছাম মন্দিরটি আমার ভাল লেগে গেল। শেষ বেলার রোদে মন্দিরটির পাশে একটি বকুলের ছায়া দীর্ঘ হচ্ছিল। দূরে মাঠের উপর দিয়ে দলে দলে লোক আসছে। সন্ধ্যার পরে হয়তো কিছু ভিড় বাড়বে।

ঘুরতে ঘুরতে লক্ষ্য করলুম বড় বড় ম্যাজিকের তাঁবু, ইলেকট্রিক নাগরদোলা, ওখানে এসব কিছু নেই। একটি তাঁবুর মধ্যে মিনি চিড়িয়াখানা। তাঁবুটি তেমন বড় নয়। বাইরে দাঁড়িয়ে একটি লোক ঘণ্টা নেড়ে নেড়ে সবাইকে ডাকছে, "আসুন, আসুন, বাঘ দেখুন, ভালুক দেখুন, হনুমান, গোখরো সাপ দেখুন।"

একপাশে ছোট একটি নাগরদোলা রয়েছে। দুটি লোক হাত দিয়ে ঘোরাচ্ছে। কয়েকটি তেলেভাজার দোকান, মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকান। এমনকি দুটি ভাতের হোটেলও রয়েছে।

এছাড়া সার সার অস্থায়ী দোকানগুলিতে দেখলুম, সাধারণ গ্রাম্য গেরস্থালির নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যই বেশি। লোহার বঁটি-কড়াই-দা-কুড়ুল-কোদাল-নিড়ানি-খুরপি ইত্যাদি। কাঠের চাকি, বেলুন, ছোট-বড় বারকোশ, থালা বাটি। মাটির হাঁড়ি-কলসী-কুঁজো, পিলসুজ, নানা আকারে ফুলের টব। একটি চালার নীচে একসার পুতুলে চোখ আটকে গেল। এই পুতুলগুলি আমার কেমন চেনা-চেনা মনে হল। দুটি ষাঁড় মুখোমুখি মাথা নিচু করে রয়েছে। কয়েকটি সাদা-কালো ঘোড়ার গর্বিত গ্রীবা ভঙ্গি। ...এই হাতের কাজ, এই রঙের খেলা আমার খুব চেনা। কোথায় যেন দেখেছি, কবে দেখেছি। সেকি এই জন্মে নাকি অন্য কোনও জন্মে, অন্য কোথাও?'

লেখক মশাই কুলিয়ার মেলা নিয়ে যে গল্পই লিখুন না কেন, আমার মনে হল, মেলার মাস নিয়ে তিনি যে তথ্য দিয়েছেন, তা বোধহয় ঠিকই—কেননা পাঁজিতেই এ' রকম খবর আছে। তাহলে কোনটা ঠিক?

সন্ধ্যা তখন যুবতী মাত্র।

মেলায় যাত্রী সমাগম তখন তুঙ্গে। মূল মন্দিরে যেমন ভীড়, তেমন ধুনি, ঢাকাই পরটা তেলে ভাজার দোকানেও। ওদিকে নাগরদোলা ইত্যাদিতেও বেশ ভীড়ের লাইন। অন্য কোন প্রমোদ ব্যবস্থা এ মেলায় তেমন চোখে পড়ল না।

ট্রাডিশনাল জিলিপি-পাঁপর ভাজার সঙ্গে আজ এই সব গ্রাম্য মেলাতে এগরোল-চাউমিনরা এসে গেছে। শুধু তাই নয়, সস্তার ক্যাসেটও চোখে পড়ল, এ মেলায়—বিক্রিও হচ্ছে বেশ।

হাড়োয়ার মালতী মণ্ডলের 'ঢাকাই সুইটে' তখন জোর কদমে ঢাকাই পরটা ভাজা হচ্ছে—টপাটপ বিক্রিও হচ্ছে। তার বর দেখছে পরিবেশন, আর বৌ দেখছে ক্যাশ

প্রসঙ্গ কথা

চৈতন্যদেবের কুলিয়ার পাটে আগমন বিষয়ে যে সকল কিম্বদন্তী শোনা যায়, তার অতিরিক্ত কিছু সংবাদ এখানে পরিবেশিত হল। তিনি কাঁচরাপাড়া-হালিশহর প্রভৃতি স্থানে এসে থাকলেও, এই কুলিয়ায় এসেছিলেন কি না—এ বিষয়ে এক ভিন্ন মত প্রচলিত আছে।

চৈতন্যভক্ত কবিকর্ণপুর 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক নাটক লিখেছিলেন ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে। চৈতন্যের জীবনকাব্য 'চৈতন্য চরিতামৃত'-ও এঁরই রচিত। এই গ্রন্থে চৈতন্য-জীবনীর সকল কথাই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর কুলিয়ায় আগমন সম্বন্ধে সেখানে কিন্তু পয়ার ছন্দে লেখা মাত্র অর্ধপংক্তি একটি বাক্যাংশ হল—

'একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস। প্রাতে কুমারহট্ট আইলা যাঁহা শ্রীনিবাস॥
তাঁহা হইতে আগে গেলা শিবানন্দ ঘর। বাসুদেব গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর॥
বাচস্পতি গৃহে প্রভু যেমনে রহিলা। লোক ভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা॥
মাধবদাস গৃহে তথা শচীর নন্দন। লক্ষ কোটি লোক তথা পাইলা দর্শন॥
সাতদিন রহি একা লোক নিস্তারিলা। সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা॥'

[কৃষ্ণদাস গোস্বামী বিরচিত। মধ্যলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণ। পৃ. ৩৯১]।

প্রসঙ্গতঃ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের নবম অংক হল 'মথুরাগমন'—এই অংকের বিষয়বস্তু হল: রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং সার্বভৌমের কথোপকথন ব্যাপদেশে চৈতন্যদেবের পানিহাটি, কুমারহট্ট (হালিশহর এবং কাঞ্চনপল্লী), শান্তিপুর, নবদ্বীপ এ অপর পারাস্থিত কুলিয়া গ্রাম এবং গৌড়েশ্বরের রাজধানী গমন এবং তথা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হইয়াছে।'

সুতরাং এখানে কুলিয়া গ্রামের অবস্থান দেখা যাচ্ছে নদীয়া জেলার নবদ্বীপের অপর পারে। আবার কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবনীগ্রন্থেও যে তথ্য আছে তাতে জানা যায়: 'তথা হইতে নৌকাযোগে পানিহাটি, হালিশহর, কাঁচরাপাড়া, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কুলিয়া এবং রামকেলি গমন এবং পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন।'

উভয় তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে সতীশচন্দ্র দে প্রণীত 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী' গ্রন্থ থেকে। প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠার এই বিশাল গ্রন্থে লেখক কুলিয়া সম্বন্ধে আরো তথ্য দিয়েছেন: 'কাঁচরাপাড়ার নিকটস্থ কুলিয়া নয়, নবদ্বীপের অপর পারস্থ কুলিয়া গ্রাম—ভক্তনিবাসনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া গ্রাম নামে 'মাধবদাস বাট্যা মুক্তিণ যান'—শ্লোকটি আছে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের নবম অংকের ৩৩ শ্লোকে।

উপরোক্ত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক এবং চৈতন্যচরিতামৃত জীবনীগ্রন্থ—এই দুই মহাগ্রন্থের পাঠ পরস্পর বিরোধী বলেই মনে হয়। একই কিম্বদন্তীর সঙ্গে দুটি ব্যক্তি জড়িত থাকায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কুলিয়ার প্রকৃত অবস্থান নিয়ে এখন আর কোন আলোচনা হয় না, তবে নবদ্বীপাঞ্চলে এ জাতীয় কোন মেলা হয় না।

—কর্মচারী আছে বিস্তর। ওদের দোকানে পরোটা খাবার অছিলায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঢাকাই পরোটা নির্মাণের গঠন কৌশলটাই পুরো দেখা হয়ে গেল।

একটা ঢাউস পরোটা মাত্র চার টাকায় বিক্রী করেও তার লাভ থাকে—বিক্রী বেশী হচ্ছে যে! এছাড়া অন্যান্য মিষ্টিও তো আছে হরেক রকম। সেগুলো অবশ্য সাতবাসী। টাটকা বলতে শুধু জিলিপি ভাজা।

মালতীরা এ মেলা শেষে যাবে লালবাগে কোন 'মুসলমান মেলায়'। তাতে কি আসে যায়—বিক্রী হওয়া নিয়ে কথা।

এরপর ওরা অনেক মেলায় ঘুরে পুনরায় কুলিয়ার খুব নিকটে কল্যাণীতে দোলের সময় আসবে—ঘোষপাড়ার সতীমার মেলায়। এইভাবেই ওদের সংসার চলে। সে সংসারের চিত্রও দেখা হল খানিকটা—ঢাকাই পরোটা খেতে খেতে।

থরে থরে সাজানো মিষ্টির গ্যালারী মার্কা বেঞ্চি—তার নীচে শুয়ে আছে—তার দুগ্ধপোষ্য শিশুটি। তার বড় ছেলে, হয়তো বছর তিনেক তার বয়স—সে তাকে দেখাশোনা করছে। মালতীর এখন এসব দেখার সময় নেই। সে সেজেগুজে ক্যাশবাক্স সামলাচ্ছে—হাতে নোটের তাড়া, মুখের কথায় টেবিলের হিসাব।

কথায় কথায় জানা গেল, শুধু মালতী বা তার বর নয়, এখানে যারা দোকান করেছে, তারা কেউই হাট-বাজারের স্থায়ী দোকানী নয়। মেলায় মেলায় ঘুরে তাদের জীবন কাটে। পশ্চিমবঙ্গের সব মেলার পাঁজিকা তাই তাদের কণ্ঠস্থ।

এদের কেউ বৈশাখ মাসে কিছুদিন ঘর সংসার করে আসে—কেউ বা বর্ষার সময়ে মাস দুয়েক থাকে। চাষবাসের জমি আছে যাদের—তারা। সংসার এদের বেঁধে রাখতে পারে না। মেলায় মেলায় ঘুরে এদের আনন্দ। মেলা তাদের ঘর, পাশের দোকানী তার পড়শী।

সুতরাং এখানে যে দেখলাম দেবানন্দ গোস্বামীর সমাধি এবং গ্রন্থে যে নাম পেয়েছি মাধবদাস—এ দুইয়ের মধ্যে কোনটি সত্য—শেষ পর্যন্ত তা নিয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগেই। আবার নবদ্বীপের ওপারের কুলিয়া এবং এখানে এই কাঁচরা-পাড়ার নিকটবর্তী কুলিয়া এই দুয়ের মধ্যে কোনটা সত্য অর্থাৎ ঐতিহাসিক—তাতেও মনে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি যে মেলা দেখছি আমি আজ পৌষ মাসে, আরেকজন দেখে গেছেন তা অগ্রহায়ণ মাসে—

এতগুলি দ্বন্দ্ব মনে নিয়ে এবার আমাকে মেলা ছেড়ে নিজের ঠিকানায় ফিরতে হবে। অবশ্য মন বলে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'। এতগুলি লোক যে এখানে এসেছে তীর্থ করতে—তা কি সবই মিথ্যা! শুধু এ বছরই তো নয়, ফি বছরই জমায়েত হয় এখানে। এমন কি পাঁজিতেও লেখা আছে এই মেলার নাম।

আমি গবেষক নই, ভক্তিরসের ছিঁটেফোঁটাও নেই আমার হৃদয়ের মধ্যে। আমি পর্যটক মাত্র। হঠাৎ মনে হয়, মেলা দেখতে এসে তবে কী অজ্ঞাতসারে এক কিম্বদন্তীর জগতে এসে পড়লাম! কিন্তু চৈতন্যদেবের জন্ম তো এই সেদিন—তা

নিয়ে এরই মধ্যে এত কিম্বদন্তী হয় কি করে! তার শিষ্য বা ভক্তদের মধ্যে যাঁরা তাঁর জীবনী রচনা করেছেন—তাদের বিবরণীতে কেন এত ফাঁক!

এখনই যদি এত মতান্তর, তবে হাজার বছর হয়ে গেলে যে কত কিম্বদন্তী সৃষ্টি হবে কে জানে! অবশ্য ভক্তমনে তার কোন বাধা পড়বে না—উপকৃত হবে শুধু লোকসংস্কৃতির ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের কিম্বদন্তীর ঝুলি উঠবে ভরে!

ইতিহাস-গ্রন্থের কথা থাক। ভক্তর মনের কথাও থাক। অত দ্বন্দ্বের মধ্যে নাই বা গেলাম। এ মেলা ঐতিহাসিক হোক বা কিম্বদন্তীমূলক—কিছুই এসে যায় না তাতে আমার। কিম্বদন্তীর গন্ধ পেলেই আমার মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আমার ভ্রমণটা একটা পৃথক মাত্রা পায়। মেলা ভ্রমণ করতে এসে কিম্বদন্তী বা ঐ জাতীয় কিছু পাওয়া মানে—একটি উপরি পাওয়া।

এবারে আর কাঁচরাপাড়া দিয়ে নয়, এখান থেকে এক কিমি আন্দাজ হেঁটে গেলেই চাঁদামারীর মোড়—মানে বড় রাস্তা। সেখান থেকে আরো দু'পা হাঁটলেই কল্যাণীর রেল লাইন। মেলা গাড়ী পাওয়া যায় কল্যাণী যাবার—এই মোড় থেকে।

আমার অন্তরে যে ভক্তির ছিঁটে ফোঁটা তা শুনে কেউ দুঃখ করবেন না। চুপি চুপি জানিয়ে রাখি, সে বছরে মানে ১৯৯২ সালে ঐ টুকুন মেলায় জিলিপি ভাজার দোকান ছিল প্রায় চাল্লিশটা। পরের বছর যে তার সংখ্যা আরো পরিবর্তিত হবে—তা তো সবাই জানেন! ❑

যে মনীষী বলেছিলেন
'এই পৃথিবী এক রঙ্গমঞ্চ'—
তিনি জানতেন কি, তাঁর এই উক্তি একদিন হয়তো
প্রবচন-তুল্য জনপ্রিয় হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে।
যে নাট্যকার ও শিল্পী একদা বলেছিলেন
'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'—
সেই সব গিরিশ ঘোষরা আজ হারিয়ে গেছেন, তার বাণী হয়ে গেছে প্রবচন।
অভিনয়-অভিনেতা-মঞ্চ—এর যে বিশাল জগৎ
যার সবটাই প্রায় নেপথ্যে থেকে যায়
সাধারণ দর্শকের কাছে,
তার অন্দর মহলের রূপটা কেমন ?
যাদের নাট্যকুশলতায়, মঞ্চমায়ায় মূর্ত হয়ে উঠছে
নাটকের সংলাপগুলি—
তার নেপথ্যে আছেন যারা, তাদের অন্যতম হল সাজঘর।

লোকবিনোদন-১

যেখানে সংসার সেখানে অভিনয়, যেখানে অভিনয় সেখানে সাজঘর।
শহরের নাটক অথবা গ্রামের লোকনাটক—
সর্বত্রই সেই সাজঘরের আধিপত্য।
তাদের বর্জন করলে কোন নাট্যানুষ্ঠানই
সফলতা পায় না।
সকল প্রকার মনসা যাত্রা, দুখে যাত্রা, ছো নাটক, কৃষ্ণ যাত্রা,
ষষ্ঠী মঙ্গল পালা, রামযাত্রা, ডোমনী—আর যত প্রকরণ
সবারই সাফল্য নিহিত আছে অনেকাংশে
এই সাজঘরের উপর।
লোকনাট্য উপস্থাপনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গভীর।
পুতুল নাচের মত
তারা হল সব সময়েই নেপথ্যের কারিগর।
বিধি-নিষেধ ডিঙ্গিয়ে কোনদিন তাদের অন্দর মহলে ঢুকে পড়লে
কী দেখা যাবে—তা কি কেউ জানে ?

বাখরাহাটের মা লক্ষ্মী সাজঘর

যাত্রাদলের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহরের চীৎপুরে হলেও, এ ঘটনা শুধু এখানেই কেন্দ্রীভূত হয়ে নেই। পশ্চিমবঙ্গের নানা অঞ্চলে নানা দল ছড়িয়ে আছে। তারা অনেকেই নিতান্তই সৌখীন, বা আধা বাণিজ্যিক—তবে পূর্ণ বাণিজ্যক একেবারেই নয়। কেননা, কৃষিনির্ভর সমাজে এটি কখনও প্রধান জীবিকা হতে পারেনি, বা পারে না। টি-ভি সংস্কৃতি যতই প্রসারিত হোক, গ্রামীন সাংস্কৃতিক জীবনে এর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে।

এই সব দলগুলি কখনও বা নিতান্ত সাময়িক—কোন কৃষকদের গোষ্ঠীমাত্র। পুজো বা এই জাতীয় উপলক্ষ্যে দানা বাঁধে। দু-চার বার যাত্রানুষ্ঠান হয়—আবার ভেঙ্গে যায়। আর কিছু থাকে স্থায়ী যাত্রাপার্টি। যারা অল্প পয়সায় গ্রামের আরো ভিতরে ভিতরে তাদের দল নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সব গ্রামের লোক আর্থিক অনটনের জন্য কলকাতার দলকে গ্রামে নিয়ে যেতে পারে না।

এই সব দলকে সহযোগিতা করে গ্রামেরই সাজঘর কোম্পানী—তারা যেন এদেরই ঠিক উপযুক্ত। ছোট দলের উপযোগী ছোট যাত্রাপোষাকের কোম্পানী। তারা শুধু মাত্র গ্রাম্য দলগুলির জন্যই। তাদের পুঁজি অল্প, জৌলুষ অল্প—অথচ তারাই কিন্তু এই সব ছোট গ্রাম্য দলগুলিকে একরকম করে বাঁচিয়ে রেখেছে—অবশ্য নিজেরাও বাঁচছে এই ভাবেই। সাইনবোর্ডের বিজ্ঞাপনে ইংরাজীতে একেই বোধহয় বলে 'মেড ফর ইচ আদার'।

এ বিষয়ে মা লক্ষ্মী সাজঘরের কথা শোনা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যত যাত্রাপার্টি আছে এবং তাদের যারা ড্রেস ইত্যাদি সরবরাহ করে—মা লক্ষ্মী সাজঘর যেন তাদের প্রতিনিধি হতে পারে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই সাজঘরের ব্যবসা চলছে বিগত ২৬ বছরেরও বেশী সময় ধরে। যত দিন পাল্টে যাচ্ছে, ততই তাদের দৃষ্টিভঙ্গীও পাল্টে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ পারিবারিক ব্যবসা বলেই হয়তো তা এখনও টিকে আছে।

মা লক্ষ্মী সাজঘরের ঠিকানা কিন্তু খুব সহজ। কলকাতার বাবুঘাট বাসস্ট্যাণ্ড থেকে ৭৫ নং রায়পুরগামী বাসে এসে ঠাকুরপুকুর বাজার হয়ে বাখরাহাট নামা। দোকান ঘরের নং ২২/১ বাখরাহাট রোড, পাশেই একটি যুবকদের ক্লাব। মালিকের বাড়ীর সংলগ্ন এই দোকানটি। সুতরাং সাজঘরের মালিককে দোকানে না পেলেও, বাড়ীতে পাওয়া যাবেই। স্থানীয় অঞ্চলে তিনি হারু নামে পরিচিত—দ্বিতীয় কোনও নাম জানি না।

মা লক্ষ্মী সাজঘরের নাম ঠাকুরপুকুরের লোক কিন্তু জেনেছিলেন অনেক আগে

—সেই পাঁচের দশকেই। এদের একটি বিজ্ঞাপন ছিল ক্ষেত্র পরামানিকের দোকানে। ক্ষেত্রমোহন প্রামানিক—তার একটি সেলুন ছিল ঠাকুরপুকুরের ৩এ বাসস্ট্যান্ডের নিকট। সেলুনের অবস্থানটা ছিল বড় অদ্ভুত—বর্তমানে এখানে যে পোলটি আছে ডায়মণ্ডহারবারে রোড বরাবর, তার পূর্বদিকে রাস্তার ধার ঘেঁষে একটি বটগাছ ছিল। ঐ বটগাছের একেবারে কোলে—আক্ষরিক অর্থেই। সেলুন নেই, সেলুনের নামটা হয়তো পড়া যেত না, স্পষ্ট অক্ষরে কিন্তু পড়া যেত ঐ সাজঘরের নাম : 'মা লক্ষ্মী সাজঘর'।

সে সময়ে ক্ষেত্রমোহন নিজেই এই সাজঘর পরিচালনা করতেন—বাড়ী ঐ উপরের ঠিক কোণেই ছিল। ঠাকুরপুকুরের ঐ সেলুনটা ছিল যেন একটা শহুরে ঠিকানা।

তারপর দিন কেটেছে অনেক। ক্ষেত্রমোহনের দোকান ভাঙ্গা পড়েছে—কেননা ডায়মণ্ডহারবার রোড প্রশস্ত হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। পুরাতন অনেক স্থায়ী দোকানের সঙ্গে ভাঙ্গা পড়েছে ক্ষেত্রমোহনের ঐ অস্থায়ী সেলুনটিও—। সেই প্রাচীন বটগাছটিও কাটা গেছে। আজ একদিন পরে শুধু স্মৃতি ছাড়া মা লক্ষ্মী সাজঘরের কথা ঠাকুরপুকুরের কারোর হয়তো মনেই নেই।

তারপর ক্ষেত্রমোহনের ছেলে অম্বিক ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দোকানের জন্য জমি পেয়েছে বড় রাস্তার উপরে—বেশ ভাল পজিশন। সে পুনরায় পৈতৃক ব্যবসা অর্থাৎ সেলুন তৈরী করে নিয়েছে। এটাই তার এখন প্রধান জীবিকা। তার সেলুনের নাম মা লক্ষ্মী সেলুন।

আর মা লক্ষ্মী সাজঘর ?

সেটা আজও আছে ঐ উপরের ঠিকানায়—বাখরাহাট রোডে, তবে ঠাকুরপুকুরের ঐ সেলুনে তার আজ কোন বিজ্ঞাপন নেই।

অম্বিকের ভালো লাগেনি ঐ সাজঘর ব্যবসার অনিশ্চয়তা। তাই সে স্থায়ী জীবিকার জন্য বড় হওয়া রাস্তার ধারে নতুন করে গড়ে ওঠা সেলুনটিতেই বেশী করে মনোনিবেশ করল। আর পৈতৃক ব্যবসার অর্ধাংশ তুলে দিল নিজের ভাগ্নে হারুর হাতে—আসলে সে ছিল তার সেলুনের সহকারী।

হারু লেখাপড়া একেবারেই জানে না—তার মামা অম্বিক তবু কিছুটা এগিয়ে আছে। ধীরে ধীরে সে-ও বুঝল এই সাজঘরের ব্যবসায়ে জীবন চলবে না। তাই সে-ও জীবিকা হিসাবে পরে সেলুন-বৃত্তিই অবলম্বন করল। কেননা, এ অভিজ্ঞতা তো তার আগেই হয়েছে।

মা লক্ষ্মী সেলুনে চুল কাটতে কাটতে এসব গল্প করছিলাম নবমীর সন্ধ্যায়। আজ দোকানে খদ্দের কম। অম্বিক একটু খোশ মেজাজে ছিল। তার এখন বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। মনটা কিন্তু তাজা আছে। পুরানো কথা তার সব মনে আছে।

দোকান এখন ফাঁকা—নবমীর দিন সন্ধ্যায় কে আর দোকানে চুল কাটতে আসে! তাই অবসর বুঝে তাকে এ সব প্রশ্ন করে করে পুরানো গল্পগুলো টেনে বের

করছিলাম। তাছাড়া তার সঙ্গে পরিচয়টাও তো আমাদের প্রায় দু'পুরুষের শেষ হতে চলল—তার বাবার হাতে চুল কেটেছি যে বাল্যকালে। পরে অম্বিক বলল সে কথা সে তার বাবার কাছেও শুনেছে।

'তাহলে এখন কেমন চলছে সে সাজঘর কোম্পানীর অবস্থা?' এ প্রশ্ন করতে ধীরে ধীরে কথার পিঠে কথা জুড়তে জুড়তে সময় বেশ কেটে গেল। অম্বিক বেশ আগ্রহ নিয়েই কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। সাজঘর তার নিজের ব্যবসা নয় বর্তমানে —ভাগের ব্যবসা এটা। তবু এ বিষয়ে কাউকে জানাতে তার আগ্রহও কম নয়।

● দুটি কাজই একসঙ্গে সে চালায় কি করে?—সাধারণতঃ পার্টি আসে বিকেলের দিকে—তাও রোজ নয়। যেদিন আসে, সেদিন বিকালে সেলুন বন্ধ রেখে বা সহকারীকে চার্জ বুঝিয়ে সে চলে যায়, পার্টির সঙ্গে। তেমন বুঝলে কখনও কখনও সহকারীকেও পাঠিয়ে দেয় যাত্রাপার্টির সঙ্গে।

● মেকআপের কাজ সে শিখল কোথায়?—বাবার কাছে দেখে দেখে। তাছাড়া এটা তো আমাদের পারিবারিক ব্যবসা—তাই ঘরোয়া পরিবেশেই সব শেখা হয়েছে তার।

● আর অন্যান্য কাজ—মানে সাজপোষাক?—হ্যাঁ, মুখে তেল রঙের কাজ তো করেই। সেই সঙ্গে মাথার চুলের কারিগরিও তাকে করতে হয়। আর সাজ-পোষাক ঠিক মত পরানো। তবে কোন কোন পার্টি পৃথক ড্রেসার নিয়েও আসে।

● এখন তো সামাজিক পালা হয় বেশী। তাহলে পোষাকের ব্যবসা কিভাবে চলছে?—আসলে লোকের কাছে ঐতিহাসিক পালার আকর্ষণ কমে যাচ্ছে, তবু পৌরাণিক পালা কেউ কেউ করে। তবে বেশীর ভাগ দলেরই আজ নজর হল সামাজিক পালার দিকে।

● তাহলে ঐতিহাসিক পালার দিন কি শেষ হতে চলল? ঐ সব ঝলমলে পোষাকের গতি কি হবে?—না, নষ্ট করা হয়নি। যত্ন করে বাক্সে রাখা আছে ন্যাপথালিন দিয়ে। যদি কালেভদ্রে কোন যাত্রা পার্টি আসে তো তাদের সাপ্লাই করা হয়। তখন ভাড়াটাও হয় চড়া।

● কি ভাবে এ সাজ পোষাকের রেট ঠিক করা হয়?—পালার গল্প বুঝে। পুরো পালার অভিনেতা, পোষাক মেক-আপ ইত্যাদি একসঙ্গে হিসাব করে থোক টাকা।

● ঐতিহাসিক পালাই যদি না রইল, তবে শুধু সামাজিক পালার জন্য পোষাক সরবরাহ করে কি পোষায়?—সামাজিক পালার জন্যও তো নানা রকমের পোষাক সাপ্লাই করতে হয়। যেমন ধরুণ কোট, টাই—এসব। জমিদার শ্রেণীর লোকের পোষাকও লাগে। দামী ঝলমলে কিন্তু সস্তার শাড়ী কাপড়। আর মাথার চুলের ব্যবসায়ে তো সব সময়েই চাহিদা থাকে।

● বর্তমান মালিক তোমার ভাগে হারু। বললে, সে একেবারেই লেখাপড়া জানে না। তাহলে হিসাবপত্রের কাজ করে কি করে?—সেটা আমিই তাকে বলে কয়ে শিখিয়েছি। কখনও কখনও আমিই দেখে দিই। আমরা থাকি তো এক

জায়গায়। তবে পালা পড়া তার দ্বারা হয় না।

● নিজে ও ব্যবসায়ে যুক্ত না থাকলেও তোমার তো এখনও দেখছি আগ্রহ কম নয়। তবে লেগে রইলে না কেন ?—আগে বাল্যকাল থেকে বাবার সঙ্গে থেকে থেকে একটা আগ্রহ তৈরী হয়েছিল। অনেকবার তো বাবার সঙ্গে যাত্রাপার্টি'র দলেও গেছি কাজে সাহায্য করতে। কখন পালা হত মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত থেকে, সব কাজ শেষ করে সব পোষাক হিসেব মিলিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসা—সে বড় কষ্টের কাজ !

● পুরানো দিনের কয়েকটা পালার নাম করো—যাতে তোমাদের কোম্পানী পোষাক সাপ্লাই করেছিল—বিশেষ করে ঐতিহাসিক পালার। - সে তো বিস্তর নাম। তবু কয়েকটা মনে পড়ছে এখন, লিখে নিন। নাচঘরের কান্না, দীপ আজো জ্বলে, মসনদ কার, নাচমহল, সাঁঝের প্রদীপ, বেগম আসমান তারা—আরো কত বলব ? তবে এ ধরনের পালার আর এখন তত চাহিদা নেই।

● এবারে দু চারটে সামাজিক পালার নাম বল।—সে সব পালাও তো প্রচুর, এখন তো তারই জোয়ার বলতে গেলে। নটী বিনোদিনী, একটি পয়সা, রিক্সাওয়ালা, কাবুলীওয়ালা আরো কত !

লক্ষ্য করলাম, কত সহজে ওরা 'নটী বিনোদিনী'কে সামাজিক পালা বলে মেনে নেয়। কেননা এতে ঢাল-তরোয়াল রাজা-বাদশা ইত্যাদি নেই—তাই এটি সামাজিক পালা। অথচ পুরো বিষয়টি যে ইতিহাসের, তা একে বোঝানো নিষ্ফল। তেমনি কাবুলিওয়ালা পালাটি রবীন্দ্র-কাহিনীর পালারূপ কি না—তা যে জানতে পারি নি। যদিও, ঐ নামের একটি পালা যে একদা কলকাতার এক যাত্রা কোম্পানী লাগিয়েছিল—তা আমাদের জানা আছে। আসলে পালার কাহিনী সম্বন্ধে তাদের কোন আগ্রহ নেই। তবে এ সম্বন্ধে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য পরে বলা যাবে।

এরপর এদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। যদিও সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত পূর্বেই পেয়েছি যে এ ব্যবসায়ে নির্ভর করে কেউই পুরোপুরি জীবন চালাতে পারে না। এটা সব সময়ই হয় 'সাইড বিজনেস'। কেননা আসল ব্যবসাটাই তো সিজনাল।

আসলে যাত্রাপ্রেমটাই হল মূল কথা। যাদের অন্তরে এটা আছে, তারা শত কষ্টেও এ ধরনের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। ক্ষেত্রমোহনের এই রোগ ছিল। যুবক বয়সে অপরিচিত যাত্রা দেখা, প্রৌঢ় বয়সে পোষাক-আষাকের ব্যবসা নিয়ে মেতে ওঠা, বৃদ্ধ বয়সে তা অন্যের হাতে তুলে দেওয়া। নিজে সে কখনও যাত্রাভিনয় করেছে কিনা—তা অম্বিক জানাতে পারেনি আমাকে।

● ঐতিহাসিক পালার জন্য ভাড়ার দর বেশী, তা তো শুনলাম,—সেটি কি রকম হতে পারে ? - সেটা পার্টি বুঝে। যদি তারা পুরানো মাল চায় তবে ৫০০-৬০০ এর মধ্যে রফা হয়ে যেতে পারে।

প্রসঙ্গ কথা

গ্রামবাংলার অসংখ্য ছোট ছোট যাত্রাদলগুলিকে যারা নিয়মিত পুষ্ট করে আসছে, তাদের মধ্যে পূর্বোক্ত 'সেণ্টুরানী' ছাড়াও আরো নানা জন আছে। সেণ্টুরানীর কথা মনে হলেও হালিসহর ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটি সাইনবোর্ড-এর কথা মনে হয় —এখানে থিয়েটারের ড্যান্সার, সখীর দল ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। তাদের কথা সংযোজিত হলে ভাল হত—তাহলে যেতে হবে আমাদের গ্রামের অনেক ভিতরে।

আবার মনে পড়ে চাকদা ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দল—সেখানে ষ্টেশনের ধারেই ছোট ছোট যাত্রা কোম্পানীর অফিস। এরা এতদঞ্চলে যাত্রা পালার অনুষ্ঠানের বায়না করে। তারা বিজ্ঞাপন লাগায় হাফ নিউজ পেপার সাইজের কাগজে। এরা সবাই কলকাতার যাত্রা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে চলে। এদের পালাগানও হয় কলকাতার দলের সাথে। তবে এটুকুই যা মিল, বাদবাকী সব নিজেদের নামে। প্রসঙ্গতঃ চাকদহ ও মদনপুর দু' জায়গাতেই ষ্টেশনের ধারেই যাত্রা-নাটক ইত্যাদিতে ড্রেস-মেকাপম্যান-ষ্টেজ ইত্যাদি মাল সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আছে।

বোলান নামক একপ্রকার লোকনাট্যের কথা এ গ্রন্থের অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে। সে বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে—গ্রন্থটিতে তার পূর্বেকার ৩।৪ বৎসরের তথ্য আছে। বোলান গানের এক বিশেষ শ্রেণী হল পোড়ো বোলান। এই প্রকার বোলানে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের এক বিশেষ ধরনের সাজসজ্জা ও মেকাপের প্রয়োজন হয়।

এই মেকাপ যারা করেন তারা মূলতঃ যাত্রাপার্টির অর্ডার সাপ্লাই করে সারা বছর এবং ঐ বিশেষ সময়ে বোলান পার্টির জন্য কিছু সময় ব্যয় করে। কেননা বোলান দলগুলির নিজস্ব ক্ষমতায় পোড়ো বোলানের পূর্বে অঙ্গসজ্জা করা সম্ভব নয়। এছাড়া শ্মশান বোলানের অংশগ্রহণকারীদেরও এক বিশেষ সজ্জার জন্য তাদের পেশাদার মেকাপম্যানের সাহায্য নিতে হয়।

কাটোয়া শহরে গঙ্গার ধারে পাশাপাশি কয়েকটি স্টুডিও আছে। তারা, মৃতদেহ যারা সৎকার করতে আসে, তাদের নানাবিধ ছবি তোলে—আর আছে একটি সাজঘর। 'বোলান কথা' গ্রন্থের রচনার জন্য এই সাজঘরের মেকাপম্যান ভূতনাথ মহাশয়ের সঙ্গে সেদিন আলাপ করা হয়েছিল। এ এক ভিন্ন ধরনের লোকনাট্য। তার কাহিনী, পোষাক, মেকাপ সবই ভিন্নধর্মী। তবু এ প্রসঙ্গে তাদের কথাও প্রয়োজনীয় হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে সত্য কথাটা হল এই যে, গ্রামাঞ্চলে যাত্রাপালার দল যেমন সৌখীন ভাবে গড়ে ওঠে, তেমনি তার সাজঘরের বিষয়টিও সেই রকম তাল মিলিয়ে চলে। কখনও বা এর পিছনে প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলে। কিন্তু জীবনের মূল জীবিকা কখনই এটা নয়। তাই শিল্পী যারা, তাদের সবার কাছেই এটা নিছকই একটা 'ছবি' মাত্র।

* পুরানো মাল আর নতুন মালে তফাৎ কী ? —এসব পালার তো আজকাল ডিমান্ড কম, তাই সেগুলো বাক্সবন্দী করে রাখা থাকে, রঙটা একটু পুরানো হয়ে যায়। যদি কোন পার্টি নতুন সাজ-পোষাক চায়, তাদের জন্য নতুন রকম ব্যবস্থা করতে হয়। তাই দরটা বেশী পড়ে যায়। তাহলে হাজার পর্যন্ত হতে পারে এক এক পালার জন্য।

ড্রেসার, মেকাপ—সব কাজ কি এক হাতে করা হয়, না কি এর জন্য হেল্পার লাগে ? সেটাও পালা বুঝে ! তাহলে তাকে এক রাত্রির জন্য দিতে হয় ৮০-১০০ টাকার মত।

এ বাদে আর কি কি খরচ হয় পালা নামাবার জন্য ?—রিক্সা ভাড়া লাগে বিস্তর, সেটা পার্টিই দেয়। কেননা আমাদের দোকান থেকে যাত্রার আসর পর্যন্ত মালপত্র সব নিয়ে যেতে হলে রিক্সা ছাড়া উপায় নেই।

* আর খুব দূরে দূরে যে পালার স্থান ?—তাহলে ছোট টেম্পোর ব্যবস্থা করতে হয়। তবে এসব খরচ তো পার্টির। আমাদের শুধু মাল নিয়ে যাওয়ার হাঙ্গামা।

পয়সা কড়ির লেনদেন ঠিকমত আদায় হয় কি করে ?—প্রথমে চুক্তির সময়ে ফিফটি পার্সেন্ট অগ্রিম দেওয়া হয়। তারপর পালাগান হয়ে গেলে বাকী পয়সা—সেটা ঐ আসরের মধ্যেই।

• এ নিয়ে কোন রকম গণ্ডগোল হয় না !—যথেষ্ট হয়। কেউ কেউ গোলমাল বাঁধিয়ে পরে আর টাকাই দেয় না—তখন পুরোটাই ক্ষতি। গোলমালের মধ্যে একা পড়ে যাই। নানারকম খুঁত বের করে। তখন কোন রকমে মাল নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়।

• আর পালাগান ভাল হলে কেউ কি কোন রকমে বকসিস বা ঐ জাতীয় কিছু দেয় ? -একেবারে না। টাকা-কড়ির ব্যাপারে এ সব পার্টি খুব সেয়ানা। আসলে আমরা যাদের সঙ্গে কাজ করি, এরা তো কেউ যাত্রা ব্যবসায়ী নয়। বিশেষ কোন কারণে কয়েকজন দল বেঁধে এক-দু' রাত্রি যাত্রা করল, তখন আমাদের ডাক পড়ে। নইলে বড় পার্টি পাবো কোথায়।

* পুজোর সময়টা তাহলে বেশ ভালই অর্ডার আসে ?—তা হয়, কখনও কখনও সারা মাস ধরেই অর্ডার থেকে। প্রায় প্রতি রাতই বাইরে। আবার এমনও হয়েছে মাসের মধ্যে দু' তিন বার মাত্র অর্ডার আসে। বর্ষার সময়টা যে মন্দা যায়—তা তো জানেনই।

* তোমাদের সাজঘর থেকে মাল নিয়ে গেছে যারা—সে সব যাত্রাপার্টির নাম কি ? বললাম তো, যাত্রা পার্টি বলে এদিকে গ্রামের মধ্যে এখন কিছু নেই। সবই সৌখিন। তবে কাছাকাছির মধ্যে জোকা, পৈলান, রাম মাখালচক, সজনেবেড়ে, বাখরা, রায়পুর, রসপুঞ্জি, কলাগেছিয়া, সিরিটি, সোদপুর, টালিগঞ্জ, সরপুল, খিদিরপুর—এসব জায়গায় মাল সাপ্লাই করেছি। শুধু পোষাক নয়, মেকাপম্যান, ড্রেসার - তাও পাঠিয়েছি আমরা। কোন কোন দল নিজেরাই মেকাপের ব্যবস্থা করে নিজেদের মধ্যে থেকে।

কথাবার্তা বলতে বলতে বুঝতে পারছিলাম, অম্বিকা নিজে তার ভাগ্নের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত না হলেও, সবই বোঝে এ ব্যবসার কাজকর্ম। আজও তার পৈতৃক ব্যবসা সম্বন্ধে আগ্রহটি ঠিক আছে। হয়তো তার ভাগ্নে হারুরও। এতসব কথা ও গুছিয়ে বলতে পারত না। হারুর বয়স এখস এখন ২৮।৩০ হলে কি হবে, এত অভিজ্ঞতা তো তার নেই।

কিন্তু একটু আগে যেসব স্থানের কথা অম্বিক বলল, সেগুলি সবই আমার পরিচিত স্থান। কিছুটা বা আপনাদেরও। তালিকার প্রথম দিকের নামগুলি ঐ ৭৫নং বাসরাস্তা ধরে রায়পুর অবধি গেলে পর পর সব পড়বে। সেগুলি সব গ্রাম, কৃষি প্রধান জায়গা। শহরের থেকে দূরত্ব কিঞ্চিৎ বেশী। কোন কোন ক্ষেত্রে যাতায়াত ব্যবস্থাও তত ভাল নয়।

ঠিক ঐ তালিকার শেষের দিকের নামগুলি যে একেবারে শহর কলকাতার মধ্যে—তা তো অনেকেই জানেন। অবাক করার কথা হল এই যে বেহালার ভিতর দিয়ে আধুনিক পর্ণশ্রী পল্লী, সেখান থেকেও এরা অর্ডার পায়। আর অন্যান্য স্থানগুলি এখানে আসে মাল নেবার জন্য—শুধু আর্থিক কারণে। নচেৎ কলকাতা শহরের মধ্যে তো একাধিক স্থানে নানা কোম্পানী আছে। তবু আশেপাশে এ জাতীয় কোম্পানীর হালচাল সম্বন্ধে কিছু জানতে ইচ্ছা হয় বইকি!

● এত দূর দূর তোমরা মাল সাপ্লাই করো। কেন, সে সব অঞ্চলে কি কোন কোম্পানী নেই?—আছে হয়তো, তবে দরে পোষায় না। যতই কলকাতার ভিতর ঢুকবেন, ততই রেট বাড়বে। আর আমাদের প্রধান খদ্দের তো হল ছোট খাটো পার্টিই—সে তো আগেই বলেছি।

● অন্য কোন কোম্পানী নেই এদিকে? তাদের সঙ্গে কম্পিটিসান হয় না তেমন? হয় বৈকি!—তবে তাদের সঙ্গে তালে তাল দিয়ে কাজ করাটাই তো বুদ্ধিমানের।

● কোথায় আছে সে সব অন্য দোকানী গুলি?—আমতলার ভিতর দিকে আছে একটা। বাখরায় আছে একটা।

দুটি স্থানই আমার চেনা। এদের যে প্রধান কেন্দ্র বাখরাহাট, সেখান থেকে সহজেই ঐ দুটি কেন্দ্রে পৌঁছানো যায়। অদূরে এই যে ঠাকুরপুকুরের মা লক্ষ্মী সেলুন, এখান থেকেও ঐ সব কোম্পানী যাওয়া যায়। যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল হয়ে যাওয়ায় এরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করে।

● এমনও তো হতে পারে, পার্টি যে পালাটা নামাবে তার কিছু ঘাটতি হল—হয়তো দু'একটা মাল। তখন কি করা হয়?—এস্থলে ঐ সব বাবুদের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে দলকে ম্যানেজ করে দেই। তেমনি এরাও মাঝে মাঝে এটা-ওটা চেয়ে নিয়ে যায়। মোট কথা পার্টিকে হাত ছাড়া করা চলবে না। বুঝতেই পারছেন, এটা তো ব্যবসা! কৌশলটাই তো আসল।

● তাদের সঙ্গে এ নিয়ে কি রকম বোঝা-পড়া হয়?—সে আমাদের নিজেদের

ব্যাপার। তার সবটা আপনাকে বলা যাবে না। তাছাড়া সব সময় তো টাকা-পয়সার নিয়মে নিজেদের মধ্যে কাজ চালানো যায় না।

আশ্চর্যের কথা হল, এত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে হলেও মা লক্ষ্মী সাজঘরের মত আরো কত সাজঘর যে গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে আছে তার ঠিক নেই। কলকাতাকে বাঁচিয়ে এরা শুধু গ্রামবাংলাতে সেবা করে যাচ্ছে। উপরে যে নামগুলির কথা বলা হল—কোম্পানী বা স্থাননাম, সবই মোটামুটি দক্ষিণ ২৪ পরগণার নানা গ্রামাঞ্চলে অভিনয়ের জন্য—কোনটা বা শহর কলকাতার শেষ সীমানার কোন গ্রাম। এই যেমন ঠাকুরপুকুরের পরবর্তী বিশাল দক্ষিণাঞ্চল।

তবে যাত্রাপালার অভিনয়ের জন্য আজ যে শুধু গ্রামই নয় শহর কলকাতাও একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, তা যারা নিয়মিত দৈনিক পত্রিকা পড়েন তা তাদের জানা আছে। রবীন্দ্রকাননে যাত্রা উৎসব এখন তো সবার কাছে এক মধুর স্মৃতি। হাতীবাগানের বাণিজ্যিক নাট্যশালায় দুপুরে মাঝে মাঝেই শো হত। বিশ্বকর্মা পুজায় তো কারখানার মধ্যেই যাত্রাভিনয় হয়—কলকাতা শহরের শেষ সীমানা এই ঠাকুরপুকুরেও তো হয়েছে একদা।

শহরে যাত্রায় মানে চীৎপুরী সংস্কৃতিতে যে জিনিষটা এখন প্রায় উঠে যেতে বসেছে, তার একটা দিক ছিল সখীর নাচ। একদা ড্রেসার-পেণ্টাররাই এইসব ড্যান্সার সরবরাহ করত। এদেরও সেই ধরনের কোন সিস্টেম আছে কি না, তার খোঁজ করলে মন্দ হত না। তাহলে গ্রামের দিকের এইসব ছোটখাটো সৌখীন যাত্রা পার্টির প্রবণতা কোনদিকে সে সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যেত।

ড্যান্সার সাপ্লাই বিষয়ে এখন তোমরা কি করো? কোথা থেকে তার যোগাড় হয় —দেখুন, সখীর নাচ এখন প্রায় উঠে যাবার দাখিল। দেখছেন তো শহুরে নামী পার্টিতে তারা রঙীন নৃত্যনাট্য সাইক্লোরামা চালু করছে। তাই পুরানো জিনিস আজ আর তত চলছে না।

তোমরা তো বেশ পুরানো কোম্পানী। ব্যবসার প্রথমদিকে তো এসব বেশ চলন ছিল—মানে তোমার বাবা ক্ষেত্রমোহনের আমলের কথা বলছি। হ্যাঁ, তখন তো ড্যান্সার-এর বেশ রমরমা। তবে তখন তো ছেলেরাই মেয়ে সাজত। তাই অল্পবয়সী ছেলে-ছোকরাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিত যাত্রা দলগুলি।

তোমাদের সে ধরণের কোন অর্ডার আসেনি কখনও—মানে পুরানো দিনে? —তাহলে তো আপনাকে যেতে হবে সেন্টুর কাছে এককালে সে ড্যান্সার ছিল, ভাল ড্যান্সার। এমনকি পালায় বাঈজী, নর্তকীর পার্ট থাকলে সেই-ই সেটা করত। হয়তো কখনও বা তার রোলে দু-চারটে সংলাপও থাকত।

আর এখন তার কোন চাহিদা নেই বুঝি?—সে তো আগেই বললাম। ড্যান্সার ব্যাপারটাই কমে এসেছে। যারা চায় তারা তো আসল মেয়ে নিয়েই কাজ চালিয়ে নেয়।

● তাহলে সেণ্টু মানে সেণ্টুরানীর কাজ কি ছিল ?—সে তো ড্যান্সার ছিলই। তবে প্রয়োজনে তাকে দিয়ে আরো ড্যান্সার সংগ্রহ করা হত। আমাদের হয়েও একাজ করেছে।

● তাদের নাচগান শেখানোর ব্যাপারটা কি করে হত ?—সে বলা খুব মুস্কিল। আমরা তো প্রধানত ড্রেস সাপ্লায়ার। তবে মনে হয় সেণ্টুরানী নিজেই শিখিয়ে পড়িয়ে নিত। আর নয়তো সব যাত্রাদলেই অধিনায়ক থাকেন তো—তিনিই এসব দেখাশোনা করেন। এ বিষয়ে তাহলে আপনাকে ঐ সেণ্টুরানীর কাছেই যেতে হবে। সে সব ভাল বলতে পারবে। গত ১০।১২ বছর ধরে ড্যান্সার সাপ্লাইয়ের কোন অর্ডারই পাই না আমরা। অবশ্য সে সব পার্টি যদি অন্য কোন স্থান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে থাকে—তো আলাদা কথা।

বিচিত্র এই ড্যান্সারদের জীবন। মনে মনে তাদের সম্বন্ধে কৌতুহল আমার কম নয়। যদি সম্ভব হয় পরবর্তীকালে না হয় এসব সেণ্টুরানীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। তবে তার আগে এদের নাট্যগ্রন্থ চর্চা সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া প্রয়োজন। যে যাত্রাপালা নিয়ে এরা ব্যবসা করে, তার সম্বন্ধে কতটা খোঁজ-খবর রাখে এরা।

● সেকালের যাত্রাপালার লেখকদের নাম তেমন মনে পড়ে—বেশ জমকালো পালাগানের বই ?—এই প্রশ্নের উত্তরে চট্ করে অম্বিক কিছু বলতে পারল না। তবে ব্রজেন দে-র নাম তার শোনা। এবং জানালো, আসলে বই-টই পড়ে তো আমরা ব্যবসা চালাই না। গল্প বুঝে—সামাজিক না পৌরাণিক না ঐতিহাসিক।

● ইদানীং যে সব রাজনৈতিক যাত্রার ধুম পড়েছে—তার জন্য বিশেষ কোন ধরণের সাজ-পোষাক বা মালমশলা ?—সে ঢেউ উঠেছিল এক সময়ে, এখন বন্ধ হয়ে গেছে। লোকে আর তত চায় না। তার জন্য গোটাকতক পুলিশি ইউনিফর্ম, নকল বন্দুক, এইসব থাকলেই চলে যেতো।

● এভাবে বই না পড়ে ড্রেস-সাপ্লাই করতে অসুবিধা হয় না ?—দেখুন সত্যি কথা হল, গ্রামের দিকে সে সব পালাই হয় যেগুলি চীৎপুরে আগে হয়ে গেছে। চীৎপুরী যাত্রার কথা তার আগে লোকের মুখে মুখে শোনা হয়ে যায় আমাদের—তাই পালার সম্বন্ধেও আইডিয়া থাকে খানিকটা।

● তাতে আইনের কোন অসুবিধা হয় না ? মানে চীৎপুর যেটা করছে—সেটা আসরে অন্য কোন পার্টি যদি করে ?—তা তো বলিনি, আগে চীৎপুর কোম্পানী সেই পালা বন্ধ করে দিয়ে নতুন পালা নামাবে। তার পরে সেই পালা ছাপা হয়ে বই হয়ে বেরুবে। তারপর তা থেকে আমরা বাছাই করে নিই। নচেৎ বড় কোম্পানীর চালু পালা নামানো তো সম্ভবই নয়। সেটা হবে ঘোর বেআইনী।

● যাদের নিয়ে কাজ করেন আপনারা, তারা নিজেরা পালাগান লিখে নিতে পারে না ?—কই, সে রকম তো চোখে পড়ে নি। আসলে সাহস করে না। চলতি চালু হিট হওয়া পালার দিকেই এঁদির নজর বেশী। যেমন ধরুন, নটী বিনোদিনী তো কত বার করেছে কত দল।

যারা এত যাত্রা করতে ভালবাসে তারা লিখতে পারে না নতুন পালা এ কখনও হয় ?—হয় না কেন, তা পারে একমাত্র যাত্রা দলের মাণ্টাররাই। তাদের তো অভিজ্ঞতা বেশী। তবে একটা কথা বলি, আজ পর্যন্ত যত পালাগানে কাজ করেছি তার মধ্যে একটা পালাগান খুব নাম করেছিল। পর পর কয়েক রাত্রি নানা জায়গায় অভিনয় হয়। সেটি কিন্তু ছাপা বই থেকে নয়, ঐতিহাসিক নাটক। লিখেছেন—দলেরই একজন অভিনেতা। তা এরকম আর কটা পার্টি'রই বা পালাকার আছে—এরা তো সব সৌখীন !

এখনও জানা হল না সব কথা। অম্বিক বললে, তাদের বাড়ীর ঠিকানায় যেতে। তার ভাগ্নের কাছে আরো সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। সে জানে আমি ব্যবসায়ী নই, তবু তার কাছ থেকে এ সব কথা শুনেছি, তাতেই সে কত সুখী আনন্দিত। এ লেখা যদি কখনও প্রকাশিত হয়, তবে তাকে যেন পড়তে দিই—এ অনুরোধ করল বার বার।

জানি না, তার ভাগ্নে হারুর কাছে গেলে আরো কত কি নতুন তথ্য পাবো। তবে গেলে যে লাভ হবে—তা নিশ্চিত। কারণ একজন ২৮।৩০ বছরের যুবকের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গেও তো পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সময় মত একদিন যেতে হবে তার কাছে—মনে মনে ভাবলাম, তবে শীতের মরশুমে নয়। কোনদিন অর্ডার পেয়ে যাত্রাপার্টি'র সঙ্গে চলে যায়। তাই খবর দিয়ে যেতে হবে।

অবশেষে সত্যিই কিন্তু একদিন চলে গেছিলাম মা লক্ষ্মী সাজঘরের বর্তমান মালিকের ঘরে—মানে অম্বিকের ভাগ্নে হারুর বাড়ীতে। বাখরাহাট রোডের ওপর তার সেলুনের ব্যবসা হলেও, ড্রেস কোম্পানীর ব্যবসা তার বাড়ীকে কেন্দ্র করেই হয়। প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের প্রয়োজন হল না, কেন না তার মামা আমার সংবাদ আগেই দিয়ে গেছিল তাকে—যে, আমি হয়তো আসতে পারি।

প্রথম শীতের ঘনায়মান অন্ধকারে, বাইরে ঈষৎ আলো থাকলেও তার ঘরে তখন উজ্জ্বল আলোয় চলছে পোষাক গোছানোর পালা—তার বৌ তাকে সাহায্য করে যাচ্ছে ব্যস্ত ভাবে : বাঁ হাতে খোলা রয়েছে তার মালের তালিকা। সেদিন ছিল তার 'অভাগীর কান্না' পালার মাল সাপ্লাইয়ের ব্যাপার। পার্টি'র দেওয়া তালিকা ধরে ধরে মাল মিলিয়ে মিলিয়ে ট্রাংকে তুলছিল ওরা দুজনে। ওরই মধ্যে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম ওর খাতার দিকে—আমার আগ্রহ দেখে হারু খাতাটা মেলে ধরল আমার সামনে। তার একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল প্রতি পৃষ্ঠায় একটি করে পালার নাম, তারিখ, স্থানের নাম এবং কত টাকার চুক্তি তা লেখা। তার নীচে পার্টি'র চাহিদা—বিশদ তালিকা। সেই তালিকা থেকে গত কয়েক মাসের তার কাজের বিবরণ যা পেলাম—

বৌ হয়েছে রঙের বিবি	কলাগেছিয়া
অভাগীর কান্না	কলাগেছিয়া

দেনা পাওনা (রবীন্দ্রনাথ)	সখেরবাজার
বশীকরণ	শকুন্তলা পার্ক
বিবাহবিভ্রাট	মাঝিপাড়া
রহস্যমহল	কদমতলা
রক্ত দিয়ে বোনের বিয়ে	শ্যাখাভাঙ্গা

ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যেই কোনমতে প্রশ্নোত্তর পর্ব সেরে নিতে হল। যেগুলির উত্তর পাওয়া গেল, সেগুলিই শুধু জানাই। তবে উপরের ঐ তালিকা আরো বিশদ নিবেদন করতে পারলে তার কর্ম পরিধি কত বিচিত্র তা বোঝানো যেত।

* কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য প্রধানতঃ কোথায় যোগাযোগ করতে হয়?—অধিকাংশ নিজেরাই সংগ্রহ করি অনুসন্ধান করে, না হলে বড়বাজারে ড্রেসার কোম্পানী আছে, সেখানে যাই।

* ঐতিহাসিক নাটকের ঝলমলে জরীর পোষাক ইত্যাদি তৈরী হয় কোথায়?—না, হাওড়ার ধুলাগড়িতে এ শিল্প চালু আছে। শুধু আমার নয়, চীৎপুরের পেশাদার কোম্পানীরাও এখান থেকেই যাবতীয় মাল সংগ্রহ করে।

* ঐতিহাসিক পালার চাহিদা তো কম বলছেন, তবে এত যত্ন করে গুছিয়ে রাখেন কেন?—এগুলি বেশী মূল্যবান, তাই যত্ন করে রাখতেই হয় যদি কোন অর্ডার পাই—সেজন্য। এর রেট বেশী, তাই পুষিয়ে যায়।

সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে আবার কখন ফেরা হবে?—যাত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো থাকতেই হবে। এসব যাত্রা সারারাত ধরে হয়। পরদিন সকাল নটা-সাড়ে নটার আগে ঘরে ফেরা হয় না। যেমন যেমন দূরে যেতে হয় তেমন তেমন দেরী হয়।

● এত যে দামী দামী শাড়ী কাপড় নিয়ে যেতে হয়—তার জন্য পার্টির কাছ থেকে কিছু 'ক্যাশ মানি' জমা রাখা হয় না?—এসব করলে আর ব্যবসা টিকবে না। তবে নিজেই তো থাকি সর্বক্ষণ, তাই ক্ষয়ক্ষতিটা কম হয়।

* এই যে পালায় দেখছি শিখ, পাঞ্জাবী খ্রীষ্টান—এদের ড্রেস কিভাবে সংগ্রহ করা হবে?—প্রয়োজনে দর্জি দিয়ে তৈরী করিয়ে নিতে হয়। এইভাবেই সংগ্রহও বেড়ে যায়।

আর যে সব প্রশ্ন তাকে তখন তড়িঘড়িতে জিগ্যেস করা হল না, তা হল: ১. এই ব্যবসায়ে কত টাকা ঢাললে একটি পরিবারের পুরো ভরণপোষণ হয়?, ২. এই ব্যবসার দু'একটি সমস্যার কথা। ৩. তার পুত্রকে সে এই ব্যবসায় লাগাবে কি? ৪. তার নিজের কেমন লাগে এই ব্যবসা চালাতে? ৫. এইসব ছোট ছোট ড্রেস কোম্পানী আর কতদিন বেঁচে থাকবে? ৬ কোন নিজস্ব ঠাকুর দেবতা আছে কি না বা বিধি নিষেধ?

এখন হারুর হাতে সময় অল্প। ঘরের চারিদিকে জিনিষপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে—অল্প সময়ের মধ্যেই রওনা হতে হবে। তাই পরে পুনরায় আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিন স্থান ত্যাগ করলাম।

'সারভাইভ্যাল অব দ্য ফিটেস্ট'—
কথাগুলি কবে কোনকালে যিনিই বলে থাকুন না কেন,
বাংলার লোকশিল্পের একটি
বিশেষ প্রকরণ সম্বন্ধে খুবই সত্য কথা।
টেরাকোটা শব্দের অর্থ পোড়ামাটি।
এর তাৎপর্য, বিস্তার, শ্রেণী, সৌন্দর্য, প্রয়োজনীয়তা—
ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা হয়েছে এতদিন ধরে বিস্তর।
এমনকি বিদেশী বিশেষজ্ঞের মতামতও জানতে বাকী নেই।
এই মৃত্তিকা-প্রধান দেশে মাটিকে
কেন্দ্র করেই যে নানা প্রকার শিল্প-সৌন্দর্য
সৃষ্টি হবে এ আর বিচিত্র কি!
কিন্তু একদা মাটির সঙ্গে সমান্তরালে
চলবার চেষ্টা করেছিল এক
জাতীয় পাথর—শিল্প বস্তু নির্মাণের জন্য।

লোকশিল্প-২

তাও আবার নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য নয়,
দেবগৃহ নির্মাণ ও অলংকরণের জন্য।
এ বঙ্গে প্রস্তর-নির্মিত দেবগৃহ এত বেশি নেই।
ভৌগোলিক বা দুর্লভতার কারণেই তা হয়তো সেদিন সফল হয়ে ওঠেনি।
তবে মন্দির গাত্রের কারুকর্মে পোড়ামাটির খ্যাতি
এত বেশি যে পাথরে অলংকরণ
বিষয়টি বড়ই কৌতুহলের মনে হয়।
অথচ পোড়ামাটি ও পাথর—
এই দুই মাধ্যমেই যে এক বিশেষ শিল্পীর দ্বারা একদা মন্দির-গাত্র
অলংকৃত হয়েছিল—
তা আজও অস্তিত্ব বজায় রেখে আছে।
কালের আক্রমণে টেরাকোটা
নকসা হয়তো নষ্ট হয়ে যায় দ্রুত,
কিন্তু পাথরের টেরাকোটা বেঁচে থাকে আরো বেশিদিন।

ফুল পাথরের উৎস-সন্ধানে

আমার হাতের বইটা দেখবার জন্যই বোধহয় সুজন সামনে এল।

আসলে 'বীরভূমের পুরাকীর্তি' বইটাকে গাইডের মত হাতে রেখে অনেকক্ষণ ধরে গণপুরের টেরাকোটা মন্দিরগুলোর চত্বরে বসেছিলাম! সুজন ও তার বন্ধু ঐখানেই কোন এক স্থানে বসে নিভৃত আলাপ করছিল—তখন সকাল দশটা হবে।

এ গ্রামে এত বেশী মন্দির গুচ্ছ (Complex) আছে যে, স্থানীয় ছেলেদের নিভৃত আড্ডার জন্য এগুলি বেশ প্রিয় স্থান। আমি নিতান্তই বাইরের লোক হয়ে তাদের গ্রামে এসে মন্দির দর্শন করছি—এটা স্থানীয় যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করারই কথা। তাই সে বন্ধু আড্ডা ছেড়ে কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে চলে এসেছে।

'এ বইয়ে এই গ্রামের সব ছবি আছে?' আমার প্রতি সুজনের প্রথম প্রশ্ন এটা। অবশ্য মুখটা তখন তার আমার-হাতে-ধরা বইটার দিকেই নিবদ্ধ।

'না কয়েকটা।' পৃষ্ঠা উল্টে দেখালাম তাকেঃ 'এই হল দোলমঞ্চ মন্দির। ফোটোয় তার পুরো চিত্র আছে। ঐ কোণার মন্দিরটা আগে কোন কোন জায়গায় ভাঙ্গন ছিল। পিছনে একটা তালগাছ ছিল—'

ছবির সঙ্গে আজকের চিত্রটা মিলিয়ে নিয়ে সুজন দেখেঃ 'হ্যাঁ' তালগাছটা একবার বাজ পড়ে পুড়ে গেছিল। তার দু' বছর পরে উপড়ে যায়। আর ঐ মন্দিরটা তো বছর পাঁচেক আগে সারানো হয়েছে।' বলতে বলতে আমার দিকে তাকায়ঃ 'এগুলি সব আমাদের প্রপার্টি।'

সুজন জানে না যে এগুলি এখন ব্যক্তিবিশেষের প্রপার্টি নয়, জাতীয় সম্পদ। তারা এর দেখাশুনা করার অধিকারী মাত্র। তবু সে আমার একটা উপকার করেছিল। আপন বন্ধুকে ত্যাগ করে মন্দিরময় এই গণপুর গ্রামের অন্যান্য মন্দিরগুলো দেখাবার দায়িত্ব নিয়েছিল। এতক্ষণ যে কাজ আমি একা একা অস্বস্তির সঙ্গে করছিলাম, সুজনের সহায়তায় তা বেশ স্বচ্ছন্দে হতে পারল।

আসলে এই গ্রাম যে সত্যিই মন্দিরময়, তা জেনেছি বহুকাল আগে—ঐ বইটা হাতে আসারও আগে। এ গ্রামে আগে একাধিকবার এসেছি। তবু ও বিশেষ কটি কারণে পুনরায় আসতে হল—শুধু 'ফুল পাথরের' রহস্য জানার জন্যই। তাছাড়া রামপুরহাট-নলহাটি বাস রাস্তার গায়েই এই গ্রামটাতে এসে পৌঁছানোও তো বেশ সহজ। গণপুরের আশেপাশে পর্যটকের মন ভরানোর মত আছে অনেক কিছুই, যদিও সঠিকভাবে এটি কোন পর্যটন স্থান নয়—আমার কিন্তু ঐ মন্দিরগুলো দেখতে ও তাদের কারুকর্ম বিশ্লেষণ করতে ভালই লাগে।

'তাহলে, এগুলিই ফুল পাথরের টেরাকোটা?'

সুজন আমাকে গ্রামের আর একটি পাড়ায় একগুচ্ছ মন্দিরের সামনে দাঁড় করালো এবারে।

এবারে আমার অবাক হবার পালা। এতক্ষণ ধরে যে সব মন্দির দেখছিলাম, তার কারুকার্য ছিল পোড়ামাটির টালির। কিন্তু এখন যে মন্দিরগুচ্ছের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তার গঠন পোড়ামাটির ইঁটের হলেও কারুকার্যগুলি মনে হল এক প্রকার পাথরের।

এ পাথরের নাম জানা ছিল, কিন্তু স্থানীয় এবং এই প্রজন্মের যুবক কী বলে এ সম্বন্ধে—তাই এবার অনুসন্ধান করা হবে।

'আসলে আমার ঠিক জানা নেই, এই পাথর সম্বন্ধে। দাঁড়ান, তবে আপনাকে নিয়ে যাই দাদুর কাছে।' সুজন যখন এই কথাগুলি বলছিল, আমি তখন এই 'পাথুরে টেরাকোটা' পরীক্ষা করছিলাম। তাছাড়া 'ফুলপাথর' শব্দটা আমিই ওর মাথায় ঢুকিয়েছি, ওর জানা ছিল না।

হঠাৎ দেখলে বুঝতেই পারা যায় না যে গণপুরের এই বিশেষ মন্দিরগুচ্ছটি পাথরের খোদাই কর্মে সজ্জিত। অবিকল পোড়ামাটির রং। সমগ্র মন্দিরটি অন্যান্য মন্দিরের মতই চেহারা। শুধু নকসাকাটা অংশগুলির বৈশিষ্ট্য হল অন্য রকম। অন্য রকম? হ্যাঁ—সেগুলি হল:

পোড়ামাটির নকসায় যেমন কালের প্রভাবে ক্ষয় কাজ হয়, কিছুটা ঝরে যায়, ভেঙ্গে যায়, বিকৃত হয়ে যায় এই পাথুরে টেরাকোটায় তেমন ধরণের বিকৃতি দেখা যায় না। এগুলি দেখে মনে হল যেন সবেমাত্র তৈরী করে মন্দিরের দেয়ালে লাগানো হয়েছে। তবে জীর্ণ মন্দির বলে এমন তাজা-টাটকা নকসা-টালি দেখে মনে সন্দেহ হতেই পারে। আর উল্লেখযোগ্য হল, পোড়ামাটি ও পাথুরে টেরাকোটা—উভয়ের ক্ষেত্রেই নক্সার বিষয়বস্তু কিন্তু একই। তাই হঠাৎ দেখলে কোন পার্থক্যই দেখা যাবে না। এবং এই কারণেই মনে ধন্দ হতে পারে যে এই নক্সাগুলি বুঝি সব কটি মন্দিরের দেয়ালে লাগানো আছে।

এই মন্দিরগুলি সম্বন্ধে প্রাগুক্ত গ্রন্থে যা উল্লিখিত হয়েছে তা এখানে সামান্য উদ্ধৃত করি—তবে মনে রাখতে হবে ঐ গ্রন্থের তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল ১৯৭২ সালের পূর্বে। তবু তার অনেক অংশই এখনও তাৎপর্যপূর্ণ আছে। যেমন:

'উপরোক্ত মন্দির সংস্থান হইতে কিছুদূরে শ্রীমহাদেব ভট্টাচার্যের গৃহের সম্মুখে ৫টি চার চালা রীতির মন্দিরের অবস্থিতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরগুলি কোন সময় নির্মিত হয়েছিল তাহার উল্লেখ নেই। ফুলপাথরের ফলকে সজ্জিত এখানের খিলানের উপর উৎকীর্ণ দৃশ্যাবলীর শিল্পশৈলী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে' (পৃ. ৩০) এবং অন্যত্র: 'গ্রামের উত্তর দিকে শ্রীজয়কৃষ্ণ মণ্ডলের গৃহসংলগ্ন জীর্ণ এবং পরিত্যক্ত এক আটচালা বিষ্ণু মন্দির দর্শনীয়।...আয়তনে অন্য মন্দিরগুলির অপেক্ষা বৃহৎ এই মন্দিরগাত্রে ফুলপাথরের ফলকে রাম-রাবণের যুদ্ধ, মহিষাসুরমর্দিনী, গোপিনীসহ কৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রবেশপথের খিলানের উপর উৎকীর্ণ।' (পৃ. ৩১)

'টেরাকোটা' শব্দটির অর্থ আজ অতি সরলীকরণ হয়ে আমাদের কাছে এক ঘরোয়া শব্দে পরিণত হয়েছে। এই সুপ্রাচীন লোকশিল্পটি যে মহেঞ্জোদারোর যুগেও প্রচলিত ছিল—তা ইতিহাসে নথিবদ্ধ হয়েছে। নিত্যকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাইরে নানাবিধ শিল্পমণ্ডিত নিতান্ত নান্দনিক স্তরের পোড়ামাটির কাজও যে সে যুগে প্রচলিত ছিল—সে সব তথ্য আজ যথেষ্ট আলোচিত হচ্ছে।

বঙ্গসংস্কৃতির চর্চায় মন্দির-স্থাপত্য ও অলংকরণ নিয়ে গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর ধরে যত আলোচনা হয়েছে, তার সিংহভাগ এই বিশিষ্ট শিল্প-প্রকরণটির অভিনবত্ব ও সৌন্দর্য নিয়ে ব্যয়িত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই, বৃটিশ যুগের সেই কবে শেষ হয়েছে, তবু এই বিশেষ শিল্পটির বিষয়েও যে এক বিদেশী গবেষক ডেভিড ম্যাকাচ্চন সবার সামনে নতুন করে তুলে এনেছেন—তাতে প্রমাণ হয়, আমাদের জাতীয় সম্পদ সম্বন্ধে আমরা এখনও তত সতর্ক নই।

অথচ বঙ্গ-ইতিহাসের যে যুগে এই বিশেষ শিল্প তার চরম শিখরে আরোহণ করেছিল, তার সন-তারিখ মোটামুটি ভাবে জানা গেলেও, সেই শিল্প-পদ্ধতি সম্বন্ধে আজ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। শিল্পী ও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এ বিষয়ে এখনও প্রায় অন্ধকারে। নিতান্ত কুমোরের চাকে যে এগুলি নির্মিত হত না, তা সবাই জানেন, কিন্তু তাদের এই বিশেষ ধরণের শিল্পমণ্ডিত টেরাকোটা বস্তু নির্মাণের কি পদ্ধতি ছিল—তা এক প্রকার অজানাই রয়ে গেছে।

শিল্পীদের জনসমাজ সংবন্ধে যে তথ্য প্রচলিত আছে, তা থেকে বোঝা যায়, তারা ছিলেন প্রকৃত শিল্পী। কেননা মাটি, কাঠ, পাথর ও মৃত্তিকা—এই চার প্রকার কাঁচামালের মাধ্যমেই তারা কাজ করতে পারতেম।

এ বিষয়ে বিশেষ তথ্য সরবরাহ করে এদেশের অসংখ্য দেবমন্দিরগুলি। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ সাঁতরা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মন্দির গাত্রের লিপি দেখে শিল্পীদের ঠিকানা, সংক্ষিপ্ত সমাজ পরিচয়, জাতি-গোত্র এবং সময়কাল—এসব তথ্য খুঁজতে সুরু করেছেন তাঁদের রচিত নানা গ্রন্থে। কিন্তু সেই বিশিষ্ট মন্দির-গাত্র-অলংকরণ শিল্প কিভাবে অবলুপ্ত হয়ে গেল—এ সম্বন্ধে তারা কোন হদিশ বের করতে পারেন নি। বিষয়টি একমাত্র তুলনীয় হতে পারে মুসলমান সংস্কৃতির প্রসারের যুগে গৃহনির্মাণ পদ্ধতিতে 'খিলান' নির্মাণের সঙ্গে। সেতু, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণে এর বিস্ময়কর ভূমিকা সবাই জানলেও সে শিল্পও আজ প্রায় লুপ্ত।

কিন্তু এরই সঙ্গে সমকালে পা মিলিয়ে যে শিল্পীরা সেদিন এক বিশেষ ধরণের পাথরকে মন্দির-অলংকরণের কাজে ব্যবহার করেছিল, আজ তাদের সেই শিল্প-নৈপুণ্যকে তারিফ করতেই হয়। গবেষকরা যে এখনও এই ব্যতিক্রমী শিল্প নিয়ে কেন ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করেননি—সেটাই আশ্চর্য! এই দেশের আর কোথায় কোথায় এ হেন বিচিত্র শিল্পকর্ম প্রচলিত হয়েছিল, তার কথাও জানা যাবে তাহলে। এই কৃত্রিম টেরাকোটা কি আজ বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব?

সেই বিখ্যাত গোবিন্দদাদু মন্দিরের নিকটবর্তী একটি মাটির বাড়ীর দাওয়ায় বসে আমাদের দেখছিলেন। এখন আমরা গ্রামের বেশ ভিতরে চলে এসেছি। সুজন ছাড়াও আরো দু'চারজন এসে বসে কাছে। তাদের গ্রামে বাইরের একজন লোক এসে তথ্যানুসন্ধান করছে—এটাই তাদের কাছে খুব কৌতূহলের।

গোবিন্দদাদুর বয়স ৬০।৬৫ বলে মনে হল। আমায় পরিচয় দেবার পর যখন তিনি তার পাশে চটের আসনে আমাকে বসতে বললেন, তখন মনে হল এটাই ঠিক। তথ্য সংগ্রহের জন্য যত তাঁদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারব, ততই কাজের সুবিধা হবে।

কিন্তু সব ছেড়ে এই গণপুরের মন্দির নিয়েই বা পড়লেন কেন আপনি? 'আমাকে প্রথম প্রশ্ন সেই গোবিন্দদাদুর'।

'দেখুন, এর অনেক কারণ আছে। বীরভূম জেলার প্রাণকেন্দ্রে সিউড়ি থেকে এতদূরে একটা গ্রামের অন্দরে এতগুলি মন্দিরের অবস্থান—এটাই বেশ কৌতূহলকর। তারপর মন্দিরগুলি সবই প্রায় শিব মন্দির, তার মধ্যে আবার একগুচ্ছ দোলমঞ্চ নামে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য অন্য মতের যারা—যদিও গ্রামবাসীর তাতে কোন চিন্তাই নেই।' আরো কিছু বলতাম আমি, কোন একজন গ্রামবাসী বললেন ঃ

'এ নিয়ে আমাদের কোন চিন্তা নেই। শিবঠাকুর যেমন আমাদের দেবতা তেমনি দোলমঞ্চেরও প্রয়োজন আছে বৈকি?' সেই লোকটি বললেন ঃ 'আসলে একই গ্রামে এসব থাকায় আমাদেরও কত সুবিধা হয়।'

'অবশ্য এসব তো আপনাদের সময়কার ব্যাপার নয়'—ওদের সমর্থন করে বলি আমি ঃ 'কে কবে কোন যুগে কি মনে করে তৈরী করেছিল, তা তো আজ আর জানা যায় না'।

'তাহলে ঐ পাথুরে টেরাকোটা না কি যেন বলছিলেন আপনি'—এবারে মূল প্রশ্নে আসেন গোবিন্দদাদু ঃ 'এসব কি অন্য কোথাও দেখেন নি আগে?'

'দেখি নি বলেই তো এই গ্রামে তিন তিনবার এলাম গত দশ বছরে।'

'কি জানতে বলুন তো?' এতক্ষণ পরে সেই সুজন প্রশ্ন করে। সে বোধহয় মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করে, তখন তার বয়স কত ছিল এবং আমিই বা কতদিন ধরে এভাবে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেড়াচ্ছি।

'তাহলে প্রশ্ন করি ঃ কোন জমিদারের আমলে এসব স্থাপত্য কর্ম হয়েছিল। দ্বিতীয়, যে সব শিল্পী এই অপরূপ পাথুরে টেরাকোটা তৈরী করেছিল, তারা আজ কোথায়। তৃতীয়, এখনও এই সব কাজ হয়ে চলেছে কি না। চতুর্থ, তখন যারা একাজ করছিলেন, তাদের কোন বংশধর আজও বেঁচে আছেন কি না। পঞ্চম, এই বিচিত্র কারুকার্যের কাঁচামাল আসত কোথা থেকে। ষষ্ঠ, সেই অঞ্চলে এখন তবে কি কাজ হচ্ছে। সপ্তম, এই ধরণের বিচিত্র পাথুরে টেরাকোটা, আশেপাশে কোন গ্রামে বা মন্দিরে দেখা যায়। অষ্টম, ঐ বিচিত্র পাথর দিয়ে মন্দিরগাত্রের অলংকরণ ছাড়া আর কি কি তৈরী হত। নবম, সেকালের ঐসব শিল্পীরা মন্দিরের নকসা-টালি কারছিল, কেন—পোড়ামাটি ছেড়ে। দশম এবং শেষ প্রশ্ন, কেন এই বিচিত্র শিল্পকর্ম

লুপ্ত হয়ে গেল।' একটানা কথাগুলি বলে ফেললাম।

বলাবাহুল্য যে প্রশ্নপত্রটি বেশ দীর্ঘ।

উপস্থিত জনগণের মধ্যে কুড়ি-বাইশ-পঁচিশ বয়সীদের সংখ্যাই বেশী। ইতিমধ্যে সুজন কোথায় যেন চলে গেছিল খেয়াল করিনি। তারপরে যখন ফিরে এল, তখন তার সঙ্গে আরো কিছু অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তি। আর সেই সময়েই দেখা হয়ে গেল বাসুদেবের সঙ্গে। অনেকদিন পরে দেখা হলেও চিনতে পারল ঠিকই।

রীতিমত অনুযোগ ভরা কণ্ঠে বলল: 'আপনি আমাদের গ্রামে আছেন অথচ আমার সঙ্গেই এতক্ষণ দেখা করেন নি?'

আমি বললাম: 'আসলে তথ্য সংগ্রহের জন্য তো সবাইয়ের সাহায্যই নিতে হয়। তাই এইখানেই বসে বসে প্রাথমিক কাজগুলি করে নিচ্ছিলাম।' বলতে বলতে লক্ষ্য করলাম, সমবেত জনতার মধ্যে একটা অন্য ধরণের চাঞ্চল্য দেখা দিল। এই গ্রামে অন্ততঃ একজন ব্যক্তির কাছেও যে আমি পূর্ব হতে পরিচিত—তা তাদের কাছে বেশ মজার মনে হল। 'আমি তার কাছে এতক্ষণ না গিয়ে কেন এত স্বাধীন ভাবে ঘুরছিলাম গ্রামের মধ্যে'—এটাই বোধহয় তাদের কৌতূহল।

বাসুদেব চলে গেছে নিজের বাড়ী। সম্ভবতঃ আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করার জন্য ব্যবস্থা নিতে। এটা ঠিকই প্ল্যান করেছিলাম যে, নিজের ক্ষমতায় যতটা পারি গ্রাম পরিদর্শন করে তারপরে তার গৃহে উপস্থিত হয়ে তাকে বলতে দেব। কিন্তু সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হল না।

গোবিন্দদাদু কিন্তু আমার প্রশ্নপত্র পেয়ে তালিকার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। এই শিল্প বর্তমানে একেবারেই লুপ্ত এবং অতীতের কোন পরিবার বা তাদের বংশধর আর বেঁচে নেই। এ গ্রামে যদি কোন শতাধিক বছরের লোকের সঙ্গেও দেখা করা যায়—তাহলে তিনিও এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না।

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ সব তথ্য পেতে পেতে মনে হল, তাহলে এই অপূর্ব শিল্পকর্ম সম্বন্ধে আজকের মানুষ কিছুই জানতে পারবে না?

গোবিন্দদাদু জানালেন যে, দূরে, ২।৩ মাইল দূরে কাপাস ডাঙ্গা গ্রামে এই পাথর আজও পাওয়া যায়। এগুলি মাটির ওপরে নয়, ভিতরে থাকে। খুঁড়ে বের করে আনতে হয়। এর প্রধান গুণ হল, মাটির মধ্যে তা থাকে বেশ নরম অবস্থায়। তারপর যতই সেটা বাইরের তাপ ইত্যাদির সংস্পর্শে আসে, ততই তা কঠিন হতে সুরু করে। তারপরে যদি তা বারো ঘণ্টা জলে ডুবিয়ে রাখা হয়—তখন লোহার মত হয়ে যায়।

এই বৈচিত্র্যের কথা জানতে গিয়ে মনে পড়ল এই জেলার কিছু প্রাচীন ইতিহাসের কথা। গৌরীহর মিত্র একদা লিখেছিলেন 'বীরভূমের ইতিহাস'। সে গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (১৩৪৫.) পড়েছিলাম এক বিচিত্র 'বীচ' পাথরের কথা:

'পরগণা মল্লারপুর—ইহার প্রায় ⅘ অংশ অর্থাৎ প্রায় সমগ্র পশ্চিমাংশ লোহার

বীচ পাথরে আবৃত। তদুপরি জঙ্গল।···ইহার মধ্যে কর্দমের ভাগ অধিক। এই অঞ্চলে ভাল লৌহ নিষ্কাশিত হয়।'

আলোচ্য অংশটি এই মল্লারপুর অঞ্চলের অন্তর্গত। এবং বীরভূমের মৌরেশ্বরের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ 'ইহার মধ্যে ⅓ অংশ জঙ্গল ও পাহাড়ময়। এই অঞ্চলের জমি অনুর্বর এবং প্রান্তর ও কংকরময় ও জঙ্গলাবৃত। এখানে লৌহ নিষ্কাশিত হতে পারে. এরূপ বীচ পাথর (Iron Ores) বহু পরিমাণে আছে।···অনেকদিন পূর্বে ইংরেজ ব্যবসায়ী উক্ত বীচ পাথর হইতে লৌহ নিষ্কাশন জন্য ডেউচা গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে ১ মাইল দূরে দ্বারকা নদীর তীরে পাথর চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে···'

বীরভূমের আজকের মানচিত্রের সঙ্গে আলোচ্য বিবরণটি ও অঞ্চলটি বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ। বর্তমানে বা অনতি অতীতে তা ফুলপাথর নামে পরিচিত হলেও সুদূর অতীতে তা'হলে বীচ পাথর নামে পরিচিতি ছিল—এ কথা বিশ্বাস করা যায়। মন্দিরের গায়ে তার যে বর্ণ দেখা গেছে. তা থেকে সহজেই বোঝা যায়, এগুলি প্রচুর পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত। তাই প্রাচীনকালে এখানেও যথার্থই লৌহ নিষ্কাশন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল—তারই একটা হয়তো রূপ পেয়েছিল এইসব মন্দির শিল্পে।

কথায় কথায় জানা গেল, কাপাসডাঙ্গা অঞ্চলের বর্তমান পরিবেশ আজও বেশ মনোরম—যে কোন পর্যটকের তা মনোহরণ করতে পারে। সেখানকার পাথর আজও সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আছে। যে পদ্ধতিতে এই শিল্পকর্ম করা হয়, তা আজ আর অনুসৃত হয় না—কেন না এত পরিশ্রম আজ আর কেউ করতে চায় না।

'তার চেয়েও বড় কথা, পাথুরে টেরাকোটা করে হবে কী ?' প্রশ্ন করল কে একজন।

বাস্তবিকই, সেযুগ সেকাল সে মন চলে গেছে। আজ তাই ঐ সব পাথর দিয়ে ঘর-সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু তৈরী হচ্ছে কিছু কিছু। বিস্ময়কর বিষয় হল, ঐ গ্রামের ঐ স্থানে নিকটবর্তী একটি গৃহের সিঁড়ি হয়েছে ঐ পাথর দিয়েই—তা-ও একজন গ্রামবাসী দেখিয়ে দিলেন।

ছিল দেবগৃহের গাত্রে সবার সম্মানের পাত্র হয়ে, আজ তা রয়েছে সবার পায়ের নীচে! বিধাতার কী বিচিত্র নিয়ম।

এ সম্বন্ধে আরো তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম, তারও কিছু কিছু বললাম ওদের। বিশেষ করে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেই গ্রন্থটির সেই বিশেষ অধ্যায়টির কথা, যেখানে গণপুরের মন্দিরের সম্বন্ধে তিনি এই বিচিত্র ফুলপাথরের হদিশ দিয়েছিলেন। তিনি এই নামকরণ কোথা থেকে পেয়েছিলেন, তা অবশ্য জানান নি। তার গ্রন্থটির প্রকাশকাল হল ১৩৮৬ সাল, সুতরাং তাঁর দেওয়া তথ্য তারও পূর্বে সংগৃহীত।

সেই গ্রন্থে তিনি পোড়ামাটির টেরাকোটা ও ফুলপাথরের টেরাকোটা—এ দুয়ের এক বিচিত্র তুলনামূলক আলোচনা করে, বীরভূম ও সন্নিহিত কোন কোন অঞ্চলে এ জাতীয় বিচিত্র শিল্প একদা প্রচলিত হয়েছিল, তার বিবরণ দিয়েছেন। তার সেই সংক্ষিপ্ত—মাত্র দু পৃষ্ঠার ঘনবদ্ধ আলোচনার কিছু উদ্ধৃতি দিই ঃ

'আসল টেরাকোটায় চিরাচরিতভাবে লংকাযুদ্ধ, রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী, কৃষ্ণলীলার অজস্র চিত্রকল্প, দশাবতার পৌরাণিক উপাখ্যান, সামাজিক দৃশ্য ও ফুলকারি নকসায় যেমন ইলাহী ব্যবহার হয়েছে; এখানে ততটা হয়নি। তবে এক্ষেত্রে শিল্পীরা একটি বিশেষ সুবিধা উপভোগ করতে পেরেছেন। টালিগুলিকে ভাঁটিতে পোড়াতে হয়নি বলে, ছোট-বড় যে রকম খুশি আকারে তাদের তৈরী করা গেছে।'

শুধু দেয়ালের গাত্রসজ্জা নয় মন্দিরগুলি পর্যবেক্ষণ করার সময়েও দেখেছি, থাম বা স্তম্ভ নির্মাণেও এই পাথরের উপযোগিতা রয়েছে—এমন কি তার গায়েও যথেষ্ট কারুকার্য আছে। থামগুলি একটি পাথর কেটেই তৈরী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড জোড়া দিয়ে নয়।

আসলে পাথর জাতীয় শক্ত বস্তু বলে, তা টিকে আছে বহুদিন ধরে—এ বিষয়ে পোড়ামাটিকে হারিয়ে দিয়েছে এই ফুলপাথর। নিকটবর্তী মল্লুটির এবং এইসব মন্দির—এগুলির কোনটিই দুশ বছরের কম বয়সী নয়।

এখন বেশ বেলা হয়েছে—দুপুরের কাছাকাছি। যদি বাসুদেবের সঙ্গে দেখা না হত, তবে হয়তো ফিরতি পথের বাস ধরে চলে যেতে পাওতাম। কিন্তু সে প্রোগ্রাম আর করা যাবে না।

ধীরে ধীরে গ্রামের মানুষের ভীড় পাতলা হয়ে আসে। আমার হাতের বইটা এগন সবার হাতে হাতে ঘুরছে—শেষ পর্যন্ত ফিরে পেলে হয়! সুজন এখন দূর থেকে আমাকে দেখছে একটু অন্য দৃষ্টি এখন তার চোখে। ওর কথা মনে থাকবে।

তার চোখে কোনদিনও এই প্রতিবেদন পড়বে কিনা জানি না, তবে তার শেষ অনুরোধ যে আমি রাখতে পেরেছি—এটাই আমার তৃপ্তি।

এখন আমার একমাত্র কাজ হল বাসুদেবকে নির্ভর করা। নিকটবর্তী কাপাস-ডাঙ্গার অরণ্য খুঁজে বের করা এবং আজও সেখানে এ জাতীয় ফুলপাথর পাওয়া যায় কিনা, তার নমুনা সমীক্ষা করা! পরে সম্ভব হলে নিজের হাতে নরুণ দিয়ে—

ভাবতে ভাবতেই দেখি বহুদূর থেকে বাসুদেবের মত কে যেন একজন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। □

'কিম্বদন্তী'—
শব্দটি উচ্চারিত হলেই,
মনে জাগে এক অপার পুলক।
কবে কোন কালে কে এর স্রষ্টা, কে এর লালয়িতা
আর—কেই বা এর ভোক্তা।
সৃষ্টি করে এক বা একাধিক ব্যক্তি—হয়তো
তা' একদিন ইতিহাসসম্মত ছিল। তাদেরই জীবনের
টানা-পোড়েনে জন্ম নিয়েছিল সেদিন কিছু ঘটনা ও কাহিনী।
তারপর একদিন সব ফুরিয়ে গেল—
মহাকালের অদৃশ্য রথের স্তূপাকার ধূলিতে
সব গেল ঢাকা পড়ে অনন্তকালের মত।
বিস্মৃত হল অতীত,
জেগে উঠল তারই মধ্য থেকে এক নতুন বর্তমান।
বর্তমান-এর পরিচর্য্যায় বেঁচে উঠল সেই ইতিহাস নতুন রূপে।

লোকসাহিত্য-১

'বর্তমান'-এর মানুষ
তাদের মানসিক তৃপ্তির জন্য,
কল্পনার সমৃদ্ধির জন্য
তাকে 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে সাজিয়ে তুলল।
ধীরে ধীরে সে হয়ে উঠল আরো রমণীয় গ্রহণীয়।
তারপর একদিন জেগে উঠল নতুন রূপে—
ততদিন 'ইতিহাস' অনেক পরিবর্তিত
হয়ে গেছে 'বর্তমান'-এর মানুষদের প্রলেপে।
এদিকে মহাকালের গর্ভে জেগে ওঠে আগত ভবিষ্যৎ।
সে দায়িত্ব নেয় সেই অতীতকে ভবিষ্য-
প্রজন্মের জন্য নবধ্যানে
নবরূপে তুলে ধরতে—তার পরিচর্য্যায়।
মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তখন সেই নবীন—'কিম্বদন্তী'।
লোকসাহিত্য সমৃদ্ধ হয় আর এক নতুন প্রকরণে।

বাণরাজা-ঊষা-অনিরুদ্ধ

পিচ ঢালা বড় রাস্তাটা অনেকক্ষণ পিছনে ফেলে এসেছি।

পথের দূরত্ব কমছে না—মরীচিকার মত আর এক আঁকা-বাঁকা পিচ পথ ধরে মার্চের শেষ সপ্তাহে খালি মাথায় গঙ্গারামপুরের গ্রামপথে হেঁটে চলেছি কিম্বদন্তীর সন্ধানে। সকলেই বলেছে, ঐ তো সামনেই। মনের রসদ শুধু সেইটাই।

বালুরঘাটে এ সময়ে ততটা গরম পড়েনি তখনও—তবে আশে-পাশের তপন-গঙ্গারামপুর-হিলি অঞ্চলেও সেই রকম আবহাওয়া। তাই সাহস করে মার্চের রোদ মাথায় নিয়ে এভাবে গ্রামের পথে ঘুরতে বেরিয়েছি। বেরিয়েছি বাণরাজার গড়ের সন্ধানে। গল্প তো তার সবাই জানে—লেখা আছে সবিস্তারে ছোট-বড় সব টুরিস্ট গাইড বইয়ে।

তবে হাঁটতে হাঁটতে এটুকু বুঝলাম,—এই প্রসিদ্ধ পুরাবস্তু দেখতে আসার, পথ তেমন সুগম নয়। 'পুনর্ভবা নদীর তীরে বাণরাজার গড়ের ধ্বংসস্তূপ'—সেটা প্রচলিত কথা মাত্র। নদী আর স্তূপ—দুটি খুঁজে বের করা বেশ কষ্টসাধ্য।

সেই আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য পিচ-পথ এক সময়ে শেষ হয়ে গেল—ধানক্ষেতের আলের সামনে। দূরে দেখা যাচ্ছে এক ঢিবি মত। হয়তো ওটাই তাহলে সেই অসুররাজ বাণ রাজার গড়। আগে যতজন পথচারীকে এ পথের হদিশ জিগ্যেস করেছি, তাদের মধ্যে বোধহয় একজন বলেছিল "বাহান্ন রাজার গড়"। অনুসন্ধিৎসু মনে তখনই সন্দেহের দোলা সুরু হয়—এ তাহলে কোন্ কিম্বদন্তীর ইঙ্গিত?

'বাহান্ন রাজা' লোকমুখে অপভ্রংশ হতেই পারে 'বাণরাজা'। কিন্তু শব্দ দুটিতে যে অসীম পার্থক্য। এক রাজার গড় থেকে বাহান্ন রাজার গড়—এ ধন্দে মন বেসামাল হয়ে উঠল। কাকে জিগ্যেস করি এই রুক্ষ প্রান্তরে—জন-মনিষ্যি নেই কোথাও। এক রাজার গড় খুঁজতেই যখন এত মেহনৎ, তাহলে বাহান্ন রাজার গড় খুঁজে বের করা কি সম্ভব হবে এই কয়েক ঘণ্টায়?

অনেক চাষ জমি, মজা খাল, শুকনো বৃক্ষ পেরিয়ে এসে হাজির হলাম এক ঢিবির পাদদেশে। তাকেই তো বহুদূর থেকে দেখে দেখে নিশানা করে এতদূর এলাম মনে দৃঢ় বিশ্বাস—এই ঢিবির কাছে দাঁড়ালেই হয়তো—

কিন্তু কোথায় কী?

উঁচু ঢিবির এক প্রান্তে একটি পাকা বাড়ী—স্থানীয় ইস্কুল। সামনে একটা মজে যাওয়া প্রায়-বৃত্তাকার খাল, তাতে স্থানীয় গ্রামবাসীরা মহানন্দে ছাঁকনি জাল দিয়ে মাছ ধরছে। তার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে সেই অনুচ্চ ঢিবি—তার নীচে কী

আছে জানি না। তবে উপরে আছে রুক্ষ শূন্য পাথুরে মাটি—আর এক পাশে একটি বৃক্ষ।

ইস্কুল বাড়ীর সামনে একটা জারুল গাছ—তাতে তখনও ফুল আসেনি, সবে মাত্র কুঁড়ির দেখা দিয়েছে। আজ ইস্কুল কোন কারণে বন্ধ। তবু আইসক্রীমওয়ালা এসে বসে আছে তার নীচে—ইস্কুলের প্রাচীর দেওয়া গেটের বাইরে। পরিবেশটা মন্দ নয়। সময় কাটানোর জন্য একটা আইসক্রীম খাওয়া গেল—উদ্দেশ্য হল, ঐ অবসরে তার কাছ থেকে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া। শাস্ত্রানুসারে, এরাই তো কথা-কিম্বদন্তীর পরিযায়ী মাধ্যম।

অবশ্য, কাজ হল তাতে।

আমার আগ্রহ আর তার হাতে অঢেল সময়। সধ মিলিয়ে এই স্থান সম্বন্ধে অনেক গল্প বলল। জানতে পারলাম তার থেকে—

সামনের এই মজে যাওয়া প্রায়-বৃত্তাকার খালটাই হল গড়বাড়ীর পরিখা। বহু জায়গায় মাটি জেগে ডাঙ্গা হয়ে গেছে এবং আদতে এটা ছিল গড়বাড়ীর চারিদিকে জলে ঘেরা। সেটা পেরিয়ে ঐ ঢিবিতে গিয়ে উঠতে হবে। তার নীচে কী আছে, তা তার জানা নেই। তারপর ঢিবির অপর পারে গিয়ে নামলে একটি পরিত্যক্ত প্রায়-সমতল ভূমি। তারপরেই দৃশ্যমান হয়ে উঠবে বাণরাজার গড়বাড়ির ধ্বংসস্তূপ।

আইসক্রীমওয়ালার বয়স বেশী নয়—চল্লিশের বেশী তো নয়ই। তার কাছ থেকে বাণরাজা সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা গেল। লক্ষ্য করলাম, আমার জানা কাহিনীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ কেন, বেশ পার্থক্য আছে। এটা হল কি করে?

আসলে মৌখিক কাহিনী যে এভাবে কালে পাল্টে যায়, মূল সত্য থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়, অনেক নতুন কাহিনী সংযোজিত হয় তার সঙ্গে—এ সব তত্ত্ব তো সবাই জানেন। তার পরে কথক ঠাকুর যদি হন অতি মাত্রায় কল্পনাপ্রবণ, তবে তো কথাই নেই! তিনি ইচ্ছা করলে গল্পের গরুকে গাছেও তুলে দিতে পারেন! তবু বলব, তবে আইসক্রীমওয়ালার কথা থেকে একটা বিষয় জানা গেল যে, এই গড়বাড়ীর এলাকা বহু দূর ধরে বিস্তৃত। স্থানীয় লোকজন দীর্ঘদিন ধরে এই রাজপ্রাসাদের ভাঙ্গাচোরা অংশ বয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের নিজের কাজে ব্যবহার করেছে। তার মধ্যে আছে ঠাকুর-দেবতার মূর্তিও।

মনে পড়ল—গ্রাম্য পিচ পথে হেঁটে আসার সময়ে ক্ষেতের ধারে এমনই একটা অলংকৃত পাথুরে থাম পড়ে থাকতে দেখেছি। স্থানীয় লোক সেটাকে সিঁড়ির ধাপ হিসেবে ব্যবহার করছে।

আর গ্রামের বিভিন্ন গৃহে নাকি সেইসব দেবমূর্তি সাড়ম্বরে পূজিত হচ্ছেন। সবই যে হিন্দু দেবতা—তা না হতেও পারে।

ঢিবির থেকে তর তর করে নীচে নেমে আসতে সময় লাগল না—কেননা পায়ের গতি তখন নিয়ন্ত্রণ করছে সামনের ঐ ভগ্নপ্রায় স্তূপটি।

দীর্ঘ দু'ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে যার সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এতক্ষণ পরে তার সাক্ষাৎ লাভ করে মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। কেননা, রাজবাড়ীর ধ্বংসস্তূপ ছাড়াও সেই পুনর্ভবা নদীও যেন অস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠল আমার চোখে।

হয়তো আগামী বর্ষায় তার জল পূর্ণ হয়ে উঠবে।

চোখে পড়ল একদল ছেলে মেয়ে, তাদের সঙ্গে এক প্রবীণ শিক্ষক জাতীয় ব্যক্তিকে। এদের কথা আগেই শুনেছিলাম রাস্তায় আসতে আসতে। এরা নাকি কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী—লোকসংস্কৃতির তথ্যানুসন্ধানে এসেছে। দৃশ্য দেখে মন পুলকিত হয়ে উঠল। এখনও এমন ছাত্র-ছাত্রী আছে—যারা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এভাবে পরিশ্রমী ক্ষেত্র-কর্মানুসন্ধান করতে পারে!

না, তাদের সঙ্গে সরাসরি আলাপ করলে চলবে না। তাদের আশে-পাশে থাকলে বরং ভাল। কেননা, তাদের কাজে হয়তো তাতে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। এখন তো তাদের ক্যামেরায় ছবি তোলা, স্থানীয় লোকের থেকে গল্প শোনা, বিভিন্ন প্রত্ন-বস্তুর চিত্রাংকন করা—ইত্যাদি কাজ, দেখতে পাচ্ছি এই নিরাপদ দূরত্ব থেকে। তবে তারই মধ্যে তায়া যে দু' একটি 'প্রাণের-মনের' মত ছবি তুলছে এই ভগ্ন প্রাসাদকে সঙ্গী করে—তা-ও চোখে পড়ছে বৈকি!

ভগ্ন স্তুপটির মধ্যে এবারে তাহলে প্রবেশ করতে হয়—বেশ পরিচ্ছন্ন স্থানটি। দেখে মনে হল, একটি পিকনিক স্পট।

যে ছাত্রছাত্রীরা ওখানে ঘুরছিল তাদের মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে, তারা দেখলাম তখন ঐ ভগ্নস্তূপের মধ্যেই কোথায় যেন আছে। গলা পাচ্ছি না—তবে আছে এখানেই। তাদের কলকাকলী কানে না এলেও অপর একটি অপরিচিত কণ্ঠ কানে এল। তার বক্তব্য শুনবার জন্য একটু উৎকর্ণ হলাম:

'আর ঐ হল সেই উষাহরণ রোড।'

বলে কী লোকটা? 'সড়ক' বলতে তো পারত! দ্রুত সেই লোকটির সামনে এসে হাজির হই এবারে।

লোক কোথায়—কুড়ি-বাইশ বছরের একটি উঠতি যুবক মাত্র। মনের আগ্রহে সে তার সামনে জমায়েত হওয়া ঐ ছাত্র-ছাত্রীর দলকে গল্প বলা সুরু করেছে। নীরবে দাঁড়িয়ে গেলাম—হ্যাঁ, ছোকরার গল্প বলার ভঙ্গী আছে বটে। প্রায় মুখস্থর মত বলে যাচ্ছে একটা কাহিনী!

'শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র মানে প্রদ্যুম্নর ছেলে অনিরুদ্ধ তো একদিন ঘোড়া হাঁকিয়ে নিশীথ রাত্রে এসে হাজির বাণরাজার প্রাসাদে—সোজা উষার কাছে। আর উষাও বোধহয় ব্যাপারটা জানত! জানত যে এতে তার পিতার ঘোর অমত।

'তারপর?' ঐ দলের একটি সিনেমা-পাগল ছাত্র জিগ্যেস করল—কণ্ঠে তাঁর চরম উৎকণ্ঠা।

'কেউ কিছু জানবার আগে বোঝবার আগে সতর্ক হবার আগে উষাকে আর

একটি অশ্বে বসিয়ে ঐ রাজপথ দিয়ে সশব্দে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল কোন বিদেশে ! কেউ জানলেও কিছু করতে পারল না !'

ছেলেটি ক্ষণেক থামল। তার সঙ্গে আরো দু' চারজন সমবয়সী ছোকরা ছিল। তারা এখানে বসে কী করছিল—না, খারাপ কিছু নয়। ওরা দুপুরে এই ভগ্নস্তূপের নির্জনে তাস খেলতে মত্ত ছিল। চেহারা দেখে তো মনে হল, নিতান্তই শ্রমজীবী শ্রেণীর—বয়স ঐ কুড়ি-বাইশের মধ্যেই হবে। শুনে মনে হল, এ কাহিনী বলতে বলতে এটা তাদের কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। সবাই যে যার মত করে বলতে পারে। রাম যদি বলে একভাবে, শ্যাম তবে বলবে একটু অন্যভাবে—এই আর কি ! আর এর ফলে একই কাহিনীর নানা পাঠ-পাঠান্তর তৈরী হচ্ছে ! এরা তো আবার বড়দের কাছ থেকে এ কাহিনী শুনছে দীর্ঘদিন ধরে। সুতরাং সে কাহিনীই বা কতটা সত্য—তা আজ বোঝা মুস্কিল।

তবে তার বলার কৌশলে মনে হচ্ছিল—সে যেন সব স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে ঘটনাটা—এটাই তার ক্রেডিট ! আরো কতজন এ কাহিনী আরো কত রকম ভাবে আগন্তুকদের কাছে বর্ণনা করেছে কে জানে ! তারা কি জানে, লোকসংস্কৃতির তন্নিষ্ঠ গবেষকরা মূল কাহিনীর এসব পাঠ-পাঠান্তর নিয়েই মাথা ঘামায় বেশী ?

এখন হাতে সময় কম। এখানে আমি বিদেশী। ঐ সব ছেলেমেয়েরা, ওদের সঙ্গে আলাপ রাখবার প্রয়োজন। ওরা নিশ্চয়ই নিকটবর্তী কোন শহরে অস্থায়ী ভাবে বাসা করে আছে। ওরা হয়তো আরো অনেকের কাছ থেকে বাণরাজার গড়ের কত রকম-বেরকম গল্প সংগ্রহ করবে। হয়তো নতুন কোন কাহিনী-সূত্র পেয়ে যেতেও পারে।

তাছাড়া, আর একটা কথা।

আমিই কী প্রথম এই বাণরাজার গড়ে ? এ দেশে নানা রকম ভ্রমণার্থী আছে। তাদের মধ্যে একটা শ্রেণী হল নানা ধরণের পুরাতত্ত্ব দর্শনের প্রত্যাশী। তারা কি এর কোন বিবরণ কখনও লিখে যান নি ? আর টুরিস্ট গাইড বইয়ের এখন তো ছড়াছড়ি। তবে সেগুলি যে 'সাত-নকলে' আসল খাস্তা তা তো সবাই জানে ! তাহলে এই বাণরাজার মূল কাহিনীর হদিশ পাবো কী করে ? শ্রীকৃষ্ণ যখন আছেন, তখন এটির উৎস কী মহাভারত ?

ঐ ছেলেটিকেই পরে আবার ম্যানেজ করতে হল—নিজের প্রয়োজনে। অবসর সময়ে সাইকেল ভ্যান চালায় গঙ্গারামপুরের পথে পথে। ইচ্ছা আছে শীঘ্রই তার বাবা তাকে একটা সম্পূর্ণ নিজের জন্য ভ্যান কিনে দেবে। এতে বেশ ভাল রোজগার হয়—বিশেষ করে সে ভাল গল্প বলতে পারে বলে বড় রাস্তা থেকে প্রায়ই প্যাসেঞ্জার পেয়ে যায় বাণগড়ে আসার।

কপাল ভাল, যে এই বয়সেই সে গল্প বলতে বলতে একশ্রেণীর লোকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এত গল্প জানে ছেলেটা—কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে কে জানে !

প্রসঙ্গ কথা

পর্যটনের অর্ধেক আনন্দ কিম্বদন্তীর সন্ধানে যাত্রা। বাস্তবিক, সারা ভারতে পর্যটনের যত কেন্দ্র, তার হয়তো সত্তর শতাংশই শুধু কিম্বদন্তীর মাহাত্ম্য দিয়ে ঘেরা। এই কিম্বদন্তীর নানা শ্রেণী—হতে পারে তা দেব-দেবী মাহাত্ম্য, কখনও বা পৌরাণিক চরিত্র। এ বিষয়ে রামায়ণ-মহাভারতের অজস্র চরিত্র ভারতের বহু স্থানকে গৌরবান্বিত করছে। এক শ্রেণীর পর্যটক তাতেই মুগ্ধ।

যারা পুরাণকে এক প্রকার ইতিহাস বলে বিশ্বাস করেন—তারাও সৃষ্টি করেছে অজস্র কিম্বদন্তী। কিভাবে যে এত কিম্বদন্তী সৃষ্টি হয় তার উত্তর দেবে জনগণ। কেননা ঘটনার সৃষ্টি থেকে তার কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়ে ওঠা—এই দীর্ঘ সময়টা থাকে শুধু জনগণের দায়িত্বে। তারপর নির্দিষ্ট সময়ের অন্তে তা নতুন পরিচয়ে চলে আসে সবার সামনে।

স্থানিক কিম্বদন্তী, তা যদি হয় আবার পৌরাণিক কাহিনী সমৃদ্ধ—তবে তার আকর্ষণই আলাদা। এদেশে পুরান কাহিনীর চর্চা আর ধর্ম চর্চা প্রায় সমতুল্য। কেননা, তার পিছনে থাকে ইতিহাস। তাই ইতিহাসের অন্বেষণেই যেন হয় এই পুরাণ চর্চা বা স্থানিক কিম্বদন্তীর উৎস সন্ধান।

বাণরাজার গড়ের মত স্থান ভারতে প্রচুর—এ ধরনের কাহিনীও হয়তো তাই আজও পর্যটক মনের কাছে এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ হয়ে আছে দীর্ঘদিন। নীচের তালিকাটি তার অন্যতম প্রমাণ :

(১) বাণগড়। অজ্ঞাত লেখক। প্রতিভা পত্রিকা (ঢাকা), চৈত্র ১৩২৪, (২) বালুরঘাটের পুরাকীর্তির পরিচয়। কমলেন্দু চক্রবর্তী। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। ১৩৬১, (৩) কোটিবর্ষ। কমলেন্দু চক্রবর্তী। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। ১৩৬২, (৪) দিনাজপুরের কতিপয় ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ। কাশীকান্ত বিশ্বাস। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। ১৩২৪, (৫) বাণরাজার বাড়ী। কেদার নাথ সেন। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। ১৩১৬, (৬) বাণগড়। গৌরীশংকর দে। গল্প ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। ১৩৭৬, (৭) দিনাজপুর বাণরাজার গড়। চন্দ্রেশ্বর চক্রবর্তী। প্রদীপ, বৈশাখ ১৩১১, (৮) বালুরঘাটের কয়েকটি প্রাচীন স্থানের পরিচয়। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ১৩২৪, (৯) বাণগড়। বিনোদবিহারী রায়। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ১৩২৪, (১০) বাণগড় কথা। সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস। মাহিষ্য-সমাজ, মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৫, (১১) বাণগড়ের বহু পুরাকীর্তি। অনন্ত জানা। আনন্দবাজার পত্রিকা। ৭.১১.৮৪, (১২) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গের বাণগড়। অলোক চট্টোপাধ্যায়। পল্লীগ্রাম, নভেম্বর ১৯৯১ প্রভৃতি।

সেকাল থেকে একালে বাণগড় চর্চার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে স্থানটি আজও প্রয়োজনীয়। তাই কিম্বদন্তীর আলোকে তার এই পরিচয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তবে তার স্বভাবের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেছে তার এই গপ্পো করার বাতিকটা। শুধু বাণগড় নয়—মহীপালদীঘি, ধলদীঘি, কালদীঘি ইত্যাদির গল্পও জানে সে।

মূল গল্পটা কিন্তু খুবই ছোট—তাকে গুছিয়ে লিখলে বেশ নাটকীয় ভাব আসবে। পুনর্ভবার ওপারে ঊষাগড়। ঊষা হলেন বাণরাজার মেয়ে। পুরাণ মতে তিনি হলেন অসুররাজ। পুরাণে তার রাজধানীকে শোণিতপুর বলা হয়েছে। এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম বরেন্দ্রভূমি—লালবর্ণ। হয়তো পরবর্তী কালে তাই জন্যই নাম হয়েছে শোণিতপুর।

রাজপ্রাসাদ আজ শুধু কল্পনায়। একদিন ঐ প্রাসাদেই রাজকন্যা ঊষাদেবী দেবীদুর্গাকে প্রার্থনায় জানিয়েছিলেন: 'আমার সঙ্গে যার বিবাহ হবে তাঁর রূপ দেখাও।' দেবী তাতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাই যথাসময়ে ঊষা দেখলেন তার মনোনীত পুরুষটিকে—অবশ্য স্বপ্নে। রাজকন্যা অধীর হয়ে উঠলেন। এ সংবাদ ছড়িয়ে গেল রাজপ্রাসাদের সর্বত্র। রাজা বাণ শুনে ক্রুদ্ধ। কন্যা যাকে স্বপ্নে দেখেছে সে যে তার পরম শত্রু শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র অনিরুদ্ধ। এদিকে ঊষার সখীর ব্যবস্থাপনায় দ্বারকা থেকে অনিরুদ্ধ এসে হাজির। গোপন পথে তার সঙ্গে মিলিত হল ঊষা। দেখা হওয়া মানে, তাকে অপহরণ করে অন্ধকারে ধুলো উড়িয়ে ঊষা-অনিরুদ্ধ চলে গেল দ্বারকা। বাণরাজার আস্ফালন দেখল সবাই। ঊষা উদ্ধারের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল।

আজও নাকি কেউ কেউ মাঝে মাঝে ঐ ঊষাহরণ রোড দিয়ে ছুটন্ত অশ্বক্ষুরের ধ্বনি পেয়ে সচকিত হয়ে ওঠেন—তার পিঠে রয়েছে ঊষা ও অনিরুদ্ধ। এই হল সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

অবাক হয়ে ভাবছি, এই বিচিত্র কাহিনী মহাভারতে নেই কেন? মহাভারতে কৃষ্ণ আছেন, তাঁর দ্বারকা সংবাদ আছে, পাণ্ডবগণের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা আছে—আছে আরো কত কী!

হয়তো আছে কোথাও আমার জানা নেই। নচেৎ সুদীর্ঘ কাল ধরে এ কিম্বদন্তী প্রচলিত থাকে কী করে? ঊষা-অনিরুদ্ধের মত অপহরণের কাহিনীই শুধু নয়, মহাভারতেই তো আছে 'সুভদ্রাহরণ কাহিনী'—অনুসন্ধান করলে আরো কত বিবাহের নামে অপহরণ কাহিনী সেখানে হয়েছে, খুঁজে পাওয়া যাবে।

হয়তো এ ইতিহাস নয়—হয়তো কোন রূপক কাহিনী। তবু মানুষ বিশ্বাস করে এই গল্প। আর আমার পর্যটক মন—সে-ও তো তাৎক্ষণিক ভাবে এই কিম্বদন্তীতে বিশ্বাসী। নচেৎ সে আমাকে এই এতদূরে ছুটিয়ে আনবে কেন!

সেই ছাত্র-ছাত্রীর দল কখন যেন প্রস্থান করেছে। তাস খেলায় ছেলেগুলি এখনও দু'একজন আছে—হয়তো নিতান্তই বাপে-খেদানো ছেলেগুলি। তবু, ওরাই তো এখন আমার প্রধান সংবাদদাতা।

ওদের সঙ্গে ভাব জমাই এবারে। তাদের আসরে বসি—আর প্রতিটা খেলাতেই

হেরে যাই ওদের হাতে। তাতে ওরা খুসী হয়। আমাকে বলে : 'চৈত্র মাসের শেষের দিকে আসবেন।'

'তখন তো গ্রীষ্মকাল—প্রচণ্ড গরম। কিন্তু কেন?'

'তখন যে এখানে মেলা বসে।' সোৎসাহে বলে ঐ দলের সবচেয়ে বয়স্ক ছেলেটি : 'এ জায়গাটা মানুষের ভীড়ে ভর্তি হয়ে যায়। কদিন ধরে বেশ আনন্দে কাটে আমাদের।' কণ্ঠস্বর ঈষৎ ম্লান শোনায় যেন তার।

'সেখানে কি কি হয়? যাত্রাগান হয়?' আমার প্রতিটি প্রশ্ন একটি বিশেষ লক্ষ্যের দিকে স্থির রাখি।

'হয় হয়—বাণরাজার পালা হয়। আসবেন আপনি? এটা নিশ্চয় শোনেননি কখনও এর আগে।'

এবারে হার মানতে হয় আমাকে। বাণরাজার পালার কথা শোনা আছে, তবে দেখা হয়নি কখনও—সে কথা তাকে জানাতে দ্বিধা করি না। তারপর বলি : 'দেখ, অনেককাল আগে, তোমাদের বাবারা যখন বালক ছিলেন, সে সময়ে কিন্তু কলকাতার যাত্রাপার্টিরা এই ঊষা-অনিরুদ্ধ-বাণরাজার গল্প নিয়ে যাত্রাভিনয় করত।'

'ও, সেই নট্ট কোম্পানীর কথা বলছেন!'

'না না! নট্ট কোম্পানী তো একালের ব্যাপার। এসব তার বহু আগের কথা।' এটুকু বলে তার কৌতূহল দমন করি। কেননা অতি প্রাচীন সংবাদে তার আগ্রহ না থাকতেও পারে। তবু এই বিচিত্র প্রতিবেদনের পাঠকদের নিকট সেদিনের এই 'বাণরাজার' যাত্রাভিনয়ের প্রসঙ্গে জানাই :

সেকালের ভাবুক কবি হেমচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছিলেন 'বাণবিক্রম' নাটক। যার অপর নাম ছিল 'ঊষাহরণ'। সেকালের যাত্রাপালায় কখনও কখনও এ রকম দুটি নাম থাকতো—কে জানে হয়তো এ কালেও এ পদ্ধতি চালু আছে। এখনকার খবর রাখি না এত। সে যাত্রা বইয়ের একটি বিজ্ঞাপন ছিল সেকালের 'পাল ব্রাদাস' কোম্পানীর প্রকাশিত গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাগানের বইয়ের পিছনে। সে বিজ্ঞাপনে থাকত : 'বাণবিক্রম বা ঊষাহরণ' যাদব বাঁড়ুয্যের প্রসিদ্ধ অভিনয়; দারুণ যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, শিব বলরাম, অনিরুদ্ধ, বাণ ও সুকেতুর অপূর্ব বীরত্ব, ঊষা, চিত্রলেখা, সুরমা, সুষমা, ভক্তপাগল, শান্তিরাম, কান্তিরাম—সবাই আছে। [সচিত্র] মূল্য দেড় টাকা মাত্র।'

বিজ্ঞাপনটি সংক্ষিপ্ত—তবু কত তথ্য আছে এতে। সেকালের এক বিখ্যাত যাত্রাভিনেতার নাম, মূল কাহিনী কিভাবে বর্দ্ধিত হয়েছে তার ইঙ্গিত। তার চেয়েও বড় কথা হল, এ জাতীয় যাত্রা পালা যে সেকালে আরো রচিত হয়েছিল—তার সূত্র। মনে বড় বিস্ময় লাগে, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিশাল গ্রন্থে এই যাত্রা-পালাটির বা এ জাতীয় পালার কোন হদিস পাইনি।

এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে একটি গ্রন্থে—তা পূর্বেই বলা হয়েছে, অর্থাৎ তারও পূর্বে 'ভাবুক কবি-র আলোচ্য গ্রন্থটি প্রচলিত হয়েছিল।

মনে মনে কৌতূহল তৈরী হল, স্থানীয় গ্রাম্য কবি কিভাবে আজ বাণরাজার পালাগান করেন—তা দেখবার জন্য।

তাসখেলার ছেলেগুলি তখনও আমার জন্য এক বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ওদের মধ্যে বড় ছেলেটি বলল : 'এদিকে আসুন—একবার ঐ ভাঙ্গা দেয়ালটার উপর একটু উঠে দাঁড়ান।'

আমি নতুন কোন তথ্য পাবার আশায় তার কথা মানলাম। তারপর ছেলেটি আমাকে বহুদূরে একটি দিক নির্দেশ করে আঙ্গুল তুলল : 'কি, দেখতে পাচ্ছেন? ঐ—ঐ যে ভাঙ্গা-চোরা সব গড়বাড়ী?'

কোথায় যে কী—তা ওরাই জানে। তবু নতুন কিছু পাবার আশায় ওর কথায় নির্দেশ মত ঠেকা দিয়ে বলি : 'হ্যাঁ, সে তো বহুদূর। ভাল করে দেখাই যায় না এখান থেকে। কিন্তু তাতে কী?'

ভাল করে লক্ষ্য করে দেখি—হ্যাঁ, ওখানে যেন কারা সব ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, ওরা তো সেই ছেলেমেয়েগুলি—যারা একটু আগে এখানেই বাণরাজার গড়ে ছিল। ওরা ওখানে কি করছে? ওখানেও কিছু দর্শনীয় আছে নাকি?

ভগ্নস্তূপ থেকে নেমে এসে জিগ্যেস করি ওদের : 'কিন্তু ওরা ওখানে ঐ অতদূরে কি করতে গেছে?'

আমার এ কথার পরে ছেলেটি যেন রেকর্ডের মত বলে গেল : 'ওখানে আছে একটা বিশাল ভাঙ্গা থাম। মেয়েরা মনে করে সে যদি ওটা দুহাতে বেড় দিয়ে ধরতে পারে, তবে নাকি সে পুত্রসন্তানের জননী হবে। এ বিশ্বাসটা এখানে বহুদিন ধরে চালু আছে।'

একটা প্রশ্ন আসে : ওরা যে সবাই একালের শিক্ষিত মেয়ে—ওরা কি তাহলে এ জাতীয় সংস্কারে বিশ্বাসী? জানল কি করে এসব তথ্য? হয়তো পূর্ব হতেই জেনে নিয়েছে—এরাই বোধহয় গল্পটা দিয়েছে ওদের।

কল্পচক্ষে দেখতে পাই যেন এখন কত কিছু। আরো কত কি ওদের বলতে পারতাম এই বাণগড় সম্বন্ধে—কিন্তু ওরা কি আমার সে সব কথা বুঝতে পারবে! এই দক্ষিণ দিনাজপুরে বালুরঘাট শহরের সুসন্তান বিখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় মহাশয়ও যে একদা এই কাহিনী নিয়ে একটা নাট্য রচনা করেছিলেন—সে সংবাদ বোধহয় এদের জানা নেই। কেন না মন্মথ রায়ের সঙ্গে এদের কোনদিন সাক্ষাৎ হবে বলে মনে হয় না। তাদের কাছে বাণরাজার পালাগানই যে বেশী আকর্ষণীয়।

কিন্তু আমার থেকে ওরা আরো অনেক বেশী জানে ঊষা-অনিরুদ্ধর কাহিনী সম্বন্ধে। ওরা জানে যে এই ঊষা-অনিরুদ্ধই পরবর্তীকালে জন্মান্তরের ফলে মনসামঙ্গলের কাহিনীর দুটি প্রধান চরিত্রে পরিণত হয়েছিল। এরা সে গল্পও শুনেছে এখানে মনসার ভাসানের সময়ে।

মনসামঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে কীভাবে ঊষা-অনিরুদ্ধ যুক্ত হতে পারে—ভেবে

পেলাম না। তবে দেবদেবীর অভিশাপ ও জন্মান্তরবাদ তত্ত্ব এমনই যে তা কখন কী ভাবে কার সঙ্গে জড়িয়ে যায় তা আগে থেকে বুঝতে পারা যায় না।

এ প্রসঙ্গে মনে এল, একদা পঠিত মহাভারতীয় কাহিনী উত্তরা-অভিমন্যুর কথাও। এরাও নাকি অতীতে স্বর্গবাসী ছিল। পরে দেবতার শাপে মর্তে ঐ ঐ নামে জন্মগ্রহণ করে ও পরে নির্দিষ্ট সময় অন্তে তাদের শাপভোগ শেষ হয় ও সম্ভবতঃ পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করে।

নিজেকে প্রশ্ন করি এবারে : 'আচ্ছা, এরা কী জানে যে ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী এ বঙ্গের এক যশস্বী কবিকেও আকর্ষণ করেছিল—তাদের নিয়ে তিনি কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। মাত্র কয়েক ছত্রের সে বর্ণনায় সবে যখন নাটকীয়তার পটভূমি সুরু হচ্ছে মাত্র, তখনই তা শেষ হয়ে যায় আকস্মিক ভাবে!

সুতরাং আমার আবার কাজ বাড়ল। স্মৃতিকথায় আপ্লুত হয়ে যতই ভাবি না কেন ওদের কিংবদন্তীর কথা, তার মূল অনুসন্ধান করতে হবে এখন দুটি গ্রন্থের মধ্যে। প্রথমটি হল কোন প্রামাণিক মনসামঙ্গল কাব্য এবং দ্বিতীয়টি হল মাইকেলের 'বীরঙ্গনা' কাব্যের পরিশিষ্ট অংশ—হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়ল যে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের একটি অন্যতম পত্র রূপে তিনি নায়ক-নায়িকা রূপে নির্বাচিত করেছিলেন ঊষা-অনিরুদ্ধকে—তবে অসমাপ্ত সেই রচনা থেকে শেষ পর্যন্ত কবির মনোভাব বুঝতে পারা যায় না।

বাণগড়ের ধ্বংসস্তূপের ছায়ায় ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। সূর্য এদিকে ঢল নেমেছে। মনে মনে যেন এক জাগার-স্বপ্ন দেখছি—খোলা চোখেই।

যুদ্ধের ঝনঝনা, উত্তেজিত অশ্বক্ষুর ধ্বনি, বাণরাজার হুংকারে পুরাঙ্গনাদের আর্তনাদ—সব মিলিয়ে আমার জাতিস্মর মনটা যেন কোন সুদূর অতীতে ফিরে গেছে মুহূর্তের জন্য। ঐ তো দেখতে পাচ্ছি ঊষাকে—থামের গায়ে হেলান দিয়ে গবাক্ষ পথে তার দয়িতকে গোপনে দেখার চেষ্টা করছে।

সহসা তার কানে গেল অশ্বক্ষুরের শব্দ। ত্রাস্ত হয়ে উঠে স্থান ত্যাগ করল—মিলিয়ে গেল অন্দরের কোন গহ্বরের নিরাপদ পরিবেশে।

নাঃ, আর এই দিবাস্বপ্নকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। আমি বহিরাগত আগন্তুক। এবার বালুরঘাটে ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে। ছেলেগুলি বলেছিল : 'আপনি ভুল পথে এখানে এসেছেন—তাই অনেক মাঠ ভেঙ্গে আসতে হয়েছে। এবারে সোজা পথ দিয়ে যাবেন—বাস পেয়ে যাবেন একটু হাঁটলেই।' □

আনন্দের অপর নাম নৃত্য।
জাতি-ধর্ম-ভাষা ভেদে সর্বত্রই এর একটিই নাম।
নৃত্যের নানা প্রতিশব্দ—
শিক্ষিত সমাজের জন্য সেটা বোধহয় নিতান্তই আভিধানিক।
রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন 'আনন্দ সর্ব কাজে',
গেয়েছেন 'পথ চলাতেই আনন্দ'
পেয়েছেন 'জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রন'।
সে আনন্দকেও তিনি নৃত্যের মধ্যে বিকশিত করতে পেরেছেন ঃ
আনন্দ মানেই অবসর নয়,
কর্মসাধনাতেও আছে আনন্দের অংশ।
তাই, নৃত্য-আনন্দ-অবসর-এর সঙ্গে জীবন—
তবেই পরিপূর্ণ জীবনভোগ।
সে কথা শহর-গ্রাম সবার ক্ষেত্রেই সত্য
—এমন কি জীবনের ক্ষেত্রেও।

লোকনৃত্য-২

নৃত্যের ব্যাকরণ পণ্ডিতদের,
কিন্তু নৃত্যের উচ্ছ্বাস সবার প্রাণের।
ব্যাকরণ যেখানে পিছনে, উচ্ছ্বাসই সেখানে প্রধান।
শিক্ষার আলো যেখানে যত কম,
ব্যাকরণ সেখানে তত পিছিয়ে।
হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কাছে নৃত্যের ব্যাকরণ
দাঁড়াতে পারে না বলেই,
নৃত্য হয়ে ওঠে সহজ-সরল-প্রাণবন্ত।
যার সার্থক বাহন হল সেকালের অরণ্যবাসী আদিবাসীরা।
আজ নিরারণ্য তাদের জীবন নিরানন্দ করেছে—
কিন্তু প্রাণানন্দ হরণ করতে পারেনি।
তাই আজও তারা কাজে-অকাজে, কারণে-অকারণে
নেচে ওঠে, এমন কি নিজেদের আদি ধর্ম-চিন্তা
পরিবর্তিত হয়ে গেলেও।

হেমব্রম-হাঁসদা পরিবারের গল্প

সরোজিনী হেমব্রমের খোঁজ না পেলে এই কাহিনী—

সত্যই এই বিবরণী লেখা সম্ভব হত না। অথচ তাকে আমার পূর্বে কখনই চেনা হয়নি। তবে পরিচিত হবার পর মনে হয়েছিল, এ ধরনের সরোজিনী হেমব্রম যেন আগে আরো কোথাও দেখেছি।

বালুরঘাটের নিকটে তপন—সেখানে স্কুল মোড়ের স্টপে নেমে তপন-১ গ্রামে প্রবেশ করেছিলাম। উদ্দেশ্য হল আদিবাসী গ্রামে ঢুকে তাদের জীবনের সংস্কৃতির সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ করা। এবং তখন প্রায় বিনা পরিচয়েই হাজির হয়েছিলাম বাসস্টপ থেকে পাঁচ-সাতটা গৃহ পেরিয়ে একটি অতি সাধারণ গৃহে।

সেখানে মাটির ভাঙ্গা বাড়ী. উঠানে ছড়ানো নতুন-পুরাতন হাঁড়ি, একটি দাঁড়ানো সাইকেল আর এক অতি সাধারণ পরিবারের দু'-তিনজন মানুষ। সেখানে কথাবার্তা বলতে বলতে এক সাইকেল ভ্যানওয়ালার সঙ্গে আলাপ।

সুরেন সোরেন আমার কথাবার্তা ভাল করে বুঝতে পারে না। আমার কন্টামিনেটেড মেঠো বাংলা তার খাঁটি কন্টামিনেটেড গ্রাম্য ভাষাকে প্রভাবিত করতে পারল না। সুরেন এ বাড়ীর লোক নয়। আজ ছুটির দিন, রবিবার। একটু আগেই সে এবং সবাই, এ গ্রামের তার পরিচিতবর্গ চার্চে গেছিল—কেননা এখন গুডফ্রাইডের মরশুম। খ্রীষ্টানদের মহোপবাস কাল। আর এ গ্রামে বেশ কিছু ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান আছেন—সংখ্যায় তারা নিতান্ত কম নয়।

যাদের গৃহে মাদুর পেতে বারান্দায় বসেছিলাম, সুরেন তাদের বাড়ীতে এসেছে—তবে আচারে-আচরণে সে একটু ভিন্নমুখী। ঠিক কি ধরনের পরিবেশ পেতে চাই, তা বোঝাতে অনেক সময় লাগল। তারপর সে বেরিয়ে গেল সে বাড়ী থেকে।

হতাশ হলাম এবারে। হয়তো আরো কিছু জানা যেতো তার থেকে।

ভুল ভেবেছিলাম সুরেনকে। ভেবে ভেবে যখন এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবো কিনা ভাবছি, তখন ধরে নিয়ে এল হাফ মাতাল লোকটিকে। তার নামটা তখনও জানিনি, পরে হয়তো জানা হবে। কিন্তু সুরেন কেন এই দিন দুপুরেই হাফ মাতাল লোকটিকে ডেকে নিয়ে এল আমার কাছে—তা মালুম হল অনেক পরে।

আসলে লোকটি খুব আনন্দে আছে—তাই একটু নেশা করেছে। মনে পড়ল যাদের গৃহে বারান্দায় মাদুরে বসে আছি, তারাও আমাকে নেশা অফার করেছিল। যতই হোক, অতিথিকে তো এ প্রস্তাব তারা দেবেই!

সদ্য আগত লোকটি—মানে বয়স্ক যুবকটির পোষাক দেখেই বুঝলাম—তার আর্থিক জীবনের পরিচয়। সে হল বিমল মাণ্ডি—এ গ্রামে তার খ্যাতি গানবাজনার আসরে। নিজেদের জীবনের যত উৎসব আছে—তাতে তার এক বিরাট অংশ আছে।

তখন সুরেন আর বিমল-এর প্রস্তাবগুলি আমাদের ভাষায় হল : 'তাহলে চলুন সরোজিনীদির বাড়ী, ওখানে সব লোকজন আছে। নাচগানের আসর বসেছে। আমি ওখানে গেলে অনেক খবর পেয়ে যাবো।'

মনে মনে আনন্দিত হলাম, আবার চমকেও উঠলাম। আজ রবিবার আর গুডফ্রাইডের মরশুম হলেও, পুরো একটি কাজের দিন। এই কর্মমুখর দিনে এরা নাচগানে মেতে উঠেছে কেন? তাছাড়া যতদূর জানি, বৎসরের এই পর্বের সময়টা খ্রীস্টানরা সমস্ত আমোদ-আনন্দ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে। তবে এ জাতীয় অনৈতিক আনন্দে এরা আজ মেতে উঠেছে কেন? উত্তরটা পেলাম একটু পরেই।

সে বাড়ীর দরজাটা কে হাট করে ফেলেছিল। বাড়ির বাইরের দেয়ালে পরিষ্কার মাটি লেপা, তার ওপর মাটির রিলিফ-এর কাজ। বেশ সুন্দর লতা-ফুল-পাতা'র ডিজাইন। চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়ে ডিজাইনের কেন্দ্রস্থলে একটি 'ক্রশ' চিহ্ন সহজেই চোখে পড়ে।

প্রাচীর দেওয়া উঠানে তখন আর এক কাণ্ড হচ্ছিল। পূর্বোক্ত বিমল ও সুরেন তখন সেই উঠানে হাজির। সেখানে উপস্থিত আরো কিছু যুবক-যুবতী—মুখগুলি তাদের চেনা চেনা মনে হল। আজ কদিন ধরে তারা বালুরঘাটকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ দিনাজপুরের নানা অংশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা শিবির করেছে বালুরঘাটের সরকারী ভবনে। ও পাড়ার রিকশা, ট্রেকার ইত্যাদিরা সবাই জেনে গেছে যে এরা সবাই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী। এখানে তার কয়েকজন মাত্র এসেছে—বোধহয় আদিবাসী জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে।

নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াই সেই গৃহপ্রাঙ্গণে—তবু আমার বয়সের জন্যই বোধহয় অতি শীঘ্রই তাদের কাছে পরিচিত হয়ে গেলাম। জানলাম এই গৃহটির পরিচয়।

এটিই হল সরোজিনী হেমব্রমের গৃহ। সে এই গৃহের প্রবীনতমা না হলেও, গৃহকর্ত্রী বটে। তার অবস্থানটি এ গৃহে একটু বেমানান মনে হলেও, তার কারণ হল, সরোজিনীর স্বামী একদা সরকারী অফিসে স্থায়ী কর্মী ছিলেন। তার অকাল মৃত্যুতে সরকারী ভাবেই তিনি একটি চাকুরী পেয়েছেন স্থানীয় বিডিও অফিসে। যার প্রকৃত পরিচয় ছিল গৃহবধূ, তিনিই এখন সরকারী কর্মী হওয়ায়, তার গৃহে তাই একটু খোলামেলা হাওয়া। পারিবারিক আব্রু বা 'প্রাইভেসী, রক্ষার অতটা গরজ নেই এ পরিবারটির। তাই এখানে সহজেই গ্রামের লোক তো বটেই সম্পূর্ণ বহিরাগত ব্যক্তিরও প্রবেশাধিকার ঘটে।

আরো জানা গেল ঐ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে, এই সাঁওতাল পরিবারটি ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান—বাড়ীর প্রধান প্রবেশ পথে তার ইঙ্গিত দেখে এসেছি।

আজ যারা এই গৃহ-প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছে, তারা সবাই এই গৃহের সদস্য তা নয়। এখানে এখন তিন ধরণের ব্যক্তি উপস্থিত—যারা এই পরিবারের লোক, তারা শিশু-যুবা-প্রৌঢ়া মিলিয়ে ৬।৭ জন। গ্রামের কিছু প্রতিবেশী—তারা

এসেছে এ বাড়ীতে—কারা সব বাইরের লোক এসেছে তাদের দেখতে, আলাপ করতে এবং সম্ভবতঃ একটু পরে তাদের নৃত্য-গীত শোনাতে। আর তৃতীয় হল—ঐ সব বহিরাগত ছাত্রছাত্রী, যার মধ্যে আমিও একজন।

তাই এই গৃহ-অঙ্গন আজ কলমুখরিত। বারান্দায় মাদুর পাতা হয়েছে, চেয়ার বেঞ্চি যা ছিল—তা সব এখন উঠানে নেমেছে। মনে হল, এখনই জমে উঠবে নৃত্য-গীতের আসর।

সরোজিনী হেমব্রম-এর সঙ্গে আলাপ হল। জানলাম, আসলে এই সময়টা নৃত্য-গীতের সময় একবারেই নয়। তবে এরা ছাত্র-ছাত্রী—লেখাপড়ার বিষয়ে এসেছেন—তাই একটু তাদের অনুরোধ রাখার জন্য···আসলে নৃত্য এদের রক্তে।

লক্ষ্য করে দেখলাম, প্রথমে যাদের বাড়ী ঢুকেছিলাম, তাদেরও কয়েকজন এখানে হাজির। আর সেই লোকটি—যে এ গ্রামের সেরা গায়ক, যে না থাকলে এখানকার কোন সঙ্গীতই জমে না, সে ততক্ষণে হারমোনিয়ামের রীড টিপে টিপে সুর তুলবার চেষ্টা করছে। এমন ভাবে গাইবে যেন, তা আমাদের শহুরে কানে ভাল লাগেই। আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম, ঐ ছাত্র-ছাত্রীগুলির একপ্রস্থ চা খাওয়া হয়ে গেছে—গৃহস্বামিনী তাদের আপ্যায়ন করেছেন নিশ্চয়। এই ভাবনা শেষ হবার আগেই দেখি আমার জন্যও চা এসে গেল।

বড় অবাক লাগল এই পরিবারটির চাল-চলন দেখে।

হেমব্রম, টুডু, সোরেন, মান্ডি, হাঁসদা, কিস্কু—শুনলেই আমাদের সাঁওতাল জাতি সম্বন্ধে এক দীর্ঘপোষিত অনুভূতি কাজ করে। কিন্তু এই গৃহাঙ্গনে একটি পূর্ণ হেমব্রম পরিবারের সঙ্গে বসে সে কথা আদৌ মনে হল না। মনে হল, এরা সবাই যেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গোপালগঞ্জের গ্রামে বিশ্বাস-অধিকারী-বৈরাগী-দাস ইত্যাদিদের মতই। এরাও ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান, তারাও—এই জন্যই কী তাদের জীবনাচরণের মধ্যে এত সাযুজ্য ?

মাদলে বোল ফুটেছে। বাঁশীতে সুর লেগেছে। হারমোনিয়মে কুশলী হাতের খেলা সুরু হয়েছে—নেই শুধু একটা সারিন্দা। তা হোক, মনের আনন্দের স্পর্শে তখন সেই গৃহাঙ্গন হয়ে উঠেছে যেন একটা নৃত্যাঙ্গন। চোখের সামনে যা যা দেখেছি, তা যেন একটা ডকুমেনটারী ফিলমের মতই মনে হচ্ছে।

ঐ ছেলেমেয়েগুলি এতক্ষণ তাদের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন-উত্তর, টেপ, ফোটো ইত্যাদি পদ্ধতি প্রয়োগ করছিল। এবার দেখলাম তাদের অন্য রূপ—তথ্য সংগ্রহের কাজ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য ওরা এদের উদ্দীপিত করেছে তাদের একটি নাচ দেখার জন্য—তা এই গৃহ-পরিবেশ দেখেই বুঝতে পারছিলাম। নচেৎ একটা ঘর-গেরস্থ পরিবার রবিবারের মত কাজের দিনে এভাবে আনন্দে মেতে উঠতে পারে ?

প্রথমে বাড়ীর নানা বয়সী চারজন নারী কোমর-হাত ধরাধরি করে নৃত্য-ভঙ্গিমা সুরু করল। মাথার উপর ছায়া ছায়া রোদ। দক্ষিণ দিনাজপুরে মার্চের

শেষ সপ্তাহে তখনও রোদটা তত কড়া হয়ে ওঠেনি। এখানে নাকি এমনই আবহাওয়া।

তাদের সবার পরিচয় জানি না—তবে পারস্পরিক সম্বন্ধে তারা দিদি-কাকী-মেয়ে-প্রতিবেশিনী জাতীয় হবে বোধহয়। ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যে ক'জনকেই বা নামে নামে চিনব। তবে এর চেয়েও বিস্ময় দেখলাম মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই নৃত্যে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা বেড়ে হল সাতজন—অপর দু' জন হল পথ চলতি দুটি উঠতি যুবতী কর্মী নারী। সে এক এলাহি কাণ্ড দেখলাম চোখের সামনে!

ভাষাটা বোধহয় সাঁওতালিই হবে—কিছুই বুঝতে পারছি না তার মর্ম। তবু হারমোনিয়ামের সঙ্গে যিনি আছেন তিনি তার নেশা ভরা কণ্ঠে একটা গান গেয়ে চলেছেন 'উদাত্ত' কণ্ঠে। তার সঙ্গে মাদল-বাঁশী নাচের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাজনা বাজিয়ে চলেছে। নাচের দল ততক্ষণে প্রায় অর্ধবৃত্তাকার হয়ে এসেছে।

নৃত্য-গীত এদের সহজাত আনন্দ। যে ধর্মই অনুসরণ করুক না কেন, এটাই ওদের জাতীয় সংস্কৃতি—তা সে যে উৎসবই হোক। এখন এদের গুডফ্রাইডে পরবের প্রস্তুতি—যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর সময়, অন্তরে শোকার্ত থাকার সময়। কিন্তু তাদের মনে সে চিন্তা ভুলিয়ে দেবার জন্য আমরা তখন ওদের অন্য প্রস্তাব দিয়েছি। বলেছি: 'মাত্র ক' মাস আগেই তো হয়ে গেল বড়দিন। তখনকার গান করা হোক তবে একটা।' একটু দ্বিধায় যেন ভরে উঠল তাদের মন।

এ কথায় কাজ হল। তারা যেন শুধু আমাদের খুশী করার জন্যই তাদের সব জড়তা-সংস্কার কাটিয়ে ফেলল। এবার আমরা বিশেষ অনুরোধে বারান্দায় এবং দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা যথাক্রমে ২৩।২৪ ও ১৬।১৭ বছরের দুটি পুরুষকে ঐ দলের সঙ্গে মিলে যেতে অনুরোধ করলাম। প্রথমে অস্বস্তি বোধ করলেও পরে তাদের পায়েও যেন ছন্দ জাগল।

আসলে তারা যে এতক্ষণ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে এই পরিবেশের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে তাদের শরীরী আন্দোলনের দ্বারা মনে মনে এর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছিল—তা দেখেছি। তাই একবার মাত্র অনুরোধ করতেই তারা এই দলে ভিড়ে গেল!

আমার অন্তরে চমক সৃষ্টির আরো বাকী ছিল।

বহিরাগত ছাত্র-ছাত্রীর দলটির দুটি মেয়ে ততক্ষণে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—দেখে তাদের কী উল্লাস। অনভ্যস্ত হাতে তারা ঐ বৃহৎ দলটির সবার সঙ্গে হাতে হাত মেলাবার চেষ্টা করছে—এটা তাদের কাছে একটা পরম কৌতুক। নতুনরা পায়ে পায়ে মিলতে পারছে না—তবু তাদের কোন সংকোচ নেই এ বিষয়ে।

এতক্ষণে যেন নাচের পরিবেশ পূর্ণ হল।

হারমোনিয়ামে তখন বাজছে বড়দিনের গানের সুর—সেকথা তারাই জানালো আমাদের। কিন্তু যেহেতু ভাষা বুঝি না, তাই তার কোন অর্থই উদ্ধার করতে পারলাম না। তাছাড়া আমাদের কাছে ঐ দলবদ্ধ যৌথ নৃত্যটিই যে বেশী দর্শনীয়।

মনে হল, আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি কোন আদিম বনচারী সমাজে। এখন

আদিবাসী জীবনের সঙ্গে নৃত্যের এক অভেদ্য সম্পর্ক। সেই নৃত্য—যা তাদের গোষ্ঠী চেতনার তথা জীবনের প্রতীক।—তাই নৃতাত্ত্বিক বলেন তাদের গোষ্ঠী-জীবনের মূল সুর যেন ব্যক্ত হয় ঐ গোষ্ঠীর নৃত্যের মধ্যে। তাদের শ্রেণী বা স্তর যা-ই হোক না কেন, সকল আদিবাসী অঞ্চল যেন এই বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট, বিশেষতঃ সাঁওতাল সমাজ তো বটেই।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এদেশে লোকনৃত্যের নানা প্রকরণ নিয়ে অনুসন্ধান হয়, অনুশীলন হয়। বৃহত্তর সমাজ তাকে সাদরে বরণ করেন মানবিক জীবনের এক নান্দনিকরূপ বলে। শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চা হয়, তাকে নিয়ে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। বৃহত্তর সমাজের সংস্কৃতিতে তার একটি নির্দিষ্ট স্থানও আছে। ইদানীং রবীন্দ্র সঙ্গীতের নৃত্য—যা বিশুদ্ধভাবেই সঙ্গীতভিত্তিক—তার চর্চাও বেশ চোখে পড়ে। বিশেষতঃ নৃত্যনাট্য চর্চার জন্য তার অনুশীলন বেশ ব্যাপক—এ কথাও বলা যায়।

কিন্তু আদিবাসী নৃত্যের ক্ষেত্রে এ জাতীয় স্বতন্ত্র কোন উদ্যোগ চোখে পড়ে না। সাধারণতঃ লোকনৃত্যের চর্চা ও অনুশীলন করার সময়ে একপ্রকার 'দায়-সারা' গোছের করে আদিবাসী নৃত্যের চর্চা করা হয়। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় যে, প্রচলিত লোকনৃত্য গোষ্ঠীনৃত্য হয়তো আছে, কিন্তু আদিবাসী জীবনের গোষ্ঠীনৃত্যের সঙ্গে তার অনেক তফাৎ।

স্থূল বিচারে আদিবাসী নৃত্য অবশ্যই লোকনৃত্য। কিন্তু তাদের সঙ্গীতের বিষয়, বাদ্যযন্ত্র, সংঘটন সময়, অংশগ্রহণকারীদের পরিচয়—ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই যে পার্থক্য দেখা যায় —তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা লোকনৃত্যেও যে স্তর বিন্যাস আছে—স্ত্রীলোক ও পুরুষ লোকের জন্য,—আদিবাসী নৃত্যে সেটা তত প্রয়োজনীয় নয় বা নেই বলেই চলে। স্ত্রী পুরুষের সম্মিলিত নৃত্যই তাদের সবার থেকে পৃথক করেছে। তাই তাদের নৃত্যের ছন্দ ভঙ্গিমা, পাদবিক্ষেপ এবং সর্বোপরি সামগ্রিকতা সেই নৃত্যে এনে দিয়েছে এক ভিন্নতর মাত্রা।

পশ্চিমবাংলার আদিবাসীরা সাধারণতঃ বাস করে তিন ভাবে—১ শহরাঞ্চল সংলগ্ন, ২. গ্রামের মধ্যে, ৩. আদিবাসী অঞ্চলে। বলা বাহুল্য যে তিন শ্রেণীই এখনও তাদের নৃত্যে সেই আদিম সাধনা বজায় রাখতে পেরেছেন। অন্যান্য শ্রেণী তাদের স্বাতন্ত্র্য হারাবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই আগামী দিনে তাদের গোষ্ঠীনৃত্য হয়তো গবেষণার বিষয় হয়ে দাড়াবে।

লোকনৃত্যের চর্চার ধারায়, আদিবাসী সমাজের নানা নৃত্যে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকলেও, এ বিষয়ে বিধিবদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনা আজ অবধি তেমন হয়েছে বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে ব্রতচারী আন্দোলনের গুরুসদয় মহাশয়ের নাম একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলেও, তার পরে আর তেমন নামও পাওয়া যায় না।

চাঁদনী রাত। চারিদিকে বসন্ত কাল—কেঁদ-মহুয়ার গন্ধ ভেসে আসছে। চারিদিকে এক অপার্থিব আনন্দের ইসারা। তারই মধ্যে আমরা সবাই নাচছি-গাইছি-শুনছি। কারো কোন চিন্তা নেই—সবাই যেন জীবনের আদিম নেশায় নেশাগ্রস্ত। তারপর সে দৃশ্য পাল্টে গেল। ঝড় উঠল। বনাঞ্চলে লাগল আন্দোলন। উৎসবের নৃত্য-গীত যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবার মত পরিবেশ হল। চারিদিকে বারুদের গন্ধ।

আমি শংকিত হলায়, উৎকর্ণ হলাম, অজানা আশংকায় কম্পিত হলাম। মাদলের বোলে যেন অশনিসংকেত পেলাম। বাঁশি যেন বেসুরো হয়ে গেল, তাদেরই নৃত্যছন্দ কী অদ্ভুত ভাবে এলোমেলো হয়ে গেল—যা একান্তই তাদের নিয়ম বহির্ভূত।

হা-রে-রে-রে করতে করতে কারা যেন ধেয়ে এল পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের সেই আনন্দবাসরে। এরা কারা? এরা গৌরবর্ণ, পোষাকে উন্নত, ভাষায় ভিন্ন। তাদের এই সজ্জা সাঁওতাল সমাজ চলে না। এতদিন তারাই ছিল প্রধান নাগরিক এই দেশটার—জঙ্গল ছিল তাদের ধাত্রীদেবতা। আজ এরা এখানে এসেছে কেন? তাদের আক্রমণ করতে, পদানত করতে, বশ্যতা স্বীকার করাতে? কী এদের পরিচয়?

সরল অরণ্য-মানব সেই নবাগতদের বোঝে না। তারা জানে যে ওরা বহিরাগত, ওরা উন্নত, ওরা বর্ধিষ্ণু। ওদের সংস্কৃতি আলাদা, ভাষা আলাদা, ধর্ম আলাদা—সব আলাদা। ওদের মনের ইচ্ছা বুঝে উঠতে এই অরণ্যচারীদের বহু সময় লাগল। যখন বুঝল ঐ উন্নত বহিরাগতদের স্বধর্ম, তখন দেখল—

তারা ভারতের আদিম অধিবাসী হলেও তারাই ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে গেছে, হয়েছে তাদের পদানত, মেনে নিয়েছে তাদের আধিপত্য, গ্রহণ করেছে তাদের অনেক কিছু—হয়তো এসব না করলে তাদের অস্তিত্ব রক্ষাই সম্ভব হত না! বহিরাগতরা কারা? ইতিহাস বলে তারাই নাকি আর্য। তাই আদিম অরণ্যচারীদের নাম ছিল অনার্য! যারা ছিল একদিন 'বনরাজ', তারা আজ হল 'বনদাস'।

'এ ইতিহাস দীর্ঘদিনের'।

কানের কাছে কে যেন খাঁটি সাঁওতালী ভাষায় এ কথাটি উচ্চারণ করল। তাকিয়ে দেখি বৃদ্ধ সাঁওতাল, যাকে এতক্ষণ গৃহাঙ্গণে দেখিনি, কোথা থেকে নৃত্য-গীতের শব্দে এ-ও এসে উপস্থিত হয়েছে এখানে। মনে হল, ও যেন যাত্রার বিবেক।

বোধহয় ঝিমিয়ে পড়েছিলাম খানিকক্ষণ।

একবার মনে হয়েছিল অন্য কালের কথা। ব্রতচারী গ্রামে লেখাপড়ার আদি কালে শিখেছিলাম সাঁওতালী নৃত্যের প্রথম পাঠ। তাদের ছন্দ সুর। আজ এতদিন পরে অন্তরে জেগে উঠল তাদের দু এক কলি:

আগা ডালে বস কোকিল মাঝ ডালে দিয়া রে
ভাঙ্গিল বিঁখির ডাল জীবনে নাই আশা রে!

স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করলাম—হয়তো ভুলই হল, তো হোক। আজ এই পরিবেশে অদ্ভুত এক মাদকতায় আমার মনও এদের সঙ্গে যেন মিশে গেছে। কতক্ষণ ঝিমিয়ে

পড়েছিলাম কে জানে ! আবার মনে বাজে সেই সুর ঃ

অকালে পুষিলাম পাখি ঘেত' মধু দিয়া রে
বিকালে পালালো পাখি দারুণ শোক দিয়া রে।

কখন যেন নাচের দল ভেঙ্গে গেছে।

যে যার ঘরে যাবার উদ্যোগ করছে। সেই ছেলেমেয়েগুলিকে আবার চোখে পড়ল। তাদের বললাম ঃ 'তোমাদের দলে কটি ছাত্র ছিল, তাদের দেখছি না ?'

মেয়ে দুটি বলল, 'ওরা দুজন তো আমাদের সঙ্গে নাচছিল—কেন, দেখেন নি ?'

নিতান্ত অপরিচিত এখন নই ওদের কাছে।

অর্থাৎ, আমার ঐ ঝিমিয়ে পড়া সময়ে লোকসংস্কৃতির তথ্যানুসন্ধানী ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই একে একে ওদের সঙ্গে নাচে অংশ গ্রহণ করেছে। সহমর্মিতায় এক না হলে এ শিক্ষা কি সম্পূর্ণ হয়! নাইবা জানল, নাই বা পারল—অন্তরের অনুভূতিটাই তো বড় কথা! তারা খাতা ভরালো, গান রেকর্ড করল, আলোকচিত্র গ্রহণ করল—এবংঃসর্বোপরি তাদের সঙ্গে যৌথনৃত্যে অংশগ্রহণ করল।

এটাই তো প্রকৃত ক্ষেত্রসমীক্ষা। জানি না, পরে এই বিদ্যাকে ওরা কোন্ কাজে লাগাবে। নাই বা প্রয়োগ করতে পারল। জীবনের সব শিক্ষাই তো এক প্রকার অভিজ্ঞতা। বই না পড়েও যে কত কী জানা যায়—তাও তো ওরা জানল।

এবারে বিদায় নেবার পালা—এখানে অনেকক্ষণ কেটে গেল সাঁওতালী লোক-নৃত্যের আসরে। মনে থাকবে সরোজিনী হেমব্রম নাম্নী ঐ সুশিক্ষিত সাঁওতাল রমণীর কথা, ওদের আপ্যায়নের কথা, সরোজিনীর ঐ ছেলেমেয়েগুলির কথা। মনে থাকবে সেই প্রধান গায়কের কথা, যে আমাদের শোনাবার জন্যই তার নিজস্ব কণ্ঠে 'নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা যদি বা পথ ভুলে যায়' গানটি প্রায় সাঁওতালী ঢঙে গেয়ে শুনিয়েছিল।

অল্পক্ষণের আলাপে মনে ছাপ রেখে গেল চাকদার সঞ্জয় ঘোষাল, পলাশীপাড়ার মৃদুলা গুঁই, আসাননগরের তরুণ ড্রাইভার, চন্দননগরের মৃত্তিকা আর বাংলাদেশের মানিক চৌধুরী।

ওরা এবারে হয়তো অন্য কোন গ্রামে যাবে, অন্য কোন তথ্যের সন্ধানে। আমি যাবো বাস স্টপে—বালুরঘাটে ফিরবার জন্য। বেলা বাড়ছে।

মার্চ ১৯৯৯, বালুরখাট।

লোকসংস্কৃতিশাস্ত্রীর কাছে প্রশ্ন, লোকউৎসবের সঠিক সংজ্ঞা কি ?
যে উৎসব সমাজের,
সকল শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে,
যে উৎসবে সমাজের সকল বা অধিকাংশ
শ্রেণীর লোকের ষোল আনা অংশগ্রহণ সম্ভব হয়,
যে উৎসব এক বিশেষ সম্প্রদায়ের হলেও,
তার আনন্দ বা রেশ ছড়িয়ে পড়ে সেই
সমাজের বৃত্ত-বহির্ভূত সর্বত্র—
তাকেই কি তাহলে বলব সার্থক লোকউৎসব ?
অথবা, যদি পরিবারকেন্দ্রিক উৎসবে গ্রামের সকল
অধিবাসীর অংশগ্রহণ হয়, এক পল্লীর অনুষ্ঠানে যদি
আশেপাশের সমগ্র পল্লীর অধিবাসী
মুখরিত হয়ে ওঠে,
তবে তাকেও তো লোকউৎসব বলা চলে।

লোকউৎসব-৩

লোকউৎসবের সীমানা-পরিধি তাহলে কতদূর বিস্তৃত ?
জাতি-ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কার-প্রথা-ঐতিহ্য ভেদে
তাই লোকউৎসবের স্বরূপ চিহ্নিত
করা এক সমস্যা বিশেষ।
এক জাতির উৎসয যদি অন্য জাতিতেও ছড়িয়ে পড়ে,
এক ধর্মবিশ্বাসের রীতি-আচার-প্রথা-সংস্কার
যদি অন্য ধর্ম বা বিশ্বাসী গোষ্ঠীও সহজেই আপন
করে গ্রহণ ও মান্য করে,
কিংবা এক বিশেষ সংস্কার-প্রথা
যদি নির্বিশেষ হয়ে সকল জনসমাজের
অন্তরকে এক বৃহৎ আঙিনায় একত্র করতে পারে—
তবেই বোধহয় লোকউৎসবের প্রকৃত চেহারাকে
খানিকটা স্পর্শ করা যায়।
সে অর্থে দুর্গাপূজা-বড়দিন-মহরম—সবারই এক পরিচয় হতে পারে।

ভুরুলের মহরম মেলা

লালগোলা প্যাসেঞ্জার সেদিন মোটেই লেট্ করেনি।

বোধহয় বেলা দশটা নাগাদ নেমেছিলাম শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের পলাশী ষ্টেশনে। এ সেই পলাশী, যেখান থেকে রেলপথে মুর্শিদাবাদ জেলা সুরু হল। আর সেই পলাশী 'বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর।' পলাশীর আমবাগান—পলাশীর যুদ্ধ—পলাশী মনুমেণ্ট-অজস্র স্মৃতি।

পলাশী ষ্টেশন থেকে প্রায় মাইল খানেক পথ হেঁটে আমাদের যেতে হবে ভুরুল। আসল নাম হল ভুরুলিয়া।

সকাল দশটার পর থেকেই নাকি মেলার বন্দোবস্ত শুরু হয়ে যায়। জমে ওঠে বিকালের দিকে। যত সূর্য ঢল নামে পশ্চিমাকাশে, ততই যেন জনতার ঢেউ আছড়ে পড়ে মেলা প্রাঙ্গণে।

মেলা প্রাঙ্গণের পরিবেশটা বেশ বিচিত্র। তিন দিক থেকে তিনটি পথ এসে মিলিত হয়েছে এখানে। স্থানটি—যেটি মেলার সময়ে কারবালা নামে অভিহিত হয়, সেটি একটু উঁচু আশেপাশের অঞ্চল থেকে—তাই বহুদূর থেকে মেলার জনসমাবেশটা দূরাগত যাত্রীদের চোখে পড়ে। প্রাঙ্গণের বৃদ্ধ বটগাছটা তো আমরা বহুদূর থেকে দেখতে পেয়ে সেটিকেই নিশেন করে এগোতে লাগলাম। তার নীচেটা এই দিনমানেও বেশ আঁধার—অসংখ্য ঝুরি নেমে স্থানটি বেশ জমাটি হয়ে গেছে—এখানেই নাকি আসল ভীড়টা জমবে।

জনতার ভীড়ে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। এ মেলা মুসলমানদের, কিন্তু ফাঁকা মাঠের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে যারা চলেছে কারবালার দিকে—তারা সবাই কি মুসলমান? অন্য সমাজের লোক কি সেখানে নেই? কিংবা আমাদের মত সাধারণ দর্শনার্থী?

প্রাঙ্গণে এসে পড়ে দেখলাম সেই পীরের দরগাটি—এর কথা আগেই শোনা ছিল—পীরের নাম জানি না। এই দরগাকে কেন্দ্র করেই নাকি মহরমের হৈ-চৈ জমে ওঠে। একটা কথা বলি, মহরমের সঙ্গে কোন পীরের নাম জড়িয়ে আছে—তা আগে শুনিনি বা কোন গ্রন্থে পড়িনি। অন্যান্য কারবালাতে তা আছে কি না—তাও জানি না। তবে যস্মিন দেশে—

দরগার কথাটা একটু বলা দরকার।

অল্প পরিচয়ে জানা গেল দরগা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন খাদেম আছেন। এখানে মহরমের দিন মানসিক করতে আসেন অনেকে। তিনি এই দরগা থেকে মোরগ কেটে নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে রান্না করে ঘি-মিশ্রিত খিঁচুড়ি—যাঁকে এঁরা বলেন

'দানা তাত' অথবা আতপ চালের গ্‌ুঁড়ির রুটি তৈরী করে দরগায় জমা দেন। দরগা পরিচর্যা যাঁর হাতে তিনি ঐ খাদ্য নিজের প্রয়োজন মত রেখে বাকী সব বিলিয়ে দেন গরীব দুঃখীদের মধ্যে।

মানত যারা করেন, তারা ঐ জাতীয় কোন নির্দিষ্ট স্থানে মাটির ঘোড়া দেন, সিন্নিও দেন অনেকে। মেলার সময় তাই দরগার সামনে মানসিকের ঘোড়ার এক স্তূপ হয়ে যায়। কিন্তু মৌলবী সাহেবরা এইসব মানসিক বা ঘোড়া দেওয়া ইত্যাদি পছন্দ করেন না। তবে এটা চলে আসছে—এই যা। তবে এখানে নাকি অন্যান্য স্থানের চেয়ে মানত করার পরিমাণ কম।

দরগার অবস্থানটি বেশ শোচনীয়। দৈর্ঘে-প্রস্থে প্রায় তিন হাত বর্গাকৃতি একটি ইঁটের স্তূপ জাতীয়—প্রাচীনতার জন্য তা ভেঙ্গে ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হচ্ছে ক্রমেই। মাটি থেকে এর উচ্চতা ছয়-সাড়ে ছয় ফুট হবে। ওপর দিকটা চূড়া হয়ে গেছে। সামনে বা পিছনে কোথাও কোন লিপি নেই—থাকলেও তা আজ আর হদিশ করা সম্ভব নয়।

এই দরগার বয়স বা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য খুঁজে পেলাম না—নানা জনকে জিগ্যেস করেও। এমন কি, মহীউদ্দীন, নিকটবর্তী এক মাষ্টারমশাই-এর মুখে জেনেছিলাম, স্থানীয় কোন পত্র-পত্রিকাতেও ন্যাকি সে রকম কোন বিবরব তার চোখে পড়েনি। ইতিহাসে উল্লেখ নেই, প্রচলিত কোন ইতিহাস নেই—তাই কল্পনা আর কিম্বদন্তী সেখানে ছড়িয়েছে ভিন্ন এক দেব-মাহাত্ম্য।

'ধান ভানতে শিবের গীত' বলে মনে হলেও, এই কারবালায় অবস্থিত দরগাটি সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার আছে—সেটি মহরমের বর্ণনার জন্যই। রোগ মুক্তির জন্য যারা মানসিক করেন, দরগা পরিচর্যাকারী ব্যক্তি তাদের হাতে একটি কাগজের ছোট পুরিয়া তুলে দেন —ওর মধ্যে থাকে ইঁটের ভাঙ্গা ধূলি। এর চলতি বাংলা নাম হল 'ধুলফুল'। মেলায় আগত মানতকারী ব্যক্তিরা বিশেষতঃ নারীসমাজ ঐ ধুলা শ্রদ্ধাভরে কপালে ঠেকান।

আলাপ হল নওসের আলির সঙ্গে—মেলায় তার দোকান বসবে। তেলেভাজা-পাঁপড়ওয়ালী সরি-বেওয়া সৌখীন খেলনাপাতির দোকানী খালেক মিয়া—আরো কতজনের সঙ্গে। এরা ছাড়া আরো অনেকেই। এদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করছিলাম দরগার নানা সংবাদ—তাদের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে এ ব্যাপারে।

এই কারবালা অংশটি তেমন বিস্তৃত নয়—ধীরে ধীরে তা লোকজন, দোকানী ইত্যাদিতে ভরে উঠেছে। প্রত্যেক ব্যাপারীই একটি করে অস্থায়ী সংক্ষিপ্ত দোকান সাজিয়ে বসতে বেশ তৎপর। কয়েক ঘণ্টার জন্য কেনাকাটা হয়। সূর্যাস্তর পরে কতক্ষণই বা থাকা যাবে এখানে!

অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করি প্রায় প্রতি মেলাতেই। এখানে মিষ্টির দোকানের সংখ্যা বোধহয় তুলনীয় অনুপাতে বেশীই। ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয়

ভুরুলের মহরম মেলা

লালগোলা প্যাসেঞ্জার সেদিন মোটেই লেট্ করেনি।

বোধহয় বেলা দশটা নাগাদ নেমেছিলাম শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের পলাশী ষ্টেশনে। এ সেই পলাশী, যেখান থেকে রেলপথে মুর্শিদাবাদ জেলা সুরু হল। আর সেই পলাশী 'বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর।' পলাশীর আমবাগান—পলাশীর যুদ্ধ—পলাশী মনুমেণ্ট-অজস্র স্মৃতি।

পলাশী ষ্টেশন থেকে প্রায় মাইল খানেক পথ হেঁটে আমাদের যেতে হবে ভুরুল। আসল নাম হল ভুরুলিয়া।

সকাল দশটার পর থেকেই নাকি মেলার বন্দোবস্ত শুরু হয়ে যায়। জমে ওঠে বিকালের দিকে। যত সূর্য ঢল নামে পশ্চিমাকাশে, ততই যেন জনতার ঢেউ আছড়ে পড়ে মেলা প্রাঙ্গণে।

মেলা প্রাঙ্গণের পরিবেশটা বেশ বিচিত্র। তিন দিক থেকে তিনটি পথ এসে মিলিত হয়েছে এখানে। স্থানটি—যেটি মেলার সময়ে কারবালা নামে অভিহিত হয়, সেটি একটু উঁচু আশেপাশের অঞ্চল থেকে—তাই বহুদূর থেকে মেলার জনসমাবেশটা দূরাগত যাত্রীদের চোখে পড়ে। প্রাঙ্গণের বৃদ্ধ বটগাছটা তো আমরা বহুদূর থেকে দেখতে পেয়ে সেটিকেই নিশেন করে এগোতে লাগলাম। তার নীচেটা এই দিনমানেও বেশ আঁধার—অসংখ্য ঝুরি নেমে স্থানটি বেশ জমাটি হয়ে গেছে—এখানেই নাকি আসল ভীড়টা জমবে।

জনতার ভীড়ে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। এ মেলা মুসলমানদের, কিন্তু ফাঁকা মাঠের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে যারা চলেছে কারবালার দিকে—তারা সবাই কি মুসলমান? অন্য সমাজের লোক কি সেখানে নেই? কিংবা আমাদের মত সাধারণ দর্শনার্থী?

প্রাঙ্গণে এসে পড়ে দেখলাম সেই পীরের দরগাটি—এর কথা আগেই শোনা ছিল—পীরের নাম জানি না। এই দরগাকে কেন্দ্র করেই নাকি মহরমের হৈ-চৈ জমে ওঠে। একটা কথা বলি, মহরমের সঙ্গে কোন পীরের নাম জড়িয়ে আছে—তা আগে শুনিনি বা কোন গ্রন্থে পড়িনি। অন্যান্য কারবালাতে তা আছে কি না—তাও জানি না। তবে যস্মিন দেশে—

দরগার কথাটা একটু বলা দরকার।

অল্প পরিচয়ে জানা গেল দরগা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন খাদেম আছেন। এখানে মহরমের দিন মানসিক করতে আসেন অনেকে। তিনি এই দরগা থেকে মোরগ কেটে নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে রান্না করে ঘি-মিশ্রিত খিঁচুড়ি—যাঁকে এঁরা বলেন

'দানা ভাত' অথবা আতপ চালের গঁড়ির রুটি তৈরী করে দরগায় জমা দেন। দরগা পরিচর্যা যাঁর হাতে তিনি ঐ খাদ্য নিজের প্রয়োজন মত রেখে বাকী সব বিলিয়ে দেন গরীব দুঃখীদের মধ্যে।

মানত যারা করেন, তারা ঐ জাতীয় কোন নির্দিষ্ট স্থানে মাটির ঘোড়া দেন, সিন্নিও দেন অনেকে। মেলার সময় তাই দরগার সামনে মানসিকের ঘোড়ার এক স্তূপ হয়ে যায়। কিন্তু মৌলবী সাহেবরা এইসব মানসিক বা ঘোড়া দেওয়া ইত্যাদি পছন্দ করেন না। তবে এটা চলে আসছে—এই যা। তবে এখানে নাকি অন্যান্য স্থানের চেয়ে মানত করার পরিমাণ কম।

দরগার অবস্থানটি বেশ শোচনীয়। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় তিন হাত বর্গাকৃতি একটি ইঁটের স্তূপ জাতীয়—প্রাচীনতার জন্য তা ভেঙ্গে ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হচ্ছে ক্রমেই। মাটি থেকে এর উচ্চতা ছয়-সাড়ে ছয় ফুট হবে। ওপর দিকটা চূড়া হয়ে গেছে। সামনে বা পিছনে কোথাও কোন লিপি নেই—থাকলেও তা আজ আর হদিশ করা সম্ভব নয়।

এই দরগার বয়স বা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য খুঁজে পেলাম না—নানা জনকে জিগ্যেস করেও। এমন কি, মহীউদ্দীন, নিকটবর্তী এক মাষ্টারমশাই-এর মুখে জেনেছিলাম, স্থানীয় কোন পত্র-পত্রিকাতেও ন্যাকি সে রকম কোন বিবরব তার চোখে পড়েনি। ইতিহাসে উল্লেখ নেই, প্রচলিত কোন ইতিহাস নেই—তাই কল্পনা আর কিম্বদন্তী সেখানে ছড়িয়েছে ভিন্ন এক দেব-মাহাত্ম্য।

'ধান ভানতে শিবের গীত' বলে মনে হলেও, এই কারবালায় অবস্থিত দরগাটি সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার আছে—সেটি মহরমের বর্ণনার জন্যই। রোগ মুক্তির জন্য যারা মানসিক করেন, দরগা পরিচর্যাকারী ব্যক্তি তাদের হাতে একটি কাগজের ছোট পুরিয়া তুলে দেন —ওর মধ্যে থাকে ইঁটের ভাঙ্গা ধূলি। এর চলতি বাংলা নাম হল 'ধুলফুল'। মেলায় আগত মানতকারী ব্যক্তিরা বিশেষতঃ নারীসমাজ ঐ ধুলা শ্রদ্ধাভরে কপালে ঠেকান।

আলাপ হল নওসের আলির সঙ্গে—মেলায় তার দোকান বসবে। তেলেভাজা-পাঁপড়ওয়ালী সরি-বেওয়া সৌখীন খেলনাপাতির দোকানী খালেক মিয়া—আরো কতজনের সঙ্গে। এরা ছাড়া আরো অনেকেই। এদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করছিলাম দরগার নানা সংবাদ—তাদের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে এ ব্যাপারে।

এই কারবালা অংশটি তেমন বিস্তৃত নয়—ধীরে ধীরে তা লোকজন, দোকানী ইত্যাদিতে ভরে উঠেছে। প্রত্যেক ব্যাপারীই একটি করে অস্থায়ী সংক্ষিপ্ত দোকান সাজিয়ে বসতে বেশ তৎপর। কয়েক ঘণ্টার জন্য কেনাকাটা হয়। সূর্যাস্তর পরে কতক্ষণই বা থাকা যাবে এখানে!

অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করি প্রায় প্রতি মেলাতেই। এখানে মিষ্টির দোকানের সংখ্যা বোধহয় তুলনীয় অনুপাতে বেশীই। ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয়

দ্রব্য কেনা হোক বা না হোক, মিষ্টি খাওয়া বা খাওয়ানো—এখানে এক বিচিত্র প্রথা। শুধু তাই নয়, এক ধরণের বিচিত্রিত মৃৎপাত্র পাওয়া যায় এই মেলাতেই! তাতে করে মিষ্টান্ন নিয়ে যায় তারা বাড়ীতে বা সমর্পণ করে দরগায়।

নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম থেকে জারী দল নিয়ে এসেছে রফিকুল—তার দলের একটি কাপড়ের ব্যানারে লেখা আছে রফিকুলের নাম। তার কাছে জানতে চাই 'কারবালা' শব্দের অর্থ। সে পেশায় কৃষিজীবী, পড়েছে পঞ্চম মান পর্যন্ত—তার গলাটা সুরেলা আর মুখে মুখে মর্সিয়া গান বলতে পারে বলে জারী গানের ব্যাপারটা তার আয়ত্বে আছে। তাছাড়া হয়তো পৈতৃক সূত্রেও কিছু গুণ পেয়ে থাকতে পারে। তার গাওয়া একটি মর্সিয়া গানের কিয়দংশ হল ঃ

বাজিল এজিদের ডঙ্কা
কাঁপিল এই মদিনা
চৌদিকে বসিয়া গেল
এজিদের সেপাই খানা
ঘোড়া কুদে সেপাই হাঁকে
ধূলা ওড়ে ময়দানে
এজিদা হারাম জাদে
ঘিরেছে আজি মদিনে
না করে খোদার ডর
না করে রছুলে ভয়
বদ রক্ত ওই নেমক হারাম
নবি বংশে দুঃখ দেয়।

কারবালা—মধ্যপ্রাচ্যের ফোরাত নদীর ধারে এই 'মহরম' নামক শোকাবহ ঘটনার পটভূমি। আজ এখানে কোন নদী নেই। নেই সেই জলের জন্য হাহাকার বা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। তবু সেই ঘটনাকেই স্মরণ করে স্থানীয় লোক এই প্রাঙ্গণটিকেই 'কারবালা' মনে করে আজ পুরাতন শোকের কথা স্মরণ করে।

ঠিক এই ভাবেই একদিন কৃত্তিবাসের হাতে পড়ে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ বাংলাদেশের জমিদার বাড়ীর রূপ নিয়েছিল। আর বাংলার লোকগীতিতে হর-গৌরীর বাসস্থান কৈলাস পর্বত যে এই বাংলারই কোন প্রচলিত স্থান—এ ব্যাখ্যা তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে।

দাঁড়িয়ে আছি লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে সেই 'কারবালা' নামক স্থানটির কাছাকাছি। স্থানটি একটু উঁচু বলে দেখতে পাচ্ছি, দূর যেকে মেঠো পথ ভেঙ্গে লোক আসছে দলে দলে, নানা বয়সের – তবে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। হাতে মানচিত্র থাকলে বলে দিতে পারতাম নিকটবর্তী কোন্ কোন্ গ্রামের লোক এরা।

কথাবার্তায় জানলাম, এবারে জারি গানের দল নাকি ভালই এসেছে—আরো

হয়তো আসবে। তার সঙ্গে আসছে মাতনের দল। জারী গানের সামনে থাকে কাপড়ে লেখা ব্যানার—অর্থাৎ তাদের পরিচয় পত্র। এ জাতীয় কয়েকটি দলের নাম ও ঠিকানা নোট করে রাখলাম।

শোভাযাত্রা সহকারে ওরা একে একে মেলার নানা দিক দিয়ে এসে মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। সমবেত কণ্ঠে তারা মাতনের গান গেয়ে মেলা প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে প্রতিটি দল একে একে গান গেয়ে যায়—সবই মহরমের করুণ কাহিনী বিষয়ক। সেই লাইনের একটি বিশেষ স্থানে এসে তারা গানের ছন্দের তালে তালে বুকে চাপড় দেয়। 'মাতন' গান সম্বন্ধে আমাদের কারোরই তেমন ধারণা নেই—তবু একটি গান এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

প্রায় সব মহরমের মেলায় এই ভাবের গান শোনা যায়। হাসান-হোসেনের জন্য শোকপ্রকাশে বুক চাপড়ানো, কাতর কণ্ঠে গান—যাতে ফুটে ওঠে পিপাসার আর্তনাদ, প্রিয়জনের মৃত্যুর দুঃখ ঃ

হায় হায় হাসেন হায় হায় হোসেন
কাশেম, আকবর হায় আসগার।
পানি বিনে মরে রণে দিল কলেজা ফতেমার ॥
আহালিয়াতে নিয়ে সাথে ছেড়ে শাহা মদিনা
কুফায় যাওয়ার তরে হইলেন রওয়ানা
রাহা ভুলে সকল মিলে পেঁছিলেন কারবালা
কাতেলের আলামত দেখে হোসেন উতলা ॥

এ গানটি বেশ দীর্ঘ, অনেকক্ষণ ধরে গাইল তারা। জিজ্ঞাসায় জানা গেল এটি হল কারবালায় পেঁছবার পর 'মাতন জারি'। এর পর আছে আরো নানা ধরণের মাতন জারি। অর্থাৎ মহরমের কাহিনী যত এগুবে, গানগুলিও ততই সেদিকে যাবে। যেমন হল 'কাশেমের' শোকে সখিনার মাতন ঃ—

হায় হায় হোসেন হায় হোসেন
কাসেম, আকবর হায় আসগর।
পানি বিনে মরে রণে দিল কলেজা ফতেমার ॥
বুকে মারে মাতম করে কান্দে সব আহালিয়াতে
সখিনা কান্দিয়া বলে কোথায় প্রাণনাথ।
সাদীর সময়ে মেহেদী পিন্দিনাবো এ হাতে
রঙ্গিন হয়েছে কেমন দেখ তোমার লহুতে ॥
করে সাদী হয়ে বাদী আমায় ফেলে যেও না
আমিও যাইব সাথে একা যেতে দিব না ॥

অতঃপর তারা সারিবদ্ধভাবে বসে জারী গান সুরু করে। হাতে তালি মেরে সমবেত ও একক কণ্ঠে জারিগান গাওয়া হয়। এরও বিষয়বস্তু কারবালার প্রান্তরে

'চান্দ্রমাসের বৎসরের প্রথম মাসের নাম মহরম। হিজরী ৬১ সালের ৮ই মহরম তারিখে মদিনাধিপতি হজরত এমাম হোসেন ঘটনাক্রমে সপরিবারে কারবালা ভূমিতে উপস্থিত হন এবং এজিদ-প্রেরিত সৈন্যহস্তে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। এই শোচনীয় ঘটনা 'মহরম' শব্দে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ ঘটনার মূল কী এবং কী কারণে সেই ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, ইহার নিগূঢ় তথ্য বোধহয় অনেকেই অবগত আছেন। পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া "বিষাদ সিন্ধু" বিরচিত হইল।'

শতাধিক বৎসর পূর্বে মীর মোশাররফ হোসেন সাহেব রচিত 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে 'গ্রন্থকারের নিবেদন' থেকে উপরোক্ত অংশটি উদ্ধৃত হল।

সেই শোকাবহ ঘটনার স্মরণে এ দেশের মুসলমান সমাজ প্রতি বৎসর ঐ নির্দিষ্ট দিনে মহরম উৎসব উদযাপন করেন। এ উৎসবে নেই কোন আনন্দ বা উচ্ছ্বাস। খ্রীষ্টান সমাজে যেমন গুডফ্রাইডে—যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশমৃত্যুর স্মরণে উদযাপিত শোক দিবস, মুসলমান সমাজের মহরম যেন সেই রকমই এক শোক উৎসব। প্রসঙ্গতঃ বৃহত্তর সমাজের কোন উৎসবে শোক-প্রকাশের কোন স্থান নেই।

উৎসবের দিনে শোকাচ্ছন্ন মুসলমানরা কোন পরিচিত স্থানে এসে সমবেত হন। সচরাচর সেই স্থানটি হয় কোন পীরস্থান বা দরগা-মসজিদ যুক্ত স্থান। এ দিন সেই স্থান কারবালা প্রান্তরে পরিণত হয়—শুধু উৎসব পালনের জন্যই। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান অধ্যুষিত বহু অঞ্চলেই ঐ ধরণের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এ বিষয়ে মুর্শিদাবাদের লালগাগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর চব্বিশ পরগণার নানা স্থানে বিশেষত বারাসাত এলাকায়ও তা সবিশেষ পালিত হয়। শহর কলকাতার রাজাবাজারকে কেন্দ্র করে যে সমারোহপূর্ণ সাড়ম্বর ক্রিয়াবহুল বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হত এই উপলক্ষে—তা-ও সবাই জানেন। মহরমের ঘটনাকে যেভাবে যেখানে-সেখানে খণ্ড রূপে রূপায়িত করা হয় নানা প্রকরণের মাধ্যমে—তা খুবই আকর্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে উত্তর কলিকাতায় 'কারবালা ট্যাংক লেন' রাস্তাটির নামকরণ উৎস সম্বন্ধে মনে আজ চিন্তা উদিত হতে পারে।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণেও এই উৎসব দর্শনের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রতিবেশী রাজ্য বাংলাদেশের ঢাকা শহরের মহরম উৎসবের সমৃদ্ধ বিবরণ এখন এদেশেও সহজ লভ্য। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর 'লোক-সাহিত্য' (১৯৬৩) গ্রন্থে বলেছেন: 'জারী গান সাধারণতঃ বায়না করে আনা হত মহরম মাসে। দুটি দল আসতো। একদল পরিশ্রান্ত হলে অন্য দল সুরু করতো। মহরম মাসে সাধারণতঃ 'শহীদে কারবালা', 'ইমাম চুরি' প্রভৃতি পালা হত। জারী-গানের প্রধান কবিয়ালের পায়ে নূপুর, হাতে থাকতো 'দাং'...জারী গান করতো আর অঙ্গভঙ্গী করে সেই দং যন্ত্রটি ঝির ঝির ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে বাজাতো।'...পৃ. ২৪৫

সংঘটিত সেই করুণ কাহিনী। এ গানগুলি মনে হল আকারে ও গায়ন ভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, কাহিনী বিবৃতি মূলক।

এই মেলায় গাওয়া একটি ক্ষুদ্রায়তন জারী গান এখানে উল্লেখ করি। যিনি শোনালেন, তিনি জানালেন এ গানটি নাকি এতদঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়। একদা কৃষ্ণনগর শহরের রবীন্দ্রভবনে জারী গানের যে উৎসব হয়, সেখানে এটি শোনা। সেই সভায় অনেক নামী-দামী রাষ্ট্রীয় ব্যক্তি ছিলেন, অনেক জারী গানের দল যাত্রারূপ গান শোনান। বিভিন্ন দল এসেছিল নদীয়া জেলার নানা গ্রাম হতে। গানের কথাগুলি হল ঃ

এজিদ বলে জয়ন্যল তুমি কর এই কাজ,
আমার নামে দামেগাস্কতে (=দামাস্কাস) পড়া নামাজ।
জয়নাল বলে তোমার নামে পড়িব নামাজ
দামেস্ক তুফানে
এমাম মেরে বেহেস্তে (=স্বর্গে) যাবে এই ভেবেছ মনে ?
তোমার খেলা দেখবে আল্লা আরসেতে (=স্বর্গে) বসে
ঐ মুখ ভাঙিব তোমার পায়জার চোটে।
ঐ কথা শুনে এজিদের গোস্বা (=গোঁসা) হল ভারি
ফের নিয়ে মা জয়নালকে ধরে হাতে দিয়ে দড়ি।
'খাকদান' নামে এক পালোয়ান সেই খানেতে ছিল,
আশি মণ এক রশি নিয়ে সামনে দাঁড়াইল।
জয়নাল উঠিয়া বলে ঃ 'ওরে খানদান ভাই,
দিয়ো না মোর হাতে দড়ি আল্লাজীর দোহাই।
পালাবার আসামী নইরে সামনে হাজির আছি,
ছেড়ে দে মোর হাতের বন্ধন আল্লা বলে ডাকি।
ফের জয়নাল উঠিয়া বলে ওরে খানদান ভাই
চলো তবে বাদশার কাছে নমাজ পড়তে যাই।
ওজু (=হাত পা ধৌত, দেহ শুদ্ধি) করিয়া জয়নাল পড়ে আল্লার নাম,
দেল শক করিয়া পড়ে আল্লাজীর নাম॥

তার কাছেই জানা গেল নদীয়া জেলার হাঁসপুকুরিয়া গ্রামের করিম শেখের কথা। করিম শেখের নেতৃত্বে সে গ্রামে একটি দল তৈরী হয়েছিল—এ জাতীয় গানে তাদের বেশ পারদর্শিতা ছিল। সেখান থেকেই সংগ্রহ করা এই 'করিমের জারী'—তবে নামকরণটি যে ভুল, তা আর তাকে বললাম না। কেন না, জারী গান পরিচিত হয় গায়ক বা নায়কদলের নামে নয়, মহরমের ঘটনা দিয়ে।

এ এক অভিনব লোকউৎসব। শোকউৎসব না বলে একে লোকউৎসব বলাই

বোধহয় ভাল। কেননা, বৃহত্তর সমাজের যত কিছু উৎসবের সঙ্গে অদ্যাবধি পরিচয় হয়েছে, তার মধ্যে শোকের কোন স্থান নেই। শোক কখনই উৎসবের কেন্দ্র হতে পারে না বলেই সবার ধারণা। কিন্তু এই মহরম অনুষ্ঠানের সবটাই যেন শোকের নানাবিধ প্রকাশ। মনে হয় একমাত্র খ্রীষ্টানদের গুড ফ্রাইডের সঙ্গে এর তুলনা হতে পারে—অর্থাৎ যে দিনটিতে যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে হত্যা করা হয়। অবশ্য খ্রীষ্টসমাজে এ নিয়ে এ জাতীয় কোন প্রকাশ্য উৎসব হয় বলে শুনিনি।

ইতিমধ্যে অন্যান্য দলও আসতে সুরু করে। প্রত্যেকেই পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে আপন আপন পরিচয়পত্র সহ আসছে, গান গাইছে এবং প্রাঙ্গণের এক ধারে বসে পড়ছে বৃত্তাকার ভঙ্গীতে। মোট কতগুলি দল এসেছে তা এখন স্পষ্ট গুণে নেওয়া যায়। তবে গানের মধ্য দিয়েই প্রতিটি দল পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে বলে, মনে হয় তাদের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব তৈরী হয়ে যায়। কেননা, দেখলাম, কোন দলই অন্য দলের সঙ্গে তেমন কোন পরিচয় করছে না।

জারী গানের সদস্যদের হাতে থাকে লাঠি। গানের পর তারা লাঠি খেলা সুরু করে—লাঠি ঘুরিয়ে আত্মরক্ষার নানা কসরৎ। দেখে মনে হয়, অংশগ্রহণকারীরা বিষয়টি বেশ ভালভাবেই অনুশীলন করে এসেছে। এ সময়ে মেলাস্থল সত্য সত্যই জমজমাট হয়ে ওঠে। বটগাছটি ভরে যায় ছেলেমানুষদের ভীড়ে। ভাল করে সব কিছু দেখবার জন্যই তাদের এই উর্ধগমন—বটগাছ তাতে কোন আপত্তি করে না।

দেখতে দেখতে মেলার ঐ বিশাল জনসমাবেশের চেহারা ধীরে ধীরে কিভাবে যেন পাল্টে গেল। সমগ্র জনতা টুকরো হয়ে কয়েকটি দলে যেন ভাগ হয়ে গেল। লক্ষ্য করে দেখলাম, দর্শক স্থির আছে, তবে লাঠি খেলার দলের সদস্যরা একদল থেকে অপর দলে যাতায়াত করছে। তবে এসব কাজের মধ্যেও লাঠি খেলার মাতন ও জারীর গান ঠিকই হয়ে যাচ্ছে।

এতক্ষণ ধরে ভুরুলের মহরম মেলার জারি গান লাঠি খেলা—এ সবের কথা বললাম—কিন্তু আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখনও বলা হয় নি। সেটা অবশ্য সব মহরম মেলায় হয় না। সেটি হল মহরমের তাজিয়া বের করা।

এই তাজিয়া লম্বা ধরণের—তাতে থাকে দুলদুল অর্থাৎ কাশিমের ঘোড়া। বাখারি-কাপড়-কাগজ দিয়ে তৈরী নকল ঘোড়া। তৈরী করে গ্রামের শিল্পীরাই। বড়ই মনোহর তার আকৃতি। তার পেটের মধ্যস্থান থাকে ফাঁকা—সেখানে থাকে তাজিয়া নির্মাতা। তাজিয়ার সামনে থাকে লাঠি খেলোয়াড়ের দল—অন্ততঃ পক্ষে ২৫ জনের দল। এই তাজিয়া বহন করে ১২।১৪ জন লোক।

আমার ঠিক সামনে পলাশীর চিনিকলের ইরফান মণ্ডল দাঁড়িয়েছিল। ভদ্রলোক জানালেন আমাকে, 'এখন তাজিয়া নিয়ে উৎসব করার রেওয়াজ কমে গেছে।' তাঁর কথা শুনে মনে হল ইনি বোধহয় এ বিষয়ে বেশ কিছু জানেন। মুহূর্তে তার

মুখোমুখি হয়ে আমার আগ্রহ জানাই তাঁকে। তখন তিনি বলেন, 'আগে অন্ততঃ আট-দশটা গ্রাম থেকে তাজিয়া এসে সমবেত হত ভুরুলিয়ার মেলা প্রাঙ্গণে। এখন যে তার সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে, তার প্রধান কারণ হল অর্থনৈতিক সংকট। অবশ্য জারী ও মাতন গানের জৌলুষ মোটেই কমেনি।'

আমার মনে হয় তার একমাত্র কারণ, সেগুলি ব্যক্তির নিজস্ব দক্ষতার ব্যাপার—তার সঙ্গে ব্যয়-বহুলতার কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু তাজিয়া বা দুল-দুল তৈরীর খরচ দিনকে দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রতিভার স্থান যতটা, তার চেয়ে বেড়েছে অসুস্থ প্রতিযোগিতার গোপন ইচ্ছা।

তবে প্রথাটা ছিল এক রকম ভালই। এইভাবে মাতনের সময়ে আশেপাশের সব গ্রাম থেকে সব তাজিয়া একত্র হয়ে এখানে এলে সবার বিচারে যেটি শ্রেষ্ঠ বলে মান্য হত, সেটিকে বসানো হত সকলের ডাইনে। তারপর ক্রমান্বয়ে মান অনুসারে পরবর্তী শ্রেষ্ঠগুলিকে বামদিকে পর্যায়ক্রমে সাজানো হত। বিষয়টা আমার কেমন বিসদৃশ বলে মনে হল।

এসব দৃশ্য আমরা দেখিনি সেখানে এবং ঐ মেলায় আগামী দিনেও দেখা যাবে বলে মনে হয় না। তাই অন্যের চোখ দিয়ে অতীত পর্যবেক্ষণ করলাম।

তাজিয়ার প্রসঙ্গ যখন উঠলই, তখন আমার পরিচিত নদীয়া জেলার বার্নিয়া স্কুলের মাষ্টার মহীউদ্দীনের কাহিনী শুনাই। সে আমাকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিল—এই মেলার কিছু অতীত কাহিনী। তার নিবাস পলাশী চিনি কলের অতি নিকটে হলেও তার গৃহে যাইনি বলে, তিনি খুবই দুঃখিত হয়েছেন। তবুও আমার জন্য তিনি এই মেলার অতীত বিষয়ে বে তথ্য দিয়েছেন, এই তাজিয়া প্রসঙ্গে সে কথা এবার বলে যাই ঃ

তাজিয়া বসানো ব্যাপারে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় বলে মনে হতে পারে। সাধারণতঃ কোন বস্তু প্রথমে মাটিতে নামিয়ে তার ডানদিকে পর্যায়ক্রমে আমরা অন্য জিনিষগুলি সাজিয়ে যাই। এটা এসেছে আমাদেয় লিখন-রীতি বা পঠন-রীতি থেকে—অর্থাৎ বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে। কিন্তু আরবী-ফারসী-উদু প্রভৃতি ভাষা ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে পাঠ বা লেখার নিয়ম। যেহেতু এই উৎসবেয় উদ্ভব মধ্য-প্রাচ্যের আরবী ভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলে এবং যেহেতু এ দেশীয় মুসলমানরা এখনও নিজেদের সামাজিক ক্রিয়াকর্মে আরবী ভাষা ব্যবহার করেন—হয়তো তাই এই কারণেই তাজিয়া বসানোর ক্ষেত্রে এই রীতি অনুসৃত হয়। অবশ্য এটা এখন প্রথা রূপেই গণ্য, কিন্তু সব প্রথারই তো একটা উৎসমূল থাকে।

মহীউদ্দীনের চিঠির কথা পরে আবার বলা যাবে, ইরফান মণ্ডল তাজিয়া বসানোর ব্যাপারে আর যা যা বলেছিল সেদিন ঐ মেলা প্রাঙ্গণে তা হল ঃ তাজিয়াটা বসানোর আগে সমস্ত তাজিয়া পর্যায়ক্রমে মেলা প্রদক্ষিণ করত এবং লাঠি খেলোয়াড়েরা নিজ নিজ তাজিয়ার সামনে বিভিন্ন প্রকারের খেলা দেখিয়ে দর্শকদের আনন্দবর্ধন

রত। এই লাঠিখেলা কখনও সমবেত ভাবে, কখনও বা দ্বৈরথ যুদ্ধের অনুকরণে হত। এই সব কাণ্ড কারখানা পুরানো দিনে দর্শকদের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করত।

'আচ্ছা, এই সব কম্পিটিশন জাতীয় ব্যাপার নিয়ে কোন গণ্ডগোল হত না তখন?'

'হত না আবার! বিভিন্ন দলের মধ্যে রক্তারক্তি কাণ্ড পর্যন্ত হয়ে যেত। যেহেতু ঐ সব প্রথা এখন আর প্রায় হয় না, তাই রক্তারক্তি কাণ্ডও বন্ধ হয়ে গেছে।' আমাকে জানালেন ইরফান।

ইরফানের কথার যেন প্রতিধ্বনি শুনছিলাম লালবাগের সিরাজ হোটেলের যুবক ম্যানেজারের কাছে। সেটা বোধহয় ১৯৯৫ সালের শীতের সময়। মহরম তখন অনেক দেরীতে। ভুরুলিয়ার মহরম দেখার অনেক পরের ঘটনা এটা। সেই যুবক ম্যানেজারটি আমার কৌতূহল দেখে বলেছিল সেদিন: 'তাহলে আসবেন মহরমের সময়। লাঠি খেলা ছোরা খেলা করতে করতে তারা কী রকম মাতোয়ারা হয়ে যায়। রক্তারক্তিও হয় যথেষ্ট—কেমন যেন পাগলামির মত হয়ে বার শেষটা।'

সেই যুবক ম্যানেজারটি পরেও আমাকে চিঠিকে জানিয়েছিল লালবাগের মহরম দেখতে আসার জন্য। লালবাগ—সিরাজনগরী লালবাগে অবশ্য সে সময়ে আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যাক, সে সব পুরাতন কথা!

সুতরাং আবার আসে তাহলে মহীউদ্দীনের পত্রের কথা। মহীউদ্দীন অতি বাল্যকাল থেকে এই মহরম দেখতে অভ্যস্ত। তাই ইদানীং ভুরুলিয়ায় না এলেও তার সব কথা খুব ভাল করে মনে আছে। আমার পত্রের কোন প্রশ্নই তাই কাছে কঠিন নয়। তার চিঠিতে আছে:

'কারবালার মেলার এক ঘটনা আমার মনে আছে। সেবার একদল বয়স্ক লোক সর্বাঙ্গ কালো পোষাকে আবৃত হয়ে কাতর কণ্ঠে মাতন গেয়ে সমবেত দর্শক মণ্ডলীর মনে করুণার উদ্রেক করতে পেরেছিল। এ ছাড়া তখন ছিল ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা। যে ঘোড়া প্রথম স্থান অধিকার করতে পারত, সেই ঘোড়ার মালিককে একটা কাঁসার তৈরী বড় ঘড়া পুরস্কার দেওয়া হত। এই ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতা মেলার উত্তর দিকের মাঠে হত। একবার ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার সময়ে উপস্থিত ছিলাম। জানকীনগর গ্রামের খ্যাপাচোর লোকটি কিন্তু প্রকৃতই চোর। এক ব্যক্তির অশ্বচালনা আমাকে সেদিন চমৎকৃত করেছিল। লাগাম না ধরে খালি হাতে সে ঘোড়া ছুটিয়েছিল তীর বেগে এবং প্রথম হয়েছিল। অতি বিস্মিত হয়েছিলাম ঘোড়ার পিঠে উল্টো ভাবে বসে ঘোড়া ছুটানো দেখে—অর্থাৎ খ্যাপাচোরের মুখটা ছিল ঘোড়ার পিছনের দিকে, অথচ ঘোড়াটি সামনে দিকে তীর বেগে ছুটে চলেছে।

কত বিচিত্র রঙ্গই না হত সেদিন এই কারবালায় প্রান্তরে। মহীউদ্দীনের চিঠি ঠিক সময়ে আমার হাতে না এসে পেঁছালে এই প্রতিবেদন যে কত অসম্পূর্ণ থাকত!

নাইবা আমার সে সব দেখা হল, মহীউদ্দীন তো দেখেছিল—অন্ততঃ আমার পরিচিতদের মধ্যে একজন তো তার সাক্ষী আছে আজও !

শুধু তাই নয়, বাঙ্গালীর নির্দোষ রঙ্গপ্রিয়তার একটি সুন্দর প্রকরণ আজ যে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল, মহীউদ্দীনের পত্রপাঠে সে কথা যেন মনে আরো বেশী বাজল। এ ভাবে কত প্রথা যে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে—কে জানে। ঘোড়ার নাচ অবশ্য এখনও বেঁচে আছে। অন্য সমাজের লোকেরাও তা ভিন্ন উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেছে। ১৯৯৮ সালে পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে ছো সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারা যে আজ জীবিকার জন্য বেঁচে থাকার তাড়নায় এক ভিন্নধর্মী ঘোড়া নাচ নিয়ে মাতামাতি করছে—তার সংবাদ পেয়েছি।

ঘোড়া চালানোর ঐ বিচিত্র কৌশল মহীউদ্দীনের পত্রে পাঠ করে আমার সেদিন মনে হয়েছিল সেই বিলিতি ছড়ার কথা—তাতে এক বিলিতি রাজার গল্পে ঐ ভাবে ঘোড়া চালানোর কথা ছিল—বেশ মজাদার ছবিসহ। দীর্ঘদিন ধরে তা বিদ্যালয় পাঠ্য – ছাত্রদের কাছে বেশ আদরণীয় ছিল—এখনও বোধহয় পুরাতন ছাত্ররা তা মনে করতে পারবেন।

আবার 'ধান ভানতে শিবের গীত' হয়ে গেল। ভুরুলের মহরমের মেলা বলতে গিয়ে বিলেতের মাটিতে গিরে পড়লাম। তার চেয়ে বরং মহীউদ্দীনের পত্রের রেশ টেনে বলি কিছু নিজের কথা ঃ

অন্যান্য সব অনুষ্ঠানের মত উপরোক্ত সবই আজ উঠে যেতে বসেছে বা নানা রূপ পাল্টে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। অর্থনৈতিক সংকট ছাড়াও সহরের প্রভাব, মূল্যবোধের রূপান্তর, গণমাধ্যমের সর্বনাশী প্রসার—এগুলি তার অন্যতম কারণ বলে মেনে নিতে হবে।

সেই শিক্ষক মহাশয়ের পত্রে ছিল আরো কিছু কথা ঃ 'আগে কত দূর-দূরান্তর গ্রাম থেকে লোকেরা এই মেলা দেখতে আসত। ১২ মাইল দূর থেকে মেলায় এসেছে—এমন ঘটনাও শোনা গেছে। সেই সঙ্গে আছে মেলার সংখ্যা বেড়ে যাওয়া—তাই কোন মহরম মেলাতেই জনসংখ্যা তার তত জোরালো হয় না। আসলে লোকদের আগ্রহ এখন যেন ভিন্নপথে বইছে।'

ঐ দীর্ঘ পত্রে আরো অনেক কিছু ছিল। ভুরুলের মেলায় আগত বিভিন্ন মাতন দলের কিছু গান ও দল পরিচয় তার মধ্যে অন্যতম। সে প্রসঙ্গে না হয় পরে কিছু সংবাদ দেওয়া যাবে। জারী গানের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নিয়ে কিছু তথ্য ছিল, যার সঙ্গে এদেশের লোকসংস্কৃতি চর্চার গ্রন্থগুলির সঙ্গে ততটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু সেই পত্রের একটি অংশ এখানে পুনরায় উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না এ কারণে যে, তা থেকে ঐ অঞ্চলের মুসলমান সমাজের একটি দিক জানা যাবে ঃ

'আগে এই পর্ব উপলক্ষে বাড়ীতে মাংস-রুটি হত, মিষ্টান্ন বিতরণ করা হত গরীবদের মধ্যে। আমাদের মাঠকরালী গ্রামের বাড়ীতে এবং মোফাজ্জল হোসেনের

যে বাড়ীতে আমি থাকি, সে বাড়ীতে খালি পেটে গ্রামসুদ্ধ লোককে খেতে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল।'

আমার পুঁথিগত বিদ্যায় জানা ছিল না মহরমের মেলায় নাকি পটুয়াদের হাতে আঁকা জড়ানো পটের গান শোনা যায় হয়তো কোথাও না কোথাও। একদা নাকি মুর্শিদাবাদ থেকে পটুয়ারা ঢাকায় গিয়ে সেখানকার মহরম মেলায় পট দেখিয়ে গান গাইত, দু'-চার টাকা রোজগার করত। সেদিন তার চলতি নাম ছিল 'মহরমের পট'। সে প্রথা যে কবেই বন্ধ হয়ে গেছে, খোদ মুর্শিদাবাদেই তার কোন হদিশ পাইনি—তা এই নগণ্য গ্রাম ভুরুলিয়ায় এসে সেজন্য আক্ষেপ করে কোন লাভ নেই। এ মেলার কোনখানেই তার কোন অস্তিত্ব পেলাম না—বয়স্ক কোন লোকও তার সংবাদ জানে না।

পরিবর্তে—সেদিনের ভুরুলের মেলায় দেখেছিলাম আটটি জুয়াঘটিত খেলার দোকান—দোকান নয় জমায়েত। তার সঙ্গে এসেছে মার্কসবাদী সাহিত্য-রাজনীতি প্রচারের স্টল। 'কোটনীস' স্মৃতিরক্ষা সমিতির, অফিসও খোলা হয়েছে এখানে। শারীরিক কসরৎ যা দেখানো হয়—তা সার্কাসের জিমন্যাস্টিকেরই অনুরূপ—এ মন্তব্য মেলার দর্শকদেরই।

সন্ধ্যার মুখেই মেলা ভাঙ্গার পালা। ওদিকে যখন জারী-মাতন লাঠিখেলা জমজমাট হয়ে উঠেছে—এদিকে তখন দোকানীরা ধীরে ধীরে তাদের দোকান তুলতে সুরু করেছে। একটি বিকালের মেলা—সুরু না হতে হতেই শেষ। হঠাৎ কখন আবার ঝুপ করে আঁধার নেমে যাবে, সেই ভাবনায় সবাই বাড়ী যাবার ধান্দায় ব্যস্ত।

সেই বিরাট বটগাছটা তার আরও শাখা-প্রশাখা নিয়ে নিকষ আঁধারে আরো যেন বৃহৎ হয়ে উঠবে। একক সম্রাটের মত দাঁড়িয়ে থাকবে অনাদি কাল ধরে। প্রতীক্ষা করবে এক বছর ঘুরে পরবর্তী মহরম মেলার জন্য। একদিনের 'কারবালা' হয়ে ওঠার গৌরবে গৌরবান্বিত হবে সে।

বাড়ী ফেরার পথে মনে ভেসে উঠেছে সেই লাঠি খেলার টুকরো দৃশ্য, মাতন গানের সেই শোকাবহ উন্মত্ততা আর জারী গাইবার বিচিত্র ভঙ্গী। আমার অভিজ্ঞতার গ্রন্থে আরো কিছু পৃষ্ঠা বেড়ে গেল এভাবে।

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আমার দেখা ভুরুলিয়ার মহরম মেলা আজ কোন পথে চলেছে কে জানে! মনে রাখার মত অনেক ঘটনাই ঘটল এই স্বল্প সময়ে। সে সব ভাবা যাবে ডাউন লালগোলা প্যাসেঞ্জারে! এ লাইনে ট্রেন বড় কম! দ্রুত পা না চালালে হয়তো— □

লোকনাট্যের নানা প্রকরণ-রস-ভঙ্গী।
তাছাড়া সত্যি কথা হল,
লোকনাট্য বলে কোন বস্তুই জানে না গ্রাম সমাজের অধিবাসীরা।
তারা বোঝে পালাগান, গান বা
ইদানীং যাকে তারা বলে যাত্রা।
লোকনাট্য শব্দের কোন গভীরতা নেই,
এ যেন ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া—
শহুরে শিক্ষিত লোক নিজেদের সংস্কৃতিকে পৃথক করবার জন্য
তার সমান্তরালে প্রবাহিত বৃহৎ
লোকজীবনের সংস্কৃতিকে তাই 'লোক' আদ্যশব্দের
দ্বারা চিহ্নিত করতে চায়—
পৃথক করতে চায় এভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য।
তাই নির্মিত হয় গীতির পরিবর্তে লোকগীতি, চিত্রকলার
পরিবর্তে লোক চিত্রকলা, কথার পরিবর্তে লোককথা।

লোকনাট্য-১

কিন্তু তাতেও কি পাল্টে যায় গ্রামীণ
সমাজের নানা সাংস্কৃতিক প্রকাশভঙ্গী?
লোকগীতি, লোকসাহিত্য, লোকনাট্য, লোকচিত্রকলা—
ইত্যাদি হাজার 'লোক'
চিহ্নিত শব্দ যে আপন বৈশিষ্ট্যে
সেই কবে থেকেই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়ে আছে, তাই শেষ পর্যন্ত
নাগরিক মনকেই নানা সময়ে এগিয়ে আসতে হয় তার কাছে।
তাই 'মহুয়া' নিয়ে আধুনিক নাটক রচিত হয়,
লোকগীতির সূত্রে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চান
চান নাগরিক সঙ্গীতশিল্পী—
তিনিই আবার 'আলকাপ'-কে শহুরে
মঞ্চে ভিন্ন মাত্রায় মঞ্চস্থ করতে চান—শহরের
দর্শকদের জন্য।
এই তালিকা থেকে বাদ যাবে না তাই 'বনবিবির' পালা'-ও!

'দুখে পালা'-র আসরে

'চলুন, যাবেন নাকি ?'

বাস্—এইটুকু মাত্র। পিছনে আর তাকালাম না। মাত্র মিনিট দশেকের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করলাম এক বিচিত্র পরিবেশে। এই মোহনীয় স্বপ্নিল পরিবেশ রচনার কথা আজ বিকাল কেন, সন্ধ্যাবেলাতেও মাথায় আসেনি।

বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছিলাম গোসাবা পেরিয়ে পাখিরালা। গোসাবা থেকে সাইকেল ভ্যানে এসেছিলাম—তখনই দেখেছিলাম সাতজেলিয়া গ্রামটি। পাখিরালায় আমাদের কোন ঠিকানা ছিল না—এখানে কোন টুরিস্ট লজ তখন হয়নি।

মনে মনে জানা ছিল এই পাখিরালা গ্রামের পরেই নদী, সেই নদীর ওপারেই সজনেখালি—মানে আসল সুন্দরবন সুরু হল ওখান থেকে। বাঘেদের আবাস আরও অনেক ভিতরে। থাকতে যদি হয়, তবে গা ছমছমে মন নিয়ে পাখিরালাই তো আমাদের পক্ষে ভাল !

জানতামই না কোথায় আজ রাত্রিবাস হবে। নেহাৎ পাখিরালা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আমাদের উড়নচণ্ডে ধরণ-ধারণ দেখে তার গৃহের দাওয়ায় রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তাই কোনমতে ঘুমুতে পেরেছি। নইলে হয়তো পুঁটুলি নিয়ে সেই গোসাবাতেই গিয়ে ঢুকতে হতো ভাগ্যলক্ষ্মী হোটেলের ছারপোকা ভরা তেলচিটে বালিশওয়ালা বিছানাতে।

আর বলিহারি লোক বটে এই পঞ্চায়েত উপপ্রধান ! বয়েস তো পঞ্চান্ন-ছাপান্ন হবে নিশ্চয়ই। সজনেখালি যাবার জন্য কোনমতেই ব্যবস্থা করতে না পেরে খানিকটা উদ্দেশ্যহীন হয়ে এদিক-ওদিক করছি, তখন স্থানীয় ছেলেরা সব শুনে আমাদের নিয়ে চলল ওই ভদ্রলোকটির কাছে। যতই হোক, তিনি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তো বটে !

আমাদের কাছে রাজ্যের প্রশ্ন মেলে ধরেছেন তখন ওরা। বেশ ভালভাবেই জানি, যদি না প্রতিটি প্রশ্নের সরল এবং ওদের মনোমত উত্তর দিতে না পারি, তবে এই বিজন দেশে সমূহ বিপদ। তাই সুবোধ বালকের মত পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। যদি এই কৌশলে তাদের মন ভিজাতে পারি।

মাথার উপর ফিনকি ছড়ানো জোছনা। চারিপাশে ছড়ানো হলুদ মাঠ—সবে ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। তার গোড়াগুলো পড়ে আছে। প্রথম সন্ধ্যার সামান্য শিশিরে সেগুলো ভিজে সব নেতিয়ে গেছে। নইলে আমার হাওয়াই পরা পদযুগল হয়তো তাদের রূঢ়তায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতো। আর দূরে—কোন দূরে জ্বলছে এক উজ্জ্বল বাতি, ঠিক যেন ধ্রুবতারার মত জ্বলছে। ঐ দিকেই যে এগিয়ে চলেছি আমরা তা বুঝতে পারছি।

আমাদেয় যেন ধরে-পাকড়ে নিয়ে চলেছে পরিমল—মানে ঐ উপপ্রধানমশায়ের ভাগ্নে, যে এ বছর সদ্য হায়ার সেকেণ্ডারী দিয়েছে রাঙাবেলিয়ার তুষার কাঞ্জিলালের স্কুল থেকে। আশ্চর্য ছেলেটি! সুন্দরবনের কথা, বনবিবির কথা, গরান-গেঁও গাছের কথা, দুখে যাত্রার কথা ইত্যাদি বইয়ে পড়া শব্দগুলি সম্বন্ধে যতই ওর কাছে প্রশ্ন তুলি, ততই ও আমাকে মুগ্ধতার সঙ্গে সব উত্তর দিয়ে দেয়। মনে হয়েছিল যেন, ঐ বালকটি সুন্দরবনের অভিধান। শামুকখোল-বাইন-মৌলে-দখিণরায়—সব যেন ওর নখদর্পণে। সারা গায়ে ওর নোনামাটির গন্ধ।

একবার ভেবেছিলাম রবীনকে তুলব ঘুম থেকে এই বিচিত্র দুখে যাত্রা দেখতে যাবার জন্য। কিন্তু পরিমলের মামার বাড়ীর বারান্দায় বাঁশের মাচার বিছানায় সে বেচারী সারাদিনের পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে এমন বেঁহুস হয়ে ঘুমাচ্ছিল যে ডাকতে ইচ্ছা হল না। ঘুমাক এখন, পরে ডেকে তুলে নেব।

দুখে যাত্রার, ব্যাপারটা কী—এবারে জানতে চাইলাম পরিমলের কাছে। কেন না পালা দেখব তো জানি—কিন্তু তার বৃত্তান্তটা যদি না জেনে নিই তো সে দেখার কোন মূল্যই নেই।

'কেন, বিকালেই তো বললাম আপনাকে বনবিবির পূজা দেখবার সময়ে—' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল পরিমল। তখন মনে পড়ল ব্যাপারটা।

উপপ্রধানমশায়ের ঘরে রাতের ব্যবস্থাটা কোনমতে হয়ে যাবার পর পরিমল আমাদের নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করতে বেরিয়েছিল। আমাদের মত দুই অদ্ভুত টুরিষ্ট পেয়ে বোধহয় সে একটু বেশী আগ্রহীই হয়েছিল। তাছাড়া নিজের গ্রামকে শহুরে লোকের কাছে মেলে ধরতে যে একটা গর্ব তার মনে মনে কাজ করছিল—তা প্রতি পদে পদে টের পাচ্ছিলাম।

গ্রামের সর্বত্র ঘুরতে ঘুরতে নানা দ্রষ্টব্য ও অ-দ্রষ্টব্য বিষয় দেখতে দেখতে অবশেষে পরিমল নিয়ে এসেছিল আমাদের নদীর ধারটায়। উঁচু বাঁধ—সেইটাই নদীর পাড়। তার উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাবার সময়ে চোখে পড়েছিল একটা ঠাকুর-ঘর। পাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে দৃষ্টি দিয়ে যা দেখেছিলাম তখন, তা হল: কিছু নর-নারী সেখানে সমবেত হয়েছে। জানলাম 'হিন্দু-মুসলমান দু' সম্প্রদায়ই আছে তার মধ্যে। মনে হল কোন পূজার্চ্চনা জাতীয় কর্ম হচ্ছে। কিন্তু মুসলমানরাও ছিল সেখানে। তারা এক দেবীর পূজা করছে—এমনতর দেবী আজ পর্যন্ত কোথাও দেখিনি। শুনলাম তিনিই বোনবিবি, তার সাথে ভাই সাজঙ্গলী আর এক শিশুবালক—দুখে।

তখনও আকাশে বেশ আলো আছে। সূর্য ডুবে যাবার পরের গোধূলির আলো সেটা।

মনে বেশ আগ্রহ হচ্ছিল। এ ধরনের পূজা কখনও দেখা হয়নি। কে ইনি, কি তার পূজা-পদ্ধতি, কেন এই পূজা—এসব প্রশ্ন আসছিল মনে। তাছাড়া বোনবিবি

নামটা যে শুনেছিলাম আগে—তাই এই অস্বস্তি। তবে তিনি ছিলেন বনবিবি—ইনি হলেন বোনবিবি। কী যে এর পার্থক্য কে জানে! আসলে—জেনেছিলাম পরে, দুজনেই কিন্তু এক। মুসলমান সমাজে বলে বোনবিবি, হিন্দুসমাজ বলে বনবিবি। আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদ্ তাকে আবার ইদানীং 'বনদেবী' বলে প্রচার করছেন।

পরিমল তখন বলেছিল বোনবিবির গল্প সে বলবে আমায়। সে এক চমৎকার নাটকীয় যুদ্ধ বৃত্তান্ত। যুদ্ধ হল সুন্দরবনে বোনবিবির দখল অধিকারের। সুন্দরবনের ভাঁটি অঞ্চলের অধিপতি হলেন দক্ষিণ রায়—মানে 'সোঁদরবনের ডোরাকাটা বাঘ'। তার আক্রমণে মানুষ অতিষ্ঠ। বোনবিবি হলেন তাদের উদ্ধারকারিণী মাতৃতুল্য দেবী। সাজংগলী তার ভাই। দক্ষিণা রায়ের সঙ্গে বনবিবির যুদ্ধ হয়। প্রথমকে সাহায্য করেন নারায়ণী আর দ্বিতীয়জনের সঙ্গে সাজংগলী। আর দুখে?

তাকে নিয়েই তো নাটক। এই শিশু-বালককে নিয়ে গেছিল ধোনা-মোনা দুই মৌলে জঙ্গলে মহাল করতে যাবার সময়ে। পরে দক্ষিণ রায়ের কাছে তাকে ভেট দিতে গিয়েই তো যুদ্ধের সূত্রপাত—তার পরেও আছে এক মধুর নাটকীয় ও মঙ্গলময় পরিসমাপ্তি।

মুসলমান লোককবির লেখা পুঁথিমার্কা বই আছে উর্দু মতে ছাপা—পিছন দিক থেকে যে 'কেতাব' খুলে পড়তে হয় সেই 'বোনবিবি জহুরানামা'। চোদ্দ অক্ষরী পয়ারে গাঁথা সে কাহিনী একদা কলকাতার বটতলায় ছাপা হত—এখন আর পাওয়া যায় না। সে গ্রামের দুখে যাত্রার এক বিখ্যাত অভিনেতার ঘর থেকে ঐ পুঁথির একটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কপি সংগ্রহ করলাম। তার নাম ছিল বোধহয় আশুতোষ খাটুয়া—এখন ঠিক মনে পড়ছে না। বেশ মেহনৎ হয়েছিল এটা করতে।

অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর সে 'শাস্তরখানা' আমার হাতে তুলে একান্ত অনিচ্ছায় পরে ভক্তিভরে, কপালে একবার ছুঁইয়ে আমাকে বলল: 'দেখবেন, মান্য করবেন।'

তার নির্দেশ মান্য করে সেই দুর্লভ পুঁথি-মার্কা পুস্তকের খানিকটা অংশ তুলে দিই এখানে, শুধুমাত্র এই পাঁচালী গানের স্বরূপ বোঝাতে—নচেৎ ঐটুকু সময়ে তার সম্বন্ধে কী-ই বা ধারণা করব! পিছন দিক থেকে পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে—মানে যেহেতু এটা উর্দু মতে ছাপা বই তাই, একটা স্থানে চোখ আটকে গেল:

'নারায়ণী বলে সেই কামারের ধনি ॥ তোমার কামায়ে রাজি এলাহি আপনি *
আধার ভাটির কর্তা হৈল এবে তুমি ॥ যাহা জান কর তাহা কি কহিব আমি *
বোনবিবি বলে সই শুন দেখা দিয়া ॥ সকলে আঠার ভাটি লইবে বাটিয়া *
কার মনে দুঃখ নাহি দিব কদাচন ॥ যাও তুমি আপনার ঘরেতে এখন *'

এই হল 'বোনবিবি জহুরানামার' সামান্য নমুনা। তার থেকে কাহিনী নিয়ে পাখিরালা গ্রামের নবীন যুবকরা যাত্রা লেখে আবার আধুনিকমনস্ক নাট্যকারও লেখে প্রগতিশীল নাটক। মোট কথা এই বোনবিবির গল্প এ অঞ্চলে খুব জনপ্রিয়। বোনবিবি হলেন মৌলে-বাওয়ালীদের দেবী। এখানে হিন্দু-মুসলমানের কোন ভেদ

নেই। সত্যনারায়ণ যেমন সত্যপীর হয়ে গেছেন মুসলমানের ঘরে, ইনিও তেমনি। বোনবিবি যে হিন্দুর লোকধর্মের কোন স্বীকৃত দেবী নয় তাও তো জেনেছি পরে।

পা দুটো বোধহয় ধানক্ষেতের ডগা ফুটে ফুটে ক্ষত-বিক্ষতই হয়ে গেছে এতক্ষণে। বাতির কাছে যেমন পোকা এগিয়ে চলে, আমি তখন পরিমলের সঙ্গে নেশাগ্রস্তের মত এগিয়ে চলেছি সেই গানের আসরের দিকে।

বিকালের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারছিলাম, আগামী দু' একদিনের মধ্যেই তাহলে কোন এক দল জঙ্গলে মহাল করতে যাবে। তারই প্রস্তুতি হল আজকের এই দুখে পালার অভিনয়।

উজ্জ্বল এক হ্যাজাক বাতির আলোর নীচে বোনবিবির পালাগান হচ্ছে। মাইক নেই তবু খোলা মাঠে সে অপরূপ পালার সংলাপ আর গান দুই-ই ভেসে আসছে। অভিনেতাদের শরীরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না—আসরের চারিধারে কত লোক জমে আছে। তাদের ছায়াগুলো লম্বা হয়ে পড়েছে সেই চাঁদনী-ধোয়া ধান ক্ষেতে।

উদ্ধশ্বাসে ছুটছিলাম সেই আসরের একজন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। পা চলে না—এ ধরনের মাঠে হাঁটায় তো অভ্যস্ত নই! পরিমল ইচ্ছা করলেই খর পায়ে আরো দ্রুত চলে যেতে পারে, তবু সে আমার মুখ চেয়েই ধীর পদে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। আর মুখে রানিং কমেণ্ট্রি দিয়ে যাচ্ছে—

এই ধোনা মোনে হাজির হল দুখের মার বাড়ি, তাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করতে—

এই, লোভ দেখাচ্ছে ধোনা দুখের মাকে—

এই, দক্ষিণ রায় তার রাজত্বি নিয়ে চিন্তায় পড়েছে—

এই, সাজংগলীর সঙ্গে বোনবিবির পরামর্শ হচ্ছে—

এই, নারারণীর সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের শলা হচ্ছে কী ভাবে বনবিবিদের ভাঁটি থেকে সরানো হবে—ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা হাজির হলাম আসরে। ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে সামনের সারিতে আসি তার সাধ্য কী! সমস্ত দর্শকই তখন উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে। এই বুঝি কী একটা বিষম ঝড় উঠবে পালার আসরে।

মুহূর্তের মধ্যে চারিদিকের পরিবেশটা একবার আঁচ করে নিতে চেষ্টা করলাম।

কাছেই একটা পাকা বাড়ি প্রায় ভেঙে এসেছে। তার প্রশস্ত প্রাঙ্গনে এই আসর বসেছে। বাড়ির মেয়েরা একটু পেছনে আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। নানা-বয়সীরা এসেছে আসরের একপাশের সামনের সারিতে। আর নানাবয়সী পুরুষরা চারিদিকে গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাজাক বাতিটা বসানো আছে একটা টুলের উপরে। তার আলোটা ভাল করে ছড়িয়ে পড়তেও পারছে না।

পরিমলের সাহায্য নিয়ে খুঁজে বের করি পালাগানের প্রম্পটারকে। কেননা, পূর্ব অভিজ্ঞতায় জানা ছিল যে, এইসব অভিনেতা পার্ট মুখস্থ করতে পারে না, লেখাপড়াও জানে না তেমন। তাই প্রম্পটারেরর উচ্চারণ শুনেই সেটুকু করে।

'লোকনাট্য' শব্দটির নির্মাণ, গভীরতা বা প্রয়োগ নিয়ে এ যাবৎ যত দ্বন্দ্ব প্রচারিত আছে লোকসংস্কৃতির গবেষকদের মধ্যে—তা থাক। তাতেও কিন্তু অভিজাত যমাজের নাট্যকলা বিশেষ পুষ্টি সাধন করে নিজেদের প্রবহমান শিল্পকলা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছে—এমন মনে হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত কাহিনী বা লোকবিশ্বাস অবলম্বনে বনবিবির পালা কিন্তু সেদিক থেকে ব্যতিক্রমী। বনবিবি সংক্রান্ত যাবতীয় নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পাঠের পর এই লোকদেবীর উৎস, তাৎপর্য, প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেলেও, তার সমতুল্য আর কোন লোকনাটক বোধহয় দেখা যাবে না।

'ক্ষমতা দখলের জন্য লড়াই'—ধারণাটি একালের রাজনীতিতে যেমন অত্যন্ত প্রচলিত, তেমনি বাদা বনের দেশেও যে এ লড়াই আরো বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত—তাও বোধহয় সবার জানা নেই। 'দুখে পালার' কাহিনী বা বনবিবির জয়যাত্রার সঙ্গে হয়তো কিছুটা তুলনীয় হতে পারে মনসামঙ্গলের কাহিনী যা সচরাচর চাঁদসদাগর বণিকের মাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়।

আরো একটি কারণে এই বিশেষ শ্রেণীর লোকনাট্য তার বিশিষ্টতা অর্জন করেছে—তা হল তার অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের জন্য। আজকের রাজনীতিতে 'অসাম্প্রদায়িক' ধারণাটি যেভাবে গৃহীত, ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হয়ে থাকে, আলোচ্য ক্ষেত্রে তা কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। রাজনীতির নিয়মে অসাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যুক্ত আছে প্রকাশ্য ভাবে ক্ষমতা দখলের লড়াই, অন্যকে বঞ্চনা করার কৌশল। তাই তার আবেদন সমাজের উপরিস্তরেই থেকে যায়—অন্তরে কোন ঢেউ তোলে না।

কিন্তু বনবিবির কাহিনী যাদের মধ্যে প্রচলিত তারা প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক ভাবে এই লোকদেবীর আরাধনা করে—বিচ্ছিন্ন হবার জন্য নয়, প্রাণে বাঁচবার জন্য সকলে একজোট হতে চায় প্রাণের মূল্যে।

তিনি 'বনবিবি' বা 'বোনবিবি'—এ দ্বন্দ্ব থাকুক বিশেষজ্ঞদের জন্য, কিন্তু তিনি যে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দ-মুসলমানের উভয় সমাজেরই আরাধ্য দেবতা—এ কথা আজও সত্য। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যখন সমাজের সকল স্তরেই রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, তখন আজও কি করে 'বনবিবির পালা' তার অস্তিত্ব ধক্ষা করে চলেছে আপন মর্যাদায়—তার কারণ অনুমান করা মোটেই শক্ত নয়। আতংক বা বা ভয় থেকে যে দেবীর উৎপত্তি—তিনি কোন দল বা নীতির করতলগত নন। অসহায় মানুষই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে তাই বদ্ধপরিকর।

সেদিক থেকে তুলনা করলে সর্পদেবী মনসাও কিন্তু পিছনের সারিতে পড়ে যাবেন। তাঁর নাশকতার শক্তি নেহাৎ কিছু কম নয় এবং দুই সমাজেই বা কেন, পৃথিবীর সব সমাজেই তার যাতায়াত। তবু কিন্তু তিনি সর্ব সমাজের আরাধ্য হতে পারেননি—আলোচ্য বনবিবির মত।

গ্রামের মানুষেরা তাতেই খুশী। সেই স্বল্প আলোকে হাতে লেখা খাতা থেকে গ্রাম্য পালাকারের নাট্যরচনার যে অংশটুকু চোখে পড়ল, তা ভাল করে পড়ে নিলাম—অবশ্য সে সময়টুকু অভিনয় থেকে চোখ সরে গেছিল।

আমার ভ্রমণসঙ্গী তখন নিপুণ হাতে টেপ করে নিচ্ছে ঐ অভিনেতাদের সংলাপ। জানি, ঐ গুঞ্জন-মুখরিত পরিবেশে রেকর্ড তেমন ভাল হবে না—তবু 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা' তো ভাল। হয়তো অনেকে এ বিষয়ে পরে আগ্রহী হবেন।

ধনা ও দক্ষিণ রায়

ধনা ॥ খোদা! আমার ভাগ্যে কি এই ছিল? এত ভেঙ্গে মহলে এলাম, কিন্তু এক ফোঁটা মধু পেলাম না। এখন কি করি। একটু ঘুমাই?

[নেপথ্যে দক্ষিণ রায়]

দক্ষিণ রায় ॥ কেন রে ধনা মাঝি শুয়ে অনাহারে। কি দুঃখ পেয়েছে বাছা কহ দেখি মোরে ॥ দেখিয়া তোমার দুঃখে ফেটে যায় হিয়া। সুউপায় করিব আমি বিপদ নাশিয়া ॥

ধনা ॥ কে—কে কে তুমি এই শূন্য বনমধ্যে নাম ধরে ডাক মোরে? না—না—এই বোধ হয় স্বপ্ন দেখছি। নইলে সুপ্ত জগৎ নিস্তব্ধ নিথর—হেরি সমগ্র কান্তার। চতুর্দ্দিকে হেরি শুধু বন্য পশুর চীৎকার। এর মধ্যে কে ডাকে নাম ধরে মোর। স্বর শুনে হয় অনুমান নারী কণ্ঠ করে আবাহন, মা—মা—কৃপা যদি করিলে এ দাসেরে। ছলনা ত্যাজিয়া মোরে দেখা দাও মোরে। এস—এস—দাও মোরে দেখা।

দক্ষিণ রায় ॥ মা—মা বলিস যেটা। আমি তোর মা নই। বলতে পারিস বলিস মোরে বাবা।

ধনা ॥ কই কই প্রভু, দাও মোরে দেখা। সন্দেহ ভঞ্জন করে দাও মোরে দেখা।

দক্ষিণ রায় ॥ এই দেখ ধনা। এই আমি এসেছি তোর দুঃখ দূর করতে। আমাকে তুই চিনিস না। দণ্ড বক্ষ নাম ছিল ভাটির প্রধান। দক্ষিণ রায় নাম মম তাহার সন্তান ॥ মধু যত বনে আছে আমার সৃষ্টি। যেই জন পুজন করে তারে দেই দৃষ্টি ॥

ধনা ॥ সত্যিই যদি ভাটির ঈশ্বর হও তুমি, তবে কেন মধু নাহি পাই আমি। অপরাধ যদি কিছু করে থাকি পায়। ক্রোধ সম্বরিয়া প্রভু হও হে সদয় ॥

দক্ষিণ রায় ॥ শোন ধনা, বহুদিন হল কেহ আমাকে নরপূজা দেয় নাই। তাই বলি ধনা। নরপূজা যদি মোরে তুমি পার দিতে। সাতডিঙা মোম-মধু আমি পারি দিতে।

ধনা ॥ এ্যাঁ, কী বললে নরপূজা?

দক্ষিণ রায় ॥ হ্যাঁ, নরপূজা। আমাকে একটি নর দিতে হবে। অষ্টম বয়স শিশু, নাম যার দুখে। তাকে দিয়ে মধু নিয়ে যাও তুমি সুখে ॥

ধনা ॥ কি বললে রায় ঠাকুর। একে নরপূজা শুনে প্রাণ শিউরে উঠেছে, আবার দুখে? না-না, আমি দিতে পারব না। আমায় ক্ষমা কর। আমি দেশে ফিরে যাই।

প্রসঙ্গত বলে রাখি এটি সুন্দরবনের পাখিরালা গ্রামের আশু খাটুয়া রচিত হাতে লেখা 'দুখে যাত্রা'। ১৯৭৮ সালে এটি রচনা করেছিলেন এবং অদ্যাবধি, তা নানা স্থানে অভিনীত হয়েছে। অবশ্য আর দু-একজন পালাকারও আছে সুন্দরবনে—তবে সংখ্যায় তা কম। দর্শকদের মধ্যে এটিই নাকি তার মধ্যে সেরা।

লক্ষ্য করি, এরা যত দক্ষ বা প্রাচীন অভিনেতাই হোক না কেন, আলো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে পেশাদারী অভিনেতার মতো অভিনয় করতে শেখেনি। আর যন্ত্রীসংঘ— আছে একটা। হারমোনি আর ঝাঁজ ঢোল ক্ল্যারিওনেট জাতীয় কী একটা বাজছে মাঝে মাঝে—কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

এই সব দেখতে দেখতেই দেখি সাজঙ্গলীর সঙ্গে নারায়ণীর যুদ্ধ বেধে গেল। তাদের সংলাপ আর আস্ফালন দেখে বুঝলাম—সত্যিই যুদ্ধটা জমেছে বটে!

পরিমলকে খুঁজে পেলাম না—তবে কাহিনীটা তো এতক্ষণে মনে করতে পারছি—তাই বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না আর। সমগ্র কাহিনীর মধ্যে এই জায়গাটা বেশ জমকালো, তা দর্শকদের মুখ দেখেই টের পাচ্ছি।

যুদ্ধের মুহূর্তগুলি মাঝে মাঝে হারমোনি ও ঝাঁজের শব্দ মুখরিত হয়ে উঠেছে। দ্রুত লয়ে বেজে চলেছে ঢোলক আর ফ্লুট বাঁশী। নারায়ণীর হাতের রাংতা জড়ানো তলোয়ার তখন মুহুর্মুহু ঘুরপাক খাচ্ছে আর হ্যাজাকের আলোয় ঝলসে উঠছে, তখন দর্শকদের চোখে-মুখে সে কী অকৃত্রিম উল্লাস। আর সাজঙ্গলীর বন্দুক তুল্য অস্ত্র যখন থেকে থেকে গর্জন করে উঠছে, তারি নেপথ্যে ফাটছে কালীপূজার পটকা—তখন মনে হল সুন্দরবনের বোনবিবির যুদ্ধ তাহলে সত্যিই হচ্ছে বোধহয়!

অবাক হয়ে দেখছি সকল বয়সের লোক কি নিষ্ঠার সঙ্গে আন্তরিকতা নিয়ে দেখছে এই বোনবিবির পালা। সমগ্র দর্শকের মধ্যে তৃপ্তির সাড়া পাওয়া গেল। এবার তারা বুঝতে পারল, বোনবিবির পুনরায় আবির্ভাব হবে ও এবারের যুদ্ধে দক্ষিণ রায়ের নিশ্চিত পরাজয় ও ভাটি বনে বনবিবির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হবে।

তারপর আরো আধঘণ্টা পরে সেই ধানক্ষেত ধরে চাঁদের স্বপ্নমায়া গায়ে মেখে হালকা শীতের আভাসে যখন উপপ্রধানের বাড়ির দিকে আসছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল—গ্রাম্য সুষমায় মণ্ডিত এ কী অপরূপ পালাগান শুনতে পেলাম আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে? শহুরে দর্শকরা এ বস্তুর স্বাদ পাবে কবে?

'গল্পটা খুব ভালো, না কাকু?' পরিমল বেশ মোহাবিষ্টের মত বলল কথাটা। ও নিশ্চয়ই এ পালার অভিনয় আমার থেকেও অনেক বেশী বার দেখেছে। তাও সে অভিভূত হয়ে পড়ে এর অভিনয় দেখতে দেখতে।

'তোমার কি মনে হয় এসব সত্যি ?' এ প্রশ্নটা সেদিন চাঁদনী রাতে সেই ধানক্ষেতের মধ্যেই ফিরতি পথে করেছিলাম পরিমলকে। এই ক' ঘণ্টার মধ্যে এই কিশোর ছেলেটির কাছে আমি 'কাকু' হয়ে গেছি। তার ভালো লাগার বস্তু সে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, এতেই তার তৃপ্তি। আমি তাই একে দুঃখ দিতে চাই না।

'সত্যি নয় ?' আমার প্রশ্ন শুনে কেমন যেন আহত হয়ে উত্তর দিল পরিমল। তার এতদিনকার আবাল্য সঞ্চিত বিশ্বাস যেন চিড় খেতে চলল। কেমন যেন জড়ানো স্বরে বলল ঃ 'তাহলে সবাই যে বলে বোনবিবির দয়া না হলে ...'

পরিমল হয়তো আরো কিছু বলেছিল সেদিন আমাকে, তা আজ আমার মনে নেই। ততক্ষণে ধানক্ষেতের অচেনা মাটির মেঠো পথ ছেড়ে আমরা উঠেছিলাম চেনা ইঁট বিছানো পথে।

আমার তখন মনে হচ্ছিল, অন্য একটা সম্ভাবনার কথা।

এত সুন্দর একটা নাট্যকাহিনী। ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম যার কেন্দ্রীয় বস্তু—তাকে নিয়ে কোন আধুনিক নাট্যকার নাটক লিখতে পারেন না কেন ? আগ্রহী হন না কেন এ বঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের ভিতরের কথা জানতে।

এই 'দুখে যাত্রা' দেখার পরে—অনেক পরে কলেজ ষ্ট্রীটের পুরানো বইয়ের পাড়ায় আমায় চেনা এক বইয়ালা যখন আমার হাতে ধরিয়ে দয়েছিল সমীর রায়ের 'বনবিবি ও নারায়ণীর পালা' কাব্যনাট্যটা—যার প্রকাশকাল হল ১৩৮৯ বঙ্গাব্দে—তখন যেন সেই উত্তর পেলাম কিছুটা। তখন মন শান্ত হল, তাই পাঠকদের জন্য তার কিছুটা উপহার দিলাম তার নবম দৃশ্য থেকে।

নারায়ণী ও বনবিবির যুদ্ধ

নারায়ণী ॥ বাদল গরজে যেন ভারি বাদাবন
শক্তির দাপটে করে গরজে গগন
গরাণের ডাল কেন নড়ে না চড়ে না,
সুঁদরীর গাছে ফুল একটি ঝরে না...

সনাতন ॥ কি হোল রাণীমা। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? দেরী করলে সর্বনাশ হবে।...

সনাতন ॥ এই আমি ছুঁড়িলাম দুর্ভেদ্য বাণ
যুদ্ধ দেখ বনভূমি দেখ আসমান

সনাতন ॥ বাণ তো আসমানে ভো, শালী শালকাঠের পাশে সেগুন দাঁড়িয়ে কেমন কটমট তাকাচ্ছে দেখছেন সেনাপতি ?

কদম্ব ॥ রাণীমা যদি হুকুম করেন তবে সেগুন কাঠ আমি বেগুন করে ছাড়ি।

নারায়ণী ॥ কি নাম কদম্ব ওর কাঁড় বাঁশে হাত
আকাশে বিজুলি যেন পূর্ণিমা রাত।
বাদাবনে আলো হাতে কে গো ও দাঁড়ায়ে

মনে হয় বনভূমি যাবে ও মাড়ায়ে।

কদম্ব ॥ গুলালবিবির বেটা সাজঙ্গলী। বনের ফলমূল খেয়ে বেশ নাদুস্‌ নুদুস হয়েছে। যদি বলেন, আমি এগিয়ে একটা ব্যবস্থা করে আসি।

বনবিবি ॥ মায়ের বয়সী তুমি মাতা দক্ষিণার
ধনুর্বাণ না ফেলিলে করিব সাবাড়,
বাঘিনী না হও যদি দাঁড়াও সরিয়া
পুত্রখাকি হও যদি যমে দিব বিয়া

সাজংলী ॥ এই আমি ছুঁড়িলাম কাঁড় বাঁশ মাগো
বাঁচিতে যদি চাহো এইবার ভাগো
পালাইতেছে দৈত্য দানো যত আছে তোর
এইবার ঘিরিবে মাগো অন্ধকার ঘোর।

নারায়ণী ॥ পালায়েছে দৈত্য দানো কদম্ব সেনানী
একাকী যুঝিব আমি ব্রাহ্মণ ঘরণী
পরাজয় মানিব না মরিব রণেতে
দক্ষিণেয় পাপে আমি পুড়িব বনেতে।

বনবিবি ॥ পাপ যদি মনে কর দক্ষিণেরে দাও
দক্ষিণ মরিলে খুশি বন পাখীরাও।

নারায়ণী ॥ পাপ যদি করে থাকে সে আমার পাপ
বাপ নাই আমি আছি কে বলে খারাপ।

হয়তো সুন্দরবন-ভ্রমণ বলতে যা বোঝায়—আমাদের এবারের ভ্রমণ ঠিক সেভাবে হল না। হয়তো এই প্রতিবেদনের মধ্যে কোন রোমাঞ্চকরতা নেই—কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে যে রোমাণ্টিকতা আছে—তা কি যে কোন ভ্রামণিকেরই অমূল্য সঞ্চয় নয়? এমন করে কাছ থেকে বোনবিবির পালা দেখার সুযোগ ক'জনের হয়? ক'জন টুরিষ্ট পরিমলের মত উৎসাহী কিশোরের সাহচর্য পায়?

কী দরকার ওর বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে? বাদাবনের মানুষ কোন্ নিরাপত্তা নিয়ে জীবনযাপন করে, তা তো আজ কদিন ধরেই সুন্দরবনের নানা গ্রামে ঘুরে শুনলাম আর দেখলাম। বোনবিবি যদি সত্যিই তাদের অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয় তো হোক না। সুন্দরবনকে তো কেউ দেখে না, বোনবিবিই যদি তাদের রক্ষাকর্ত্রী হয় তো তার চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে। □

তথ্য সংগ্রহ ঃ ১৯৮৩ শীতকাল

লোকশিক্ষা বিস্তারে লোকবিনোদনে কবিয়াল অপরিহার্য।
গণমাধ্যমের শরিক রূপে আজ তার
ভিন্নতর মূল্যায়ন হচ্ছে।
তাই আজ তিনি কোথাও কোথাও চারণ কবি।
এই দুই শব্দের পার্থক্য নিয়ে তাদের চিন্তা নেই।
তবে, দ্বিতীয় শব্দটা যে আধুনিক,
তা তারা বুঝতে পারেন।
তাই হয়তো হীনমন্যতাকে দূরে ঠেলে
এই 'নতুন বোতলে পুরানো মদ' পরিবেশনের এক চিরন্তন প্রচেষ্টা।
আধুনিক কবিয়ালদের
কথাবার্তা, চালচলন, বিষয়-নির্বাচন, উপস্থাপন-রীতিও কিন্তু অনেক ভিন্ন—
ঠিক যেমন দেখা যায় আধুনিক বাউল গায়কদের ক্ষেত্রে।
তাদের এই 'নবায়ন' শ্রোতৃ সমাজ
গ্রহণ করেছে বলেই তারাও আর এক পরিচিতি পেয়েছে।

লোকবিনোদন-৩

তাতে কবিগানের কোন ক্ষতি হচ্ছে না,
কবিয়ালের কোন ক্ষতি হচ্ছে না।
বরং তাদের পুরাতন পরিচয়ে এক নতুনতর মাত্রা প্রযুক্ত হচ্ছে।
তাই, কেউ কেউ তারা ভিন্ন পদবীও গ্রহণ করে।
বিভিন্ন গণমাধ্যমে তারা আজ
আমাদের একান্ত কাছের লোক হয়েছেন।
তারাশংকরের 'কবি' উপন্যাস বাদ দিলেও
গল্পে, সাহিত্যে, মঞ্চে, চলচ্চিত্রে—বিনোদনের
প্রায় সর্বস্তরেই তারা আজ প্রয়োজনীয়।
অবশ্য সাহিত্যের কবিয়ালের সঙ্গে
বাস্তবের কবিয়ালের যে বিস্তর ফারাক—তা-ও আজ
তারা ক্রমাগতই বুঝতে পারছেন।
তাই আজ কবিয়ালের জীবন কাটছে
বৃক্ষরোপণ উৎসব, সাক্ষরতা অভিযান ইত্যাদির গানেও।

কবিয়ালের সঙ্গে কিছুক্ষণ

তেজনগরে এক কবিগানের আসরে আলাপ হয়ে গেল চারণকবি নন্দকুমার মাঝির সঙ্গে। তার সন্ধান দিয়েছিল পলাশীর বোলান প্রেমিক মহীউদ্দিন।

পলাশীর ধারেই এই গ্রাম—পশ্চিমবাংলায় অনেকগুলো পলাশী নামে গ্রাম আছে। হুগলী জেলায় গুড়াপ-পলাশী, উঃ চব্বিশ পরগনায় কাঁপা-পলাশী। তবে এক ডাকে চেনা পলাশী হল ইতিহাসের পলাশী। তারই সংলগ্ন গ্রাম হল নদীয়ার এই তেজনগর।

ইদানীং নন্দকুমাররা নিজেদের বলেন চারণ কবি—শব্দটা চারণকবি মুকুন্দদাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে, তিনি যে অর্থে চারণ কবি—শব্দটা সেই অর্থে সেখানে সার্থক। কিন্তু কবিয়ালের নামে এই শব্দটা যেন কিঞ্চিৎ কেমন শোনায়। মনে হয় তার চেয়ে সেকালের 'অ্যান্টনী কবিয়াল' জাতীয় পরিচিতিই বোধহয় ভাল ছিল। সেটা মাটির অনেক কাছাকাছি একটা স্বাভাবিক শব্দ। আর চারণকবি যেন তৈরী করা আরোপিত শব্দ।

সারা রাতের প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠান সেরে সকালে একটু ধীর-স্থির হয়ে আসর ত্যাগের আয়োজন করার পূর্ব মুহূর্তে দেখা হল তার সঙ্গে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় কথা জানা গেল তার কাছে—জানালো সে নিজেরই প্রয়োজনে। কেননা অনেক কবিয়ালই এখন বেশ শহর-সচেতন হয়ে গেছে। তাই হয় পরবর্তী বায়না সংগ্রহের সুবিধে হবে বলে অথবা কোথাও সংবাদ রূপে প্রকাশিত হতে পারে বলে আজকের কবিয়ালরা শহরে লোকের বা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী লোকের সঙ্গে আলাপ করাটাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে না।

নন্দকুমারের বাড়ী মুর্শিদাবাদের নওদা থানার অন্তর্গত মোক্তারপুর গ্রাম, ডাকঘর ভেলানগর। বয়স এখন যাই হোক না কেন, দীর্ঘদিন ধরে দাদা সুবল-চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কবিগানের আসরে দাঁড়ানোর তালিম হয়েছে। তারপর নিজে স্বতন্ত্র ভাবে দল করেছেন গত এগারো বছর ধরে।

কথাবার্তায় জানা গেল নিজেদের পদবী সরকার বললেও আসলে মাঝিগিরিই হল পৈতৃক জীবিকা। তবে এরা নিজেরা মাঝি শব্দটি ভদ্রসমাজে ব্যবহার করেন না। বলেন 'কৃষ্ণ কান্ডারী'—শব্দটা শুনেই একবার তাকাই, তার মুখের দিকে—হ্যাঁ কণ্ঠে বৈষ্ণবদের কণ্ঠী আছে বটে।

শুনতে শুনতে মনে খটকা লাগছিল একটা ; 'আপনার পদবী বললেন সরকার—আবার পৈতৃক জীবিকা হল মাঝিগিরি—এ কেমন হল ?'

'পদবীটা তো পৈতৃক তাই বললাম'—বললেন নন্দকুমার, 'গলায় কণ্ঠী দেখলেন না। আসলে মাঝিগিরি করলেও আমরা কিন্তু সে মাঝি নই। আমরা হলাম কৃষ্ণ

কাণ্ডারী। তবে শহুরে বাবুদের কাছে সেকথা বলি না।' নন্দকুমারের যুক্তি শুনে মনে তারিফ করতেই হয় তার আধুনিকতাকে। টিকে থাকবার লড়াইয়ে সৌখীনতাও যে একটা অবলম্বন, তা ও বেশ বুঝে গেছে।

শুধু তাই নয়, সেকালে যেমন সারা রাত ধরে কবিগান গাইবার রীতি ছিল, এই নন্দকুমাররা তা পাল্টে দিয়েছে ঃ

'তা কি করে হয় মশায়রা। আপনারা পাল্টে যাচ্ছেন, কবিগান পাল্টে যাচ্ছে—তাহলে সারারাত ধরে কবিগান শুনবে কেন লোক?' আমাকে নিরুত্তর দেখে বলে ঃ 'গাঁয়ে-গঞ্জে যাত্রা পালা হচ্ছে সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা থেকে রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত—তার বেলা?'

এই সব টুকরো টুকরো কথা থেকে আজকের কবিয়ালদের চিত্রটি বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ততক্ষণে আমারও মনটা বেশ প্রস্তুত হয়ে গেছে।

এখন কোন কবিয়ালই, অন্ততঃ এইসব অঞ্চলে কেউ আট ঘণ্টার বেশী গাওনা করেন না। চুক্তি পত্রে এ কথা ছাপার অক্ষরে লেখা থাকে। চুক্তিপত্রটি একটি বিল বইয়ের আকারে ছাপা হয়। তাতে বায়নাকারের নাম, কবিয়ালের গৃহীত অগ্রিম টাকা, গ্রামের নাম, স্থান ইত্যাদি সবই লেখা থাকে।

আলোচ্য নন্দকুমার সরকার দেখালেন তার চুক্তিপত্রটি ঃ

শ্রীগুরবে নমঃ

॥ বায়না পত্র ॥

চারণকবি—শ্রীনন্দকুমার সরকার (মাঝি)

গ্রাম—মুক্তারপুর, পোঃ—ভেলানগর, মুর্শিদাবাদ

'আমি ······ গ্রামে গান করিবার জন্য ······ টাকার চুক্তি করিয়া বায়নাদারের সঙ্গে ······ টাকা বায়না লইলাম। গানের পরে বাকি টাকা বায়নাদারের সঙ্গে আদায় লইব, ইহা জানিয়া বায়নাপত্রে স্বাক্ষরিত হইলাম।'

এর পর উল্লেখ করা আছে দু'জন বায়নাদারের নাম ও ঠিকানা এবং গানের তারিখ। তবে বিশেষ দ্রষ্টব্য রূপে ঐ চুক্তি পত্রে যা' বলা হয়েছে—সেটি সত্যই বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ '৮ ঘণ্টার বেশী গান হইবে না। পেঁছানোর পর / আসার অসুবিধার জন্য আপনি / আপনারা দায়ী।'

সামান্য এই চুক্তিপত্র থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, পাওনা টাকা নিয়ে গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা থাকে বলেই কবিয়ালরা আজকাল এই ধরণের লেখাপড়ার মধ্যে যাচ্ছেন। এর পিছনে নিশ্চয়ই তাদের পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা কাজ করছে। দ্বিতীয়তঃ, কবিগান করা যখন তাদের জীবিকা, তখন তারাও তো এক ধরণের চাকরী করছেন—তবে কবিয়ালের চাকরী। সুতরাং শ্রম বিনিময় করে যখন অর্থ উপার্জন করা হচ্ছে, তখন তারাও এক ধরণের শ্রমিক। তাই কি 'আট ঘণ্টার' কথা উল্লেখ করা হয়েছে? কেননা, ব্যক্তিজীবনে আট ঘণ্টার পরিশ্রমের ঝথা তো আর তাদের অজানা নেই। হয়তো তারই প্রতিফলন হয়েছে

একটু আগেই যাকে দেখা গেল দোকানে দোকানীর ভূমিকায় বা কৃষিক্ষেত্রে কৃষকের ভূমিকায় বা নিতান্তই দিন-মজুরের সাজে, তাকেই যখন কবিগানের আসরে সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারায় দেখা যায়, তবে শুধু সেই বিশেষ পরিধিই নয়—যারা সেই আসরে শ্রোতা রূপে উপস্থিত থাকে, তারাও তাদের এক প্রিয় গ্রামবাসীর ভিন্ন পরিচয়ে আনন্দিত হয়।

এ বিদ্যাও গুরুমুখী—কারোর শিষ্যত্বে দীর্ঘদিন থেকে তবে সে পাকা কবিয়াল হয়ে উঠতে পারে। নন্দকুমার-কাঞ্চন মণ্ডলের কাহিনী তারই এক নমুনা মাত্র। এদের বহু মানসভ্রাতা এ দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে আছে।

গণমাধ্যমের যুগে গ্রামের জীবন টিভি, এবং অন্যান্য প্রকরণ এত বেশী ঢুকে গেছে যে তারা সেগুলির আকর্ষণ কাটিয়ে আজও কি কবিগানের আসরে তেমন ভাবে আনন্দ পায়? এ প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে বলতে হয়, শহর-সংলগ্ন গ্রামগুলির কথা বাদ দিলে, যেসব গ্রাম এখনও কিছুটা দুর্গম, যেখানে অর্থনীতি এখনও দুর্দশাগ্রস্ত—সেখানে কবিগান এখনও তার জনপ্রিয়তা হারায় নি। নন্দকুমারের দল সে সব অঞ্চলে শহরের 'কিশোরকুমার' নাইটের মতই তারকা বিশেষ।

রেকর্ডিং ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় ফলে এবং রেকর্ড কোম্পানীর ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আজ কিন্তু শহরে তো বটেই, সুদূর গ্রামাঞ্চলেও কবিগানের ক্যাসেট সহজেই শুনতে পাচ্ছেন—নিজের ঘরে বসে। কিন্তু তাতেও জনপ্রিয়তা কমেনি, কোন প্রোগ্রাম ঘোষণা হলেই সেই আসর লোকে পূর্ণ হয়ে যায়।

গণমাধ্যম যত বিস্তৃত ও বিজ্ঞানসম্মতই হোক না কেন,—পারফরমিং আর্টের নিয়মানুযায়ী, তা যদি সরাসরি দর্শক বা শ্রোতার সামনা-সামনি সংঘটিত হয়, তবে তা আর্টিষ্টের মনে এক ভিন্ন প্রেরণা সৃষ্টি করে। তার হাতছানি কাটাতে পারেন না প্রকৃত মঞ্চশিল্পীরাও। আজ যারা কবিয়াল হয়ে উঠলেন, তাদের বাল্যকালও নিশ্চয় এই জাতীয় 'তারকা-ভজনা'য় কেটেছিল কোন এক সময়ে। আজ তারাও সে পর্যায়ে উঠতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, কবিয়াল যে মানুষের মধ্যে ধর্মচেতনা বৃদ্ধির সহায়ক সেই আদিকাল থেকে—সে কথা ভুললে চলবে না।

কবিয়ালের চরিত্র তাই বাংলা উপন্যাসেও এক স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে। বিনোদনের এই যথার্থ গ্রাম্য প্রকরণটি যেদিন সত্যই লুপ্ত হয়ে যাবে, সেদিন সাহিত্যের পৃষ্ঠায় এইসব কবিয়ালরাই এক ডকুমেণ্ট হিসাবে বেঁচে থাকবে। তবে যারা কবিগান শুনেছেন, তারা জানেন, যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষের মনের চাহিদার যোগান দিতে এঁরা আজ অভ্যস্ত। এই নিত্য পরিবর্তনশীলতার জন্যই তারা এক মঞ্চে কবিয়াল হলেও অন্য মঞ্চে অন্য রূপে উপস্থিত হতে পারেন। এ প্রসঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্রের দৌলতে কবিয়ালদের এক বিশেষ রূপ দেখে আপামর জনসাধারণ আনন্দিত হন—সে কথাও বলা প্রয়োজন।

এই চুক্তিপত্রে তথা জীবিকাতেও।

চুক্তিপত্রটা হাতে নিয়ে আর একবার ভাল করে পড়ে দেখি : 'সত্যই কি এই চুক্তি সব সময় রাখা সম্ভব হয় ?'

'সত্যি বলতে কি—' নন্দকুমার একটু নিস্তেজ গলায় বলেন : 'কখনও কখনও নিয়ম ভাঙ্গতে হয় বৈকি। যখন ভোরের আলো ফুটবার সময়ে সময়ে আসর ভাঙ্গার তোড়জোড় হচ্ছে, তখন সেখানে হাজির হলেন গ্রামের কোন বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়। হয়তো কোন কারণে তার আগের রাতে আসা হয়নি আসরে—তখন কি তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারি ? আবার একটুখানি গাইতে হয় তাদের মুখ চেয়ে। বুড়ো মানুষের এ ইচ্ছাকে তো আর ফাঁকি দিতে পারি না !' এর বিশদ ব্যাখ্যা হতে পারে এই রকম :

কেননা, তাদের কাছে কবিগানের আসর শুধু প্রমোদ বা বিনোদন নয়, ধর্মশিক্ষা ও চর্চার কেন্দ্রও বটে। তাই আসরের কবিয়াল বয়সে ছোট হলেও বিলম্বে আগত বৃদ্ধের তাকে ঐ অনুরোধ করতে বাধে না।

নন্দকুমারের প্রতিপক্ষ হলেন কাঞ্চনকুমার মণ্ডল। এঁর নিবাস হল মুর্শিদাবাদের মশিমপুর ডাকঘরের অধীনে তারানগর গ্রামে—বেলডাঙ্গা অঞ্চলে। ওঁর অভিজ্ঞতা সাত বছরের। এই সময়টি তাঁর কেটেছে নন্দকুমারের সঙ্গে সঙ্গেই। এখনও অতটা দড় হয়ে উঠতে পারেননি বলে মনে হল। অন্ততঃ কথায়-বার্ত্তায় যে ততটা পটুতা আসেনি—তা বেশ বোঝা যায়।

একই আসরে দুইজন কবিয়ালের পারস্পরিক সম্বন্ধ বড় বিচিত্র। আলোচ্য দুই কবিয়াল—পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের পরিচিত। তারা একসঙ্গে একই আসরে গান করেছেন প্রায় ৭০।৮০ বার। ব্যক্তি জীবনেও তারা পরস্পরের বন্ধু। কিন্তু আসরে দাঁড়ালে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে যান। তখন কে কাকে কোন যুক্তিতে নীচে নামাবেন—চলে তারই প্রচেষ্টা।

শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া জানতে ইচ্ছা হয় না এদের ? মঞ্চাভিনয়ে যেমন দর্শকদের মানসিকতা সরাসরি টের পাওয়া যায়, কবিগানের আসরেও তো তেমনিই হয়—এটাই আমার ধারণা। তাই প্রশ্ন করি নন্দকুমারকেই, কারণ তার অভিজ্ঞতাই বেশী !

'সে তো সরাসরিই বুঝতে পারি। তাই কাঞ্চন আমার বন্ধু হলেও, আসরে যে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী—তা তো বলেইছি। কিন্তু আসর জমানোর ব্যাপারটা সবটা অভিজ্ঞতার ব্যাপার। যে কোন ভাবেই হোক আসর তাজা না রাখলে—'

'তার উপায়টা কি ?'—আমার সরল প্রশ্নে নন্দকুমার দ্বিধার ভাব কাটিয়ে বলেন :

'আপনি তো আর কবিয়াল নন, তাহলে আর বলতে বাধা কি। যখন শাস্ত্রের যুক্তি দিয়ে আর প্রতিপক্ষকে হারাতে পারি না, তখন প্রতিপক্ষের বুদ্ধি-জ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে ঝেড়ে দু'কথা শুনিয়ে দিলেই আসরের লোক খুসী হয়—কী, বুঝলেন তো ?'

অবশ্যই বুঝেছি এবং পূর্বের আসরে বসেও তা লক্ষ্য করেছি যে এক শ্রেণীর নয়, প্রায় সকল শ্রোতাই এতে খুসী হয়। কেননা শুনতে শুনতে তারা স্পষ্টতঃই দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তখন একদল যদি কোনভাবে পরাজিত হয়—তবে তো

আনন্দ হবারই কথা। আর তখনই মনে হল ঃ তাই কি কোনমতে প্রতিপক্ষকে দমন করতে খিস্তি-খেউড়ের আমদানী করতে হয়।

জিভ কেটে সলজ্জ ভাবে বলেন নন্দকুমার ঃ 'ও কথা বলবেন না বাবু—এটি আমাদের নিজস্ব ব্যপার।'

তাকিয়ে দেখি কাঞ্চন কবিয়াল আমাদের কথাবার্তা শুনছে মন দিয়ে—কেননা একদিন তাকেও তো এভাবেই আসর মাতিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু কবিগানের আসরে স্ত্রীলোক আসে না কেন—এর উত্তর কি এরা জানে? ধর্মকথাই যদি হচ্ছে এখানে, তবে স্ত্রীলোকেরও এসব শুনতে ভাল লাগার কথা?

'আপনি বলুন মশায়, এইসব খিস্তি-খাস্তা যদি আসরে হয়, তবে কি কোন ভদ্র গেরস্থ মেয়েমানুষের সেসব জায়গায় থাকা ভাল? আপনিই কি তা সইবেন?"

এত স্পষ্ট উত্তর পাবো আশা করিনি।

নন্দকুমার জানালেন, তাদের আসরে সে ধরণের কদর্যতা হয়নি কখনও। তবে যেখানে প্রতিপক্ষ ক্যঞ্চন মণ্ডল, সেখানে এতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। কিন্তু যে আসরে অন্য কোন বর্ষীয়ান ও অভিজ্ঞ কবিয়াল থাকে, সেখানে মানের দায়ে ঐ ধরণের কাজ করতেই হয়। কেননা তখন বয়স, মান, পরিবেশ - কিছুরই নাকি খেয়াল থাকে না কবিয়ালদের। তবে কখনও কর্তৃপক্ষ বা উদ্যোক্তাদের ইচ্ছাতেও যে নীচু হতে হয়—সে কথাও সময় মত বলা যাবে।

দুই কবিয়াল—নন্দকুমার ও কাঞ্চন। দু'জনেই একই সঙ্গে নাকি প্রোগ্রাম করেছেন সত্তর-আশি বার - একটানা। এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে? নন্দকুমারকে কখনও অন্য কবিয়ালের সঙ্গে গাইতে হয়নি? কাঞ্চন মণ্ডল না হয় জুনিয়ার— কিন্তু এরা পরস্পরের সঙ্গে কিভাবে এত প্রোগ্রাম করল? এ রহস্যের উত্তর পাই অতি সহজেই। কেননা ততক্ষণে ওরা দুজনেই জেনে গেছেন তাদের এই সাক্ষাৎকার একদিন ছাপার অক্ষরে কোথাও বেরুবে, তারা আরো পরিচিতি পাবে।

'কি করে আপনারা পরস্পরের এত কাছাকাছি থাকেন সব প্রোগ্রামে?'

'যখন আমাদের কাছে কেউ বায়না করতে আসেন, তখন জেনে নিই প্রতিপক্ষ কে হচ্ছেন। যদি তখন উদ্যোক্তাদের প্রতিপক্ষ ঠিক করা না থাকে, তবে পরস্পর পরস্পরের নাম দিয়ে দিই।' এবারের উত্তরটা পাই কাঞ্চম মণ্ডলের কাছ থেকে।

'এতে আপনার কি সুবিধা হচ্ছে?'

'বাঃ! মনের মত পার্টনার পেলে গাইতে সুবিধে হয় যা কবিগানের আসরে একটা আলাদা রস তৈরী হয়। তাছাড়া বুঝতেই তো পারছেন—'

কণ্ঠ নামিয়ে বলে কাঞ্চন কুমার ঃ 'আমাদেরও তো উঠে দাঁড়াতে হবে। কারোর সাহায্য না পেলে সেটা কি সম্ভব। নন্দদাই তো আমাকে আজ এতটা এগিয়ে দিয়েছেন। নইলে—'

'থাক থাক ওসব কথা –' বাধা আসে বয়োজ্যেষ্ঠ নন্দকুমারের কাছ থেকে। বলেন আমাকে ঃ 'আসলে' আসরে ওসব খিস্তি-খাস্তা আমাদের তৈরী করা। না হলে

আসর জমবে কেন !'

ওদের দলে থাকে মোট চারজন করে, বাকীরা সবাই বাদ্যকর। দোহার ধরার সময়েও তারাই—সবাই পরস্পরের পরিচিত।

এদের অভিজ্ঞতার পরিধিও যথেষ্ট। শুধু এ দেশীয় নয়, বাংলাদেশী কবিগানও শোনার সুযোগ পেয়েছেন নন্দকুমার। তার মতে বাংলাদেশের কবিয়াল আসরে শ্রোতাকে মুগ্ধ করেন ভক্তি রসের প্লাবনে। যুক্তি-তর্ক বাদ দিয়ে তিনি একই দর্শককে চোখের জলে ভাসিয়ে দিতে পারেন শুধু আবেগ দিয়েই।

ঐ পদ্ধতিটি এদের আদৌ পছন্দ নয়। শাস্ত্র থেকে কূট যুক্তির অবতারণা করে প্রতিপক্ষকে প্রতি পদে ধরাশায়ী করতে না পারলে আমোদ কোথায়! এতে দর্শককেও যেমন উত্তেজিত করা যায়, নিজেদেরও তেমন এক ধরণের মনস্তুষ্টি আসে!

এই প্রসঙ্গে আগের রাতে গাওয়া 'তরণী সেন বধ পালা' নিয়ে আলোচনা উঠল। বাংলাদেশী কবিয়াল এই কাহিনীকে ভক্তিমার্গে নিয়ে যাবার জন্য রামের হাতে নিহত হতে তরণী সেনের কি আকুল আগ্রহ—সেসাব রঙে-রসে ব্যাখ্যা করে আসর জমাতো। কিন্তু যুক্তি দিয়ে পরিবেশন করলে,—রাম কেন তরণী সেনকে বধ করবে—তার সপক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি খাড়া করে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব তৈরী করায় নন্দকুমারের আগ্রহ বেশী। সেই সঙ্গে আনতে হবে কাহিনীতে বিভীষণের ভূমিকা।

যদি প্রয়োজন হয়, তবে কবিয়ালকে এর জন্য কাল্পনিক কথাও জুড়ে দিতে হবে—যেমনটি করেন নন্দকুমারও। দর্শক যখন চাইছে তখন কাহিনীর মূলসূত্র ধরে বিস্তার করলে তাতে কোন অন্যায় নেই। তাছাড়া তরণী সেনের মত কাহিনী মূল রামায়ণ বা বাংলা সংস্করণ—কোথাও তেমন বিশদ ভাবে নেই। সেক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় নিতে পারা যায় সহজেই।

এই ভাবেই আসর মাত করেন নন্দকুমার ও কাঞ্চন মণ্ডল—তাতে তারা সার্থকও হয়েছেন। হয়তো অন্যরাও।

আসল কথা হল দ্বন্দ্ব। যে বিষয়টি নির্বাচন করা হবে তার মধ্যে দ্বন্দ্বের অবকাশ না থাকলে কবিগান গেয়ে সুখ নেই। কাহিনীর মধ্যে পরস্পর-বিরোধী চরিত্র বা ঘটনা না থাকলে তা নিয়ে কবিগান গাওয়া হতেই পারে না। তাই রাম-লক্ষ্মণ নিয়ে, কবিয়াল কোন পালা তৈরী করেন না। তবে রাম-রাবণ, রাবণ-বিভীষণ, রাবণ-মেঘনাদ, ইত্যাদি ধরণের দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র ও আখ্যান তারা পছন্দ করেন বেশী।

কেননা কবিগানের আসরে দাঁড়ালে দুজনকে তো দুইটা পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে। সে দুটি যদি দ্বান্দ্বিক না হয়, তবে যুক্তি তর্কের জাল তৈরী হবে কি ভাবে! তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয় বিষম ঘটনা ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ কাহিনীর।

কবিগানের আসরে তারা এ' যাবৎকাল গেয়ে এসেছে পৌরাণিক বিষয়ক সমৃদ্ধ গান। সেটাই তাদের বেশী পছন্দ, শ্রোতা বা উদ্যোক্তাদেরও। তারাও যেন কবি-

গানের আসরে একটু ধর্মকথা শোনার আশাতেই হাজির হয় বা হতে চায়। কিন্তু ইদানীং সুরু হয়েছে এক অন্য উপসর্গ।

লোকশিক্ষার শক্তিশালী মাধ্যম রূপে যে কবিগানের বিশেষ উপযোগিতা আছে, তা' জেনে গেছেন এ দেশের বুদ্ধিজীবিরা। সেই শক্তিকে তারা এখন নানাবিধ কাজে ব্যবহার করতে চাইছেন। একদা পটুয়াদের মাধ্যমে যেমন জনশিক্ষার নানা প্রসঙ্গ প্রচারের ব্যবস্থা হত, বিভিন্ন ছড়ার মাধ্যমে যেমন চাষ-বাসের রীতি-পদ্ধতি প্রচারের ব্যবস্থা হত, এ-ও যেন কতকটা তাই।

তাই এখন রাজনীতির দাদারা কবিগানের আসরে নিজেরাই বিষয় ঠিক করে দেন। এবং কানে-কানে বলে দেন—কোন পক্ষকে হার স্বীকার করতে হবে। কেননা, এ তো আর স্বীকৃত শাস্ত্রীয় বিষয় নয়, এ হল তৈরী করা উদ্দেশ্যমূলক বিষয়। এখানে নীতির তো কোন বালাই নেই, শুধু উদ্দেশ্য পূর্ণ হলেই হল।

এই প্রসঙ্গে নন্দকুমারের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল, একবার এক রাজনৈতিক কবিগানের আসরের উদ্যোক্তা তাকে এ' ধরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেহেতু তারা টাকা দিয়ে গাওয়াচ্ছেন, কাজেই তাদের মনস্তুষ্টি করতে হবে বৈ কি!

তবে এ' ধরণের কবিগান এক-দেড় ঘণ্টার বেশী টানা যায় না—তাছাড়া শ্রোতারাও শুনে তৃপ্ত হন না। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা শুধু রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তথা ভোটের সময়ই তাদের এ' ধরণের অনুষ্ঠান করতে হয় মাঝে মাঝে। সামগ্রিক অনুষ্ঠানের তুলনায় এর সংখ্যা নিতান্তই কম হলেও এ' ধরণের ঘটনা যে তাঁদের মনে দাগ কাটে—এটাই তার প্রমাণ।

যেহেতু দ্বন্দ্বমূলক বিষয় না হলে কবিগানের আসরই জমে ওঠে না, তাই এইসব উদ্যোক্তাদের দেওয়া ফরমাসী কবিগানের কয়েকটা ধারা হল পরস্পর-বিরুদ্ধ দুই রাজনৈতিক দল। এছাড়া থাকে ডানের বলদ ও বাঁয়ের বলদ—স্বভাবতই এর বিষয় কৃষিকাজের সঙ্গে সংযুক্ত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু দক্ষ কবিয়াল বিষয়টাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যান ধীরে ধীরে দুই মতাদর্শের দুই দিকে। কৃষিভিত্তিক সমাজে এই জাতীয় বিষয় নির্বাচন যে অতি প্রয়োজনীয় এ' কথা স্বীকার করতেই হবে। এর দ্বারা সাপও মরল, লাঠিও ভাঙ্গল না।

কখনও বা পুরুষ ও প্রকৃতি, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, লাঙ্গল ও কলম—এ সব বিষয়েও তর্কে অবতীর্ণ হতে হয়। শেষোক্ত বিষয়টি শেষ পর্যন্ত শিক্ষিত-অশিক্ষিত বিষয়ের তর্কে সমাপ্ত হয়। এই সমীকরণটি একটু কষ্টকল্পিত মনে হলেও লাঙ্গল=শ্রমজীবী—অশিক্ষিত এবং কলম=পণ্ডিত=শিক্ষিত—এই অর্থবিন্যাসই কবিয়ালদের নিকট বিশেষ প্রিয়, অবশ্য জনতারও বটে।

কবিগান থেকে তৃপ্তি-অতৃপ্তিরও একটা প্রশ্ন আছে। টাকা দিয়ে উদ্যোক্তারা ডেকে নিয়ে যায় বলে তারাও যে মন খুলে সর্বদা গান করেন এমন নয়। রাজনীতির আসরে যে তা হয় না—সে কথা তো বলাই হয়েছে।

তবে নন্দকুমারের দল নদীয়া জেলার আসরে গান গেয়ে বেশী তৃপ্তি ও সমাদর

পেয়েছেন। তাঁর মতে যতই হোক চৈতন্যের দেশ তো! রসের আর প্রেমের বন্যা বইছে সেখানে মানুষের অন্তরে। তাই গান যদি গাইতে হয় তো সেখানেই—অন্ততঃ প্রাণের টান থাকে সেখানে।

তখনই মনে পড়ল, নন্দকুমারের কণ্ঠে দেখেছিলাম কণ্ঠী। তাই, কেন যে চৈতন্যের দেশে গান গাইতে তার এত ভাল লাগে—তা বোঝা গেল। হয়তো নিজের জন্মভূমি যদি 'চৈতন্য-ভূমি' নদীয়া জেলায় হত, তাহলে আরো ভালো লাগত। সারা বছরই এভাবে তাদের ঘুরতে হয় এ আসর থেকে সে আসরে। বছরের শেষ ভাগটা তাদের স্থিতির জীবন—নিজের গৃহে থাকেন। একটু ঘর-সংসারের কাজ দেখা শোনা হয় সে সময়।

অবসর সময়ে বাউল গান লেখা—তাঁর আর এক নেশা। সেটা অবশ্য তার মুখ থেকে শোনা হয়নি—জানিয়েছেন তাঁর এক সহচর। আরো প্রশ্ন হল, আমার সঙ্গে রেডিওর কোন যোগাযোগ আছে কি না বা বাউল গানগুলি প্রচারেয় ব্যবস্থা করতে পারি কি না।

এ' অনুরোধ গ্রামাঞ্চলের সংস্কৃতিসেবী ব্যক্তির নিকট আগেও শুনতে হয়েছে। সুদূর দক্ষিণের সুন্দরবন অঞ্চলের দুখে-যাত্রা পালার এক চরিত্রাভিনেতা জানিয়েছিলেন এ' ধরণের অনুরোধ। মফঃসলেয় এক যাত্রা-শিল্পীরও ছিল সেই অনুরোধ—নন্দকুমার তাদেরই মত একজন।

কিন্তু নন্দকুমারের অতীত জীবনের চিত্রটা অন্য রকম। তখন ইনি ছিলেন বোলান গানের দলপতি। এই বিচিত্র বিনোদন মাধ্যমটি নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান অঞ্চলে প্রচলিত আছে। চৈত্র-সংক্রান্তির গাজন উৎসবে বোলান গাওয়ায় তাঁর তখন জনপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু কালক্রমে বোলান গাইতে গাইতে কবিগানের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। এখন বোলান গান সম্বন্ধে তার মনোভাব ভিন্ন ধরণের।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কথা জানা হল। তবু মনে হল নন্দকুমারের নিজের কথা কিছু জানতে পারলে ভাল হত। এত যে কবিগান গেয়ে বেড়ায়—কথায় কথায় ছড়া বাঁধতে পারে, তার জীবনের অন্য কোন পরিচয় কি নেই?

'কবিগান ছাড়া আর কি কি করা হয়?' এ প্রশ্নটা আমার, তবে উত্তরটা আমার জানা। কেননা নানা গ্রাম্য বিনোদন প্রকরণের সঙ্গেই এদের যোগাযোগ থাকে।

'কবিগান তো ইদানীং গাইছি। আগে আমার বোলানের দল ছিল।' উত্তর দিয়ে ক্ষণেক থামল নন্দকুমার। বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করল 'ব্যেলান' সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা আছে কি না। আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম না যে একদা ওই বিশিষ্ট গ্রাম্য বিনোদনটি নিয়ে দীর্ঘদিন ধয়ে বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ বীরভূমের নানা গ্রামে যেতে হয়েছিল আমাকে। চৈত্র-সংক্রান্তিতে গাজনের সময়ে অনুষ্ঠিত এই বিচিত্র বিনোদনটি যে একই সঙ্গে নাটক-নৃত্য-গীত—এসব তথ্য এখানে এই কবিয়ালদের ভাঙ্গা আসরে বলে আমার কী লাভ?

'তাহলে বোলান গান করা ছেড়ে দিলেন কেন ? সে সব তো এখনও হয় নদীয়া, বর্ধমান জেলায় ?'

'আসলে কী জানেন, বোলানে ভাবনা চিন্তার অবসর কম। গায়ককে ধরা-বাঁধা পথে চলতে হয়। আজ কবিগান গাইতে গাইতে বুঝতে পারছি, এতে স্বাধীনতা অনেক—নিজের কথা বলার সুযোগ অনেক আছে। আরো বুঝতে পারছি, এখন আর বোলান দলে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়—মন ভরবে না। তাই মনটাকে সেভাবে বেঁধে নিয়েছি। নানা রকম পড়াশুনাও করতে হয় এজন্য।

বোলান গানের চাহিদা বছরের মাত্র একটি সময়ে—গাজন উৎসব। তারপরে তার বাঁচার কোন পথ নেই। কিন্তু কবিগানের চাহিদা বছরের সব সময়ে হয়। পরিচিতি ও প্রচার হয় অনেক বেশী—যে সুযোগ বোলান দলে থাকলে হত না। এ সব ভেবে চিন্তে এখন তিনি পুরোপুরি কবিয়ালই—বা, চারণ কবি।

কথা প্রসঙ্গে তার কাছ থেকে এতদঅঞ্চলের আরো অনেক কবিয়ালের নাম-ধাম জানা গেল। কিন্তু এটুকু বুঝলাম যে সকলের প্রতিই তাঁর আছে এক অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিনয়। নিজে কতটা করতে পেরেছেন বা করতে চান—এ' প্রশ্নের উত্তর দেন উপরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে।

এ' জাতীয় কাঞ্চন মণ্ডল বা নন্দকুমার ছড়িয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র। শেখ গুমানি বা রমেশ শীল সবাই হতে পারেন না। শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ সময়েই তাদের দেখা যায়—যেমন দেখা গেছিল মুকুন্দদাসকে।

কিন্তু তাদের বাইরেও যে কত অসংখ্য কবিয়াল বাংলার গ্রামেগঞ্জে মানুষকে শিক্ষিত করে তুলছে এবং অকৃত্রিম আনন্দ দিয়ে যাচ্ছে—তার কথা বোধহয় সাধারণের পক্ষে জানা বা জানানো খুবই দুরূহ। দলের গঠন, বেশবাস ইত্যাদি দেখে তাঁদের আর্থিক তবস্থা অনুমানের চেণ্টা করা যায় মাত্র—কিন্তু মুখ ফুটে সে প্রশ্ন করতে যেন কেমন বাধে।

তাই, হাতে সেই চুক্তিপত্রের নমুনা নিয়ে ভবিষ্যতের সঞ্চয় মনে করে পকেটে রেখে দিতে হয়—কিন্তু চুক্তিপত্রের সেই শূন্য স্থানে বায়নাদাররা কোন অংক বসিয়ে দেয়, তা জানতে পারলে হয়তো নন্দকুমারদের জীবনের অন্য দিকটা আরো স্বচ্ছ হয়ে উঠতো। কিন্তু এ' জিজ্ঞাসা তো শুধু আমারই—তাদের কি ? মনে হয় না। নচেৎ আসরে উৎফুল্ল শ্রোতার মুখ দেখে বা সারারাত গাইবার পরেও জনৈক 'ধর্মপিপাসু বৃদ্ধের অনুরোধে ভাঙ্গা গলায় আবার গাইতে বসেন তারা ? চুক্তিপত্রের বায়নানামার কথা বা বিশেষ দ্রষ্টব্য সেই 'আট ঘণ্টা গাওনার' কথাটা তখন তারা স্মরণ করেন না কেন ?

এ' প্রশ্নটা আর জিজাসা করা যায় না নন্দকুমারদের। কারণ তার উত্তরটা তাদেরও অজানা। □

মালভূমি-সমভূমি-পাহাড়-সমৃদ্ধ দেশে লোকশিল্পের যে বিচিত্র প্রকরণ
এ বঙ্গের নানাস্থানে এখনও দেখা যায়,
ও এখনও যার অকৃত্রিম অনুশীলন হয়,
তার মধ্যে লোকচিত্রকলা হল অন্যতম।
সরা, আল্পনা, চালচিত্র, মুখোস—প্রভৃতি
নানা প্রকরণে ও নানা মাধ্যমে বাংলার
লোকচিত্রকলার রূপ বিস্তার করে চলেছেন তারা দীর্ঘ
দিন ধরে। কিন্তু তাতেও শেষ হয় নি
তাদের সৃজনশীলতার ভাণ্ডার। রথ চিত্রাংকনে
বা পাল্কীর বহিরঙ্গ অলংকরণেও সে হয়ে
উঠেছে সক্রিয়।
রং-তুলির যে মায়াময় জগৎ নিয়ে এই লোকশিল্পকলা,
তার এক অন্যতম নিদর্শন হল পটচিত্র—
যায় কথা আজ বিদেশেও ছড়িয়েছে।

লোকশিল্প-৩

যে বিচিত্র জনসমাজের মাধ্যমে এই
শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে,
সমাজের ইতিহাসে তা বরাবরই যেন বিতর্কিত।
বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের সংকীর্ণ অনুদার বহুতর স্তর-বিন্যাসে
তাদের আসন কোথায়—
সে বিষয়েও দ্বন্দ্ব আছে বিস্তর। কিন্তু তাদের সৃষ্ট
চিত্রকলা যে সত্যই চিত্রকলা এবং
নান্দনিক সম্পদে ভরপুর—
এ বিষয়ে উচ্চতর শিল্পী সমালোচক সমাজে
আজ আর কোন দ্বিমত নেই।
এ প্রসঙ্গে প্রাচীন কলকাতার কালীঘাটের পট থেকে সুরু করে
তাদের তৈরী জড়ানো পটের কথা
আজও বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ।
কেননা আজ তাদের অংকন-ভঙ্গী শহুরে শিল্পীদেরও ঈর্ষণীয়।

তমলুকের অজিত পটিদার

হুজুগের জায়গা ছেড়ে এবারে তবে চলুন গাঁয়ে-গঞ্জে।

যেতে হবে এবার পটুয়াপাড়ায়। কলকাতার কাছে-পিঠে নয়, সেই মেদিনীপুর জেলার গ্রামে। রেল লাইনের ধারে পাশে কোন গ্রাম নয়—মেচেদা থেকে তমলুক এসে তারপর অন্য ঠিকানায়। যদি একদিনে কাজ শেষ না হয়, তবে প্রয়োজনে তমলুকে রাত্রিবাস করতে পারেন—ছোটখাটো লজিং আছে।

অজিত পটিদারের ঠিকানা পেয়েছিলাম তমলুক শহরের নৃতত্ত্বের গবেষক ড. তারাশিস মুখোপাধ্যায়ের মুখে। তাঁর খোঁজ পেয়েছিলাম স্থানীয় হ্যামিলটন স্কুলের এক তরুণ শিক্ষকের কাছে। তার কাছেই ছিলাম তখন ক'রাত্তির।

তার আগে জানিয়েছিলেন একজন এদের কথা—তিনি হলেন লোকসংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক তারাপদ সাঁতরা মহাশয়।

তমলুক শহরের বাসস্ট্যান্ড থেকে ট্যাংরাখালি ও পুরুষাঘাটগামী বাস ধরুন—দূরত্ব মাত্র চৌদ্দ কিলোমিটার। বাসে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না। তারপর ঠেকুয়াচকের বাজার মোড়—সেখান থেকে সামান্য একটুখানি পথ গ্রামের মধ্যে ঢুকলেই খোদ পটুয়াদের আস্তানা।

ওখানেই আলাপ হল আশু, অজিত, বাবলুদের সঙ্গে। এদের মধ্যে বাবলু বয়সে হল নবীন—তার মুসলমান নাম হল বাহারউদ্দিন। অন্যদের মুসলমান নাম নেই। এদের প্রধান হল অজিত ওস্তাদ—তার ভাই বিষ্ণুপদও এখন পটিদার হয়েছে। এদের নামের প্রচলিত পদবী কি তা জানা গেল না, তবে সাধারণ্যে এদের পরিচিতি 'পটিদার' নামে। যারা চিন্তা-ভাবনায় একেবারেই গ্রাম্য, তারা নিজেদের বলে 'মিস্ত্রি'। কিন্তু যারা একটু শহুরে হয়েছে, সাধুভাষার মর্ম জেনেছে, তারা নিজেদের নামের সঙ্গে 'চিত্রকর' শব্দ যুক্ত করে।

এদের ধর্মবিশ্বাস বেশ বিচিত্র—এরা হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়। কিংবা বলা চলে এরা হিন্দুও বটে, মুসলমানও বটে। এ চেতনা আরও আগেও হয়েছে, এবারও হল। তাই পট বেচতে চাইলে বা পটের গান শুনতে চাইলে এরা সত্যপীরের পট দিয়ে শুরু করে। তারপর হয়তো দেখাবে রামায়ণের পট।

আসলে ইতিহাস বলে সত্যপীর হল জনসমাজের মান্যবর দেবতা। মুসলমানের কাছে যিনি সত্যপীর তিনিই হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণ ঠাকুর। তাই দুই সমাজকেই খুসী রাখবার জন্যই বোধহয় এই দেবতার নাম গেয়েই এরা পাঁচালী গাওয়া সুরু করে। কেন এমন করে? এ নিয়েও শোনা যায় এক গল্প—এর পেছনে আছে

নাকি দেবতার শাপ।

আদিতে এরা নাকি মুসলমান সমাজেরই লোক ছিল। তখন ছবি এঁকে গান গেয়ে জীবন যাপন করত। সেই ছবির পট—তার কাহিনী ছিল হিন্দু সমাজের নানা পুরাণ কাহিনী। সম্ভবতঃ জীবিকার জন্যেই এই বৃত্তি গ্রহণ। এর ফলে তারা নিজেদের সমাজে হল ব্রাত্য। অপর পক্ষে হিন্দুসমাজের কাহিনী প্রচার করলেও তারা সেখানে কোন পরিচয় তৈরী করতে পারল না—পেল না হিন্দুত্ব। আসলে হিন্দুত্ব আসে জন্ম সূত্রে—ধর্মান্তর সেখানে হয় না, তা তাদের জানা ছিল না। ফলে এক জনসমাজে জন্ম ও অন্য জনসমাজে জীবনচালন—এই বিচিত্র জীবন ওদের। তাই ওদের বাড়ির মেয়েরা শাঁখা-সিন্দুর পরে আবার পুরুষেরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। ওদের দুটো নামও হয়—সামনে শ্যামসুন্দর পিছনে সামসুদ্দীন, সামনে জহুর পিছনে জহিরউদ্দীন। এদের সামাজিক লেনদেন হয় নিজেদের জনসমাজেই।

রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের কাহিনী এদের সকলেরই মোটামুটি জানা—বংশ-পরম্পরায় যেমন হয়। এমন কি বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য—তার মূল কাহিনীও জানা। গল্প বলার বা ছবি আঁকার কত কায়দা—একেক জনের একেক রকম। যেহেতু কাহিনী বর্ণনা করে নিজের মুখে, তাই মূল কাহিনীকে সামান্য বাড়িয়ে-কমিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এদের আছে।

তবে মহাভারতের কাহিনী এই পটুয়ারা তত পছন্দ করে না। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ যে মহাভারতেরই তা এদের জানা নেই। নচেৎ ঘরে-বাইরে গাঁয়ে-গঞ্জে কৃষ্ণলীলা পটের এত জনপ্রিয়তা কেন ?

অজিত মিস্ত্রি আরও জানালেন এসব ট্রাডিশনাল পটে এখন আর লোকের তত মন ধরে না। তবে যেহেতু পটশিল্প বরাবরই গড়ে উঠেছে দেব-দেবী কাহিনীর পরিমন্ডলে, তাই নবযুগের নতুন ধারায় এখন এসেছে জীবনীমূলক পট অর্থাৎ শহুরে ভাষায় মহামানবের জীবনী।

তাহলে কি করে ধর্ম রক্ষা হয় ?

আমার এ প্রশ্নে অজিত মিস্ত্রির বক্তব্য হল, প্রথমে যথারীতি দেব-বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। তারপর ধরা যাক বিদ্যাসাগরের জীবনী। এই পুণ্য জীবনী বর্ণনার শেষাংশে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল বিষ্ণুলোকে—তারপরই স্বর্গমাহাত্ম্য ও বিষ্ণুনাম। এ ভাবেই ধর্মরক্ষা হল আবার পয়সার সংস্থানও হল।

মাটির উঠানে খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসে আমরা ঐসব কথা বলছিলাম। ওদের বাড়ীর স্ত্রীলোক ও বাচ্চারা হাঁ করে আমাদের দেখছিল—এসব দেখতে ওরা অভ্যস্ত। অনেক লোকজনই নাকি আসে এ গ্রামে।

একটি দশ বারো বছরের বালকও দেখলাম কচি হাতে পট আঁকা অভ্যাস করছে। কথায় কথায় আবার জানালো অজিত, পুরনো দিনের বিষয়-বস্তু ছেড়ে দিয়ে এখন ওরা একটা নতুন কোন কিছুর দিকে ঝুঁকছে। শুধু বাঙ্গালী পাড়াতে গেলেই

হয় না, বাংলাভাষী অন্যান্য সমাজেও যাতায়াত করতে হয়—নেহাৎই অর্থের জন্য। তাই এখন তারা সাঁওতাল জাতির জন্মকাহিনী নিয়ে পট আঁকে। সেটা নিয়ে গেয়ে আসে সাঁওতালদের পাড়ায়।

হয়তো কোন একদিন কেউ গেছিল ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে, সেই-ই সংগ্রহ করে এনেছে এই গল্প—এটা অজিতের অনুমান।

আমার অনুরোধে অজিত সাঁওতালী পট দেখিয়েছিল আমাকে। কি ভাবে সেই পটের ছবির কাহিনী সাজানো হয়েছিল, তা বলছি পরে। তবে ছবি দেখানোর সময়ে যে বিচিত্র ভাষায় সে ছবির 'রানিং কমেণ্ট্রি' করেছিল—তা বেশ বিচিত্র। সেটি সাঁওতালী ভাষা কিনা—তা জানি না। তার মুখ থেকে গান শুনে নিয়ে তারই নির্দেশে সেটি লিখে দিলাম। এর ভাষা ব্যাকরণ ইত্যাদি শুদ্ধাশুদ্ধির দায় কিন্তু আমার নয়।

'যুগেরে সিং বঙ্গা মারং বুরু তালাবে—দৌড়াকিং দিপলাকরে পিতল সিকড়ি মারকিং হোরয়া কাদায় সে দায় আইনি গাই, বাইনী গাই কাপিল গাই তাহালে নাই তড়ো সিতাম রিত কাতে মচাড়ে উলি দাকিং বাসং লেখা সে দা কাঠ কম রাজ হেকরাজ ইর রাজ কেচুয়ারা বাত রাজিকিং দুড় যাওয়াং কাতে অনা বিচারতে কেচুয়া রাজ পাতাল ফোড় চালাও কাতে আড়াইতি বসমন্ত সিজন লেনাই।'

এটি কী ভাষা তা জানা নেই আমার। অজিতের মুখে যেমন শুনেছি, অনেক কষ্ট করে লিখে নিয়েছি। এর শুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন সাঁওতালি সমাজে যাইনি। কিন্তু সাঁওতালী পট তারা গেয়ে শোনায় বটে, তবে পরে ব্যাখ্যা করে দেয় চলতি বাংলা গদ্যে। তারা যে সাঁওতালী ভাষা বোঝে এমন নয়, তবে বেশ দক্ষতার সঙ্গে ওটা মুখস্থ করে নিয়েই বলে—তারাও এর অর্থ বোঝে না।

অজিতের হাতের কাজের কিছু বর্ণনা দেয়া যাক। এর হাতের সাঁওতালি পটটি বেশ নতুন ধরনের বলে মনে হল।

মাত্র চোদ্দটি ফ্রেমে সাঁওতালদের জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে আছে ফিকে সবুজ রং এবং গৃহের অভ্যন্তর ও জল ইত্যাদির ইঙ্গিত দিচ্ছে নীল পটভূমি। এছাড়া দেবতা, গরু এদের রং কালো—অবশ্য সাদা হলুদ রংএর গরুও আছে। এছাড়া পাখী, কুমীর, কচ্ছপ সব হলুদ রংএর। স্ত্রীলোক হল হলুদ এবং পুরুষ ব্রাউন।

প্রথম চিত্রটি হল দেববন্দনা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চিত্রে আছে মানুষ অর্থাৎ সাঁওতালী সৃষ্টিতে পৃথিবীর অন্যান্য মানবেতর প্রাণী—পাখী, কুমীর সাপ, কচ্ছপ, গরু ইত্যাদি। তার পরবর্তী চিত্র হতে শুরু হল প্রথম মানুষের জন্ম। তাদের শিকারে যাওয়া, সুন্দরী মেয়ের সন্ধান, সাত ছেলে ও সাত মেয়ের বিবাহ। তাদের বিয়ের বাদ্য, শিকার, সংসার যাত্রা ইত্যাদি—এইভাবে গল্প এগিয়ে গেছে প্রায় রূপ-কথার ধরনে। বিষয়বস্তু প্রচুর, কিন্তু মাত্র চোদ্দটা ছবিতে সব কাহিনীটা ধরিয়ে দেওয়ার কৃতিত্বটা কম নয়।

একটা বিষয় অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম। একই বিষয় নিয়ে তিনটি জড়ান পট আমাকে দেখাল ওরা তিনজন—অজিত, তার ভাই বিষ্ণুপদ ও অজিতের বৌ। বিষয় 'সেতুবন্ধ' হলে কি হবে, উপস্থাপনের কত পার্থক্য। তিনজন শিল্পী একই সঙ্গে থাকে, একই বিষয় নিয়ে আঁকে এবং একই উপকরণ ও পদ্ধতিতে। তবু এদের তিন জনার শিল্প-ভাবনার কত পার্থক্য।

এইসব কথায় কথায় বেলা বাড়ছিল। আমাদের অন্য জায়গায় যাবার পরিকল্পনা ছিল, আকারে ইঙ্গিতে সে কথা বলেওছি ওদের। প্রত্যুত্তরে ওরা আমাদের দুপুরে এখানে খেতে অনুরোধ জানাল। এ জাতীয় একটি প্রস্তাব যে আসতে পারে, তা আগেই আমাকে জানিয়েছিল ভ্রমণসঙ্গী স্বপন।

আমরা অক্ষমতা জানালাম। শুনে ওদের মুখটা যেন কী রকম যেন হয়ে গেল। কথাবার্তা বলতে বলতে ওদের সঙ্গে একপ্রকার মানসিক আত্মীয়তা হয়ে গেছিল যেন। সেই জন্যই ওরা আমাদের কাছে ভাত খাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। অক্ষমতা জানানোয় অজিত পরে বলেছিলঃ 'আসলে আমরা তো কোন জাতেরই নই। তাই কেউ আমাদের হাতে খেতে চায় না।'

ওর এই আক্ষেপোক্তি শোনার পরে ও প্রায় স্বগতোক্তির মত করে জানিয়েছিল, কবে কখন কে কে তার বাড়ীতে ভাত খেয়েছিল। আজ এটাই তার জীবনের এক বিরল ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবন জীবিকার তাগিদে অজিত পাটিদাররা আজ সমাজের এমন স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে যে কোন সমাজেই তাঁরা যেন নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায় না।

এসব অনেক পুরানো দিনের কথা। ১৯৮৫ সালেরও আগে এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। তখন জেনে নেওয়া হয়নি এরা তপশীলী ভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে কি না। তবে সম্প্রতি কোন কোন শিক্ষিত পটুয়া স্কুলে মাষ্টারী করছে—এসব সংবাদও পেয়েছি। তারা নিজেদের এখন হিন্দুসমাজভুক্ত বলতে চায় বোধহয়। তবে অবশ্যই বর্ণ-হিন্দু নয়—বর্ণ-হিন্দুদের ভাষায় ছোটলোক হিন্দু।

এদের ছবি আঁকার ধরণ দেখলাম, একটি পুরো গান কপি করলাম খাতায়, সাঁওতালি পটের কথা জানলাম। তবু মনে হচ্ছিল আরো কত কী যেন জানা বাকী রয়ে গেল। রামায়ণের 'সেতুবন্ধু' পটের গানটা আজও খাতায় সঞ্চিত আছে।

যে ভাবে এরা গান গেয়ে ছবি দেখায়, তার সঙ্গে ছবির সম্বন্ধ কিংবা অঙ্কিত ছবির সঙ্গে গানের সম্বন্ধ—প্রায়ই অসংলগ্ন বলে মনে হয়েছে। সম্ভবত, আমি শহুরে লোক—তাই। কিন্তু যারা এমনি শুনে আনন্দ পায়, তাদের কাছে এটি কোন সমস্যাই নয়।

এ সম্বন্ধে কিছু জানালো অজিতের ভাই বিষ্ণুপদ। এ বিষয়ে তার বক্তব্যটা বেশ বিচিত্র।

প্রসঙ্গ কথা

বাস্তবজগতের রক্তমাংসের মানুষ বা ইতিহাসের চরিত্র নিয়ে রচিত হয়েছে পটের পট। হজরত মহম্মদ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও তিনি কখনই পটের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেননি। কেননা, ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী শুধু তাঁর চিত্রাংকনই নয়, ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষের চিত্রাংকন করাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ এমন একটা বিশ্বাস ইসলাম পন্থীদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

অপরপক্ষে নিমাই-সন্ন্যাস জাতীয় পটগুলিও এই ঐতিহাসিক শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। যদিও উপস্থাপনের গুণে এই সব চরিত্র মানব অপেক্ষা দেবতা রূপেই বরাবর চিত্রিত হয়েছেন—এ ধরনের প্রকাশ-ভঙ্গীর জন্য পটুয়াদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা বোধকেই দায়ী করা চলে। এই পটভূমিতে পটুয়াদের হাতে আঁকা যীশুখ্রীষ্ট বিশেষ অভিনব ব্যাপার বলে মনে হয়।

যে সময় ও কাল অতিক্রম করলে কোন ধ্যান-ধারনা বা বিশ্বাস জাতির মনের গভীরে স্থায়ী আসন পাতে, এদেশে খ্রীষ্টধর্ম সে বয়স এখনও পায়নি। অন্ততঃ নিরক্ষর, অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত জনসমাজে তো বটেই। তার চেয়েও বড় কথা, যে পটুয়ারা এই সব কর্মে নিযুক্ত আছেন, তাদের সমাজের সঙ্গে খ্রীষ্টজনসমাজের পার্থক্য বেশ দূর।

মেদিনীপুরের পিংলা থানার কয়েকটা গ্রামে গেলে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে ওখানকার পটুয়ারাই একদা যীশুপট এঁকেছিলেন এবং এখনও অর্ডার পেলেই আঁকতে পারেন। অন্যত্র এ বিষয়ে তত দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। পিংলা অঞ্চলেই নয়া নিবাসী ননীগোপাল চিত্রকরের কথা তাহলে বলা যাক।

এর আঁকা যীশুপটগুলি একক চৌকো পট। বিষয়বস্তু যীশুখ্রীষ্টের জীবনের নানা অংশ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, আস্তাবলে যাবপাত্রের মধ্যে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম, তিনি শিষ্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ধর্ম-উপদেশ দান করছেন, প্রান্তরে আত্ম উপলব্ধির সময়ে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ কিংবা তাঁর ক্রুশারোহনে মৃত্যুর নিষ্ঠুর দৃশ্য।

যীশুর সমগ্র জীবন থেকে যে বিষয়গুলি তিনি নির্বাচন করেছিলেন তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একথা স্বীকার করতেই হবে। একজন যুগোত্তর পুরুষকে বুঝবার জন্য চিত্রকরের এই দৃশ্য নির্বাচন বিশেষ উঁচুদরের বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটা আরও সপ্রমাণ হয়, যখন জানা যায় যে তিনি যীশুখ্রীষ্ট নিয়ে ধারাবাহিক বা জড়ানো পটের কাজ কখনো করেন নি।

এর অর্থ এই নয় যে, যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে তাদের গভীর আস্থা বা জ্ঞান আছে। তারা যে ধর্মমতে বিশ্বাসী সেখানে চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর যে স্থান, যীশুখ্রীষ্টরও সেই স্থান। তাদের চিত্র এঁকে প্রচার করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়—তাই বিষয়ের বৈচিত্র্য পেলে এবং তাদের জীবন-দর্শনের সঙ্গে সহমত হলে তবে তারা তাকে সাদরে গ্রহণ করতে পারে।

যেটুকু জানা ছিল, তার সঙ্গে যা সংযুক্ত হল তা হল এই ঃ ছবির সংখ্যা যদি কম হয়, তবে দীর্ঘ গানটাই তারা গেয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে গানের বহু অংশ চিত্রশূন্য হয়ে পড়ে। আবার গান যদি ছবির তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন হয়, তবে দক্ষ গাইয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিভায় বাকীটুকু বানিয়ে বানিয়ে গেয়ে দেয়—নচেৎ ওদের এই সব গান সবারই মুখস্থ থাকে। এ কাজে অবশ্য অজিতের থেকে ওর ভাই বেশী পটু এবং তার প্রমাণও পাওরা গেল।

আমাদের অনুরোধে 'সেতুবন্ধ' পটের গানটা সে মুখে মুখে গেয়ে গেল—ছবি সামনে রাখা ছিল। ছবি না থাকলে তারা গাইতে পারে না।

গুণে দেখলাম শেষ পর্যন্ত ৭৪ লাইন হলো। মূল কাহিনী হল প্রথম ৭০ লাইন, তারপর সে গাইল ঃ

'রথ লয়ে রাবণ রাজা করিয়া গমন
কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচে গীত রামায়ণ।'

এই পর্যন্ত শুনেই তাদের বললাম যে, তারা যে গান গাইল তা মূল রামায়ণে নেই এবং তা কৃত্তিবাসের লেখাও নয়। লেখা হল ঐ গায়কের অর্থাৎ বিষ্ণুপদর।

শুনে তো তারা দু'ভাই ভীষণ অবাক। এতদিন ধরে তারা এভাবেই রামায়ণ গেয়ে আসছে পট দেখিয়ে দেখিয়ে।

'ভণিতা' নামক শব্দটা তাদের জানা ছিল না। সেটা বুঝিয়ে বলতেই তখন একটু ভেবে নিয়ে বিষ্ণুপদ নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে শেষ দু'লাইন নতুন করে তৈরী করল ঃ

'এখানে শেষ করলাম রামায়ণ বন্দনা।
শিল্পী বিষ্ণুপদ চিত্রকর ঠেকুয়াচক ঠিকানা।'

ইতিমধ্যে দুটি পট পছন্দ করতে হল—এত গল্প-গুজব করে তো আর শুধু হাতে ওঠা যায় না। একটি সেতুবন্ধ পট ও অপরটি সাঁওতালী পট—অর্থাৎ দু'ধারার দুটি। একটু দর-দাম করে দুটিই সংগ্রহ করলাম নিজের অভিজ্ঞতার প্রয়োজনে। প্রথমটি ঐতিহ্যাশ্রয়ী ও দ্বিতীয়টি নবযুগের প্রয়োজনে রচিত।

সহযাত্রী স্বপন প্রশ্ন করল মুসলমানী পট সম্বন্ধে - অবশ্য প্রশ্নটা আমার মনেও জেগেছিল তখন। হিন্দু ধর্ম তো হল, কিন্তু যেটা ওদের নিজেদের ধর্ম—তার কথাও তাহলে হোক কিছু। ব্যাপারটা ওদের মাথায় আসেনি আগে। তবে লায়লা মজনু, শিরিফরহাদ, সোরাব-রুস্তম জাতীয় ধ্রুপদী গল্পের পট তৈরী করতে পারলেও, ওরা বোধহয় ততটা সাহসী হয় না এ ব্যাপারে। ওদের ধারণা, সম্ভবত; এগুলি মুসলমান সমাজে অপসংস্কৃতি বলে গণ্য হবে।

এসব কথা অজিত বিষ্ণুপদের নয়, এগুলি আমাদের চিন্তার সারাংশ। মুসলমান সমাজে লোকধর্ম বলে কোন মতবাদ নেই। কোরাণের কোন অংশ পটের মাধ্যমে চিত্রায়ণ—একথা কেউ ভাবতেই পারে না। তবে উপরোক্ত কাহিনীগুলি কোরাণের নয় বা ধর্মীয় নয়। তাই সেগুলি পটে রূপান্তরিত করা তত বিপজ্জনক নয়।

কিন্তু তাতেও ওদের সন্দেহ—লোকে কিনবে তো ?

এই ভাবেই চলে অজিত-বিষ্ণুপদর জীবন। এখন এরা শুধু জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামেই যায় না, শহরেও যেতে শুরু করেছে। কলকাতায় কিছুদিন আগেও বাস-এর দোতালায় অন্যান্য হকারদের মতই পট বিক্রী করত—গান গেয়ে ছবি দেখিয়ে।

এদের বেশ কিছু পট কিনেছেন শান্তিনেকেতনের কলা ভবন, কল্যাণী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগ তাদের নূতন মিউজিয়ামের জন্য। বালিগঞ্জের বিশিষ্ট নাগরিক পি. লাল, লোকসংস্কৃতির গবেষক তারাপদ সাঁতরা—সেই সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কর্তৃপক্ষ তো আছেনই। এদেশের লোকে কি-ই বা দাম দেয় পটের। ওদের কাছ থেকেই জানা গেল ইদানীং কালের পট বিক্রীর হাল-চাল।

রংয়ের ব্যবহার, কাগজের গুণাগুণ এবং আয়তন—এই তিনটির কম-বেশী বা ওঠা নামার জন্য দামের তারতম্য হয়। সাধারণতঃ বিদেশীরা এ ব্যাপারে বেশী টাকা খরচ করেন বলে সেগুলি খুব ভাল কাগজে রং-ঝলমলে করে আঁকা হয়। সেগুলি এক এঝটার দাম কখনো কখনো আড়াইশ' পর্যন্ত হয়। তবে কম দামে বিক্রী হবার জন্য এরা এখন অতি সাধারণ দিস্তে কাগজেই পট আঁকছেন।

কতদিনই বা এসব এঁকে দিন চলবে—দু' ভায়েরই এই একই কথা। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ে বাড়ীর মেয়েরা।

মৃৎ শিল্প আর তাঁতশিল্পের দিকে ঝুঁকছে ধীরে ধীরে। 'পোটো পাড়া' অবশ্য এ গ্রামেই আছে—ঢোকবার সময়েই তা নজরে এসেছিল। এরাও করে তার কিছু কিছু নমুনাও দেখালো। আগে মৃৎশিল্প-তাঁতশিল্প ছিল অবসর সময়ের কাজ, এখন বেঁচে থাকার তাড়নায় এটাই হয়েছে প্রধান। আর পট আঁকা হয় সময় পেলে বা কেউ অর্ডার দিয়ে গেলে।

তবু শুনে ভাল লাগল যে, এখনও এরা দেশীয় প্রথায় রং তৈরী করে ছবি আঁকে। সে পদ্ধতিও বড় বিচিত্র। সিম গাছ থেকে আসে সবুজ রং। হলুদ বের হয় হরতেল থেকে। সিঁদুর হয় লাল রং। ভুষো কালি থেকে হয় ঘন কালো। আর কাপড়ে দেবার নীল রং থেকে নীল রং। তবে দু' তিনটি রং মিলিয়ে নতুন নতুন রং তৈরী করতেও এরা ওস্তাদ।

একটা নারকেলের মালায় কালো রং তৈরীই ছিল। একটা ছেলে তাই দিয়ে পট আঁকার শিক্ষানবিশী করছিল। আমি অজিতকে বললাম, তার নাম ঠিকানা পটের পিছনে লিখে দিতে—যত্ন করে কালো রং-এ লিখে দিল নিজের নাম ঠিকানা। বেশ আর্টিষ্টিক ওর অক্ষরের ছাঁদ।

ভাল করে চেয়ে দেখলাম, ওর তুলিটি যেন কেমন অচেনা বস্তুর তৈরী। পরে জানতে পেরেছি তা হল ছাগলের পিঠের লোম দিয়ে তৈরী। নিজেই করে নিয়েছে। তুলির যা দাম—কোথা থেকে কিনবে।

অজিত যতক্ষণ পটের পিছনে নিজের নাম ঠিকানা লিখছিল তখন বিষ্ণুপদ কোথায় যেন উঠে গেছিল। লেখা শেষ হতেই ফিরে এল আমাদের সামনে—হাতে একটা ছাপানো কাগজ, অনেকটা হ্যাণ্ডবিল গোছের।

অজিতের সলজ্জ চাহনি দেখে বুঝলাম, এর সঙ্গে ও নিশ্চয় কোনভাবে জড়িত। বিষ্ণুপদ জানালো, একদা এখানে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পদার্পণ করেছিলেন। তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছিল এই পটুয়ারা। তাদের মুখপত্র হয়ে অজিত রচনা করেছিল এই কবিতা—তারপর ছাপিয়েছে। বলেছিল ১৯৭৮ সালের বন্যার পর এটি রচনা করেছিল ও—স্থানীয় লোকদের অনুরোধে। যেহেতু তাদের সহজাত কাব্য-প্রতিভা আছে, তাই বোধহয় তকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমরা। ও যে শুধু মুখে মুখে গান তৈরী করে গাইতে পারে—তা নয়, কাব্য প্রতিভাও আছে! দু একটি বানান ভুল ছাড়া, মোটামুটি সাহিত্য গুণ সম্পন্ন ঃ

সুস্বাগতম বঙ্গ দুলাল শান্তির কর্ণধার।
চালাও চক্র ক্যটুক ত্রিতাপ দুঃখের পরিহার ॥
দুঃখেরে তুমি ডরিও না, সাধনায় তব সত্য
দুঃখ যদি হয় কণ্ঠের হার এই ত তব চিত্ত ॥

এর পর আছে অনেক ভালো ভালো কথা—যেগুলি বিদ্যাসাগর, রামমোহন রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি মহাপুরুষ সম্বন্ধে চিরকাল বলা হয়ে থাকে প্রায়—সেই জাতের। কবিতার শেষাংশে কবির ভণিতা হল ঃ

অভিনন্দন লিখছি আমি ক্ষমার যোগ্য বারংবার।
শিল্পী শ্রী মিস্ত্রী অজিত বাস্তুহারা চিত্রকার ॥
ঠেকুয়াচক বাসভূমি মোর পোষ্ট কুম ঠিকানা।
ডিষ্ট মিডনাপুর সাব তমলুক মহিষাদল থানা ॥

একে একে পটগুলো জড়িয়ে নিয়ে, দুটো যাদুপট উপহার নিয়ে, সেই সঙ্গে উপরের ছাপা কাগজের কবিতাটা নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোলাম। একদিনের পক্ষে অনেক কাজ হল।

জানি না আর কোন দিন অজিত মিস্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে কিনা। হয়তো কোনদিন কলকাতার রাস্তার বা ডবল ডেকার বাসে বা রাণী ভিক্টোরিয়ার বাগানে দেখা হবে হঠাৎ। হয়তো সে সেদিন আমার মুখটা দেখে পুরানো পরিচয় মনে করার চেষ্টা করবে বা কোন কাল্পনিক পরিচয়ে আমাকে সে জড়াবার চেষ্টা করবে। এ তাকে করতে হবেই—কেননা পট তো বিক্রী করতে হবে—জীবিকার জন্যই!

পটিদারদের জন্য সদাই আমার মনটা কেমন যেন হয়ে থাকে। ওদের ছবি আঁকার ধরন, বিষয় নির্বাচন, রঙের বিন্যাস এত সরল মনে হয়, যে তাদের ঘর-বাড়ীর জীবনযাত্রা না দেখেও যেন ওদের সব দেখা হয়ে যায় ঐ ছবি দেখেই।

আর সত্যই কিন্তু ওদের জীবনযাত্রাও সেই রকমই সরল। যেমন ওদের ছবি, তেমন ওদের মন। এত ঝড়-ঝঞ্ঝার দিনেও ওরা সাধারণতঃ ছবি আঁকার বিষয় বস্তু থেকে সরে আসতে চায় না। কবে ওদের পূর্বপুরুষ কোন পাপ করেছিল বলে তারা শুনে এসেছে, তারই দেনা শুধবার জন্য আজও তারা পট এঁকে চলেছে—তাও রংদার নয়, ধর্মকথার পট। মানুষের মনে এভাবে ধর্মচেতনার জাগরণ ঘটিয়ে তবে হবে ওদের সেই পূর্বপুরুষের পাপের স্খালন—বিধাতার কী অভিশাপ!

মনে পড়ে যায় ওদের দেখে সেই প্রাচীন ইতিহাসে উল্লিখিত পটিদারদের কথা—যেমনটি লেখা আছে বানভট্টের 'হর্ষচরিতে'। ইতিহাস বলছে, সে সময়েও এই পটুয়ারা সমাজে ছিল। তখন তাদের অন্য পরিচয় ছিল—একটা পট দেখানোর ছলে রাজার হয়ে তারা নাকি গুপ্তচরের কাজ করত। প্রাসাদের অন্দর মহলেও তাদের প্রবেশাধিকার ছিল। নানা ধরনের সংবাদ দেয়া-নেয়া করত।

শুধু কি বানভট্ট—বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকেও আছে তাদের প্রসঙ্গ—ঐ একই পরিচয়ে। মানব সভ্যতার কোন আদি যুগ থেকে যে তারা এই সমাজের শিল্পসৃজন করে যাচ্ছে—তার সঠিক ইতিহাস কেউ নথিবদ্ধ করেছেন কিনা জানি না। তবে চিরকালই যে ধর্মকথা জাগরণের জন্য বা চিত্র নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ—তা বোধহয় নয়। অতীতের কোন ভাঙ্গা-চোরা ইতিহাসের চূর্ণ কণিকা মাত্র। বিবর্তন হতে হতে আজ তারা কোন পর্যায়ে এসেছে, ভাবলে অবাক লাগে।

শহর কলকাতার পথে-ঘাটে, এ মেলায় সে মেলায় কেন তারা আজ এঁকে বেড়ায় বনসৃজনের পট, তিনশো বছরের কলকাতার পট, ফরাসী বিপ্লবের পট, সুকুমার রায়ের পট—তা কি বুঝি না! তাদের আঁকার পদ্ধতি যে জনমনকে স্পর্শ করে, তাদের সরল বক্তব্যে যে সবাই জ্ঞানী হয়ে ওঠে, যেখানে শিক্ষা পেঁাছায়নি, সেখানে তারাই যে শিক্ষকের কাজ করছে – তা তো জানি।

তবু মনে হয় এ যেন এক প্রতিভার অপচয়। তারা যদি নিজেদের মত করে পুরানো দিনের মত করেই স্বাধীনভাবে চিত্র নির্মাণ করতে পারত—তবে আজ বেঁচে থাকতে পারবে তো? ☐

মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মা নিয়ে যেমন
মৃতদেহ নিয়েও তেমন নানা লোকাচারের শেষ নেই।
সেই সব লোকাচারের শরিক কারা?—
অবশ্যই মৃতের আত্মীয়স্বজন।
কিন্তু যারা এই লোকচার পালনে সহায়তা করে—
তাদের সামাজিক পরিচয় কী?
মহারাজা হরিশচন্দ্র একদা
চণ্ডালবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন—
তাই বোধহয় আজও চণ্ডাল শ্রেণী এক স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত হয়ে আছে।
তাদের আরেক সাহিত্যিক
রূপ ফুটে উঠেছে রবীন্দ্র কাব্যনাট্যেয় 'চণ্ডালিকা'-য়।
সাম্প্রতিককালের প্রগতি সাহিত্যে আজ
সেই চণ্ডাল ও ইত্যাকার জনসমাজও গল্প-উপন্যাসের
চরিত্র হয়ে উঠছে এবং সমাদরে বিশ্লেষিত হচ্ছে।

লোকপ্রথা-২

কিন্তু বৃটিশ-পরবর্তী যুগে এ
দেশেয় খ্রীষ্টজনসমাজের মৃতাচার পালনে
যে জন সমাজ সহায়তা করছে—বৃহত্তর জনসাধারণ
তাদের হয়তো একপ্রকার হরিশচন্দ্র বলতে পারেন—
কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে এই সমাজের
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও মৃতাচার পালনে ভূমিকা আরো অনেকের।
তাদের মধ্যে—যারা কবর খোঁড়ে,
যারা ধর্মীয় রীতি মান্য করে দেহ
সমাধিস্থ করে, যারা সমাধিভূমির শেষ
কাজ সুসম্পন্ন করে···প্রভৃতির কথা এ প্রসঙ্গে আসে।
পৃথিবীর প্রথম সমাধি কিন্তু মনুষ্য নয়, প্রকৃতি নির্মিত—
সেদিন কোন শবাধার নির্মিত হয়নি 'আদমের' জন্য।
সেই মৃতাচার পালনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হল—যারা
শবাধার নির্মাণ করে—যার নাম হল 'কফিন'।

যারা 'কফিন' বানায়

অনাথের কথা বলতে গেলে জয়দেবের কথা আসবেই।

আসলে জয়দেবের মাধ্যমেই খোঁজ পেয়েছিলাম অনাথের। আমার এই কথা শুনে কেউ যেন জয়দেবের খোঁজ করতে যাবেন না। তার কারখানা যেখানে ছিল, সে জায়গায় আজ বিরাট বিল্ডিং উঠেছে। পুরানো কোন চিহ্নই আর সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অথচ স্থানটি কিন্তু কলকাতা সহর সংলগ্ন। ঠিক ঠাকুরপুকুরে ৩এ বাসস্ট্যাণ্ডের পরে যেখানে ব্রতচারী স্কুল ও গুরুসদয় সংগ্রহশালা—তার বিপরীত দিকে। ঐ বাসস্ট্যাণ্ডের পরেই ঠাকুরপুকুর এলাকা শেষ, কলিকাতা সহরের এলাকা শেষ। তারপর সুরু হল পঞ্চায়েত এলাকা, বিষ্ণুপুর থানা এলাকা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এলাকা—আর জোকা গ্রামের সুরু।

এত সব 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাওয়ার চেয়ে বলে দেওয়াই ভাল যে, জয়দেবের ছিল কাঠের কারখানা। তার হাতের কাজ ছিল বেশ পরিচ্ছন্ন। ঠিক মত মাপ-জোক নিয়ে আধুনিক ধরনের কাজ করতে পারত সে।

তার আগে পর্যন্ত সে অঞ্চলে ভাল কাঠের মিস্ত্রী ছিল না। এপিফানি চার্চের পিছনে পচা মিস্ত্রী, নগেন মিস্ত্রী প্রভৃতিরা ঠিক সে জাতীয় কাজ জানত না। অবশ্য তাদের কথাও আসবে ক্রমে ক্রমে। সে সময়ে ঠাকুরপুকুরের চেহারা ঠিক এ রকম ছিল না। এসব বহু পুরাতন দিনের কথা। বোধ হয় ছয়ের দশকের শেষের দিকে বা তার কিছু আগেও হতে পারে। তখনও এসব অঞ্চল বেশ গ্রাম-গ্রাম ছিল।

জয়দেব কি ধরনের কাঠের কাজ করত—বলেছি আগেই। সে তো সবার জন্যই। কিন্তু আর একটি কাজের জন্য সে স্থানীয় খ্রীষ্টান সমাজের পক্ষে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠেছিল।

ঠাকুরপুকুর, কেওড়াপুকুর, নেপালগঞ্জ, রাঘবপুর, রাজারামপুর প্রভৃতি অঞ্চলগুলি বহু প্রাচীন কাল থেকে খ্রীষ্টান অধ্যুষিত—এ কথা তো সবাই জানেন। এই ঠাকুরপুকুরেই রেভারেণ্ড জেমস লং দীর্ঘ ২১ বছর ধরে পুরোহিত ছিলেন শতাব্দী উত্তীর্ণ 'এপিফানি চার্চে'। সম্প্রতি তাঁর নামে একটি দীর্ঘ রাস্তা হয়েছে এখানে। তিনিই সেই জেমস লং। যিনি 'নীলদর্পণের' ইংরাজী অনুবাদের প্রকাশক হিসাবে বৃটিশ বিরোধিতা করে জেলে গিয়েছিলেন।

এই বিরাট অঞ্চলের খ্রীষ্টান অধিবাসীদের জন্য তাদের মৃতদেহ সমাধি করার প্রধান উপকরণ 'কফিন' নির্মাণের জন্যই জয়দেবের গল্প করতে হল। আমাদের এই কাহিনী প্রাক-জয়দেব বা জয়দেব-উত্তর পর্বের নয়।

কি করে জয়দেব এ বিদ্যা আয়ত্ব করল—সে কাহিনীও বড় বিচিত্র। তার কাঠের কারখানায় ছোট ফাঁকা জায়গাটিতে প্রতি বছর দুর্গাপূজো হয়, সেখানে সে ফি বছর অঞ্জলি দেয় মহাষ্টমীর দিন। তবু কফিন তৈরীর অর্ডার এলে, তা-ও নিষ্ঠার সঙ্গে করে দেয় হাতের অন্য সব কাজ ফেলে।

বোধহয় সে বৎসর কোন এক দুর্বৎসর ছিল। পূর্বোক্ত মিস্ত্রী পাড়ার লোকেরা তখন সংখ্যায় ক্রমেই কমে আসছিল এবং জয়দেব কাঠের মিস্ত্রি হিসাবে ততদিনে এতদঞ্চলে বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই সামাজিক প্রয়োজনেই হয়তো কোন খ্রীষ্টান পরিবার তার কাছে এসে প্রথম কফিন তৈরীর অর্ডার দেয়। কাঠের মিস্ত্রী হিসাবে সে যে এ কাজ করতে পারত না তেমন নয়, তবু মানুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপার—তাই সে এ কাজকে একটু ভিন্ন চোখে দেখে কাজ সুরু করে দেয়।

জয়দেবের তৈরী কোন কফিন আমার দেখা হয়নি—তাহলে কফিন নির্মাণের সেই বৈশিষ্ট্যটি সে জানত কি না, তা এখানে জানাতে পারতাম।

আসলে কফিন এমনই একটা বস্তু, যা দোকানে তৈরী অবস্থায় পাওয়া যায় না। খাট-পালঙ্ক-টেবিল-চেয়ার তৈরীই থাকে—কফিন সে ভাবে কেউ দর-দাম করে কিনতে আসে না। যে বাড়ীর প্রয়োজন, তারা ঝটিতি আসে তাদের চাহিদা নিয়ে এবং মিস্ত্রী তখন তার হাতের সব কাজ ফেলে এই কফিন নির্মাণে এগিয়ে আসে—তাতে অন্যের কাজের সামান্য ক্ষতি হলেও।

এই মেজাজটা জয়দেব রপ্ত করে নিয়েছিল বোধহয় চারিদিকের খ্রীষ্টান সমাজের লোকেদের সঙ্গে আদান-প্রদান করতে করতেই। আমার মনে হয়, কফিন তৈরীর ব্যাপারটাকে সে একটা পুণ্যকর্ম বলে মনে করত।

কফিন তৈরীর ব্যাপারটা তাহলে কি?

একটি বিশেষ ধরনের কাঠের বাক্স—যার মধ্যে একটি মৃতদেহকে শুইয়ে রেখে দেওয়া হয় এবং পরে সেই বাক্সটির উপরের ডালায় পেরেক মেরে তাকে বরাবরের জন্য মাটির নীচে গভীর গর্ত করে প্রোথিত করা হয়।

এই প্রক্রিয়ার আগে ও পরে কিছু ধর্মীয় শাস্ত্র, লোকাচার, গান-প্রার্থনা ইত্যাদি করা হয়। যে স্থানে এটি সমাহিত করা হয়—সে স্থানের সাধারণ নাম হল কবর স্থান বা সমাধিভূমি। গ্রামাঞ্চলে এটি সাধারণতঃ 'কবর ডাঙ্গা' নামেও পরিচিত হয়। উত্তর চব্বিশ পরগনার কাঁচরাপাড়া শহরের নিকটে এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ঠাকুরপুকুর শহর পেরিয়ে কাওরাপুকুরে 'কবরডাঙ্গা' নামে দুটি স্থানও আছে।

খ্রীষ্টান সমাজে মৃতদেহ সৎকারের জন্য যে ধরনের কফিন ব্যবহৃত বা নির্মিত হয়, তা ঠিক চৌকোণা বা আয়তাকার কাঠের বাক্স নয়—একটি দেহকে চিৎপাত করে শুইয়ে দিয়ে, তার হাত দুটি বুকের ভাঁজ করে রাখলে মৃতদেহটির যে আকৃতি হয় কফিনের বাক্স কতকটা সেই আকারের—অর্থাৎ এক প্রকার 'হেক্সাগনাল' বা ছয় কোন বাক্স-এর একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে।

এই শেষ বাক্যটি জয়দেবের নিজস্ব। সে বলেছিল—'এই ছয় কোনা তৈরী বেশ হাঙ্গামার। মাথা বা পায়ের কোণগুলি সমকোণ হয়, সেটি তৈরীতে কোন কৌশল নেই। তবে দেহর কনুই বরাবর কফিনে যে ভাঁজ হয় সেটা দুটি পৃথক কাঠ নয়—একটি লম্বা কাঠকে ঠিক মাপ মত করাত দিয়ে আধ-কাটা করে পরে তা চাপ দিয়ে ভাঁজ করে ঐ বিশেষ ধরনের আকৃতি আনা হয়।

এর পরের কাজটা হল হাতুড়ির আর পেরেকের।

আমার মনে পড়ছে, একদা যখন সে একটি কফিন তৈরী করতে আমাকে তার কৃৎ কৌশল বোঝাছিল, তখন আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিল ঃ

'আচ্ছা যীশুখ্রীষ্টের কফিন কে তৈরী করেছিল? শুনেছিলাম তো তাঁর পিতাও ছিলেন ছুতোর মিস্ত্রি!'

আমি জানি না, সে এর দ্বারা ইঙ্গিতে কি এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিল যে, তাহলে যীশুর বাবা যোষেফই কি ছেলের জন্য কফিন বাক্স বানিয়েছিলেন?

না, সে ভেবেছিল মাত্র এ-কথা। আমি আন্দাজ করেছিলাম। তবে এ প্রশ্ন তার মনে দীর্ঘকাল জমা ছিল—যে কথা পরে বলা যাবে।

তবু তার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাকে তাৎক্ষণিক ভাবে বোঝাতে হয়েছিল যে ঃ 'যীশুখ্রীষ্টের সময়ে কফিন তৈরীর চলন ছিল না। মধ্যপ্রাচ্যের সে দেশ পর্বত-মালভূমিময়। সে দেশে পাহাড়ের গুহায় দেহ সমাধি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। সাধারণত সমাজের নামী লোকেদের জন্য আনকোরা সম্পূর্ণ অব্যবহৃত নতুন গুহা ব্যবহার করা হত। পরবর্তীকালে অবশ্য এই ধর্ম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং তারা সমাধি দেবার জন্য উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বন করল। হয়তো তা থেকেই ধীরে ধীরে কফিন প্রথার উদ্ভব হল।'

আমার কথাবার্তায় যে তাঁর হাতের কাজ থেমে থাকে নি—তা দেখে আমিও স্বস্তি পেলাম। কেননা তার বর্তমান কাজ বিয়ের পালংক নয়, সৌখিন টেবিল-চেয়ার নয়। এখনই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাকে কফিন তৈরী করে সেই পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দিতে হবে—সে খেয়াল তার আছে। তবু শুনি তার প্রশ্ন ঃ 'আচ্ছা, যীশুখ্রীষ্ট যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেছিলেন—'

'না জয়দেবদা, ভুল হল।' আমি তাকে বাধা দিয়ে বলি ঃ 'যীশুখ্রীষ্ট নিজে তো যিহুদী পরিবারের সন্তান। কফিন তো খ্রীষ্টানদের প্রথা।'

আমার কথায় হতবাক হয়ে জয়দেব হয়তো আরো কোন প্রশ্ন করে। তার উত্তরে আমিই তাকে বলে দিই ঃ 'আসলে তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কতকগুলি ভাল কথা, জ্ঞান, নীতি, জীবন চালনার নির্দেশ। তার মৃত্যুর পরে তার শিষ্যরা তাঁর বাণী প্রচার করেছিল। পরবর্তীকালে সেটাই খ্রীষ্টধর্ম বলে গৃহীত হল। যীশু নিজে কিন্তু এসব কিছুই দেখে যান নি।'

মনটা কেমন উদাস করে নিয়ে সে আবার কাজে মন দিল।

জয়দেবের সঙ্গে কথাবার্তার পর্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তবুও জানিয়ে রাখি এর শেষাংশটা।

যার কফিন তৈরী করছিল সে, তাকে বোধহয় সে চিনত – বেশ বর্ষীয়ান এক ব্যক্তি এই অঞ্চলের। জীবনে অগুণতি না হলেও সে বেশ কিছু কফিন তৈরী করেছিল। কিন্তু কোনদিন তার সমাধি ভূমিতে যাওয়া হয়নি বা খ্রীষ্টানদের সমাধি পদ্ধতি দেখা হয়নি। কী ভেবে জয়দেব সেদিন ঐ পূর্ব পরিচিত বর্ষীয়ান খ্রীষ্টান ব্যক্তির সমাধি প্রক্রিয়া দেখতে গেছিল। তাঁর মনে কোন দ্বিধা বা সংকোচ ছিল না।

সমাধিভূমি তো কাছেই—এপিফানি চার্চ সংলগ্ন। তার বহু পরিচিত স্থান। দূর থেকে সে বহুবার শববাহকদের মিছিল দেখেছে, শোকসংগীত শুনেছে, কিন্তু সেদিন সে প্রথম এই বিচিত্র লোকপ্রথার সবটা পুরোপুরি প্রত্যক্ষ করল। জানি না, সেদিন গৃহে ফেরার পর সে গঙ্গাজলে স্নান করে বিশুদ্ধ হয়েছিল কি না!

তাহলে জয়দেব কেন কফিন তৈরী করা বন্ধ করে দিল সে কথায় আসতে হয় এবারে। সংবাদ পেয়েছিলাম যে সে এখন আর নাকি এ কাজ করে না—তার একটা কারণ ছিল। অনাথ এখন তৈরী হয়ে গেছে। সে ঐ সমাজের লোক। সে এখন এই কফিন তৈরীর পুরো দায়িত্ব তুলে নিয়েছে—বয়সে সে অনেক তরুণ।

কিন্তু তাতে যে জয়দেবদার একটু অর্থোপার্জন কম হল—তা জেনেও যখন এই প্রশ্ন করি, তখন উত্তর পেলাম ঃ

'বুঝলেন দাদা, এ কাজ করা পুণ্যের। কিন্তু যেদিন এক ন-দশ বছরের বালকের কফিন তৈরী করতে হল আমায়, সেদিনই ঠিক করলাম—এত নিষ্ঠুর নির্বিবেক হতে পারব না আর। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই কাজ করে সমাজের দায় উদ্ধার করে মনে মনে ঠিক করলাম—নাঃ! এ কাজ আর নয়।'

মনে হল, এ যেন বাপ হয়ে ছেলের কফিন তৈরীর মত। কেননা সে যে ছুতোর—যীশুখ্রীষ্টের পালক পিতার মতই।

জয়দেবের সঙ্গে তার পরেও দেখা হয়েছে, গল্প হয়েছে—কিন্তু কোনদিন আর এ প্রসঙ্গ তুলিনি। শুধু তার দুঃখের কারণটা মনে চেপে রেখেছি কাউকে না-বলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আজ জয়দেবদা নেই। তাই সে কথা জানালাম অন্যান্যদের।

এই সূত্রেই এসে যায় অনাথের কথা। অনাথ নস্কর।

ডায়মণ্ডহারবার রোডের প্রায় সমান্তরালে তৈরী হয়েছে জেমস লং সরণী। এক সময়ে এখানে ছিল কালীঘাট-ফলতা রেলপথের ন্যারোগেজের সিঙ্গল লাইন। সে সব কবেকার কথা—রেলগাড়ি চলা তো বন্ধ হয়ে গেছে কতদিন!

বোধহয় আটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই লাইন উঠে গেল। তারপর দীর্ঘদিন পড়ে রইল। কতগুলো ভোট হল, কতগুলো বন্যা হল, খরা হল। তারপর এই সেদিন সেখানে তৈরী হল ঐ রাস্তাটা। তারপর নাম হল রেভারেণ্ড জেমস লং-এর নামে। দীর্ঘদিনের পড়ে থাকা রেললাইন হয়ে গেল রাস্তা।

মৃতাচার বা মৃত্যুর পরে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মাদির পর্যবেক্ষণ—এটিও লোক-সংস্কৃতি গবেষকের চোখে কোন কোন সময়ে মূল্যবান হয়ে ওঠে। বৃহত্তর জনসমাজের এ' জাতীয় লোকাচার এদেশে সকলেরই জানা। কিভাবে তার আধুনিকীকরণ হল ইলেকট্রিক চুল্লীর মাধ্যমে – তা-ও আজ আর কারোর বিস্ময় উৎপাদন করে না। এই প্রাচীন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পুরাতন পদ্ধতির একটি নবরূপ মাত্র।

তাই আজ বাংলা প্রবাদভাণ্ডারে 'রাবণের চিতা', 'চিতার আগুন' 'চিতায় তোল্য' প্রভৃতি বাগধারাগুলি প্রায় ইতিহাস হতে চলেছে। কেননা আগামী কোন সময়ে একটা দিন আসবে যখন শুধু উপরোক্ত শব্দগুলি থেকে বৃহত্তর জনসমাজের মৃতদেহ সৎকারের পরিবর্তন সন্ধান করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করা প্রয়োজন অন্যান্য সংখ্যালঘু সমাজের মৃতাচার একশ্রেণীর লোকসংস্কৃতিবিদের কাছে পর্যবেক্ষণের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। কোন ধর্মে মৃতদেহকে বসা ও ধ্যানরত অবস্থায় মাটির মধ্যে সমাধিস্থ করা হয়, কোন ধর্মে দেহটি সুউচ্চ বংশদণ্ডে স্থাপন করে কাক-শকুনের খাদ্যে পরিণত করা হয়, কোন ধর্মে বা সমাধিস্থ করা হয়। মৃতদেহের পায়ে দড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলার পদ্ধতিও নাকি কোন কোন জনজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল অতি সাম্প্রতিক কালেও। আর সাপে-কাটা মৃতদেহ যে জলে ভাসিয়ে দেয় ভেলায় করে—তার উৎস যে এক বিশিষ্ট মঙ্গলকাব্য—তা-ও সবার জানা। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ সবই হল বঙ্গসংস্কৃতির নানা জনসমাজের ব্যবহৃত দৃষ্টান্ত।

খ্রীষ্টসমাজের সমাধি পদ্ধতি সম্বন্ধে 'কফিন' কথাটি আজ বৃহত্তর সমাজের ভাষায় এক বিশেষ বাগধারা হয়ে উঠেছে। এমনকি এর আকার-আয়তন ইত্যাদি সম্বন্ধেও হয়তো অনেকের পরিচয় হয়েছে—যদিও তার সঙ্গে খ্রীষ্টসমাজের যোগাযোগ নিতান্তই কম। শহর কলকাতার এজন্য কয়েকটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান আছে।

কিন্তু শহরতলী বা গ্রামাঞ্চলের খ্রীষ্টজনসমাজে যারা এই কফিন তৈরী করে, তাদের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা আজও বোধহয় কোন লোকসংস্কৃতিবিদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। এটি যদি একটি লোকাচারভিত্তিক লোকসংস্কৃতি হয়—তবে সে অভিমতেও বোধহয় আপত্তি করা যাবে না। যদিও 'মৃতাচারকেন্দ্রিক লোকশিক্ষা' বলে কোন কথা প্রচলিত আছে কিনা—এ নিয়েও সংশয় রয়েছে।

খ্রীষ্ট জনসমাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার এই প্রকার কোন উল্লেখ অবশ্য বাইবেলে প্যাওয়া যায় না। যে জনসমাজে এই ধর্মের প্রথম উদ্ভব, সেখানে কফিন পদ্ধতির ব্যবহার অনেক পরবর্তী কালের। যিহুদী পুরাণ মতে পৃথিবীর প্রথম মানবের সমাধি হয়েছিল উন্মুক্ত পরিত্যক্ত পার্বত্য গুহায়। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের অন্তর্গত 'আদিপুস্তক' গ্রন্থে এ জাতীয় কিছু মৃত্যু ও সমাধি বিবরণ পাওয়া যাবে। সেই যুগ ও কালের পক্ষে তা ঠিকই ছিল। তারপর সমাজ ও প্রকৃতি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই মৃতাচার পদ্ধতিতেও এসেছে এক 'নান্দনিক' পরিবর্তন।

অতীতে ঐ রেললাইন আর ডায়মণ্ড হারবার রোড যেখানে পরস্পর মিলেছিল—সেখানকার চলতি নাম ছিল 'জোড়ের মুখ'। ঐ স্থান থেকে রেললাইন আর সড়ক পথ পাশাপাশি দৌড়াত। ন্যারো গেজের ট্রেনের অভিজ্ঞতা এখন যাদের বয়স পাঁচের কোঠায়—তারা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি। কেননা সেদিনও তা ছিল হাওড়া জেলায়। এখনও চলছে দার্জিলিং-এ আর বি. ডি. আর বাঁকুড়া-বর্ধমানে।

যা হোক, রেলপথের গল্প ছেড়ে অনাথের কথায় আসি। রেললাইন ভেঙে পথটা যখন পীচ রাস্তা হবার সময় এসেছে, তখনই বোধহয় ওখানে কোন রকমে একটা ফালি জমি বের করে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল অনাথ।

অনাথের পুরো নাম অজানা। আগে ওর বাড়ী ছিল কাছাকাছি কোন গ্রামে। ক্যাথলিক খ্রীষ্টান। অর্থাৎ ওর পূর্বপুরুষ কোন এক সময়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। ওর পূর্ব পরিচয় ভাল জানা নেই। জয়দেবের পরিবার ঐ অঞ্চলে বংশানুক্রমিক ভাবে বাস করত—অনাথের তেমন নয়। ওর ছুতোর ব্যবসা পৈতৃক না অর্জিত, তা-ও জানা নেই। শুধু জানতাম ও একজন নিষ্ঠাবান কফিন করিয়ে। তাই ওর কথা মনে রেখে একদিন ওর কারখানার গেছিলাম।

ও আমাকে কারখানার মধ্যে বসতে দিয়েছিল। তখদ বোধহয় বড়দিনের মরশুম সবে পেরিয়েছে। তাই ওর ঘরে 'ঘরের তৈরী' কেক কয়েক পিস ছিল। তার দুটো পিস আমাকে খাইয়েছে। আমার জানবার বিষয় শুনে বড় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছে : 'এত সব বিষয় থাকতে শেষে এই নিয়ে নিয়ে লিখবেন মেজদা!'

অনাথ জানে আমি গ্রামেগঞ্জে লোকসংস্কৃতির নানা তথ্য সংগ্রহ করতে ভালবাসি। এর আগে ও আমাকে ওদের গ্রামের বড়দিমের কীর্তন সম্বন্ধে অনেক তথ্য দিয়েছে। ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের বড়দিন পালনের রীতি-লোকাচার সম্বন্ধে গল্প করেছে। আশেপাশের গ্রামের মেলা সম্বন্ধেও দিয়েছে নানা হদিশ। তাই আজ 'কফিন' সম্বন্ধে জানতে চাওয়ায় ওর ওই মন্তব্য।

ওর কারখানায় আজ কাজ প্রচুর। অনেকগুলি লোক খাটাছে। সবাই খ্রীষ্টান নয়—তা জানি। জানি, কেননা কফিন তৈরীর অর্ডার পেলে সেটা ওর নিজের হাতে করে, অন্য কাউকে তার ভার দেয় না।

ওর কাজ দেখতে দেখতে বলি : 'হ্যাঁগো' তা দাম কত হবে এই কফিনটায়?'

ও কাজ করতে করতেই বলে : 'কত আর, বারোশো।'

শুনে আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, যার অত পয়সা নেই সে কী করে এই কফিন তৈরীর খরচ বহন করে। তবে জানা গেল আটশো-নশো থেকে মোটামুটি দেড় হাজারের মধ্যেই দামটা ওঠা-নামা করে। উপকরণ বলতে তো প্রধান হল কাঠ। তারপরে সাজাবার জন্য কাপড়, জরি, পিন, হ্যান্ডেল প্রভৃতি।

আর একটা প্রশ্নের উত্তরে ও বলেছিল : 'আসলে যে কাঠ দিয়ে কফিন বানাই, তা তো হয় খুব পলকা কাঠের। যেন মাটির মধ্যে অতি সহজে পচে যায়—দ্রুত।

তাই কাঠের দামটা তত বেশী নয়। খরচা যা কিছু,তো ঐ সাজাবার।'

'না দাদা, ওটা হল এক ব্যাটাছেলে মানুষের। বেশ বয়সী তিনি—তবে বিয়ে করেন নি। আত্মীয়দের কাছে থাকতেন। এখনিই শেষ করলাম ওটার কাজ। ওপরের ডালায় ক্রশটা কেমন দেখতে হয়েছে বলুন তো ?'

বলার আর আছে কি। যার জন্য করা সে তো দেখতে পাচ্ছে না এসব। মনে হয়, এখনই হয়তো এসে পড়বে মৃতের বাড়ির লোকজন—তারা নাকি মাত্র আধ ঘণ্টা আগেও এসে কাজ কর্ম দেখে গেছে সব। বলে গেছে, যত সিম্পল হয়, সেভাবে যেন করি। লোকটা মরার আগে সে রকমই বলে গেছিল তার ভাই আর ভাইপোদের।

আমাকে যে ও এখন বেশী সময় দেবে না—তা তার ব্যস্ততা দেখেই বুঝেছিলাম।

তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটা সাইকেল ভ্যান এল। আগে দুটি যুবক ও সাইকেল। তারা আমার সামনেই নিয়ে গেল কফিনটা। যুবক দুটির মুখ যেন একটু চেনা বলে মনে হল। হবেও বা—অনেকদিন তো এ পাড়ায় নেই। হয়তো তাদের দেখেছিলাম কোন এক শিশুকালে।

ওদের রওনা করিয়ে দিয়ে অনাথ একটু যেন অবসর পেল। বলল : 'বুঝলেন মেজদা, বছর শুরু হতে না হতেই কফিন তৈরী করতে হল। আমার বউ বলে এসব অশুভ ইঙ্গিত।'

'তুমি কি বল ?'

'সব ঘটনাই শুভ। ঈশ্বরের দান, তিনি যখন ইচ্ছা দেন, যখন ইচ্ছা তুলে নেন। মানুষের পৃথিবীর কাজ কখন শেষ হবে, তা তিনি ছাড়া সঠিক কেউ জানে না। তার সমালোচনা করার অধিকার কি আছে আমার ?'

এ কোন্ অনাথের সঙ্গে কথা বলছি। এত তত্ত্বভাব ওর মধ্যে আছে ? বয়স তো ওর তত গভীর হয়নি। লেখাপড়াও তেমন শিখেছে বলে মনে হয় না।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল আমাদের নানা কথাবার্তায়। ওর কাছ থেকে শুনেছিলাম কফিন তৈরীর বিচিত্র সব ঘটনা। শুনতে শুনতে মনে হল বিদেশী ভৌতিক কাহিনীতে এ রকম কত প্রসঙ্গ আছে—তাই নিয়ে কত চমকপ্রদ কাহিনী তৈরী হয়েছে। অনাথ কী জানে সে সব!

ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে বলি, কফিন আজ আর শুধু খ্রীষ্টান সমাজের নয়, এর কথা সব সমাজেই জানে। কফিন এখন বাংলা শব্দভাণ্ডারে তত প্রচলিত না হলেও বাংলা বাগধারায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে বসে আছে।

কী জানি—এতসব কথা ওর সহ্য হবে কি না।

আর সত্যই তো—ইদানীং সংবাদপত্রে যখন দেখি এদেশের কমিউনিষ্ট সরকার সম্বন্ধে সাংবাদিক মন্তব্য করেন : 'এসব কথা শুনলে মাওসেতুং-ও যে আজ কবরে পাশ ফিরে শোবেন—তা তারা ভাবেন নি ?' এখানে অর্থটা হল, চিতায় জ্বলে গেলে ভস্ম হয়ে যায়। কিন্তু কবরে থাকলে লোকে ভাববে বুঝি দেহটা অক্ষত আছে—তাই পাশ ফেরার প্রসঙ্গ আসে।

শুধু তাই নয়, সংবাদপত্রেই বোধ হয় পড়েছিলাম : 'কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেওয়া'—এটাও নাকি এক বিশেষ অর্থে প্রচলিত হয়েছে আজকাল। এর সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যা হল : সমাধি প্রক্রিয়ার সময়ে কফিনের ডালা যখন শেষবারের মত পেরেক ঠুঁকে বন্ধ করে দেওয়া হয়, তার পরেই সেটা ধীরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া হয় সমাধির গভীরে—তখন সমাধি প্রক্রিয়ার একটা অংশ শেষ হল। চিরতরের জন্য মৃতের প্রিয়জনেরা তার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করল।

সেই রকম কোন প্রসঙ্গ যখন বরাবরের জন্য সমাপ্ত করে দেওয়া হয়, যাকে আধুনিক ভাষায় আজকাল কেউ বলছেন 'ক্লোজড্ চ্যাপটার'—তখনও এই বাক্যাংশের প্রয়োগ হয়। অথবা কোন দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা ব্যক্তি বিশেষের কোনো মন্তব্যে এমন জায়গায় আটকে গেল যে আর এগোতে পারছে না—তখন সেই ব্যক্তি বিশেষের মন্তব্যকেই ঐ ভাবে অভিহিত করা হয়।

আপাতত আত্মচিন্তা ছেড়ে দিয়ে এবারে বাড়ি ফেরার কথা ভাবতে হবে। ইচ্ছা আছে যদি একবার ওয়েলেসলী অঞ্চলে 'পিস হেভেন' সংস্থায় যেতে পারি। ওরাও তো শুনেছি খ্রীষ্টানদের শুধু নয়, অন্যান্য সমাজের সমাধি সংক্রান্ত নানা কাজ করে থাকে। তবে এ সংস্থা খুবই অভিজাত সমাজের জন্য—তা-ও জানি।

কিন্তু সেটা হল না। অনাথের সঙ্গে সমাপ্তিসূচক কথাবার্তা বলতে যাবো, এমন সময়ে শুনি, অনাথ যেন উৎকর্ণ হয়ে কী শুনছে।

ইতিমধ্যে আধ ঘণ্টায়ও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। অনাথ তার কারখানার ভিতরটা গুছিয়ে নিচ্ছে। বেলা গড়িয়ে এখন প্রায় মধ্য দুপুর। সাত-আট ঘণ্টা কাজ করেছে সবাইকে নিয়ে ঐ কফিনটা বানাতে।

'শুনতে পাচ্ছেন গানটা ?'

অনাথ বলল আমাকে। তারপর দূরাগত মিছিলের সঙ্গে একটা গানের ধ্বনিকে লক্ষ্য করে গলা মিলালো সে : 'তাঁর প্রেমে হইয়া মগ্ন, পায় বিশ্রাম তথায় স্থান।'

আমি নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে অনাথের পানে। এ অনাথ আমার অপরিচিত। ওর চোখ এখন কোন দিগন্তে বিস্তৃত। ওর গান এখন শবযাত্রার গানে মগ্ন। ওর হৃদয়-মন এখন একটি চিন্তাতেই মগ্ন।

গানের দল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে অনাথের দোকানের দিকে—একটু পরেই সেটা দোকানের ওপর দিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে এপিফানি চার্চের দিকে—সংলগ্ন সমাধিভূমিতে। অনাথ দোকান থেকে বেরিয়ে দাঁড়াল শোভাযাত্রা বা শবযাত্রার কাছাকাছি। দলের চেনা ছেলেরা অনাথকে দেখল। ইসারায় নেমে আসতে বলল শববাত্রায়। অনাথ একবার আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ভাষায় বলল : 'মেজদা, একটু বসুন, আসছি।'

মুহূর্তের মধ্যে অনাথ হয়ে গেল শবযাত্রীদের একজন। ওদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে লাগল :

'সুরক্ষা যীশুর কোলে / তার বক্ষ আশ্রয় স্থল / তাঁর প্রেমে হইয়া মগ্ন / পায় বিশ্রাম তথায় স্থান ॥ ঐ শুন, সঙ্গীত ধ্বনি……'

তারপরে এক সময়ে সেই কফিন সমাধিস্থ হয়ে যাবে। সমাধির উপরে জেগে থাকবে একটি কাঠের ক্রুশ—অনাথেরই করা। তার গায়ে হবতো কেউ রং দিয়ে লিখে দেবে সমাহিতের নাম—বয়স—তারিখ। কতদিন সেটা দাঁড়িয়ে থাকবে সেখানে। সারা বছরের রোদ-ঝড়-জল মাথায় নিয়ে।

হ্যাঁ, এটিও অনাথেরই নির্মিত ক্রুশ।

হয়তো কেউ কেউ ঐ ক্রুশকাঠের সংক্ষিপ্ত পরিসরে দু চার ছত্রে কাব্য রচনা করে দেবে ঃ

'তুমি আছো আজ সবার উপরে
ঊর্ধ্বলোকেতে জানি,
আমরা রয়েছি তোমারে স্মরিতে
অন্তরে সদা মানি।'

কেউ বা আরো সংক্ষিপ্ত শোক কবিতা লিখে দেবে ঃ

'যত ফুল ফুটে আছে এ সমাধি তলে
তুমি নাই, তবু তারা তব কথা বলে
তোমারে দেখি না তবু সদা মনে রাখি
দিবা নিশা আছো তুমি যেখানেই থাকি

কে যে এর রচয়িতা তা কেউ জানে না। যেমন কেউ কোনদিন জানবে না, ঐ ক্রুশকাঠ বা ঐ কফিনের নির্মাতা কে!

আবার কোন কোন ক্রুশকাঠে বা সমাধিভূমিতে মৃত ব্যক্তির নিজের রচিত শোককাব্য দেখা যায়। যেমন লিখেছিলেন উইলিয়াম কেরী তার সমাধিলিপিতে ঃ

অসহায় কীট আমি অতি অভাজন,
তোমার করুণা-করে সঁপি এ জীবন।'

জন্ম ঃ ১৭ আগস্ট ১৭৬১ মৃত্যু ঃ ৯ই জুন ১৮৩৪

এসব কথা অবশ্য অনাথ জানে না, জানে না জয়দেবও। কিন্তু কফিন নির্মাণের পরেও যে সমাধিপ্রথার কত কাজ থাকে, তা সে জানে। □

কিম্বদন্তী লোকউৎসব বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।
উভয়েই যেন উভয়ের মুখাপেক্ষী।
কিম্বদন্তীর চরম সার্থকতা
যেন একটি লোকউৎসব প্রচলনের মধ্য দিয়ে।
আবার লোকউৎসবের জনপ্রিয়তা
নির্ভর করে যেন একটি কিম্বদন্তীর মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে।
লোকজীবনে এ ঘটনা ঘটে বরাবর।
সে কিম্বদন্তী হোক না কেন
কোন দেবতা বা দেবপ্রতিম কোন মানব-চরিত্রের,
হোক না তা কোন বিশেষ ঘটনার—
প্রাকৃতিক, সামাজিক
আর্থিক, রাজনৈতিক কোন প্রবল বিপর্যয়ের।
মানুষ খুঁজে নেবে উপলক্ষ—
আয়োজন করে নেবে এক জনসমাবেশের।

লোকউৎসব-৪

এ দেশের ইতিহাসের
রাজকাহিনী বদল হয়েছে বার বার।
বঙ্গীয়, ভারতীয়, অভারতীয়—
নানা শাসকের অধীনে
নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে এ দেশের সংস্কৃতি।
শাসক পরিবর্তনের অর্থই তাই সংস্কৃতিরও পরিবর্তন।
দেবমাহাত্ম্য অস্তমিত হলে উদিত হয়
পীরের কিম্বদন্তী—
আবার পীরের দিন
শেষ হলে আসেন কোন দেবতা।
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে।
খোয়াজ খিজিরের নাম নাই বা জানা হল,
তাকে কেন্দ্র করে যে গড়ে ওঠে
ভেলা ও প্রদীপ ভাসানোর উৎসব—সেটাও তো এক কিম্বদন্তী।

খোয়াজ খিজিরের ভেলা

কোথায় মেলা প্রাঙ্গণ, কোথায় হাজারদুয়ারী আর কোথায় গঙ্গা নদী—কিছুই বুঝতে পারছি না। অন্ধকারে নয়, লোকে লোকে একাকার হয়ে গেছে সমগ্র স্থানটা। অবশ্য বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা—মানে স্পেশাল বিদ্যুৎ-বাতির ব্যবস্থা করেছেন নবাব বাহাদুর। কিন্তু তাতেও কী অন্ধকার কাটে!

অথচ এরই মধ্যে ভীড় ঠেলে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে গঙ্গার ধারে। কোন একটা নিরাপদ স্থানে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করতেই হবে—নচেৎ গঙ্গাবক্ষে 'বেরা ভাসান' দেখতেই পাবো না।

যত রাত বাড়ছে ততই যেন জনসমাগম বেড়েই চলেছে। এত লোক ছিল কোথায়—তারা কোথা থেকে সব আসছে। দেখে শুনে মনে হল বোধহয় গঙ্গার ওপার থেকেই আসছে কেউ কেউ—কেননা লণ্ঠনের আলো আর ছোট নৌকা দেখা যাচ্ছে। যারা অতদূর থেকে আসছে, তারা এপারের কেউ নয় নিশ্চয়ই। আর রেলগাড়ী করে, বাসে করে আসা যাত্রীর সংখ্যাও কম নয়।

অথচ সারাদিন ধরে যখন লালবাগ শহরে ঘুরেছি, মুর্শিদাবাদের নানা ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য দেখেছি, তখন তো এত লোক দেখিনি।

পা টন টন করছে, কোথাও সুস্থির হয়ে বসবার চেষ্টা করছি—কিন্তু সে জায়গা কোথা। বিকেলেও যে সব বাড়ীর রোয়াক দেখেছিলাম ফাঁকা, সন্ধ্যার সেগুলি হয়ে গেল ফুলুরি-পেঁয়াজির দোকান। দুপুরে নদীর ধারে যে সব চালাঘরগুলি দেখে ভেবেছিলাম, রাত্রে এখানে দাঁড়িয়ে 'বেরা ভাসান' দেখব- সেগুলিই হয়ে উঠল জমজমাট ভাতের হোটেল।

ভাবতে পারা যায়, রাত দশটা-এগারোটা-বারোটা—তখনও চলছে ভাতের হোটেলে ডাল-ভাত-ডিম-মাছ নিয়ে হিসেবের ঝগড়া—অথচ অন্যদিন? তখন এখানে চলে চোর-ডাকাতের দৌরাত্ম্য—লোকে বলে!

মাঠের ঠিক মাঝখানটায়, লোকে লোকারণ্য। এত লোক যে কোথায় ছিল। সেই দিনের বেলাকার কামান আর দীপস্তম্ভ—তা চোখেই পড়ছে না। প্রাসাদের উপর থেকে একটা মাত্র বড় ফোকাস লাগানো হয়েছে—তার আলো কতটা আর এসে পেঁছায় এই নীচের মাঠে!

মাঠের একদিকে হাজারদুয়ারী, তার অপরদিকে ইমামবাড়ী—দুটিই বেশ বৃহৎ ইমারত। মাঝখানটিতে মেলার লোকজন। যেন রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে এখানে এক গাছপালার নার্সারি। কখন এরা এল এখানে—কোথা থেকে, কখন যে দোকান সাজালো—কে জানে!

ভাদ্রের শেষ। গাছপালা লাগানোর দারুণ মরশুম। শহরে লোকেরা তো এই সময়েই বনমহোৎসব করে। অবশ্যি অগুনতি ক্রেতাদের মধ্যে কে যে শহুরে আর গেঁয়ো—তা ঠিক ঠাহর হল না। তবে বিক্রেতারা যে সবই এদিকের লোক তা বোঝা যায়। কথাবার্তায় শুনলাম, তারা ফি বছরই আসে এই বেরা ভাসানের রাতে এখানে দোকান দিতে। এক রাতের মেলা তো—বাদলার মরশুমে বিক্রী-বাটা কিন্তু ভালই হয়, তবে গত বছরের মত ভীড় নাকি এবারে হয়নি। মেলার দোকানিদের এই এক নিত্যকার অভিযোগ।

লালবাগের কয়েকটা বেকার ছেলে ডাল-ভাতের হোটেল বসিয়েছে। এই গহীন রাতে যেটাকে এখন আদৌ রাত বলে বুঝবার উপায় নেই—তা, সেই ছেলেগুলোও বলল, এবারে নাকি তাদের ব্যবসা মন্দা পথে। অথচ দু'হাতে বিক্রী করে যাচ্ছে ঠিকই। আমাদের তো ডিম-ডাল-ভাত দেবার জন্য প্রায় পনেরো মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখল। খাবারের দাম যে যথেষ্ট চড়া তা বলাই বাহুল্য। কেননা শহরের মধ্যে তো এখন সব দোকান বন্ধ। গঙ্গাতীরে এই বেরা ভাসানের মেলার জন্যই যা শুধু টেম্পোরারি দোকান কটা জেগে আছে। তারা তো জানে, যা কামাবার এই রাতে। আবার রাত পোয়ালে তো সব ফর্সা!

খেতে বসার এই অবসরে বেরা ভাসানের গল্পটা তাহলে একটু বলে নিই।

অনেক কাল আগেকার কথা এসব। মধ্যপ্রাচ্যের কাহিনী বোধহয়। লোক-মুখে বিবর্তিত হতে হতে এদেশে চলে এসেছে। মুসলমান সমাজে নদী-সাগরে চলাফেরার সময়ে নাবিক-মাঝিরা 'পাঁচ বদর পীর'-এর নাম করে। বেরা ভাসানের সঙ্গে নাকি সেই দরিয়ার পীরদের সম্বন্ধ আছে। আবার কেউ কেউ বলে, খিজির খাঁ নামে একজন মানুষের সম্বন্ধ আছে এই ভেলা ভাসানোর গল্পের সঙ্গে।

যাই হোক না কেন কিংবদন্তী, মেলার আসল গ্ল্যামার যে নৌকা ভাসানো। যে সে নৌকা নয়। কলার মান্দাস দিয়ে বেহুলা যেমন নৌকা বানিয়ে ছিল, তেমনতর নৌকা। তাতে বাঁশ-দড়ি-লতা-ফুল-পাতা-রঙীন কাগজ দিয়ে সাজানো। তারপর প্রদীপ জেলে দিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া।

পুরাতন দিনের কোন পুণ্য ঘটনার স্মরণে নবাবী আমলে এই স্মরণোৎসব প্রথার চলন হয়েছিল এখানে—আজো তা হয়ে চলেছে। সম্বাদপ্রভাকর বা সমাচার দর্পণ—পুরাতন দিনের সে সব সংবাদপত্রেও নাকি এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হত—এ উৎসব হল এতই প্রাচীন আর জনপ্রিয়।

আর যেহেতু নবাবী ব্যাপার, তাই নবাবদের সময়ে তার যে বেশ বোলবোলাও ছিল—তা বলাই বাহুল্য। নবাবের তহবিল থেকে বেশ ভাল টাকা আসত এই উৎসব পালনের জন্য। নবাবরা নিজেই ছিলেন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এখন অবশ্য অনুষ্ঠানের দিন একাধিক বেরা তৈরী হয়—কিন্তু প্রধান বেরাটি নবাবী প্রয়োজনায়। সেটির রশি কেটে দেন নবাব বংশের কেউ, তবেই উৎসব শুরু হয়।

প্রসঙ্গ কথা

মুর্শিদাবাদে হাজারদুয়ারী-ইমামবাড়া প্রাঙ্গণে ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে মাত্র এক রাতের জন্য যে, বেরা ভাসান উৎসব হয়—মেলা ও উৎসব প্রিয় পর্যটকগণ তা সকলেই জানেন। এই উৎসব মুসলিম সংস্কৃতির অংশ হলেও আজ তা সবায়ের আনন্দ উৎসব।

পর্যটক যখন মুর্শিদাবাদ আসেন, তখন সেটা হয় কোন রমণীয় ঋতু—অথচ এই অনুষ্ঠান দেখা থেকে বঞ্চিত হন। বিশেষতঃ মেলার আনন্দটি জমে ওঠে মধ্যরাত্রে—তাতে দর্শকের আরো অসুবিধা। সে হিসাবে কোন পর্যটক যদি এ সময়ে দিনমানে এসে সমগ্র লালবাগ ভ্রমণ করে সন্ধ্যার পর হতে এই উৎসব পর্যবেক্ষণের প্রস্তুতি নেন—তাহলে ভাল হবে। পুনরায় শেষ রাত্রে ভোরের প্রথম ডাউন ট্রেনে কলিকাতা অভিমুখী যাত্রা সুরু করতে পারেন।

ইদানীং অনেক মেলারই শতবর্ষ বা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা হচ্ছে। একদা নবাব বাড়ীর প্রাঙ্গণে এই উৎসব প্রবর্তিত হয়েছিল। তাই নবাবের সময়েই বলে অনেকে অনুমান করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে (১ম খণ্ডের প্রকাশ ১৩৩৯) তৎকালে প্রচলিত সংবাদপত্র থেকে যে সব তথ্য সংকলন করে দিয়েছেন, তার তারিখ হল ৩ আশ্বিন ১২২৮, ১৫ আশ্বিন ১২৩২, (সমাচার চন্দ্রিকা) এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২১, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৫ (সমাচারদর্পণ) প্রভৃতি।

এই উদ্ধৃতি সংকলন থেকে সেকালে এই মেলাটির জনপ্রিয়তা ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে এ কালে বসেও কিঞ্চিৎ ধারণা হয়। ঐ উদ্ধৃতিগুলি পাঠে আরো জানা যায় যে, বৃহত্তর সমাজের এক বিশেষ অংশে তা কিরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—সে কথাও। এ কাজ করা সম্ভব হলে পুরাতন বাংলা ভাষার রূপ অর্থাৎ বাক্যগঠন, যতিচিহ্ন স্থাপন—প্রভৃতি এবং সংবাদপত্রের প্রতিবেদন পদ্ধতি সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া যাবে।

বাংলা ভাষায় যারা মেলা বিষয়ে লেখালেখি করেন, তাদের লেখনীতে এই মেলার কথা তত বেশী প্রকাশিত হয় না। সব মেলাই জয়দেব মেলা বা সাগর মেলা বা সাতুই পৌষের মেলা নয়। নিখাদ গ্রাম্য পরিবেশে নবাবী কাল থেকে যে মেলা আজও সুষ্ঠুভাবে ও সমমর্যাদায় চলে আসছে, এই অস্থির দিনেও—এটিই এখানে বিচার্য। তবে মেলার কেন্দ্রীয় চরিত্র খোয়াজ খিজির সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনের জন্য পীরবাদ বা পীর সাহিত্য বিষয়ক কোন গ্রন্থ পাঠ করে নেওয়া ভাল। অবশ্য সেটি জানা না থাকায় একরাতের মেলা দেখার আনন্দে কোন ঘাটতি পড়বে না।

আজকের এই সাম্প্রদায়িক সংকটের দিনে এই মেলাটি একটি আদর্শ বলে গৃহীত হতে পারে—যেখানে হিন্দু-মুসলমান কেন, সর্ব সমাজের যথার্থই ষোল আনা অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়। আসলে মেলা একদিকে যেমন উৎসব, অপরদিকে তেমনই প্রয়োজন।

তারপর প্রদীপের আলো বুকে নিয়ে কলার মান্দাসের সেই বেহুলার ভেলা—গঙ্গায় ভেসে ভেসে চলে যায় কোথায় কে জানে! নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে তখন তার পিছনে যায় আরো ছোট ছোট কলার মান্দাস। আর তার পেছনে পেছনে ছোটে উৎসবমুখী নরনারীর বিশাল বিশাল বাইচ। যেন এক অঘোষিত বাইচ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় চৈত্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের রাত্রে গঙ্গা বক্ষে।

স্কুল বাড়ীর মত হাই বেঞ্চি-লো বেঞ্চির চেয়ার টেবিলে রাত্রি সাড়ে দশটায় চড়া দামে ডিম-ভাত-ভাজা খেয়ে হাত ধুয়ে আঁচানো হয়েছে কি হয়নি, এমন সময়ে কানে এল সমবেত জনতার অধীর আগ্রহ ধ্বনি। কী তার অর্থ বুঝলাম না।

দোকানি বুঝিয়ে দিল। বর্তমান নবাব এলেই এই অনুষ্ঠানের কাজ হবে—অর্থাৎ তিনি রশি কেটে দিলেই বেরা ভাসতে সুরু করবে গঙ্গার স্রোতে আনন্দিত মনে। তাই সমবেত জনতা অধীর আগ্রহে তার আগমনের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাপার দেখে মনে হল, নবাবদের নবাবী গেলেও স্থানীয় জনসাধারণের মনে কিন্তু নবাবী ব্যাপারটা সম্বন্ধে পুরাতন শ্রদ্ধাবোধটা এখনও আছে। সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই, কিন্তু বেরা ভাসান উৎসব মানে যে নবাবদের অংশ গ্রহণ—এ মতটা স্থানীয় অধিবাসীরা তো বটেই, আগত দর্শনার্থীরাও বিশ্বাস করে। তাই আজকের রাতটায় নবাবের কোন প্রতিনিধির এখানে উপস্থিতি অত্যন্ত কাম্য!

আর সত্যই তাই! চোখের সামনে কত কী যে ঘটে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে যেন জনতা উদ্বেল হয়ে উঠল। কে যে কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। আমরাও সেই ভীড়ে পড়ে গেছি। কোন এক দিকে নিশ্চয়ই এবং সেটা যে লক্ষ্যের দিকে তাও নিশ্চিত। কিন্তু ভীড়ের চাপে কিছুই চোখে যেন পড়ছে না।

সহসা কামানের ধ্বনি পড়ল। লোকেরা আনন্দ ধ্বনি দিল। পর পর কয়েকটা বোমা ফাটল। সমগ্র জনতা কিন্তু চমকে উঠল না। তারা উৎসাহে কলরোলে মেতে রইল। সম্ভবত: তারা এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে অভ্যস্ত—তাই কলকণ্ঠে গঙ্গাতীর সেই নিশুতরাত্রে কোলাহলময় হয়ে উঠল।

তারপর ধীরে ধীরে সব ঠাণ্ডা হয়ে এল যেন।

ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলাম—এই উল্লাসের তালে। তাহলে এরই মধ্যে নবাব বাহাদুরের প্রতিনিধি এসেছিলেন—নিশ্চয়ই রাজকীয় সমারোহে। তারপর তিনি নবাবী নীতি মেনেই বেরার দড়ি কেটে দিয়েছেন আর সেই ক্ষণটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যই রাজকীয় তোপধ্বনি হয়েছে এবং তারপর সেই সুন্দর সুসজ্জিত বেরা স্রোতের পথে পাড়ি দিয়েছে অনির্দেশের মুখে। এবারে তবে পায়ে পায়ে নদীর ধারে আসতে পারি।

ভাদ্রের শেষ। তবু নিঝুম রাতে একটা ঠাণ্ডার আভাস পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে নদীর ধার শূন্য হয়ে আসছে। যারা স্থানীয়, বহুদিন ধরে এ উৎসব দেখে

অভ্যস্ত, হয়তো বা কিছুটা ক্লান্তও—তারা এখন গৃহমুখী হয়েছে। কেনাকাটার পালা তো তারা আগেই সাঙ্গ করেছে—আর বেরা ভাসান তো হয়েই গেছে। তবে আর এখানে থেকে কাজ কী!

কত ধীরে ধীরে বর্ষার ভরা গঙ্গায় এগিয়ে চলেছে বেরাটি একটি প্রদীপ নিয়ে। যেন আর এক বেহুলার মান্দাস।

তার পিছে পিছে চলেছে আরো কত ছোট ছোট বেরা—সবাই যেন নবাবী বেরার পাশে থেকে থেকে নিজেকে রাজকীয় করে তুলতে চাইছে। আলোর পর আলোর সারি—'প্রদীপ ভাসাও কারে স্মরিয়া'। চেয়ে চেয়ে দেখতে মনটা যেন ফিরে যায় সেই পুরানো দিনে—বুঝি বা সিরাজের আর মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে।

হ্যাঁ, সত্যই তো এ উৎসব সেই কবেকার পুরানো।

পুরাতন দিনের সংবাদপত্রে, মানে সমাচারদর্পণ, সম্বাদভাস্কর প্রভৃতি পত্রিকায় এসব সংবাদ প্রকাশ হত। কী তখন জৌলুষ ছিল এই উৎসবের। কামানের তোপ, বাজি পোড়ানো, বাঈ নাচ—রাজকীয় জমকের চূড়ান্ত। আর আজ!

সে সব দিনে এই মেলার যে কী জৌলুষ ছিল তার একটি বিবরণ দিই পুরাতন 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ২৯।৯।১৮২১ তারিখের থেকে!

'……সমাচার মুরশেদাবাদ হইতে আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে গত ১৩ সেপ্টেম্বর ৩০ ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীযুত নবাব সাহেব বেরা ভাসানের সমারোহ মামুল মত করিয়াছেন তাহা হইতে কোন বিষয় নতুন হয় নাই। তথাকার সাহেব লোক ও বিবিলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া দিবসে ও রাত্রিতে উত্তম মত দুইবার খানা দিয়াছেন ও উৎকৃষ্টরূপ নাচ ও গান হইয়াছিল তাহাতে সাহেব লোকেরা যথোচিত আমোদ করিয়াছেন এবং গঙ্গাতে তাবৎ নৌকা সমারোহ হইয়া তাহার উপর নানাপ্রকার নাচগান ও নানাবিধ বাজী হইয়াছিল পরে ৯ ঘণ্টা রাত্রির সময়ে বেরা ভাসানের আরম্ভে উপরে এক তোপ হইল তৎকালে রোশনাইবাগে তাবৎ বাজীতে অগ্নি দিলেন এবং মসজিদের মত একটা বাজী হইয়াছিল—এ সকল বাজী উত্তম মত পোড়ান গেল। সাহেব লোকেরা ও বিবি লোকেরা শ্রীযুত নবাব সাহেবের সৌজন্য দেখিয়া তুষ্ট হইলেন ও অনেক রাত্রি পর্যন্ত তামাসা দেখিলেন।'

এই সংবাদ পাঠের পর মনে হল, আজ এতদিন পরে আমি এক দর্শক এই মেলার—সবই তো দেখলাম ঐ উপরের তালিকা মিলিয়ে। সুতরাং এ ধারণা কী করি না যে—সেদিন থেকে আজ অবধি এই মেলা একই রকম ভাবে হয়ে আসছে।

এখনও এই মেলায় তত বিবর্তন হল না। যেমন আর পাঁচটা মেলায়—তা ভাবা যাবে পরে। অবশ্য বাঈনাচ জাতীয় প্রোগ্রাম তো কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষের সমাবেশ, তাদের আগ্রহ—এ গুলিও তো ভাবতে হবে।

মনে পড়ে হেমচন্দ্রের এক কবিতায় কবে যেন পড়েছিলাম একটি কবিতা। কবিতাটির নাম ছিল যতদূর সম্ভব 'মণিকর্ণিকা'। বেশ দীর্ঘ কবিতা—ভদ্রলোক

গীতি কবিতা লিখেছেন, তার দৈর্ঘ ছিল বেশ—প্রায় পদ্যের মত।

সেই কবিতায় তিনি একটি 'ফুটনোট' দিয়েছিলেন যে কাশীতে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে 'বুড়ামঙ্গল' উৎসব হয়। ঐ উৎসব উপলক্ষে গঙ্গাবক্ষে ভেলা ভাসানো হয় ও তাতে প্রদীপ জ্বালানো হয়। সেই ভেলা ও প্রদীপ ভাসতে ভাসতে বহু দূরে চলে যায়। কবি অবশ্য তাঁর কবিতায় এই বিবৃতি দেননি, দিয়েছেন পাদটিকায়।

পুরানো কথা না ভেবে এখন খুঁজে বেড়াই সঙ্গীদের। কারা কোথায় ছিটকে গেল জানি না। সারা রাতের ধকল সহ্য করে শরীর এখন যেন অবসন্ন। দু চোখ ভরে একবার তাকিয়ে দেখি সেই কালো নিথর রাতের গঙ্গায়। এই সুন্দর দৃশ্য দেখে এখনিই তো ফিরে যেতে হবে দিনের আলোতে।

কোন দূরে ভেসে চলেছে বেরাগুলি। দুইতীরের নরনারী আকুল নয়নে তাকিয়ে দেখছে সেই দুর্লভ চিত্রাবলী। আজ এই রাত্রের জন্য এটাই যেন তাদের সেই বহুপ্রার্থিত দৃশ্য—আনন্দের উপরি পাওনা।

রঙীন কাগজ আর আলোর মালায় সাজানো এই কলার মান্দাস ভাসতে ভাসতে কোথায় কতদূর চলে যাবে—কেউ তা জানবে না। যেদিন এর উদ্ভব হয়েছিল, সেদিন হয়তো এর পিছনে কোনো সন্ত পুরুষের নাম জড়িত ছিল—আজ আর তার প্রয়োজন তেই। আজ তার পরিচয় একটি লোকউৎসব, একটি মেলা—একটি বিশুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক আনন্দানুষ্ঠান।

এ উৎসব আজও প্রচলিত আছে বাংলাদেশের ঢাকা আর টাঙ্গাইলে। এখন থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে সেখানে যেভাবে এই উৎসর পালিত হত তা হল ঃ কলাগাছের ভেলায় রঙীন কাগজের সজ্জা। তাতে মসজিদ, ঢাল-তরোয়াল, দুলদুল ঘোড়া, তীর-ধনুক ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হত। ভেলায় মোমের বা তেলের বাতি।

বাংলাদেশে এটা হল বর্ষার লোক উৎসব—ভুরা ভাসানও বলেন কেউ। এর উৎপত্তি নাকি মধ্যপ্রাচ্যে। সিরিয়ার আরবদের মধ্যে খিজির খাজা নামক সমুদ্র-পীরের সংবাদ পাওয়া যায়। তারাও নাকি এই ভাবেই ভেলা ভাসাতো। খোয়াজ খিজির হলেন জলের পীর।

আরবীয় সেমেটিক এই সংস্কৃতি কবে যে ভারতে এল আর প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল বাঙালী জলচারী সদাগর তথা মুর্শিদাবাদের নবাবদের প্রাসাদে—এ জলচারী সদাগররা যেন সুখে নিরাপদে জলযাত্রা করে, সব বিপদ থেকে রক্ষা পায়—তাই কি এই মাঙ্গলিক উৎসব?

চমক ভাঙ্গল সঙ্গীদের ডাকে।

'কে তুমি বসি নদী কূলে একেলা।' ফাঁকা হয়ে গেছে সব। জেগে আছে মেঘলা আকাশের ফাঁকে ফাঁকে দুটি একটি তারা। জনতার মিছিল ছায়ার মত এগিয়ে চলেছে দূরে দূরে।

এই মেলা আজ তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে যে তরঙ্গ তুলল, আগামী এক বছর তার রেশ থেকে যাবে তাদের মনে শুধু নয়, আমাদের মনেও। প্রথা নয়, কিম্বদন্তী নয়—নেহাৎ মেলামেশার এই আনন্দের জন্য মেলা এখন আর মেলা থাকে না। হয়ে ওঠে যেন এক অন্তরের প্রয়োজনীয় চাহিদা।

দু' পয়সার বিনিময়ে দু' টাকার স্মৃতির সম্পদ নিয়ে ফিরে যেতে যেতে আমরাও ভাবব—বাইরে এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব হলেও, এই সব মেলা কেন আজও তবে অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বজায় রাখতে পারছে? তাহলে সবাইকে বলে সবার মূলে হল রাজনীতিস দলবাজি—এটা কি তাহলে সত্যি?

এই একরাত্রির মেলামেশার পরে এরা আবার যে যার স্থানে ফিরে যাবে, হয়তো যে যার দলে মিশে যাবে। সেই আগামী বছর পর্যন্ত। যে যার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে জীবন চালাবে। তার পর বর্ষ অন্তে আবার সব চিন্তা মুছে ফেলে চলে আসবে এখানে বা ব্যাণ্ডেল চার্চে বা পাথর চাপুড়ির মেলায়। মানুষের প্রাণের শক্তির চেয়ে বড় আর কি আছে!

একরাতের জন্য জেগে ওঠা হাজার দুয়ারীর প্রাঙ্গণ আবার ফাঁকা হয়ে থাকবে এক বছরের জন্য। আমরা এগিয়ে চললাম লালবাগ ষ্টেশনের দিকে, শেষরাতের ডাউন লালগোলা ধরবার জন্য। অসংখ্য লোক পিঁপড়ের মত পিল পিল করে চলেছে গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে—সোজা পথ দিয়ে গেলে যে পথ দীর্ঘ হয়ে যাবে—হয়তো ভোরের প্রথম ট্রেনটাই পাওয়া যাবে না। □

যত মাঠ-প্রান্তর তত কাহিনী।

যত বিল-দহ তত রাজা-জমিদার।

যত মন্দির-মসজিদ তত প্রাচীন ইতিহাস।

যত ভগ্ন প্রাসাদ-দুর্গ তত কিম্বদন্তী-কথা।

কাহিনীতে ছড়িয়ে আছে এ দেশের গ্রাম-গ্রামান্তর।

শুধু অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে এগুলি খুঁজে নেওয়া প্রয়োজন।

এ সমৃদ্ধি থেকে শহর বঞ্চিত।

তাই এই গৌরব নিয়েই বেঁচে থাকে বাংলার গ্রাম।

কেউ এদের বলেন কিম্বদন্তী,

কেউ বা বলেন প্রবাদ

যদিও উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য।

আর কেউ বলেন এগুলি হল প্রাচীন কথা।

লোকসংস্কৃতিবিদ বলেন এ হল বিশুদ্ধ লোকসাহিত্য।

তখনই শুরু হয়ে যায় অন্বেষণ আর বিশ্লেষণ।

লোকসাহিত্য-৩

অথচ তার অধিকাংশই কিন্তু

আজও ছড়িয়ে আছে সে সব স্থানেই।

হারিয়ে যেতে গিয়েও জড়িয়ে আছে শুধু বৃদ্ধদের

স্মৃতির জঠরে।

সেই জঠর ভেদ করে যিনি তুলে আনছেন সর্বাগ্রে

তিনিই হচ্ছেন এক প্রকার বিজয়ী।

কিন্তু লোকবিজ্ঞানী বলেন,

এগুলি হল প্রাচীন কালের

ইতিহাস-চূর্ণ-হয়ে যাওয়া অংশমাত্র।

সেগুলিই নানা পদ্ধতিতে প্রচারিত হতে হতে আজ

সংশোধিত-সংযোজিত রূপ নিয়ে সবার

মনের মাধুরী মিশিয়ে এক বিশেষ সাহিত্য

প্রকরণ সৃষ্টি করেছে।

লোকসংস্কৃতিবিদ তাকেই বলছেন লোকসাহিত্য।

প্রবাদ সন্ধানে যাত্রা

তপন কথা রেখেছিলো শেষ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় দিন সকালে প্রশ্ন করেছিল, 'আজ তাহলে কোথায় যাচ্ছি জানেন?' মনে পড়ল গতকাল ও আমাকে নিয়ে গেছিল ঠেকুয়াচকের এক পটিদারের বাড়ি। বিষ্ণুপদ চিত্রকর। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে পট দেখে এবং কিনে, পটের গান লিখে নিয়ে অতি ব্যস্ততায় কাটিয়েছিলাম আমরা—যার কৃতিত্বের সিংহভাগ হল ভ্রমণসঙ্গী তপনেরই।

ওরই কথামত তমলুকের হ্যামিল্টন স্কুলের শিক্ষকদের বোর্ডিং-এ ঠাঁই নিয়েছি ক'দিনের জন্য। এখন পুজোর ছুটি, ছাত্ররা সবাই চলে গেছে। শিক্ষকরাও প্রায় সবাই। তপন রয়ে গেছে আমার জন্য—তমলুকের আশেপাশে আমাকে ঘুরিয়ে দেখাবে। যতই হোক স্কুলের শিক্ষক যখন—এটুকু তো পারা উচিতই!

পরিকল্পনা কি করেছে তা আগে থাকতে বলেনি—বলেছিল 'রোজ রোজ নতুন নতুম "সিনেমা" দেখাবো আপনাকে!' ওর কথায় আস্থা রেখেছিলাম। আমার এই ছাত্র মাষ্টারটি আমার মনের গতি বুঝে যে বেশ জমাটি একটি 'দিন সাতেকের' প্রোগ্রাম করে রেখেছে তা ক্রমেই টের পাচ্ছিলাম।

আমার নিরুত্তর মনোভাব দেখে ও বললো, 'আজ যাবো "কুচল ঘড়ুই-এর পাকা" দেখতে।' বলে, আমার মুখপানে তাকিয়ে রইল।

কথাটার কোনই মানে বুঝলাম না। তপনও এখন সে কথার কোন অর্থ বলতে রাজি নয় দেখলাম। অগত্যা ওর সঙ্গে স্কুলের বোর্ডিং ছেড়ে দ্রুত তমলুকের বাস স্ট্যাণ্ডে এসে হাজির হলাম। এখন আমরা যাবো শ্রীরামপুর। হুগলীর শ্রীরামপুর নয়, তমলুকেও একটা শ্রীরামপুর আছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে এমনতর কত শ্রীরামপুর আছে কে জানে!

প্রায় ৪০।৪৫ মিনিট বাস জার্নি করে এলাম এক বিশাল নদীর ধারে। এ নদী হলো কংসাবতী। একে আগে একবার দেখেছি মেদিনীপুর শহরের ধারে—সেটা বেশ রোমান্টিক চেহারায়। কিন্তু এখানে তা রীতিমত বড়সড়—একটু ভয় জাগায় মনে। সে নদী পেরোনো হল কোন মতে।

এ পারে এসেও নিস্তার নেই। তপন বর্ণিত 'কুচল ঘোড়ুই-এর পাকা' যে কতদূর তা কে জানে। এবারে উঠলাম একটা সাইকেল ভ্যানে—স্থানীয় ভাষায় এরই নাম ট্রলি। এটা আমাদের নিয়ে যাবে রামচন্দ্রপুর। সময় লাগবে প্রায় ঘণ্টা খানেক—তারপরে পৌঁছানো যাবে 'কুচল ঘড়ুই-এর পাকা'র সামনে।

একটু পরেই টের পেলাম ট্রলি চলেছে বাঁধ রাস্তা দিয়ে। মোরাম ফেলা

নাতিপ্রশস্ত পথ। ট্রলির পাশ দিয়ে কোন মতে একটা দুটো লোক হাঁটতে পারে। পথটা দু'দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে প্রায় চার-পাঁচ ফুট নীচে। সুতরাং কোন ভাবে গড়িয়ে পড়লে—

নদী এখান থেকে বেশ দূরে। দেখাও যায় না। কতক্ষণ হয়ে গেল কে জানে।

তপন বলেছিল, 'ঘণ্টা খানেক মত লাগবে।' ট্রলিতে বাঁধ রাস্তায় এক ঘণ্টার পথ মানে দূরত্ব কতখানি হতে পারে তা আন্দাজ করার চেষ্টা করি—পারি না।

যে পথ দিয়ে ট্রলিতে চেপে চলেছি তপনের সঙ্গে-এ জাতীয় পথ পরিক্রমা আগে কখনও করতে হয়নি। মেঠো পথে হেঁটে যাওয়া—সে এক অভিজ্ঞতা, আর এ রকম প্রায়-অসমতল পথে ট্রলি করে যাওয়াষ জন্য যাত্রীকেও বেশ কসরৎ করে বসতে হয়। তার ওপর বাঁধ-পথের বৈশিষ্ট্য তো আছেই।

কত কী যে দেখতে দেখতে যাচ্ছি। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়, একটু নেমে, ঐ বাড়ীটার দাওয়ায় গিয়ে খানিক বসি। বা ঐ বাড়ীটার সামনে যে ছোট মন্দিরটা আছে, তা দেখে আসি, উঠানে শুকানো মাছ ধরার ঐ বিচিত্র জালটা কী ভাবে বোনা হল—তা জেনে নিই। কিংবা ঐ যে কুমোর বাড়ীর পাশ দিয়ে গেলাম তার একটি ছোট্ট সাক্ষাৎকার নিয়ে নিই। একটা নিখুঁত আটচালা দেখে মনে হল, তার একটা রেখাংকন করে নিই। একটা মাটির বাড়ী সদ্য সদ্য তৈরী হচ্ছিল—সেটার নির্মাণ পদ্ধতিটা দেখে নিই ক্ষণেক দাঁড়িয়ে। গরুর গাড়ীর চাকা তৈরী করছিল যে লোকটা—সে-ও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

কত কী যে উল্লেখযোগ্য বস্তু দেখলাম—তার ইয়ত্তা নেই। তপন কিন্তু কোন কিছুতেই তেমন উৎসাহ দেখালো না। নামতে তো দিলই না উপরন্তু—'ও সব পরে হবে' বলে ভ্যানওলাকে যেন মৃদু ভৎ'সনা করল।

মনে মনে একটা চাপা অতৃপ্তি নিয়ে এর পরে পথ চলেছি। কতক্ষণ সময় কেটে গেছে জানি না। তপনও কিছু বলছে না। সে ভ্যানওয়ালায় সঙ্গে নিতান্ত আঞ্চলিক ভাষায় কী যে বলছে—তা ও বুঝছি না। ও যখন আমার ছাত্র ছিল, তখন কিন্তু এ ভাষায় কথা বলত না। তাহলে হয়তো কর্মক্ষেত্রে এই আঞ্চলিক ভাষাটা রপ্ত করেছে।

মনে মনে আশ্বস্ত হলাম—তাহলে ও পরে যথাস্থানে গিয়ে আমার হয়ে দোভাষীর কাজ করতে পারবে নিশ্চয়ই। হঠাৎ শুনি ঃ

'এবারে নামুন।'

সহসা আমার হাত ধরে টেনে ট্রলি থেকে নামায় তপন, 'এই দেখুন, সামনেই কুচল ঘোড়ুই-এর পাকা। এটাই সেই রামচন্দ্রপুর।'

এর পরের ঘটনা নিজের অভিজ্ঞতাতেই বলি।

একটা খুব প্রাচীন প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি। তবে সামনের দিকটা দেখে বোঝা যায় না ভিতরে এর গভীরতা কতখানি। প্রাসাদের

প্রসঙ্গ কথা

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট'—যা নাকি এক বিশেষ হাটের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর একজন ইতিহাসপ্রেমী নিখিল নাথ রায়—তিনিও ঐ কাহিনী একটু ভিন্ন নামে লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আরো লিখেছিলেন 'ঘাটের কথা' 'রাজপথের কথা'—এসব তাঁর সাহিত্য জীবনের ঊষা পর্বের কথা। পরবর্তী কালের রবীন্দ্রসৃষ্টির কথা সর্বজন প্রচারিত, আদিযুগের সাহিত্যগুলির কথা মহাকাল আর স্মরণে রাখতে পারে নি।

আসলে এ জাতীয় ইতিহাস ও কিম্বদন্তী-আশ্রিত গল্পকথা শুনতে আমাদেরও ভাল লাগে। অনেক প্রাচীনকালের ইতিহাস—তা প্রাসাদের নোনা ধরা ইঁটের মতই ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে। প্রাসাদটা শুধু কংকালটা নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকে—হারিয়ে যায় তার অতীত। বেঁচে থাকে তার ইতিহাসটা কিম্বদন্তী-কথার আকারে। যত দিন এগিয়ে যায়, তত সুরু হয় তার নানা পাঠ-পাঠান্তরের পর্ব।

মুখে মুখে বর্ণিত হতে হতে কোথাও যদি কথকের মুখে কাহিনীসূত্র হারিয়ে যায়, তবে কথক ঠাকুর থেমে যান না। মানান-সই করে আপন প্রতিভা দিয়ে সে গল্পের ফাঁকটুকু ঢেকে দেন এক নিপুণ কৌশলে। এই ভাবে প্রাচীন ইতিহাস আরো দ্রুত লোপ পায়, রূপান্তরিত হবার পথে এগিয়ে যায়—এক নতুন সৃষ্টিতে যেন 'সাহিত্য' হয়ে ওঠে।

'নকসী কাঁথার মাঠ' বা 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'—এ তো মাত্র দুটি নাম উল্লেখ করা হল। কেননা, তার রূপ লিখিত হয়ে গেছে বলে—তা আর কোনদিনও হারিয়ে যাবে না। কিন্তু আজও কত এ জাতীয় কাহিনী ছড়িয়ে আছে—তার অনুসন্ধান করে কে! সেই সব জসীমউদ্দীনরা সংখ্যায় অনেক হলেও গণমাধ্যম সেদিন ততটা উদার ছিল না তাদের জন্য।

একদা মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাণকেন্দ্র ছিল লালবাগ—আজকের পর্যটকের কাছে যা হতে পারে এক সার্থক সিরাজনগরী। এই প্রাচীন শহরের স্মৃতি কথা নিয়ে এত গাইড বই প্রচারিত হয়েছে—যা যে কোন পর্যটকের কাছে এক প্রবল কিম্বদন্তীর আকাংখা জাগিয়ে তোলে। বাস্তব ইতিহাসের একটি একক কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়ে পর্যটক তথা পাঠকের মনকে রঙীন করে তোলে। একদা যা প্রকৃতই অস্তিত্বে ছিল, তা হয়ে যায় লুপ্ত। যা অনস্তিত্বে ছিল, তা রূপ নেয় অস্তিত্বে।

রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি'-র নায়ককে জিগ্যেস করতে ইচ্ছা করে, যখন সে বলেঃ 'হাটে-মাঠে-ঘাটে এইরূপে কাটে বছর পনেরো যোলো। একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়ই বাসনা হলো'—'তখন সেই উপেন দেশ-বিদেশের সব কাহিনী দেখতে দেখতে বা শুনতে শুনতে সময় কাটিয়েছিল। কেউ যদি তাকে এক ঠাঁইয়ে বসিয়ে হুঁকো-তামাক হাতে ধরিয়ে তার সেই নিরুদ্দেশ জীবনের কাহিনী বর্ণনা করতে বলতো, তবে হয়তো আমাদের মানস দর্পণে উঠে আসত কত দেশের কত বিচিত্র কাহিনী-কিম্বদন্তী।

সম্মুখ ভাগের প্রবেশ পথের স্থাপত্য যেন 'মিনি সিনেট' হল। অর্থাৎ বৃটিশ যুগে তৈরী, তাই তখনকার স্থাপত্য ধারা অনুসৃত হয়েছে, বিশেষতঃ গৃহস্বামী যখন ধনশালী ব্যক্তি, তখন তিনি তো বৃটিশদের অনুকরণ করতে চাইবেনই। সেটাই তো তখনকার দিনের 'বাবু কালচার'।

মূল প্রবেশ পথের সদর দরজাটা খোলা—ভিতরে তাকিয়ে দেখলাম, খুব বেশী লোকজন দেখা যায় না। তবে অভ্যন্তর ভাগটি আরো বিশাল—যা বাইরে থেকে দেখে কোন মতেই আন্দাজ করা যায় না।

তোরণ দ্বারের বাঁ দিকে একটি মন্দির। পরে শুনিছিলাম বিষ্ণু মন্দির। কিন্তু কোন দেব বিগ্রহ নেই—যেন পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে।

আমাদের এ ভাবে অবস্থান করতে দেখে অট্টালিকার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল এক মাঝ বয়সী লোক। পরনে লুঙ্গি গুটিয়ে পরা, উর্ধাঙ্গ অনাবৃত, কাঁধে গামছা। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। মাথায় চুল অবিন্যস্ত। তার চোখে মুখে প্রশ্ন আমাদের সম্বন্ধে।

পরিচয় না জানালে কাজ হবে না—তাই সংক্ষেপে তপনই সে কাজ করলো। হরেন্দ্রনাথ তখন বলল 'আমি তো এ বাড়ীর কেউ নই। তা ছাড়া এখন যারা আছে এখানে, তারা বলতে গেলে ঘোড়ুইদের কেউই হয় না। তাদেয় জমি-জমা বিষয়-সম্পত্তি দেখা শোনা করে। এই আমাদের কাজ। বলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কাকে যেন খুঁজতে থাকে হরেন্দ্রনাথ।

'তাহলে এদের ফ্যামিলির লোকেরা গেল কোথায় ?'

'নদীর আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাবার ভয়ে তারা সবাই অন্যত্র সরে গেছে। এ সব অবশ্য অনেক পুরানো কথা। দেখছেন তো এই নদীবাঁধটা—মানে তার পরে তৈরী হয়েছিলো এই বাঁধ। এই এতদূর অব্দি বন্যার জল চলে আসত। বিপদ বুঝে বাবুরা স্থানান্তরে চলে যায়। এখন মাঝে মাঝে যাতায়াত করে। খোঁজ খবর নেয়—তবে স্থায়ীভাবে কেউ থাকতে চায় না। কতজন এসেছে কত খোঁজ নিয়েছে এই কুচল ঘোড়ুই-এর পাকা নিয়ে। বলতে বলতে সব মুখস্থ হয়ে গেছে আমার। তা গাঁয়ে-গঞ্জের এ সব কথা লিখে কি হবে বাবু ?' একটু থেমে বলে, 'তা বাবু এয়েছেনই যখন একটু চা চলবে ?'

ইতিমধ্যেই আর একটি সদ্য কৈশোর পেরোনো যুবক এসে হাজির। তাকেই বোধ হয়, হরেন্দ্রনাথ একটু আগে খুঁজছিল। তাকে দেখে বলল, 'এই যে দেখছেন উত্তম, এ এখন বাবুদের বাড়ী মাঝে মাঝে একটু যাতায়াত করে, বিষয়ের খোঁজ খবর দেয়া-নেয়া করে।'

এর পর হরেন্দ্রনাথ একটা গ্রামের নাম করে, পথ নির্দেশ বলে দেয় এখান থেকে—কিন্তু সে সব কিছুই মাথায় প্রবেশ করে না আমার।

'উত্তম তুই এক কাজ কর দিকিনি, বাবুদের পাকার ভিতরটা একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দে তো বাপ !'

'বাপ' সম্বোধনে মনে হল হরেন্দ্রনাথ ও উত্তম নিঃসম্পর্কীয় হলেও এদের মধ্যে অজানিতে একটা আত্মিক সম্বন্ধ হয়তো গড়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে 'বাবুদের জন্য' চা এসে গেছে। সঙ্গে লেড়ো বিস্কুট—কাছেই দোকান। বেশ বুঝলাম এই চায়ের অবসরে জেনে নিতে হবে আসল গল্পটা। উত্তমের সঙ্গে প্রাসাদের অভ্যন্তর পর্যবেক্ষণ একটু পরে হলেও চলবে—এখনও তো তত বেলা হয়নি, সময় আছে।

অতি প্রাচীনকালে ময়না থানান্তর্গত রামচন্দ্রপুরে কুচল ঘোড়াই ছিল অতি সাধারণ এক ব্যক্তি। তখন এ সব অঞ্চল অরণ্যাকীর্ণ। জঙ্গলের কাঠ কেটে ব্যবসা— এটাই ছিল তার জীবিকা। শাল জাতীয় গাছের প্রাধান্য ছিল তখন এতদঞ্চলে। একদা তার কাঠগোলায় একটি সুন্দর কাষ্ঠখণ্ড দেখা যায়। সে ঐ কাষ্ঠখণ্ডটি এক ক্রেতাকে বিক্রয় করে। ক্রেতা সে কাঠ অন্যান্যগুলির সঙ্গে নিয়ে বাড়ী চলে যায়। তখনকার দিনে এ জাতীয় কাঠের বোঝা জলপথে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হত।

কিন্তু দেখা যায় পরদিন রাতারাতি সেই কাঠ আবার কুচল ঘোড়াই-এর কাঠ-গোলায় ফিরে এসেছে। এইভাবে প্রতিদিন সে ঐ কাঠ বিক্রি করে ও সেই কাঠ রাতারাতি তার গোলায় ফিরে আসে। এই আশ্চর্য ব্যাপার নিত্যদিন সংঘটিত হওয়ায় তার প্রচুর অর্থাগম হয়। এ বিষয়ে তার মনে এই ঘটনার অলৌকিকতা নিয়ে কোন সন্দেহ হয় নি।

একদা কোন এক ক্রেতার মনে এ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। হয়তো তার গোলায় দু'বার ঐ কাষ্ঠখণ্ড এসে গেছিল। তখন থেকেই তার মনে সন্দেহ দানা বাঁধে— কিন্তু এ সম্বন্ধে কেউ কোন রহস্যভেদ করতে পারে নি। ধীরে ধীরে এই অলৌকিক কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে—লোক জানাজানি হয়ে যায়।

তখন একজন সাহসী ক্রেতা ঐ কাঠ কিনে নিয়ে যায় এবং তা চিরে চিরে খণ্ড করার চেষ্টা করে। তখন কাঠ চেরাই করার সময়ে তা থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ে—স্বভাবতই সে এতে ভীত হয়ে পড়ে—কাঠ চেরাই কাজ বন্ধ করে দেয়। এই সংবাদের পর আর কোন ক্রেতা ঐ কাঠ কিনতে আসে না। ধীরে ধীরে এই ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। এতদিন ধরে কুচল ঘোড়াই এই অলৌকিক কাঠ দিয়ে যে প্রভূত ধন উপার্জন করে ছিল, তাই দিয়ে সে এক সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করল ঐ গ্রামাঞ্চলে। কেননা সেও বুঝতে পেরেছিল, ঐ ব্যবসা আর চলবে না। ঐ বিশাল প্রাসাদ আজও স্থানীয় লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। এই দারিদ্র্যপীড়িত বিশাল গ্রামাঞ্চলের মধ্যে প্রাসাদোপম এই অট্টালিকা ধীরে ধীরে এ ভাবে 'কুচল ঘোড়াই-এর পাকা' অর্থাৎ পাকাবাড়ী রূপে খ্যাতি লাভ করে।

গল্প শুনতে শুনতে কেমন যেন মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। সেই প্রাচীনকালেই হয়তো মনটা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সহসা উত্তম বলল, 'আর এই যে মন্দিরটা দেখছেন, এরও একটা গল্প আছে কিন্তু।'

চমক ভেঙ্গেছে আমাদের এই কথা শুনে। গল্পের ইঙ্গিত পেয়ে সজাগ হই ঃ 'কি

সেই গল্প ?' বলতে বলতে তাকাই প্রাসাদের প্রবেশ পথের পাশের সেই মন্দিরটার পানে।

কালের কবলে তার এক হতচ্ছাড়া অবস্থা। নোংরা ধূলি ধূসরিত চেহারা—কোনদিন যে এখানে কোন দেব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি—তা এর বর্তমান চেহারা দেখেই বলে দেয়া যায়।

বিষ্ণু কিন্তু মন্দিরে বসেন নি কেননা মন্দির নির্মাণ কার্য শেষ হয়ে গেলে যখন মূর্তি প্রতিষ্ঠার দিন আগত, সেদিন মন্দির চূড়ায় একটি শকুনি বসে। গ্রামাঞ্চলের বিশ্বাস মতে এটি হল কুলক্ষণ। তাই এই মন্দিরে আর বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল না। তদবধি শূন্য মন্দির ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে চলেছে।

ঠিক এরকমই এক কাহিনী শুনেছিলাম একবার সিউড়ীর নিকটে রাজনগরে। রাজনগর নাকি একদা রাজাদের নগর ছিল। সে সব রমরমার দিন কবে চলে গেছে। পড়ে আছে শুধু ভাঙ্গা ইমরাত, মসজিদ, হাওয়াখানা, দীঘি।

সেখানেই শুনেছিলাম মোতিচুর মসজিদের কাহিনী। তার নির্মাণ কার্য শেষ হয়ে যাবার পর সবার অলক্ষ্যে কোথা থেকে নাকি একটা শূকর ঢুকে পড়ে তার মধ্যে। ব্যস্, ধর্মস্থান হয়ে গেল অপবিত্র। আর সেটা কোনদিন ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত হল না! পড়ে পড়ে ধ্বংস হল। অথচ সেটাই ছিল নাকি নবাবের সাধের মসজিদ। বড় যত্নে গড়া, অনেক মনোযোগ দিয়ে।

আজ সেটা দাঁড়িয়ে আছে এক ভগ্নস্তূপ হয়ে—পর্যটক আকর্ষণ করছে। তার সৌন্দর্যের কথা 'বীরভূমের পুরাকীর্তি' বইয়েও লেখা আছে।

মানুষের কত সংস্কার কত বিশ্বাস কত অলৌকিকতা। এই গ্রামে না এলে তা বোধ করি জানাই হত না। তপনের মুখে শুনেছি একটি প্রবাদের কথা—সেটি ছড়ার মত। মেদিনীপুরের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। তার রূপ হল কতটা এই রকম :

'কুচল ঘোড়ুই-এর পাকা, দে নন্দীর টাকা। ময়না রাজার মান, দাসের ঘরে ধান'। একটি ছোট ঘনবদ্ধ ছড়ায় চার চারজন নামী পরিবারের বা ব্যক্তির ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন রাজবংশ এ অঞ্চলে প্রচুর। সব গেছে তাদের প্রতিপত্তি—আজ শুধু বেঁচে আছে এই ছড়াগুলি। হয়তো অন্য সব পংক্তিগুলির পিছনেও আছে অনুরূপ কোন সুদীর্ঘ কাহিনী।

এবার উত্তমের সঙ্গে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে। যদি আর কোন কাহিনী সেখান থেকে সংগ্রহ করা যায়। উত্তম খুবই আগ্রহী হল এ ব্যাপারে। আমাদের মত দু'জন ব্যক্তিকে অট্টালিকার মধ্যে ঘুরিয়ে দেখাতে তার কোনই আপত্তি নেই। মনে হল, তার যেন কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত আগ্রহও আছে এ ব্যাপারে—হ্যাঁ, আমার অনুমান সত্যই। এতক্ষণ ধরে বাইরে থেকে এই কুচল ঘোড়ুই এর পাকা সম্বন্ধে যে আন্দাজ করছিলাম, ভিতরে ঢুকে দেখলাম আমার কল্পনা নিতান্তই

সীমিত। অন্দর মহলে পা দিতেই অট্টালিকার পরিবেশটিই যেন পালটে গেল। মনে হল 'সাহেব-বিবি-গোলামের', সেই প্রাচীন অট্টালিকার মত এক নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশ করেছি।

বাড়িটি দোতলা—কিন্তু চারিদিকে রাশি রাশি ঘর। বহুঘরই খালি। দরজা জানালা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। বারান্দার কোন কোন অংশ জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। ভিতরে যে বেশ কিছু লোকের বসবাস আছে তা বোঝা গেল। তবে, এই বিশাল অট্টালিকার পক্ষে তা নিতান্তই বেমানান। ঘোড়াই বংশের কেউ কেউ তখনও সেখাসে ছিল কিনা বা তারা আমাদের দেখেছিল কিনা, তা জানি না। তবু কালের প্রাচীনতায় এই অট্টালিকা আমাকে দীর্ঘক্ষণ অভিভুত করে রেখেছিল।

একতলা দোতলায় সব কক্ষ-বারান্দা-হলঘর পরিক্রমার পর দোতলায় অনুরূপ ভাবে পর্যবেক্ষণ। তারপর উত্তম নিয়ে গেল আমাদের একেবারে চিলে কোঠায়।

চিলে কোঠার ঘর দিয়ে ছাদে যাওয়া যায়। সেখানে এক বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল আমাদের জন্য। ছাদের প্রাকারের গঠন দেখে মনে হয় বাড়ীটি যেন এক ছোটখাটো দুর্গ। বিপদের সময় গৃহের মধ্য থেকে যেন যুদ্ধ করতে পারা যায়—তেমন ব্যবস্থা করে রাখা। বন্দী হয়ে গেলেও পালাবার গুপ্তপথ—উত্তম ইশারায় সেটিও আমাদের দেখিয়েছিল—তবে সেদিকে যাবার চেষ্টা করিনি।

'একেবারে অবিকল ময়নাগড়ের প্রাসাদের মত।'

এটা তপনের সংলাপ—আমার উদ্দেশ্যে। চুপি চুপি বলল—'সেখানেও নিয়ে যাবো আপনাকে একদিন। আমার দেখা আছে আগেই। এসব পুরাতন দিনের প্রাসাদ, প্রায় সবই ভিতরে ভিতরে এক। প্রায় দুর্গের মত।'

ময়নাগড়ের কথা থাক। শুধু প্রসঙ্গ পূরণের জন্য বলি—চারিদিকে পরিখা বা গড়খাই দিয়ে ঘেরা সে দুর্গ-প্রাসাদে প্রবেশ পথ আজও নৌকা করে। সেখানে থাকেন বাহুবলীন্দ্র বংশ। তাদের বংশধররা কেউ কেউ এখানে থাকে, তবে আমাদের তারা চা খাইয়েছিল। এখন নয়, পরে সময় মত সেকথা বলা যাবে।

এবার চোখে পড়ল, চিলেকোঠার ঘরের টালির ছাদের বাতায় রাশিকৃত তালপাতা গোঁজা আছে—ফালা ফালা করে চেরা। নিতান্ত কৌতুহল বশে তার দুটি টুকরো নিজের ঝোলাব্যাগে ভরে নিলাম—'স্মৃতিটুকু থাক।'

'কাশী রাজার মান, ময়না রাজায় ধান, দে-নন্দীর টাকা, কুচল ঘোড়ুই-এর পাকা।' বেলা তখন মধ্য গগনে। আবার ট্রলিতে উঠি আমরা। গাড়ী চলতে শুরু করতেই তপন বলল ছড়াটা—তবে এবারে শুনতে যেন অন্য রকম মনে হল। 'কাশীরাজার মান।'—এ তো আগে শুনিনি।

ট্রলি চলেছে আপন মনে। আর তপন বলছে, 'আসলে এ সব ছড়া মেদিনীপুরের নানা স্থানেই ছড়ানো আছে—আমার বাল্যকাল থেকে শুনে আসছি। এদের প্রত্যেকে খুব নামী লোক ছিল, তাই তাদের কীর্তিকাহিনী এই ছড়ায় বেঁধে ছড়িয়ে গেছে।'

'কি সেই কাহিনী ? তার কতোটা জানো তুমি ?' বলতে বলতে আমি আবার আবার আগ্রহী হয়ে উঠি—যদি নতুন কোন স্থানে ভ্রমণ করা যায়, যদি নতুন কাহিনী সংগ্রহ করা যায়। তাকে উদ্দীপিত করার জন্য বললাম : 'এই কাশীরাজ কে ?'

'ইনি ছিলেন কাশীজোড়া পরগণার অধীশ্বর—এর নাম ছিল রাজ নারায়ণ রায়। তার মানসম্মান ও প্রতিপত্তি একদা খুবই বিখ্যাত ছিল বলে কাশীজোড়াকে নিয়ে ছড়া তৈরী হয়েছে।' তপনের এ উত্তর শুনে মনে হল নিজের অঞ্চলটাকেও তাহলে ভাল ভাবেই জানার চেষ্টা করেছে, 'বইয়েতেও তো এসব লেখা হচ্ছে আজকাল'।

'তা হলে ময়না রাজার গল্পটা বল শুনি।'

গাড়ী চলছে মন্থর গতিতে। ট্রলির পরে বসে খুব ক্লান্ত শরীরে শুনে যাচ্ছি তপনের গল্প। মনে হয় ট্রলিচালকও সেই গল্পের মধ্যে বেশ রস পাচ্ছে—তাই তার পায়েও লেগেছে খুশীর ছোঁয়া।

একদা ময়না থানায় ছিল আশিটি মৌজা—তার দক্ষিণে মহিষাদলের দশটা গ্রাম নিয়ে একটা মৌজা। দুটি দুই রাজার অধীন—কেউ কারো থেকে কম নয়। জায়গাটি নীচু, প্রায়ই বন্যা প্লাবিত হয়। একদা প্লাবনের সময়ে ময়না জল বন্দী হয়। দুটি রাজার রাজত্বের সীমানায় একটি বাঁধ ছিল। ঐ বাঁধ কেটে দিলেই জল নীচের দিকে যেতে পারত। তাই ঐ বাঁধ পাহারার জন্য সতর্ক প্রহরী রাখা হয়েছিল। কিন্তু ময়নার রাজা সকলের চোখ এড়িয়ে এক বিশেষ কৌশলে ঐ বাঁধ কেটে দেন। সব জল তখন রাতারাতি পার্শ্ববর্তী মহিষাদলের রাজার মৌজাগুলিতে গিয়ে জমা হয়। সে রাজ্য বিপদে পড়ে, রাজাও ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই গোপন ঘটনা কিন্তু একদিন প্রচারিত হয়ে গেল, সবাই এর রহস্য বুঝতে পারল। তখন মহিষাদল রাজা ময়নার রাজার নামে মামলা করল। আগে যারা ময়নার রাজাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কোর্টে কেস উঠলে তারা কিন্তু ময়নার রাজার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না। রাজা বিপদে পড়লেন। শুধু প্রজার মুখ চেয়ে দেনা করে মামলা চালাতে হল—তবু তিনি মহিষাদল রাজ্যের কাছে নতি স্বীকার করলেন না। এই ভাবে মামলা লড়তে লড়তে দেউলে হয়ে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মামলায় তার জয়লাভ হয়। তাই মামলায় রাজার এই মানের লড়াইয়ের ব্যাপারটা পরবর্তীতে এতদঞ্চলে প্রবাদে দাঁড়িয়ে যায়।

তপনের গল্প শেষ হল। আমাদের ট্রলি একটু থামল। মাথায় রোদের তাত লাগছে। কী যেন গ্রামটার নাম—একটা দোকান পথের ধারে। সেখানে বসে তিনজনে একটু চা খেলাম।

চা খেতে খেতে শুনলাম, তপনের কাছে আরো দুটি কাহিনী ধরা আছে ঐ ছড়া সম্বন্ধে। রাত্রে স্কুলে ফিরে গিয়ে সে আমাকে বলবে। আর তখন ঠিক হবে আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম।

তপন কথা রেখেছিল।

সেদিন রাত্রে নৈশভোজনের পর ঘুমতে যাবার আগে সে আর দুটি গল্প বলেছিল আমাকে। প্রথমটি হল ঐ প্রবাদের 'দে নন্দীর টাকা' সম্বন্ধে। অল্প কথায় সে গল্প হল ঃ পাঁশকুড়া স্টেশনের পর হল হাউর, সেখান থেকে এক মাইল উত্তরে ঘোষপুর। সেখানেই একদা ছিল দে নন্দীদের বিশাল জমিদারী। ময়নার রাজা যেমন তাদের প্রতিপত্তির জন্য খ্যাতিমান ছিল—এরাও তেমনি তাদের টাকার জন্য প্রসিদ্ধ হয়েছিল। মতান্তরে 'পলাশী গ্রামের দে নন্দী' বলেও একটা ছড়া চালু আছে—তারা নাকি লবণের ব্যবসা করে খুব অর্থশালী হয়েছিল।

দ্বিতীয় কাহিনীটা হল 'দাসের ঘরে ধান'। এর বিকল্প রূপ হল 'গজনাই দাসের ধান'। এর সম্বন্ধে কাহিনী শুনলাম গজিনা গ্রামের দাস পরিবারের সমৃদ্ধি। তারা ছিল বড় জোতদার ও বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ।

বাংলার গ্রামে এ রকম কত আঞ্চলিক ইতিহাস ছড়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে আছে—কে তার সন্ধান রাখে। যদুনাথ সরকাররা কি সেগুলি কোন ইতিহাস বলে মর্যাদা দেবেন? তবু, আমার ঝোলা ব্যাগে সংগ্রহ করা সেই বিচিত্র তালপাতা দুটি আজও আমার সংগ্রহে আছে—যা এনেছিলাম সেদিন কুচল ঘোড়ুই-এর পাকা থেকে। রাত্রে শুতে দাবায় আগে দেখালাম তপনকে। ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আপনি কি জানেন ওতে কি লেখা আছে?'

আমি বললাম ঃ 'তুমি জানো?'

বলতে বলতে তালপাতাগুলি পরীক্ষা করে দেখি রাতের আলোকে। মনে হল কোন সূক্ষ্ম শলাকা দিয়ে কি সব লেখা আছে তার উপর। না, কোন ভাষা নয়—সংখ্যা জাতীয়। সাহিত্য কর্ম নয়, তাছাড়া কুচল ঘোড়াই তো পণ্ডিত ব্যক্তি নন। তাহলে এসব কি লেখা আছে—কোন লিপিতে?

'কুচল ঘোড়ুই-এর কাঠের হিসাব।' বলল তপন। তখন ওর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে—'এই সাংকেতিক লিপিত্ব অর্থ আজও কেউ বের করতে পারেনি। দেখুন কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কারোর সাহায্য নিয়ে—।' ▢

সারা বছরের হাড়-ভাঙ্গা শ্রম,
প্রতিদিনের চিন্তা-সমস্যা।
নিত্যকার এই কর্মপাঁচালীর সঙ্গে সব
মনেরই খুব গোপনে গোপনে বাধে বিরোধ।
তখন সেখানে হাজির হয় 'বিনোদ'—
যাকে একটু সম্প্রসারিত করলেই হয় বিনোদন।
বিনোদন কি কর্মনাশা, বিনোদন কি জীবনবিমুখ, বিনোদন
কি অপ্রয়োজনীয়, বিনোদন কি অপচয় ?
এ সব প্রশ্নের একটাই উত্তর হল—'না'।
তাই বিনোদন দেখা দেয় নানা রূপে, নানা চরিত্রে।
শহরে-শহরতলিতে-গ্রামে-গঞ্জে,
সর্বত্রই তার আগমন - যার-যেমন তার-তেমন রূপে।
প্রতিটি বিনোদন মাধ্যমের তাই নিজস্ব চরিত্র কাঠামো রং।
প্রতিটিই বৈশিষ্ট্যে পৃথক, উপস্থাপনে স্বতন্ত্র।

লোকবিনোদন-৪

উৎস সেই একই—গ্রামীণ মানুষের মন,
অথচ তাদের চরিত্র কত পৃথক আর সাবলীল।
সেই চণ্ডীমণ্ডপে, পূজা প্রাঙ্গণ, হাটে গঞ্জে মেলায়—
এমনকি পুকুরের ঘাটেও তাকে দেখা যায় প্রায় যেন
বহুরূপীর মত নিত্য নব প্রকরণে আচরণে।
এ বিষয়ে শহুরে মনের সঙ্গে গ্রামীণ মনের
পার্থক্য থাকলেও বিরোধ নেই।
লোকজীবনের বিশাল কর্মপঞ্জীতে তাই
ছড়া-ধাঁধা—গল্পবলা—পালাগান যেমন এক
ধরনের বিনোদন তেমন সূচীশিল্প-অন্ন-ব্যঞ্জন-মেয়ে মজলিস—
সে-ও একপ্রকার বিনোদনই।
আর লোকউৎসব—সে তো হাজার বিনোদনের ফুলকে
যেন একই সূতোয় বাঁধা হয়েছে। সেখানে
নাগরদোলা—পাপর ভাজা—পুতুল নাচ যে একাসনে বসে।

পুতুল নাচের আসরে

সুজনের পরামর্শ মতো ঠিক এগারোটায় এসে হাজির হলাম।

কাল সন্ধ্যাবেলায় 'জয় মা তারা পুতুল নাচ' কোম্পানীর তাঁবুতে বসে 'সতী বেহুলা' পালা দেখে গেছি। তার আগের দিন দেখেছিলাম 'নটী বিনোদিনী।' দুটোই খুব ভালো লেগেছিল।

মাত্র এক টাকার টিকিট কেটে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে, মাটিতে বিছানো চটের আসনে পায়ের দুপাটি চটি পেতে তার উপর আরামে বসে, গত দু দিন বেশ নিবিষ্ট হয়ে বগুলার 'জয় মা তারা পুতুল নাচ' পার্টির দুটি পালা দেখে মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়েছিল। পুতুল নাটক দেখতে দেখতে মনেই হয়নি, এটা কল্যাণীর ঘোষপাড়াতে মেলা, এটা একটা তাঁবুর মধ্যে, আমার আশে পাশে কোন শহুরে দর্শক নেই।

আসলে এত নিবিষ্ট হয়ে পুতুল নাচের নানা কারিগরি ব্যাপার লক্ষ্য করছিলাম যে, ঐ সব 'বাজে' ব্যাপার অন্তরে ঠাঁই পায়নি। তবে আমার সঙ্গে মেলায় আসা সঙ্গী দুজনকে যে ইচ্ছা করেই মেলার ভীড়ে হারিয়ে দিয়ে এই পুতুল নাচের তাঁবুতে ঢুকে পড়েছিলাম—এ কথা ভেবে আর একটু দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু তারা যে সার্কাস দেখতে বেশী আগ্রহী—জীবন্ত মানুষের সার্কাস। আর আমি দেখতে চাই পুতুল নাচের সার্কাস।

উৎসুক হয়ে মনসার দাপট, কালনাগিনীর আগমন, চাঁদসদাগরের প্রতাপ – স লক্ষ্য করছিলাম। খুব সহজ সরল উপস্থাপন ভঙ্গি। আসলে ওটা যে মানুষেই নাচাচ্ছে উপর থেকে, তা বোঝবার নেই। এতই নিপুণ তাদের নাচানোর কায়দা।

"নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজীকরে। তেমনি নাচাও তুমি অর্বাচীন নরে।" কবির এ কথাটা ওখন যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।

সবচেয়ে অবাক হয়ে গেলাম, মৃত পতিকে কোলে যখন বেহুলা হাপুস নয়নে কেঁদে কেঁদে কলার ভেলায় করে নদীতে ভেসে যাচ্ছে—সে দৃশ্য দেখে। লখিন্দর আর বেহুলা যে পুতুল, তা যেন মনেই হচ্ছিল না। কান্নার দমকে আর করুণ রসের তালে তালে যে ভাবে শোকাচ্ছন্ন বেহুলা মাথা দোলাচ্ছিল, তা সত্যই সকল দর্শকের মধ্যে একপ্রকার শোক উৎপন্ন করল।

আমাকে আকর্ষণ করল পুতুলের নাচেন ভঙ্গীগুলো। যেভাবে চাঁদসদাগর মনসার গোপন শিবপূজার ঘট ভেঙ্গে দিল, যেভাবে চাঁদসদাগর মনসার বিরুদ্ধে এক প্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করল, যেভাবে চাঁদসদাগর ধীরে ধীরে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল—এসব কঠিন ঘটনা সুতোর টানে টানে পুতুলগুলো এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলল যে, সমস্ত দর্শক মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

আর তারপর মাঝে মাঝে যখন দুই সখীর নাচ সুরু হয়ে গেল—অনেকটা

রিলিফের ভঙ্গীতে, তখন সমস্ত তাঁবু জুড়ে কী উল্লাস! পুতুলের নাচের রঙ্গ ভঙ্গী দেখে, বাজনোর উত্তাল কনসার্ট শুনে আর পুতুলদের সরস সংলাপ শুনে মুহূর্তের মধ্যে আসরে যেন আনন্দের ফোয়ারা বয়ে গেল।

কারা এরা? কি ভাবে পুতুল নাচায়?

দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম।

মন চলে গেল ষ্টেজের পেছনে পুতুল নাচের অন্দর মহলে—দেখতে হবে কি করে অদ্ভুত কুশলী হাতের ছোঁয়ায় পুতুলগুলি এভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রোগ্রাম শেষ হলে তাঁবুর বাইরে এলাম না। আমার সামনে ধীরে ধীরে তাঁবু খালি হয়ে গেল—তা দেখলাম। এটাই তো চাইছিলাম।

এবারে এরা পরবর্তী শো এর জন্য তৈরী হবে। পুতুলগুলি গুছিয়ে নেবে। পর পর সব সাজিয়ে রাখবে। হয়তো একটু চা-বিড়ি খেয়ে নেবে। আর বাইরের মাইকে তখন অবিরত চীৎকার হবে—এই পুতুল নাচের প্রচারের জন্য। এই সময়টাই কাজে লাগাতে হবে।

ভরা সন্ধ্যায় হ্যাজাক বাতির আলোয় আমাকে প্রথম দেখেছিল সুজন তাঁবুর মধ্যে। আর দ্বিতীয়বার দেখল এই প্রখর রৌদ্রে ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার দুইদিন পরের এক সকাল এগারোটায়।

বিরক্ত হল না। বরঞ্চ আমি শহরের লোক হলেও, তাদের দলের কথা, বিশেষতঃ পুতুল নাচের সব জটিল বিষয়ের কথা, তাদের কাছে জানতে চেয়েছি বলে বেশ আনন্দিতই হল। একেবারে সটান তাঁবুর পিছনে তাদের আস্তানার দিকে টেনে আনল।

তখন বেশ স্পষ্ট এই পুতুল-নাচ পরিবারের সংসারটা নজরে এল।

কাল রাত্রে তাঁবুর মধ্যে দর্শকাসনে বসে যেটাকে ষ্টেজ বলে মনে হয়েছিল, এখন দেখলাম সেটা একটা বিরাট বাক্স—যার মধ্যে পুতুলরা সব সাজানো গোছানো থাকে। তার সামনে পর্দা ফেলে এবং পিছনে দৃশ্য বিষয়ক চিত্রময় পর্দা দিয়ে প্রকৃত স্টেজ তৈরী করা হয়। আর ঐ দৃশ্যের পর্দার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে পুতুল চালক—তার হাতে থাকে পুতুলের সুতো। সামনে থেকে এসব চোখে পড়ে না!

আমি মুগ্ধ হয়ে এসব দেখছিলাম। কত সরল নাট্য উপস্থাপন আর তার সরঞ্জাম। বলবার মত কোন গ্ল্যামার নেই, আবার এগুলিকে নিতান্ত উপেক্ষা করাও যায় না।

'তাহলে, দেখবেন না কিভাবে পুতুল নাচানো হয়?'

সুজন নয়, সুজনের বাবা এবারে প্রশ্ন করেন। বয়স হয়েছে, তবু প্রাণে ভরপুর। তার কথার সঙ্গে সঙ্গে দলের আর কয়েকজন দাঁড়িয়ে যায় আমার আশে পাশে। বুঝলাম এদেরই কেউ কথা বলে, কেউ হারমনি বাজায়, আবার কেউ তবলা ঠোকে বা বাঁশিতে ফুঁ দেয়। এখন তাদের পোষাক-আষাক নিতান্ত লুঙ্গী পাজামা হলেও সন্ধ্যাবেলায় এরাই হয়ে ওঠে শার্ট প্যান্ট পরা কলেজ বয়—কেননা বয়স এদের প্রায়

'পুতুল নাচ' অথবা 'পুতুল নাট্য বা নাটক'—কোনটি সঠিক শব্দ তা নিয়ে লোকসংস্কৃতিবিদদের মধ্যেই আছে দ্বন্দ্ব। আদতে, যিনি এই পুতুল তৈরী করেন তিনি হলেন লোকশিল্পী এবং সেক্ষেত্রে পুতুল হল লোকশিল্প। এই লোকশিল্পী বা শিল্প বেশ প্রাচীন হলেও এ বঙ্গের কয়েকটি মাত্র স্থানে তা সীমাবদ্ধ।

অথচ এই পুতুলকে নাচিয়ে অভিনয় করনো হচ্ছে. কেননা সে নিজে নাচতে পারে না—সুতরাং এটি স্থূল অর্থে পুতুল নাচ। কিন্তু এই নৃত্যভঙ্গীর মাধ্যমে সংলাপের সহযোগে বর্ণিত হচ্ছে একটি কাহিনী বা নাট্যকাহিনী। তাই তাকে লোকনাট্যের আধারে রেখে কেউ হয়তো বলবেন লোকনাট্য বা সেই ধারার পুতুল নাট্য। অথচ প্রকৃত লোকনাট্যের সঙ্গে এর তফাৎ অনেক। যদিও ইদানীং কোন কোন লোক-সংস্কৃতিবিদ তাকে এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই তুলে ধরেছেন।

পুতুল নাচের হরেক ভাগ-বিভাগ। বড় বিচিত্র তার নির্মাণ কৌশল। এ কাজ দুভাবে পরিশ্রম সাধ্য—একদিকে পুতুল নির্মাণের কাজ অপরদিকে তাদের যথাযথ ভাবে দক্ষ কৌশলে নাচিয়ে নাট্যকাহিনীর বিস্তারের দ্বারা দর্শকের মনোরঞ্জন করা ও নিজের জীবিকা অর্জন করা—কেননা শুধু বিনোদনই তো আর একটি পরিপূর্ণ জীবন হতে পারে না।

যিনি পুতুল তৈরী করেন—তিনি শুধু সে কাজই করেন। তবে পুতুল নাচের সমস্ত ঘটনা বা গাল্পিক বিষয় তাঁর জানা থাকে। এমন কি তাকে নাচাবার কৌশলও তিনি জানেন—কিন্তু তিনি সর্বসমক্ষে তা করেন না। অপর পক্ষে যিনি পুতুল নাচান, তিনি কিন্তু পুতুল নির্মাণ শিল্পী নন, অথচ নির্মাণের সমগ্র ক্রিয়া-কৌশলই তার জানা। তবু তিনি শুধু পুতুল নাচিয়েই ক্ষান্ত। তবে উভয় ভূমিকাতেই যে তিনি দক্ষ – তাও প্রকাশ করা প্রয়োজন।

তবে বিচিত্র বিষয় হল, পুতুল নির্মাণ শিল্পী বা পুতুল নাচিয়ে শিল্পী,—কেউই দর্শকের সামনে থাকেন না বা আসেন না। তাঁরা আড়াল থেকে সব কাজ করে যান, আর পুতুলরা তাদের ইচ্ছাতেই নেচে গেয়ে গল্প তৈরী করে ও দর্শকদের মোহিত করে। আর পাঁচটা লোকশিল্প বা লোকনাট্যের সঙ্গে এখানেই হল পুতুল নাচের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য। তাই এটি বিশুদ্ধ লোকশিল্প বা লোক-নাট্য—এ নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকবেই।

'নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে। তেমনি নাচাও তুমি অর্বাচীন নরে॥' কবির এই উক্তি আজ বহুশ্রুত। অথচ শহুরে মন যখন উপন্যাস রচনা করে, তখনও তার নামকরণ হয় 'পুতুল নাচের ইতিকথা।' নিতান্ত গ্রাম্য বিনোদন প্রথা হলেও, গ্রামীন মানুষের জন্য হলেও বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত মনও তার মধ্যে খুঁজে পান এক রূপক। আর তখনই এই পুতুল নাচ নির্বিশেষ থেকে হয়ে যায় বিশেষ। মানব জীবনের অপর নাম তাই স্বচ্ছন্দে হয়ে ওঠে 'পুতুল খেলা'—যা এদেশে-ওদেশে সর্বত্রই সমান প্রযোজ্য।

সবারই তেইশ-চব্বিশের মধ্যে।

জিনস-গেঞ্জির চলন এদের মধ্যেও এসেছে। এদের দলের একমাত্র নারী সদস্য তো রীতিমত চুড়িদার কামিজে সজ্জিত হয়ে ওঠে সন্ধ্যা বেলা।

আমার মনের কৌতূহল মেটাবার জন্য এরা বেশ তৎপর দেখে খুবই আনন্দ হল। পুতুল নাচানোর যে কুশলতা তা আমি কোন দিনই রপ্ত করতে পারব না—এ প্রায় গুরুমুখী বিদ্যার সামিল। তবু সেটা যে সামনে থেকে স্পষ্ট দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে—এরা তাতেই আমি কৃতকৃত্য।

সেই বড় বাক্সটা, যেটা সন্ধ্যাবেলায় উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে মঞ্চে রূপান্তরিত হয়ে যায়—সেটা এবারে খুলল ওরা। আর মুহূর্তের মধ্যে চাঁদসদাগর, সতী বেহুলা, মনসা, কালনাগিনী, লখিন্দর, সনকা, শিবঠাকুর ইত্যাদি সবাই বেরিয়ে পড়ল বাক্সের মধ্য থেকে। কী তাদের রূপ, কী তাদের জেল্লা!

কুমোরটুলির প্রতিমা বা কৃষ্ণনগরের পুতুল—তাদের কাছে কোথায় লাগে। এদের পুতুল যেন জীবন্ত। এবং সেটা আরো জীবন্ত হয়ে উঠেছে নাচাবার সময়ে। এখনই সে রহস্য উন্মোচিত হবে আমার সামনে।

ভাল করে তাকিয়ে দেখি এবারে পুতুলগুলির দিকে—এখন তো আর তাঁবুর আসর নয়। আর পাঁচজনের ভীড় নেই। নেই তত কাজের চাপ। এখন আমি শুধু এক সমীক্ষক মাত্র।

পুতুলগুলির কোমর পর্যন্ত নির্মিত, তার নীচে কিছু নেই। পরনের পোশাক দিয়ে নিম্নাঙ্গ ঢেকে দেওয়া হয়েছে। উর্ধাঙ্গে সবই যথারীতি আছে। হাত দুটির মাঝে ভাঁজ আছে। তবে সবই ফুলহাতা জামায় ঢাকা বলে, তাদের গঠনের এই রহস্য নাচের সময়ে দেখা যায় না। মাথার চুল অন্যান্য অলংকরণ, পোষাকের বর্ণ-বৈচিত্র্য—ইত্যাদি সবই নিখুঁত এবং বলাই বাহুল্য যে বিষয়বস্তুর অনুযায়ী।

এই পুতুলগুলিকে এরা দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে নাচায় কী করে? হাতে তুলে নিয়ে দেখলাম—সেগুলি তো নিতান্তই হাল্কা। তাই সহজেই দুহাতে দুটো পুতুল নিয়ে নাচাতে পারে বিনা পারশ্রমে।

'যা ভাবতেছেন তা নয়'—বললে সুজনদের মধ্যে কেউ: 'এগুলি সোলার নয়, খানিকটা অংশ অবশ্য তা দিয়ে তৈরী। এক রকম হাল্কা কাঠ এ জন্য ব্যবহার করি আমরা।'

কোথায় তৈরী হয় এসব পুতুল—স্বভাবতই এসব প্রশ্ন তখন মাথায় এসে যায়। তাই ওরা বলল: 'আসুন না আমাদের গ্রামে—সেখানেই তো এটা তৈরীর কৌশল দেখতে পাওয়া যায়!

'মানে বগুলায়? কোনখানে?

'রানাঘাট থেকে লাইনে ট্রেনে চেপে বগুলায় নেমে পড়ুন একদিন। তবে মনে রাখবেন, এ লাইনে ট্রেন চলাচলের টাইমের খুব গোলমাল।' বললে সুজনের বাবা:

'তবে স্টেশনে নেমে পুতুল নাচের পাড়া বললে, যে কেউ দেখিয়ে দেবে আমাদের পাড়া। অনেক ঘর আছি আমরা ওখানে।'

'আচ্ছা, আপনাদের কোন সংগঠন নেই—এই পুতুল নাচের ব্যাপারে?'

'সংগঠন? এসব বুঝি না।' বললে আরেকজন: 'তবে বগুলা স্কুলের হেড-মাস্টার সুধাংশু বাবু আমাদের খুব ভালবাসেন। তিনি আমাদের কথা ভাবেন। সরকারী স্তরে অনেক যোগাযোগ করিয়ে দেন। নানা রকম ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেন। একবার তো তারই সঙ্গে আমরা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গেছিলাম।

শুনে আমি থ' হয়ে যাই। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এরা কি করতে গেছিল? কোন কালচারাল প্রোগ্রামে নাকি? তাহলে তো সেই সব শহুরে ছেলেরা কলকাতা থেকে সুরেশ দত্ত-র পাপেট শো নিয়ে আসবে!

এ তথ্যটা আমার জানা ছিল না একেবারে। তাই তথ্য সংগ্রহ করতে এসে এ বিষয়ে কিছু জেনে নিতেই হয়—'তা ওরা এই পুতুল নাচ কিভাবে নিল? মানে, তাদের এ সব মনে ধরল তো?'

'তাদের খুব উৎসাহ দেখলাম সেদিন। প্রথমে মাস্টাররা কিছু বক্তৃতা দিল। তারপর ক্লাশঘরে হালদার মশাই আমাদের পালাগান সুরু করতে বললেন। আমরা সেদিন দেখালাম দুটি পালা—লালন ফকির আর সাক্ষরতা।' বলে যাচ্ছেন সেই উৎসাহী ছেলেটি।

'সাক্ষরতা?' যেন হোঁচট খাই আমি এই প্রশ্নে। কোথায় রামায়ণ, পুরাণ, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল—আবার তার সঙ্গে সাক্ষরতা অভিযান! এখন তাদের প্রবণতা কোনদিকে তা যেন এবারে বুঝতে পারছি। তাই আন্দাজে প্রশ্ন করি: 'তাহলে পরিবার পরিকল্পনা, গাছ লাগাও, বধূ হত্যা—এ সবও পুতুল নাচে দেখাচ্ছেন নাকি আজকাল?'

'দেখুন সরকারি সাহায্য পাওয়ার জন্যে এ সব তো করতে হয় আমাদের।'

'তা এ ধরণের পুতুল নাচের ইনকাম কেমন?'

'এ গুলি তো একক ভাবে দেখাই না। টিভিতে বা স্কুল কলেজের অনুষ্ঠানে বা সরকারি অনুষ্ঠানে। মেলার তাঁবুতে এসব চলবে না

আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি ক্রমেই ভর্তি হয়ে উঠছিল। দলের লোকগুলিকে অনেকক্ষণ আমি আটকে রেখেছি—তবে ওরা কেউ তাতে আপত্তি করছে না বা কোন অস্বস্তি প্রকাশ করছে না। আসলে এ ভাবে কোন দিন কোন লোক দিনের বেলায় তাঁবুর পিছনে এসে ওদের সঙ্গে গল্প করে না—এটা ভেবেই ওরা আমাকে তাদের আপনজন ভেবে বেশ আনন্দ পাচ্ছে।

ইতিমধ্যে দলের কয়েকজন রান্না-বান্নায় মন দিয়েছে। দশ-বারো জনের ছোট সংসার—মেলার সংসার। সঙ্গে যাবতীর বাসন-কোসন সরঞ্জাম আছে। এই ঘোষ পাড়ার মেলায় তো কাঁচা সবজী চাল-ডাল থেকে সুরু করে মাছ মাংস, কাঠ কেরাসিন, হাঁড়ি কলসী সবই পাওয়া যায়। সেগুলি বিক্রি হয় এই সব মেলার দোকানীদের

জন্য। কাজে কাজেই মেলায় মেলায় ঘুরতে হয় বলে একটি চলমান রান্নাঘর—না, ভুল হল, একটি চলমান পরিবার নিয়ে ওদের বছরের আট-ন মাস ভ্রাম্যমান জীবনযাত্রা পালন করতে হয়।

'এ এক বিচিত্র জীবন যাত্রা।' বলেছিল ওদের দলের আর এক বর্ষীয়ান সদস্য—মনে হল সে বোধহয় ম্যানেজার গোছের কেউ হবে। তবে কারোরই বয়স ৪০-৪৫-এর বেশী নয়।

'সারা বছর তো আপনারা মেলাতেই ঘুরে বেড়ান—তাহলে আপনাদের গ্রামে গিয়ে পুতুল তৈরীর কারখানা দেখব কখন ?' স্বভাবতই এ প্রশ্নটা এসে গেল মাথায়।

'না, শুধু বর্ষার কয়েকটা মাস আমাদের গ্রামে পাবেন। তখন আমরা ঘর-সংসারের কাজ দেখি। নতুন পালা তৈরী করি, নতুন পুতুল কেনা-কাটা করি। কখনও বা এ দল ভেঙ্গে ও দল তৈরী হয়। তাছাড়া বর্ষার সময় কোথায়ও মেলা হতে পারে না। তাই আমাদেয় সঙ্গে দেখা করার ঐটাই সময়।'

কথায় কথায় জানা গেল, ওদের একটা নিজস্ব মেলা ক্যালেন্ডার আছে। এখন কল্যাণীর সংলগ্ন ঘোষপাড়ার সতীমার মেলা করে চলে যাবে ঠাকুরনগর—তারপর বারাসাতের দিকে কোথায়। সবাই দল বেঁধেই যায়। কখনও বা দুই-তিনটি দল মিলে একত্রে রাঁধা-বাড়ার কাজও করে। অর্থাৎ মেলার জন্য অস্থায়ী পরিবার গঠন করে নিতেও হয়।

এই সব গল্প করতে করতে দেখলাম এরা পুতুলগুলি সাজিয়ে নিয়েছে। সেই বেহুলার পালাই দেখাবে আমাকে—দু' একটি নির্বাচিত দৃশ্য। কেন না সেই রকমই কথা ওদের সঙ্গে। তাছাড়া ওদের নিজস্ব কাজকর্ম, সন্ধ্যাবেলার প্রস্তুতি—সে সবও তো আছে। আজ নাকি দলের এক প্রধান শিল্পী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তার কাজটাও এদেরই করতে হবে। অর্থাৎ একজন দুটি পুতুল নাচাবে।

সুজন এখন চাঁদসদাগর আর বিপুল হয়েছে সনকা। দৃশ্যটা হল, সনকার ঘরে মনসার ঘট ভাঙ্গা।

এক নিপুণ দক্ষতায় চাঁদের তর্জন-গর্জন, সনকার হাহাকার এবং মনসার ঘট ভাঙ্গা পর্বটা আমার চোখের সামনে অভিনীত হতে দেখলাম। মুহূর্তের মধ্যে আমি যেন মোহাবিষ্ট হয়ে নিজেকে কোন রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহের দর্শক বলে মনে করলাম। এই কঠিন দৃশ্যটা শুধুমাত্র সুতোর টানে দুটি মানুষ কী রকম জীবন্ত করে তুলল।

পুতুলগুলি তখন তাদের হাতে জীবিত মানুষ হয়ে উঠেছে। যে ভাবে জীবন্ত মানুষ হাত-পা নাড়ায়, মাথা ঘোরায় বা প্রশ্ন করে, প্রায় অবিকল সে রকম ভঙ্গিমাই ফুটে উঠেছে তখন ঐ পুতুলগুলির মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় গান ও কথার সাপ্লাই দিচ্ছে ওদের মাষ্টার—নামটা তার জানা হয় নি। আসলে ঐ অতি সাধারণ লোকটিকে দেখে আমার একবারও মনে হয়নি যে, সে অত গুণের অধিকারী। একই কণ্ঠ থেকে চাঁদ, সনকা, মনসা—

প্রভৃতির সবার কণ্ঠ বের করছে—স্বরের উত্থান-পতনে প্রতিটি চরিত্রের অন্তরের ভাবকে প্রকাশ করে দিচ্ছে।

এমন কি গাঙুরের জলে কলার মান্দাসে ভেসে লখীন্দর যখন ভেসে যাচ্ছে, বেহুলার কোলে মাথা রেখে, তখন বেহুলার সাজ ও বিন্যাসে করুণ রসের গান সত্যই মনকে স্পর্শ করল। স্বর্গলোক থেকে যেন দেবতারা সেই করুণ গান শুনতে পাচ্ছে—এমনই মনে হল। মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলার এই জলযাত্রার দৃশ্য খুব স্বল্প-কালীন হলেও নিপুণ হাতের সুতো টানায় সেই জলযাত্রার গতি, বেহুলার শোক-বিহ্বল মূর্তি যেন সঠিক ভাবেই মূর্ত হল।

সবশেষে ওরা নাচিয়ে দেখালো বেহুলার স্বর্গসভায় নাচের দৃশ্যটা। এবারে দেখলাম, যে লোকটি এই দৃশ্যটি পরিচালনা করছে, সে নাচের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তার পায়েও নৃত্যের ভঙ্গী করছে—এবং সেই ভঙ্গীতে নিজের হাতকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। মনে হল বেহুলার মনের আনন্দ লোকটি নিজের অন্তরে গ্রহণ করতে পেরেছে বলেই যেন তার হাতে বেহুলার নাচ অত সুন্দর হয়ে উঠল। পূর্বের দুটি দৃশ্যের অভিনয় বা পুতুল নাচানোর থেকে এ দৃশ্যের অভিনয় ভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। এতসব দেখার পরেও আমার আরো চমকিত হবার মত বিষয় ছিল —সবই হল এদের আগ্রহে।

তাঁবুতে পুতুল নাচের মাঝে মাঝে রিলিফসূচক যে সখীর নাচ হয়—সঙ্গে থাকে একজন ভুঁড়িয়ালা টেকো বুড়ো—ওরা এবার সেই দৃশ্যটা সংক্ষেপে দেখালো।

দুই ঝলমলে সাজপরানো তরুণী সুন্দরী যুবতী যেন মুহূর্ত মধ্যে আমার সামনে এসে হাজির হল। পিছনে ওদের কনসার্ট বাজছে তখন জোর কদমে। তারই তালে কী বিচিত্র ভঙ্গীতে উদ্দাম যৌবনের হিল্লোল তুলল ঐ পুতুল দুটি—তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

শুনলাম দিলীপ, যার বয়স মাত্র এখন আঠারো বৎসর, এই সখীর নাচে সে অত্যন্ত দড়। তার পায়ে নৃত্য ভঙ্গী, তার দ্রুত আঙুল চালানোর ভঙ্গী, তার তারুণ্য ঝলমল মুখমণ্ডল সব মিলিয়ে মনে হল সত্যই কোন মঞ্চে যেন সুরসুন্দরীর স্বর্গনৃত্য দেখে এলাম। নাকি তার মনেই সুরসুন্দরীর বাস?

ধন্য পুতুল নাচ আর তার শিল্পীরা! কীই বা তাদের বয়স আর জীবন অভিজ্ঞতা—কিন্তু কি যত্নে তারা মানুষের মনে আনন্দ দিয়ে যাচ্ছে। এটা ঠিক, গুরুমুখী বিদ্যা ছাড়া এ বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় না—যতই না এ বিষয়ে ট্রেনিং কোর্স তৈরী হোক। □

সে যুগের এক বিচিত্র লোকযান হল পাল্কী বা শিবিকা।
সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হতে হতেও যেন
আজও কোনমতে টিকে আছে এই অভিনব
শিল্পমণ্ডিত লোকযানটি।
শহরের মানুষ শেষবারের মত পাল্কী দেখেছে
বোধহয় 'কলকাতা ৩০০' উৎসবের সময়ে।
তারপর পাল্কী চলে গেছে সংগ্রহশালায়।
হাজারদুয়ারীর নবাবী মিউজিয়ামে আজও শোভিত হচ্ছে—,
হাতীর দাঁতের রাজকীয় পাল্কী।
পাল্কী আজ বেঁচে আছে শুধু
হারিয়ে যাওয়া বনেদী বাড়ীর মনের স্মৃতিতে আর কিছুটা-বা
সাহিত্যের পৃষ্ঠায়।
'পাল্কী চলে গগন তলে'-র পর কী হবে এসব পাল্কীর ?

লোকপ্রথা-৩

বোধহয় একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যাবে না।
যানবাহনের ব্যবস্থা যত উন্নতই হোক না কেন,
পথঘাটের অবস্থা যত ভালই হোক না কেন,
গ্রামের জীবনে পাল্কী এখন শুধু আনুষ্ঠানিকতার প্রতীক।
একদিকে পাল্কী যেমন বিয়েবাড়ীর চিঠিকে কেন্দ্র করে
এক অভিনব উপায়ে বেঁচে আছে,
অপরদিকে সে তার পুরাতন
আভিজাত্য আর অনুভূতি নিয়ে প্রায় সমারোহের
সঙ্গে বেঁচে আছে গ্রাম্য-বিবাহ ব্যবস্থায়।
নৃতাত্ত্বিক একে লোকপ্রথা বা লোকাচার যে
ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন,
শুভবিবাহের মাঙ্গলিক রূপে গ্রামদেশে তাই পাল্কী আজও অপরিহার্য।
আর তার সঙ্গে থাকবে 'বরযাত্রী' সংস্কৃতি।

নিশিরাতের পাল্কী যাত্রা

শ্যামলাল বললেন ঃ 'চলুন যাবেন নাকি ? একটা নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হবে।'

আমি বললাম ঃ 'তাহলে চলুন।'

বেশ সরল মনেই বলেছিলাম আমি কথাটা। কেননা বর যাবে বিয়ে করতে পাল্কী করে। তার সঙ্গে বরযাত্রী হিসাবে যাওয়া গ্রামের পর গ্রাম ডিঙ্গিয়ে—এ' প্রস্তাবটা শুনেই মনে হয়েছিল এও তাহলে এক রকমের ভ্রমণ হতে পারে—অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে। তাই বলেছিলাম ঃ 'তাহলে চলুন।'

এই সব ঘটনা ঘটবার আগে আর কি কি ঘটেছিল—তাও সংক্ষেপে বলে নেওয়া প্রয়োজন। বৈশাখের খর রৌদ্রে কোন একদিন নেমেছিলাম ঘাটাল থানার আগর গ্রামে। তারপর এ-মাঠ সে-মাঠ ডিঙ্গিয়ে লোক জনকে জিগ্যেস করে ঢলগড়া গ্রামে হাজির হয়েছি ঘোষদের বাড়ী। ঘোষদের বাড়ী বললে অনেকেই চিনতে পারল—এই যা সুবিধা। আমার ভোগান্তি হল কম।

বরযাত্রী যাব বলে আমি যাইনি সে গ্রামে, গেছিলাম বৌভাতের নেমন্তন্ন খেতে। কিন্তু গিয়ে শুনলাম আমি দিন ভুল করেছি। আর তো ফেরবার পথ নেই—তাই সবার অনুরোধে পড়ে ঢেঁকি গিলতেই হল। এবং সেই ঢেঁকি গেলার অপর নামই হল নিশিরাতের পাল্কী যাত্রা।

তখন অবশ্য নিশিরাত নয়—সন্ধ্যা যামিনী বলা যেতে পারে।

কিন্তু বরযাত্রীর দলের সঙ্গে যাত্রা করা কী সোজা কথা! যেতে যখন হবেই, তখন মনে মনে তো তৈরী হয়েই আছি। পড়েছি মোগলের হাতে—

দেরী হচ্ছে কেন তবে ?

বাড়ীর অন্দরে তাকিয়ে দেখি—সে এক প্রলয়ংকর কান্ড। কী যে সেখানে হচ্ছে বা হচ্ছে না—তার কোনই হদিশ পেলাম না বাইরে থেকে। এদের মাটির দোতলা বাড়ীটার অন্দরের প্রাঙ্গণটা বেশ বড়ই। ভিতরের প্রাঙ্গণে জনা পঞ্চাশেক স্ত্রী-পুরুষ চলাফেরা করলেও উদ্বৃত্ত স্থান থাকে।

বুঝতে পারছি না কিছু, তবে ঘন ঘন উলুধ্বনি, স্ত্রীলোকের উচ্চহাসি ও পুরুষের গম্ভীর নির্দেশ শুনে মনে হল—হয়তো নানাবিধ স্ত্রী-আচার পালন হচ্ছে। আর বর বেচারী—মানে সুকুমারের দর্শন পেলাম না তখন কিছুতেই! এখন যে তাকে নিয়েই যত কান্ড হবে—তা-ও তো সে জানে।

এর পরের পর্বটা আমার আরো কৌতুকাবহ বলে মনে হল। বরবাবু মানে সুকুমারকে দেখলাম বিয়ের সাজে টোপর মাথায় অন্দর-প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আসতে ঃ তার সামনে পিছনে নানা বয়সী নানা স্ত্রীজাতি। তাদের অনেকেরই হাতে কুলায় নানা মাঙ্গলিক দ্রব্য, কয়েকজনের হাতে ঘটও ছিল। তারা উলুধ্বনিসহ বাড়ীর

পুকুর ঘাটের দিকে এগিয়ে চললো—বোধহয় শাঁখ বাজানো ও কাঁসর-ঘণ্টা বাজানোও হচ্ছিল একই সঙ্গে।

এয়ো স্ত্রীবর্গ এবং সম্মিলিত বিভিন্ন বয়সী নারীসমাজ সব সেই পুকুরের দিকে এগিয়ে চললেন। সমবেত সকলেই সেই দিকে চলল—সম্ভবতঃ এটিও একটি স্ত্রী-আচার।

পুনরায় তারা যখন ফিরে এলেন তাদের অনেকেরই সর্বাঙ্গ জলসিক্ত। ঘট খালি এবং আরো কিছু অভিনবত্ব চোখে পড়ল। আমার দুর্ভাগ্য যে এ জাতীয় লোকাচার ও প্রথা যে গ্রামাঞ্চলে এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয় এবং গ্রামের অধিকাংশ নারী সমাজই যে এতে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে অংশীদার হয়—ওটা দেখে বাঙালী বিবাহ সম্বন্ধে কোন একটা তাত্ত্বিক চিন্তা মাথায় আসছিল। এমন সময় শ্যামলাল বললেন—'কী দেখছেন কী?'

অর্থাৎ তিনিও এই বিশাল কর্মযজ্ঞের আশেপাশে কোথাও ছিলেন—কখনো দেখলাম একটা চন্দনের তিলক, হাতে একটা ফুল। আমায় মাষ্টার মশাইয়ের মত বললেন ঃ 'অন্দরের স্ত্রী-আচারটা ভালো করে দেখে নিয়েছেন তো? এ সব কী জানা আছে আপনার? তাহলে পরে বরযাত্রী এগুলে পথে যেতে যেতে বলব।'

এই মুহূর্তে শ্যায়লালবাবুকে বেশ উৎফুল্ল দেখছিলাম। বয়স যেন তার বেশ কমে গেছে। এই বয়সেও যে বিবাহকেন্দ্রিক নানা লোকাচার তাকে এত আনন্দ দেয়—দেখে ভাল লাগল।

যাত্রা সুরু হবার পরই শ্যামলাল সুরু করলেন তার রানিং কমেন্ট্রি—এই গ্রাম সম্বন্ধে। আমার কিন্তু সবই আশ্চর্য লাগছিল। যে পথ দিয়ে আজই ভরা দুপুরে গ্রামে ঢুকেছি, সেই পথ দিয়েই আবার বেরিয়ে যাচ্ছি। পথে পড়ল বেউড় গ্রাম, নারায়ণচক—কিন্তু অন্ধকারে কিছুই চিনতে পারছি না।

চিনব কি করে, এসেছি ত মাত্র একবারই। আর এখন ঘুটঘুটি অন্ধকার। সামনে বরের পাল্কী এগিয়ে চলেছে। তার সঙ্গে অছে একটি হ্যাজাক। সেই পাল্কীর সঙ্গে আছে কর্তা স্থানীয় জনাকয় ব্যক্তি। আর মিছিলের শেষের দিকে চলেছে পুরনারীবৃন্দ—তাদের সঙ্গেও আছে একটি হ্যাজাক বাতি।

ব্যাস্। মধ্যপথে এতগুলি নামা ধরনের পুরুষ চলেছে বরযাত্রী হয়ে—তাদের জন্যে কোন আলো নেই। কর্তৃপক্ষ বোধহয় ধরেই নিয়েছেন যে আলোটা মধ্যবর্তী দলটির পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়। তাই অন্ধকারে বিড়ির আগুন দেখে পথ চলা ছাড়া কোন পথ ছিল না। ভাগ্যিস এ গ্রামের পুরুষরা সবাই বিড়ি খায় এবং সকলেই বেশ মোটা বাণ্ডিল নিয়ে বেরিয়েছে। অবশ্য এটাও জানি যে, এই পাল্কী যাত্রার মিছিলের অন্ধকারের মধ্যে অনেক উঠতি ছোকরার বিড়ি টানার মশকো হয়ে যাচ্ছে—অন্য সময় হলে কি ভাবতাম জানি না, কিন্তু এখন মনে হল ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তবেই না বিড়ির ছোট লাল আগুনটা দেখতে পাচ্ছি আর পথ চিনতে পারছি।

বিবাহের লোকাচার রূপে যে সকল প্রকরণ আজও বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে এ সমাজে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে, বরযাত্রীপ্রথা তাদের মধ্যে অন্যতম। বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজের বিবাহে তো বটেই। বস্তুতঃ বৃহত্তর সমাজের লোকাচারগুলি যে ভাবে ক্ষুদ্র বা সংখ্যালঘু সমাজকে প্রভাবিত করে—বরযাত্রী বিষয়ক প্রথা বা লোকাচার তারই একটি।

এ দেশের অন্যান্য সংখ্যালঘু সমাজে এই প্রথা আদিতে ছিল না। একটি বিনোদন প্রকরণ রূপেই আজ এটি সকল সমাজেই গৃহীত হয়েছে। এর সুফল-কুফল সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা তথা সংবাদপত্রে আলোড়ন হওয়া সত্ত্বেও একপ্রকার জনপ্রিয়তার জন্য তা আজও চলে আসছে।

তাছাড়া নিজের বিবাহ মুহূর্তটিকে নানাবিধ প্রকরণের মাধ্যমে স্মরণীয় তথা আনন্দময় করে তুলতে কে না চায়! তাই বরপক্ষ বা কনেপক্ষ যত রকম ভাবে সম্ভব নানা প্রকার লোকবিনোদনের অনুশীলনে দ্বারা বিবাহ অনুষ্ঠানকে মধুর থেকে মধুরতর করে তুলতে চান। এ দেশের প্রধান লোককাব্য তথা মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিবাহের আরো নানা রীতি-প্রথা লোকাচার বর্ণিত হয়েছে—তবে বরযাত্রী প্রথার সেখানে উল্লেখ নেই। মনে হয় সেই সময়ে এই বাহুল্যের কোন ব্যবহার ছিল না। বরযাত্রী প্রথার মূল বিষয় হল পাত্র-পাত্রীর গৃহের দূরত্ব। দূরত্ব যত কম হবে এই আনন্দও তত কম এবং উভয় গৃহের দূরত্ব যত বেশী হবে—সমগ্র বিবাহ অনুষ্ঠানই হবে বিয়ে করতে যাওয়ার মত বিশাল আনন্দময় ঘটনা।

বাংলা ছড়ায় উল্লিখিত 'খোকা যাবে বিয়ে করতে সঙ্গে শত ঢোল' ছত্রটি এখানে মনে পড়ে। কিংবা অপর একটি ছড়ায় 'খোকা যাবে বিয়ে করতে হট্টমালার দেশে'—ছত্রটি থেকে সেই বিবাহস্থানটি যে অনেক দূরে—তার একটি কাল্পনিক ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। সে বিবাহযাত্রার রূপটি যে আরো জমকালো এবং বরযাত্রীময় হবে—তা বলাইবাহুল্য। অথবা লোককথায় বর্ণিত ছোটপুত্র যখন বলে: 'মা তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি।' তখন সে কোন দূর দেশ থেকে মায়ের জন্য দাসী তথা নিজের জন্য বৌ নিয়ে আসে! তার সঠিক বর্ণনা থাকলেও ইঙ্গিতেই দূরত্বটি বোঝা যায়। অবশ্য সে সব ক্ষেত্রে ঐ ছোটপুত্র বরযাত্রী সাজিয়ে যেতে পারে না।

তাই বিবাহ অপেক্ষা তাকে কেন্দ্র করে যে নানা আনন্দময় অনুষ্ঠান ও বিন্যাস সবই যে একদা খুবই জনপ্রিয় ছিল, পাল্কী চড়ে বিয়ে করতে যাওয়ার প্রসঙ্গে সে কথা সবারই স্মরণে আসবে।

তবে 'উলু উলু মাদারের ফুল' ছড়ায় 'বর এসেছে বাঘনা পাড়া, ছোট বৌ লো, —ঘাবা চড়া' মন্তব্যে সহজেই বোঝা যায়, বরের সঙ্গে কি বরযাত্রী ছিল না?

এখনও কত পথ জানি না—তবু এক ধরণের অভিনবত্ব আছে এই পাল্কী যাত্রার। মাঝে মাঝে একা হয়ে পড়ি হাঁটতে হাঁটতে, আর তখনই মনে আসে নানা কথা। পথ চলার সঙ্গী তখন শুধু নিজের মনই।

আসলে পাল্কী সম্বন্ধে আমার ধারণা নিতান্তই তাত্ত্বিক। সিনেমায় দেখেছি, ছবিতে দেখেছি হাতে আঁকা পাল্কী। তাতে চড়বার সুযোগ তো হয়ইনি কোনদিন—এমন কী তার সঙ্গে যাত্রা করার সৌভাগ্যও হয়নি আমার কোনদিন। তাই পাল্কী আমার কাছে এক না-হওয়া অভিজ্ঞতার ইচ্ছা।

কোথায় কতদূরে এখন পাল্কী যাত্রীরা কে জানে। তবু মনে প্রশ্ন জাগে কারা এই সব পাল্কী তৈরী করে, এদের মাপ-জোক কি রকম, তারা পাল্কী ছাড়া আর কী কী তৈরী করে, সারা বছর এদের অন্যান্য উৎপাদন কী—এইসব চিন্তা।

শুধু তাই নয়, এই যে ছয় বেহারা আট বেহারা পাল্কী যায়—এদের সারা বছরের কাজ কী? এরা কোন সমাজের লোক, বছরের শুধু বিয়ের মরশুমে এরা কত পাল্কী বহন করে, বেহারারা পরস্পরের মধ্যে কিভাবে মিল-মিশ করে চলে—কেননা সকলের উদ্যোগ ও পরিশ্রম একই রকমের না হলে তো পাল্কীই বহন করা যাবে না।

মনে মনে ইচ্ছা হয় পাল্কী বাহকদের একটা ইণ্টারভিউ নেব কি? দেখি, যদি সে রকম কোনদিন সুযোগ আসে। আর পাল্কী যারা বানায়, যারা তার গায়ে নানা রূপ চিত্র-বিচিত্র করে—তাদের সঙ্গে সে একবার দেখা করতে চাই—তাও তো শ্যামলালকে জানিয়েছি একবার। হয়তো আগামীকাল কোন এক সময়ে সে সুযোগ হয়ে যাবে আমার।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে আছে একটা অধ্যায় 'শিবিকারোহণে'—অর্থাৎ সেকালে পাল্কীকে বলা হত শিবিকা। মতিবিবি সেই শিবিকায় আরোহিণী ছিল। এ প্রসঙ্গে একটা কৌতুক-বাক্য মনে পড়ল: 'কপালকুণ্ডলা কি জানি না, তবে এ মুহূর্তে নিঙকুণ্ডলা হইয়াছি। আর তার 'ইন্দিরা' উপন্যাসে আছে সেই বিখ্যাত কালাদীঘির পাড়—যেখানে ডাকাতেরা শিবিকা শুদ্ধ ইন্দিরাকে আক্রমণ করেছিল—এবং আরো নানা ঘটনা।

অবনীন্দ্রনাথের ক্ষীরের পুতুলেও কী সুন্দর রূপকথার ভঙ্গীতে পাল্কী যাত্রার কথা আছে—অবশ্য তাঁর গল্পটাই সে রকম। আর ভূতপতরীর দেশে? সেটা মনে হলেই ভূতদের পাল্কী বওয়ার দৃশ্যটি মনে আসে—একবারে হুবহু সত্যেন দত্তের মত। মাঝে মাঝে মনে হয়, আচ্ছা, পাল্কী বওয়ার ছন্দ কি সব সময়েই একই রকম হয়?

পাল্কী চলে পাল্কী চলে গগন তলে…

ভুল করছেন। আমি সেই রকম কোন অনুভূতি সেদিন অর্জন করতে পারিনি বলে দুঃখিত। যাত্রার সুরুতে ভেবেছিলাম হয়তো হেমন্তর গানটা শুনতে শুনতে যাত্রাপথ এক সময়ে শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু যাত্রার শুভ সূচনায় সেই যে বরবাবুকে একবার দেখলাম পাল্কীর মধ্যে

কোন রকমে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে—ব্যস, সেই শেষ দেখা। আমরা বরযাত্রী হলে কী হবে বর যাচ্ছে একা একাই। পাল্কী বেহারাদের একমাত্র কাজ যে করে হোক হন হন করে পাল্কী সমেত বরকে জীবিত অবস্থায় কনের বাড়ী পোঁছে দেওয়া। তাতেই তাদের কণ্ট্রাক্ট শেষ। তা সে বরযাত্রী কে কোথায় পড়ে রইল, তার কোন দায়-দায়িত্ব তাদের নেই।

তারা চলে গেছে এই পথ দিয়ে—সেই কতক্ষণ আগে। আর আমি ভেবেছিলাম, পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে 'হুহুম না রে হুহুম না' করতে করতে বিয়ে বাড়ী যাবো।

পরিবর্তে সদ্য চাষ দেওয়া ধান ক্ষেতের এবড়ো-খেবড়ো মাটিতে হাঁটছি আর পড়ছি। আর সামনে ঐ বিড়ির টর্চ। শ্যামলাল কোথায় যে সটকেছেন—তা তিনি জানেন। সত্যিই হেমন্ত ঠিক বলেছেন ঃ 'পথে এবার নামো সাথী পথেই হবে পথ চেনা।' পথে না নামলে কি শ্যামলালকে এমন করে চেনা হেত!

তারপর এমন একটা সময় এল, মাঠ-ঘাট হাতড়ে পথ চলতেও যেন বাধা পেলাম। দলের মধ্যবর্তী অংশটা তখন ছত্রাকার—কে কোথায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ওদের কোন দোষ নেই এই শৃংখলা ভঙ্গে। ওরা তো গ্রামেরই লোক। গ্রামের লোক কে আর কবে নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে পথ চলে। শর্টকাট করার জন্য হাজার উপায় জানে। তাছাড়া এখন মাঠের চাষ নেই, মাঠ খালি। সুতরাং বিশাল বিস্তীর্ণ মাঠই তো পথ—যে যেদিকে পারো, যাও। লক্ষ্য তো বরের পাল্কী—সে ঠিক ধরে নেবো 'খন।

যে পথ বা মাঠ দিয়ে এখন যাচ্ছি তার নাম বলতে পারব না। আর সে সব বলেই বা কী লাভ! দূরে কতগুলো চলমান আগুনের ফুলকী। অনেক দূরে হ্যাজাক বাতি ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আর পিছনে কোথা থেকে যেন পুরনারীদের কলধ্বনি কানে আসছে। এই সম্বল করে পথ চলেছি। আমার আশে পাশে গোটাকতক লোক আছে। মনে পড়ল যাত্রা সুরুর সময় এরা আমার সঙ্গে ছিল না। পথে যে কতবার সঙ্গী বদল হয়েছে সে খেয়ালই নেই।

লক্ষ্মণপুর।

সঙ্গীদের কাছে জেনে নিলাম নামটা। এখানে এসে দেখলাম আরো দু'একজন আগে থাকতেই বসে আছে। এতক্ষণ পরে মনে বেশ ফূর্তি হল। একঠা হ্যাজাক-বাতির আলো এসে পড়েছে এখানে। ঠাহর করে দেখলাম, বরবাবুর পাল্কী দাঁড়িয়ে রয়েছে অদূরেই। তার মানে দল গুছিয়ে নেবার জন্যই হোক বা বিশ্রামের জনাই হোক, সবাই এখানে একটু থামছে। তাহলে পুরুষদের বিশাল বাহিনীটা এই বিশাল প্রান্তরে গেল কোথায়?

নিশিরাতের এই পদযাত্রাটা এতক্ষণে বেশ এক রকমের রমনীয় বলে মনে হল। মাথার ওপর নিকষ আলো আঁধার—তারা ফুটফুট করছে। চারিদিকে অদ্ভুত নিঝুম। যেখানে দাঁড়িয়েছি, এখানে বোধহয় জনবসতি আছে। এত রাতেও

দু'চারটে গলা পাওয়া গেল। কে যেন পরিচয় নিল আমাদের। চারিদিকে ফুরফুরে হাওয়ায় গেঞ্জি তো ঘামে ভিজে গেছে কতক্ষণ আগেই। গায়ের শার্টটা কাঁধে ফেলা। এত কঠিন আঁধার যে আমার সামান্য টর্চের আলোয় যেন পথটাও ভাল দেখা যায় না।

এবারে আবার সবাই চলা সুরু করল—কারণ সামনেই বরের পাল্কীর হ্যাজাক বাতি আবার চলতে সুরু করেছে। বলাবাহুল্য এবারে আরেক বার আমার পথের সাথী পাল্টে গেল—অবিশ্যি আমার অজ্ঞাতেই।

তাদের কাছে শুনলাম, যে পথ দিয়ে যাচ্ছি তার বাঁ দিকের অংশে 'ছোট জাতদের' বাস—অর্থাৎ শিডিউল কাস্ট এরিয়া। গ্রামের লোকেরা এখন চট্ করে ছোট জাত বলে না, 'তপশীলভুক্ত জাতি' শব্দটিও তাদের তত পরিচিত নয়। পরিবর্তে ঐ ইংরিজি শব্দটাই এখন তাদের বাংলা শব্দ। তারাই জানালো এ' পথের ডানদিকে বড়লোকদের বাস। কে জানে কেমন ধরনের বড়লোক। এই কঠিন আঁধারে সে তল্লাশ করা বিশেষ সুবিধা হবে না।

এতক্ষণ পরে বুঝলাম বেশ একটা ভাল পথ দিয়ে যাচ্ছি—অর্থাৎ এটা সত্যই একটা পথ। বেশ খানিকক্ষণ পথ চলার পর—দেখলাম, দু'ধারেই যেন বন-জঙ্গল সুরু হয়েছে, বসতবাড়ীর সংখ্যা কমে আসছে। ডান হাতে পড়ল একটা বেশ বড় পুকুর—রাতের আঁধারে জল তার আয়নার মত চকচক করছে। আর তার পরেই এল সেই বাঁশের পুল।

বিপদ এড়াবার জন্য দু'হাতে টর্চটা চেপে ধরলাম শক্ত করে। পা দিয়ে পরখ করে নিলাম—এর শক্তি কতটা। সামনের কোন লোকজন দেখতে পাচ্ছি না—পেছনের লোকজন হয়তো আছে আরো পেছনে। সমগ্র বাঁশের পুলের এপারে শুধু আমি একা। মনে হল, ওপারে কেউ যেন একজন দাঁড়িয়ে অলক্ষ্যে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

'দেরী করবেন না চলে আসুন তাড়াতাড়ি। ওরা এখনই এসে পড়বে। সামনের দল অনেক এগিয়ে গেছে।'

গলাটা চিনলাম, লক্ষ্মণপুরের পর থেকে তার সঙ্গে সঙ্গেই পথ চলছিলাম—নাকি, শ্যামলালবাবুর গলা? ঠিক ঠাহর হল না। মন শক্ত করে বাঁশের পোলে পা দিলাম। পাশাপাশি সাত-আটটা বাঁশ সাজিয়ে ওপরে মাটি-মোরাম ফেলে পথ তৈরী হয়েছে। এর তলা দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। নদী না খাল?

ওপারে গিয়ে নামতেই কণ্ঠস্বর সহ সেই মানুষটা দেখতে পেলাম। হ্যাঁ, শ্যামলালই। পুঞ্জীভূত রাগে ফেটে পড়লাম যেন: 'কি ব্যাপার বলুন তো মশাই আপনার? বাড়ী থেকে যাত্রা সুরু করিয়ে—সেই যে একেবারে—

'আহা আহা রাগেন কেন? সত্যিই তো কোন বিপদে পড়েননি। কোন না কোন লোক তো সব সময়েই ছিল আপনার সঙ্গে সঙ্গে—তাই না।'

'এটা একটা কথা হল? এমন জানলে আমি ঘর থেকে বেরোতামই না। এ ভাবে অন্ধকারে পথ হাঁটা যায়।' তখনও আমার রাগ কমেনি শ্যামলালবাবুর ওপর।

'কেন, আপনি তো তখন বললেন বেশ একটা অভিজ্ঞতা হবে। তাই তো সে সুযোগ করে দিলাম আপনাকে—এখন এত রাগ করছেন কেন।' বলে হাতের ইসারায় আমাকে চলা সুরু করতে বললেন: 'এই তো এসে গেছি। এর পর আর একটা ছোট পুল, তারপরে নদী, তারপরেই ওপারে সীমন্তপুর।'

'নদী পেরোবার নৌকা আছে তো?' মনে মনে আঁতকে উঠলাম আমি। কী সেই নদীর নাম? জল কত তাতে? একবারও মনে হল না যে, ঐ নদী পেরিয়ে বরের পাল্কীও যাবে, যাবে যত পুরমহিলার দলও।

সত্যি, এ এক অভিজ্ঞতা হচ্ছে বটে। নিশিরাতের পাল্কী যাত্রাই বটে! লোকের কাছে গল্প করলে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। শ্যামলালবাবুকে হাতের কাছে পেয়ে মনে একটু ভরসা পেলাম যেন। ধীর স্বরে বললাম: 'একবার পুলের নীচে টর্চ ফেলে দেখব, জলটা কত নীচে আছে।'

'কত আর হবে, এখন বোশেখ মাস তো। অনেক নীচে কমে গেছে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে আসবেন—কখনও কখনও এই বাঁশের সাঁকো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।' বেশ ধীর কণ্ঠেই উত্তর এল।

আমি স্তম্ভিত হলাম, এই সংকীর্ণ পোলের ওপর দিয়ে কী করে পাল্কী সহ অন্যান্য লোকজন একটু আগেই গেছে এ' পথ দিয়ে। আচ্ছা, যদি মাঝপথে হঠাৎ মড় মড় করে—

'যেটা পেরিয়ে এলাম তার নাম বকুলতলা অর্থাৎ খালের ঠিক মুখেই যে গ্রামটা। এবার চলুন সামনে—ওই প্রায় এসে গেছে। পথটা ডান হাতি বাঁক নিয়েছে—এই এ পাশে সরে এসে দেখুন। ওখানে আরেকটা পুল।' আবার সুরু হল শ্যামলালের রানিং কমেণ্ট্রি।

সত্যিই কিন্তু টর্চের আলোয় আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে দূরে একটা কাঠের পুল। তবু ভাল, এর দুধারে ধরবার হাতল আছে। ডান হাতি বাঁক নিয়ে পথটা —দেখলাম, সারি সারি চালা ঘর। কয়েকটা ছোট ছোট দোকান আছে। শুনলাম এটি হল হাটতলা। অন্য সময় হলে হয়তো 'হাটের দোচালা মুদিল নয়ান' কবিতার লাইন মনে আসতো। কিন্তু এখন সে সব—

'দূরে দূরে গ্রাম দশ বারো খানি মাঝে একখানি হাট।' শ্যামলালের কণ্ঠ। সকৌতুকে বললাম: 'ব্যাপার কি হল বলুন তো?'

'না, সেই কবে পড়েছিলাম ইস্কুলের শেষ পরীক্ষায়, তাই এখন মনে পড়ে গেল।' প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন শ্যামলাল: 'ঐ দেখুন ওদিকে।'

আঙুল দিয়ে যেদিকে দেখানো হল, দেখলাম জন পাঁচ ছয় লোক সেখানে জটলা পাকিয়ে বসে মনের সুখে তাড়ি গিলছে এবং সেমত কথাবার্তা সুরু করেছে। শ্যামলাল আর একবার টেক্কা দিলেন: 'এসব অভিজ্ঞতা আর কখনও হয়েছে

আপনার ? আমি বেশ মুগ্ধ হয়ে এসব দেখার চেষ্টা করছিলাম। চারিদিকে এত নির্জন যে বুঝতেই পারছিলাম না, পৃথিবীতে না পৃথিবীর বাইরে আছি। বরযাত্রীর দল যে কোথায় গেছে বোঝাই যাচ্ছে না। তাছাড়া সেই মহিলাদের দলটাই বা গেল কোথায় ?

শুনলাম সীমন্তপুরে যাবার অন্য একটা পথ আছে। মেয়েরা হয়তো সেই পথ দিয়েই নদী পেরিয়ে থাকতে পারে।

গলাটা শুকিয়ে গেছিল। শির শির হাওয়া দিচ্ছে। পিঠের গেঞ্জি শুকিয়ে গেছে। এবারে শার্টটা গায়ে চাপালাম। বললাম ঃ 'একটা চায়ের দোকান দেখলে হত না।'

'আরে বলেন কি মশাই ! রাত কত হল খেয়াল আছে ?' সত্যি তো ? ঘড়ির পানে তাকালাম—প্রায় বারোটার কাছাকাছি। তার মানে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা হল এই বনে বাদাড়ে পথ হাঁটছি। সত্যি এ এক অ্যাডভেঞ্চার করলাম বটে ! আমার নিজেরই তো বিশ্বাস হচ্ছে না এসব কাণ্ড-কারখানা।

দেখতে দেখতে এসে গেল সেই কাঠের পুল। এ পুলের নীচে ছোট একটা খাল—জল প্রায় নেই বললেই চলে। মনে আশা যে এর পরেই কিছুটা হাঁটা পথ, তারপরেই বড় নদী—তারপরেই সীমন্তপুর মানে কনের বাড়ী।

কাঠের পুল পেরিয়েই চোখে পড়ল সামনে থেকে আসছে হ্যাজাকের আলো। নিশ্চয়ই বরবাবুর পাল্কী—হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছে। শ্যামবাবুর কণ্ঠ ঃ 'এবারে ওরা নদী পেরোবে, তাই সব ঠিক করে দেখে নিচ্ছে কোনদিক দিয়ে নামবে।'

আমি ভেবে পেলাম না, পাল্কী সমেত নদী পেরোবার কি প্রয়োজন। বরবাবুকে পাল্কী থেকে একটু নামিয়ে নদীটা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে আবার পাল্কী বসালে ক্ষতিটা কি ? আর যাই হোক সেটা অনেক নিরাপদ হত। কিন্তু কে কার কথা শোনে। শ্যামলালের কাছে শুনলাম, এদেশে ওটাই নাকি নিয়ম। বর যখন একবার পাল্কীতে উঠেছে তখন নামবে সেই একেবারে কনের বাড়ী গিয়ে। এর একটা আলাদা প্রেষ্টিজ আছে। আরো শুনলাম নদী পেরোনো নাকি তত বিপদের নয়। এ হচ্ছে পাল্কী বেহারা। ওদের দায় কি কম ! যে ভাবেই হোক, নিরাপদে বরকে, বরের দলকে নদী পেরিয়ে ওপরে তুলতে না পারলে ওদের নাম খারাপ হবে না ?

যাহোক, এসব শুনতে শুনতে পায়ে পায়ে চুপি চুপি এসে দাঁড়াই বরের পাল্কীর সামনে। একবার উঁকি মেরে ভিতরে দৃষ্টি দিই। বেচারী বর ! কাতর চোখে চাইল আমার পানে ঃ 'দেখছেন কী অবস্থা।'

সত্যিই কী অবস্থা। ঐ ছোট্ট পাল্কী। কোন মতে একজনই বসা যায় না, তারা বসেছে ভিতরে দুজন। অন্যজন হল খোকা বর—প্রথা। ঘামে সিল্কের

পাঞ্জাবী ভিজে গেছে। চোখে জমেছে রাত জাগার কালি। অন্যান্য ক্লান্তির কথা নাই বা বললাম। বলল ঃ 'গ্রামের বিয়ে দেখেছেন কখনো ?'

'দেখেছি—তবে পাল্কী যাত্রা করা হয়নি কখনো। ভাগ্যিস এলাম, তাই সব দেখা হল।'

'এবার দেখুন সামনে নদী—দ্বারকেশ্বর। এটা পেরোতে পারবেন তো ? ভয় নেই। জল শুকিয়ে গেছে। সবাই হেঁটে পেরুচ্ছে।'

শুনেই ছিটকে সরে আসি পুরাতন জায়গায়। দেখি শ্যামলাল পুনরায় বেপাত্তা। যাক গে, বাকী পথ আমি ওদের সঙ্গেই যেতে পারব—একা একাই। শুধু একবার দেখব কোন বিচিত্র কৌশলে ডাঙ্গা থেকে ঢালু পাড় বেয়ে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত নীচে নামে বেহারারা ঐ পাল্কী নিয়ে।

দেখা হল সে দৃশ্যও। বেহারারা সকলে সন্তর্পনে পা টিপে টিপে পাল্কী নিয়ে নামছে ধীরে ধীরে। চলমান হ্যাজাকের আলোয় তা বেশ দেখতে পাচ্ছি উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে। কানে ভেসে আসছে বরযাত্রীদের প্রয়োজনীয় জয়োল্লাস। বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে যখন তারা নামল নদীগর্ভে তখন একবার শুনলাম সেই জয়ধ্বনি—অর্থাৎ বিপদ কেটে গেছে। অবশ্যি বরের পাল্কীই প্রথম নামেনি নদীতে, তার আগে বেশ পনেরো-কুড়ি জনের নানা বয়সী পুরুষের একটি দল এগিয়ে গেছে ওপারে সীমন্তপুরের দিকে।

অতঃপর আমার পালা। ঠিক ঐ একই পথ ধরে পা গুনে গুনে নামতে থাকি। এতগুলি লোক যাতায়াত করার ফলে নদীর ঢালে বেশ একটা পথ তৈরী হয়ে গেছে। আমার তেমন অসুবিধা হল না।

পায়ে পায়ে নদীগর্ভে এসে মনে হল এখন যদি কোন অলৌকিক মন্ত্রবলে নদীতে জল চলে আসে—তাহলে কি হবে ? তাকিয়ে দেখি, সেই সাড়ে বারোটা রাত্রে নদী-গর্ভে নানা বয়সী কত লোক—এ যেন মধ্য রাত নয়, এ যেন নদী গর্ভ নয়। পায়ের তলায় তির তির করে দ্বারকেশ্বর বয়ে যাচ্ছে, তার ছোঁয়া নিলাম। দুধারে উঁচু পাড়। ওদিকের পাড় থেকে মৃদু সবুজ আলো ভেসে আসছে—সীমন্তপুরে কনের বাড়ীর আলোকসজ্জা। নদীর পাড়েই আলোকিত কনের বাড়ী। নদীগর্ভ থেকেই দুটি লাউডস্পীকার থেকে দু'ধরনের সঙ্গীত কানে আসছে। একটিতে বাজছে সানাই আর অপরটিতে হচ্ছে 'তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার'। সহসা কী ভাবে যেন বাংলা গানের কলি পাল্টে গেল ঃ 'জিস কি বিবি মোটি···'

রাত একটায় লগ্ন। এখন একটু প্রাণ ভরে দেখে নিই এই শুকনো নদী, পায়ের তলায় তিরতিরে জল।··· □

লোকশিল্পের সঙ্গে অর্থনীতির
সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠ—এ কথা সবাই জানেন।
অধিকাংশ লোকশিল্পেরই একটা
ব্যবহারিক দিক আছে। তাই
অপ্রয়োজনীয় লোকশিল্প বলে কোন বস্তু নেই।
কিন্তু লোকশিল্পের যে সব প্রকরণ লোকচিত্রকলার
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত,
তাকে একটু অন্য ভাবে বিচার করতে হয়।
লোকশিল্পের যে কটি প্রকরণ লোকচিত্রকলার সঙ্গে সরাসরি
যুক্ত, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য
হল লক্ষ্মীর পট। এ বস্তুটির সঙ্গে দৈনন্দিন
জীবনের সম্পর্ক বলে তার শৈল্পিক
সত্তাকে কেউ যেন ছোট করে না ভাবেন। অনুরূপ
ভাবে প্রতিমার চালচিত্রের কথাও বলা যায়।

লোকশিল্প-৪

অবশ্য এটিও সমাজের এক প্রকার লোকবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত।
পূর্বোক্তগুলির মত,
আল্পনাও একটি বিশুদ্ধ লোকচিত্রকলা—কিন্তু
তার ততটা বাণিজ্য নেই। এই পর্যায়ে আসে
পটুয়াদের নানাবিধ পট চিত্র।
এ দুটি প্রকরণই লোকশিল্প হলেও,
অর্থনীতির সঙ্গে এদের সম্বন্ধ তত দৃঢ় নয়,
তবে এক প্রকার ধর্মাচরণ এর দ্বারা হয়।
সুতরাং এই প্রসঙ্গে মুখোস নির্মাণ
বিষয় সম্বন্ধে বলা যায়, এটি যদিও একটি
বিশুদ্ধ লোকশিল্প, তবু একই সঙ্গে লোকচিত্রকলাও—
বিশেষতঃ তা যদি হয় ছৌ নাচের মুখোস।
অবশ্য এটিও পরোক্ষে ধর্মভিত্তিক নৃত্যপ্রকরণ।
বঙ্গীয় লোকচিত্রকলার সঙ্গে ধর্ম জগতের সম্বন্ধ বড়ই বেশী।

ছো মুখোসের গ্রাম চোড়দ্যা

পুরুলিয়া শহরের জমজমাট বাসস্ট্যাণ্ড থেকে 'রজপুর হইতে রজপুর' লেখা যে বাসটা সকাল আটটায় ছাড়ে—সেই বাস মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পেঁছে দেয় বাঘমুণ্ডি থানার চোড়দা গ্রামে।

গ্রামটার বুক চিরে এই বাস রাস্তাটা চলে গেছে। তার ফলে গ্রামটা যেন প্রাণ পেয়েছে—সব সময়েই কর্ম চঞ্চল। পথের ধারে সাধারণ ব্যবসায়ীর দোকান অনেক-গুলো—সবই বাসস্টপেজের কাছাকাছি। কিন্তু তারই মধ্যে একঘর দু'ঘর করে মুখোস শিল্পীদের বাস—রাস্তার দু'ধার বরাবর। গ্রামের খুব অভ্যন্তরে এরা কেউ থাকেন না, সেখানে থাকে অন্যান্য সম্প্রদায় এবং অন্যান্য জীবিকার লোক।

চোড়দ্যা বা সৌখিন ভাষায় চোড়িদা গ্রাম মুখোস তৈরীর জন্য বিখ্যাত হলেও সমগ্র গ্রামবাসীর মাত্র ৪০-৪২ ঘর এই কাজে লিপ্ত আছে। বাদ বাকীরা চাষ, ব্যবসা, সূত্রধর ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু যেহেতু এই সব জীবিকা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র অতি সাধারণ, তাই তাদের পরিচয়ে এই গ্রামের পরিচয় নয়—যদিও তারাই এ গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ। বরঞ্চ যারা সংখ্যালঘু, শুধুমাত্র নিপুন হস্তশিল্পের জন্য তারা আজ বিখ্যাত। তাদের গ্রামের নাম শুধু ভারতেই নয়, তার বাইরেও ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

বাস থেকে নেমে একটু খোঁজ করলেই অনিল সূত্রধরের খোঁজ পাওয়া যাবে। ইনিই এই শিল্পী সমাজের বর্তমান মুখপাত্র। অবশ্য প্রথাগত ভোটের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি নন এঁর কাজ, ব্যবহার, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্যই এঁকে সবাই এগিয়ে দেন বহিরাগত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার জন্য।

তবে এটুকু বোঝা গেল এ গ্রামের লোকদের নবাগত বা বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলায় তেমন কোন আড়ষ্টতা নেই,—নেই কোন অস্পষ্টতা। তার কারণ হল সম্বচ্ছর বাইরের কৌতুহলী লোক এ গ্রামে এত বেশী যাওয়া-আসা করে যে, গ্রামের অন্য অধিবাসীদের থেকে এই সব মুখোস-শিল্পীদের কাছে বাইরের জগৎটা আজ আর তত অজানা নয়।

অনিল সূত্রধর কেন এ' অঞ্চলে নামী ব্যক্তি, সে কথাটা আলাপ হবার পর জানা গেল। একদা ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে যে নাচের দলটা বিদেশ ভ্রমণ করেছিল—অনিল সূত্রধর ছিলেন সেই দলে। দলের ম্যানেজারী করতে হত এঁকে। তাই অভিজ্ঞতায় ইনি অনেকের থেকে এগিয়ে আছেন। তার পরিচয় মিলবে এঁর কথায় চিন্তায় এবং অন্যান্য আচরণেও।

দু'চারটে কথার পর প্রশ্ন করেছিলাম—আর কোন্ নাচের সঙ্গে ছো-নৃত্যের সাদৃশ্য আছে। অনেকেই প্রশ্নটা শুনেছিলেন। কিন্তু শুধু সূত্রধর মশাই-ই

বললেন যে পাঞ্জাবের ভাংরা লোক-নৃত্যের সঙ্গে এর কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে—কেন না উভয় নৃত্যই খুব তাণ্ডব ধরনের। আবার মনিপুরি-কথাকলি ইত্যাদি নৃত্যের সঙ্গে একটা অন্য ধরণের সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে। কেননা, এগুলি হল মূলতঃ নৃত্যের সঙ্গে অভিনয়ও। কথা না বলে হাতের মুদ্রায় চোখের ভাষায়—তার সঙ্গে থাকে বাদ্য সঙ্গত। ছৌ-নাচের সঙ্গে এটা বেশ একটা বড় সাদৃশ্য।

তাছাড়া এ' গ্রামে মুখোস তৈরীর শুরু হল কবে থেকে, সে প্রশ্নেরও একটা মোটামুটি জবাব পাওয়া গেল এঁর কাছেই – যথাস্থানে তা' ব্যক্ত হয়েছে।

তখন মনে পড়ল অনিল সূত্রধরের নামটা আমার আগেই শোনা ছিল—অর্থাৎ কাগজে-কলমে লেখা ছিল। পুরুলিয়া শহরে বিশ্বনাথ ড্রেস হাউসের যে মুখোস বিক্রি হয়—তার পিছনে দোকানের পরিচয় থাকে। সেখানে ছাপানো নাম ঠিকানা ছিল, অনিল সূত্রধর।

সেই সূত্রে মনে পড়ল নকুল বাবুর কথা। তাঁর সঙ্গে পুরুলিয়া শহরে দেখা হয়নি। ইনি হলেন পুরুলিয়া শহরের চোড়িদা মুখোস ঘর-এর মালিক। এখন অফ্ সীজন বলে গ্রামে এসে নিজের অন্যান্য কাজ করছেন—এ' গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা তিনি। আর শহরের দোকানে বসিয়ে এসেছেন এক অল্প বয়সী কিশোরকে টুকটাক কাজ করবার জন্য।

কথায় কথায় জানা গেল, মুখোস তৈরী পরিবারের মধ্যে কিছু লোকশিল্প কর্মের মাধ্যমেই জীবিকা অর্জন করে ; বাকী ৪/৫ টি পরিবারের নিজেদের সাম্যন্য জমি আছে—পুরুলিয়ার রুখু জমি। অন্যেরা অবসর সময়ে অন্যের জমিতে চাষ করে কোনমতে সংসার চালায়।

'অবসর সময়' কথাটা এদের পক্ষে বড়ই ট্রাজেডীর—কেন-না বছরের প্রায় নয়-দশ মাস হল হাতে কাজ না থাকার সময়। মুখোস শিল্পীদের আসল সীজন হল গাজনের মাসটা অর্থাৎ ফাল্গুনের শেষ থেকে বৈশাখের শেষ অবধি। কখনও বা দু'দশ দিন বেশী হয়ে যায়। এর বাইরে ক্যালেণ্ডারে যে দিনগুলো থাকে—তা সম্পূর্ণ বেকার—অন্ততঃ মুখোস তৈরী ও বাণিজ্যের পক্ষে।

কাজেই যে সব পরিবার পুরোপুরি শিল্প-নির্ভর, তাদের জীবিকার জন্য অন্যান্য পথ খুঁজতেই হয়। মুখোস ছাড়া এঁরা তাই বর্তমানে প্রতিমা তৈরী ডাকের সাজ তৈরী প্রভৃতিতে মন দিয়েছে। যে সব প্রতিমা সাধারণতঃ এখানে তৈরী হয়, তা হল—মনসা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও বিশ্বকর্মা। লক্ষণীয় যে দুর্গাপ্রতিমার প্রচলন এদিকে তেমন নেই। মূলতঃ ব্যয়বহুলতার জন্যই তা' এরা নির্মাণ করে না—তবে মনসা-র ব্যবসাই বেশি।

অনিল সূত্রধরের কাকা হলেন সুচাঁদ সূত্রধর। এঁর খুব নাম ছিল মুখোস তৈরীতে—জীবিত অবস্থায় সরকারী পুরস্কার পেয়েছেন এ' জন্য। তাঁর ভাইপো অনিলও পেয়েছেন পুরস্কার। সম্প্রতি সুচাঁদ গত হয়েছেন—সুচাঁদের মামা কাশীনাথ সূত্রধর তার প্রতিমা তৈরীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন।

যেহেতু এখানে বাজার খুবই ছোট, উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা তত নয়—তাই অনেক শিল্পীকেই জীবিকার জন্য বাইরে বেরুতে হয়। কাশীনাথ প্রতি বছরই পুজোর মরশুম এলে বাইরে বেরিয়ে পড়ে—ওর এলাকা ঠিক করেই থাকে। যদি পুরাতন জায়গাতেই যায়, তবে স্থানীয় মহাজনের কাছ থেকে পুঁজি সংগ্রহ করতে হয় প্রথমেই। কিংবা তাদের অধীনে থেকেও কাজ করা চলে। কখনও বা ব্যক্তিগত ব্যবস্থায় মহাজনের মাধ্যমেও কাজ হয়। মোটকথা বিদেশে গিয়ে ব্যবসা করতে হলে মহাজনের শরণাপন্ন হতেই হবে।

কাশীনাথের কাজের এলাকা উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর অবধি। কাছাকাছির মধ্যে বিহারের পালামৌ, রাঁচি, হাজারীবাগ, বোকারো প্রভৃতি স্থানও আছে। একবার সরস্বতী পুজোর মরশুমে পালামৌর নিকটে 'গারোয়া' নামক গ্রামে ১১৫টি প্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন। এগুলি তিনটি ধরণের হয়েছিল—অন্ততঃ দামের বিচারে ও শিল্প বিচারে। অর্থাৎ ত্রিশ টাকা, পঁচাত্তর টাকা ও আড়াইশ টাকা।

এইভাবে পুজোর মরশুমগুলো বাইরে বাইরে ঘুরে পুঁজি সংগ্রহ করে কাশীনাথ এবং অন্যান্য কাশীনাথরা গ্রামে ফিরে আসেন। তারপর শুরু হয় নিজেদের জাত ব্যবসা ছৌ-মুখোসের প্রস্তুতি।

তবে বাইরে গেলে কাশীনাথদের আরো নানা ধরনের শিল্প কর্ম করতে হয়। তার মধ্যে একটি হল রথ সাজানো। আর স্থানীয় এলাকায় দুর্গা প্রতিমার তেমন চাহিদা না থাকলেও বাইরে গেলে তা করতে হয়—অবশ্য তার জন্য দামও তারা সাময়িক ভাবে ভালই পায়।

সত্যি কথা বলতে কি, এইভাবে বাইরে গিয়ে কাজ করে থাকা-খাওয়ার খরচ বাদ দিয়ে মহাজনের টাকা ফেরৎ দিয়ে পকেটে যা' থাকে—তা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু গ্রামে থাকলে দিন চালানোই কঠিন—তাই চোড়িদ্যার কাশীনাথরা গ্রামের বাইরে যেতে বাধ্য হন।

কেননা, প্রতি বৎসরই যারা গ্রামে থেকে যান এবং কোন মতে কুল-ব্যবসা অবলম্বন করে জীবন চালান, তাদের একটা আর্থিক ট্রাজেডির সম্মুখীন হতেই হয়—তাই অল্প পয়সা হলেও গ্রামের বাইরে যাওয়া বরং ভাল। এ' মন্তব্য বর্ষীয়ান অভিজ্ঞ শিল্পী অনিল সূত্রধরেই।

যে জন্য এই গ্রামের এত খ্যাতি সেই মুখোস শিল্প সম্বন্ধে এবার কিছু বলা প্রয়োজন। মুখোস শিল্প নিয়ে কিছু বলতে হলে, এ অঞ্চলের আদি বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

প্রাচীন কালে এ' সব অঞ্চল ছিল বাঘমুণ্ডী রাজাদের অধীনে। এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরেই আছে তাদের ভাঙ্গা গড় আর প্রাসাদ। তখন এ'সব অঞ্চলের দারুণ রমরমা। লোকের অভাব ছিল না—ছিল না অভাব। ব্রাহ্মণ, তেলি, সূত্রধর সবাইয়ের জমি ছিল। যে যার মত করে খেত। ব্রাহ্মণ দেখত সমাজের পুজো-

আর্চায় ব্যাপার তেলি যোগাতো তেল, সূত্রধর ছিল কাঠের আসবাব ও অন্যান্য বস্তুর জন্য। মোটামুটি সে এক সমৃদ্ধশালী ব্যাপার—এ সব হোল অনিল সূত্রধরের স্মৃতিকথা।

তখন এখানে ছিল রাজার শিবমন্দির। শিবের পূজা হত ধুমধাম করে। সেই পূজারই এক আনন্দ-অনুষ্ঠান ছিল পুরান-যাত্রা। সে সময় গ্রামের লোকেরা মুখে রং, ঝুলি মেখে রাম, রাবণ, হনুমান ইত্যাদি সেজে অভিনয় করত।

কিন্তু উৎসবের দিনে অভিনয় করার ব্যাপারটাও হঠাৎ চালু হয়নি। এখানকার কোন লোকই হয়ত্যে ইতিপূর্বে উড়িষ্যার সেরাইকেলায় গিয়ে থাকবে। সেখানে ছৌ মুখোস নাট্যের প্রচলন ততদিনে ব্যাপক ভাবে হয়ে গেছে। বাঘমুণ্ডির লোকেরা সেই সব দেখে প্রভাবিত হয়ে ভাবল—নাচ-গান যদি করতে হয় তো ভাল করে করাই ভাল। সেই থেকে মুখোস নির্মাণের সূচনা। অর্থাৎ দেব-চরিত্রকে যথার্থ দেব মহিমায় প্রকাশ করার জন্যই মুখোস নির্মাণের সূত্রপাত।

তারপর জল গড়িয়েছে বহুদূরে। সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। টিকে আছে কয়েকটা পরিবার মুখোস তৈরীকে সম্বল করে। এ'দিকে কৌলিক বৃত্তি ছাড়তে পারছে না, আবার ভরসা করে নতুন কোন বৃত্তি গ্রহণ করতেও পারছে না। অবশ্য তাদের এ অবস্থা শুধু মুখোস শিল্পে নয়—পট শিল্পেও সেই একই অবস্থা। এরা তবু কোনমতে টিকে আছেন। পটুয়ারা তো ইতিমধ্যেই মিউজিয়ামের মত সংরক্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছেন।

বংশ পরম্পরায় এ' কাজ চলছে বলে এরা বাল্যকাল থেকেই মুখোস তৈরী করতে শিখে যায়। প্রাইমারী শিক্ষা পর্যন্ত কোন রকমে হয়—তারপর লেগে যায় নিজেদের জাত ব্যবসায়।

এই শৈল্পিক আবহাওয়ার মানুষ বলে এদের ঘরের বালকরাও মৃৎ-প্রতিমা তৈরী করে—নিজের মনের মত ছোট আয়তনের। তাতে ভুল-ত্রুটি হয়তো থাকে, কিন্তু এদের মানসিক প্রবণতা বুঝবার জন্য বহিরাগতের দৃষ্টিতে এটাই যথেষ্ট।

মাটির মুখের ছাঁচ তৈরী করে তার ওপরে টুকরো টুকরো কাগজ সেঁটে মুখোস তৈরী হয়। শেষ কালে একটা কাদা-মাখা কাপড় দিয়ে ওপরটা ঢেকে দিয়ে তারপর ঘষে ঘষে পালিশ। সব শেষে নিয়ম অনুযায়ী রং ও পালিশ—সংক্ষেপে এটাই হল মুখোস তৈরীর নিয়ম।

এ' মুখোস পরে নাচ করা হয় বলে একে হাল্কা হতেই নয়—নচেৎ নাচিয়ে নাচতে পারবে না। আর ছৌ নাচ যে-সে নাচ নয়—শিবের তাণ্ডব নৃত্য। তাই মুখোস হাল্কা করা একান্ত প্রয়োজন। কাগজই তাই এই মুখোসের প্রধান উপকরণ।

এ' প্রসঙ্গে জানালেন কাশীনাথ—একদা কলকাতার কুমারটুলী অঞ্চলের মৃৎ শিল্পীরা এ' জাতীয় মুখোস নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু সফল হননি। কেননা তাদের তৈরী মাটির মুখোস বড় ভারী ও ভঙ্গুর। ছৌ নাচের ঝাঁকুনি সহ্য করার ক্ষমতা তাদের কম এবং শিল্পীর পক্ষে তা' হত বেশ ভারী।

প্রধানতঃ বয়স্ক পুরুষরা তৈরী করে মুখোস। কাঁচা মাটি দিয়ে মুখগুলি তৈরী হয়। প্রতিটি মুখোসের জন্য পৃথক পৃথক মুখ। মাটি শুকিয়ে গেলে তা' দিয়ে কাজ চলে না তাই একটা মুখোসের কাজ হয়ে গেলেই মাটির ছাঁচ ভেঙ্গে ফেলে দ্বিতীয় মুখোসের প্রস্তুতি শুরু করতে হয়।

প্রচুর সময়সাপেক্ষ কাজ বলে দিনে দুটির বেশী মুখোস তৈরী করা সম্ভব হয় না। শুধু তাই নয়, মুখের আদল তৈরী হয় হাতেই—তার জন্যও কোন ছাঁচ ব্যবহৃত হয় না।

প্রয়োজনীয় মাটি আনা হয় চোড়িদা নদী থেকে। ১৯৮৪ সালের পুজোর সময়েও এর দর ছিল চার টাকায় একগাড়ী এবং খুচরা দর ছিল আট আনায় ঝুড়ি।

নদীর মাটি হল বালা বা বেলে মাটি, এ দিয়ে মুখের ছাঁচ তৈরী ভাল হয়। তারপর টুকরো কাগজ বসানোর পালা। শেষ কালে যে কাদা-ছোপানো কাপড় লাগানো হয় মুখোসের উপর—তার জন্য লাগে এঁটেল মাটি, এরা বলে চিটা মাটি।

এ এমনই শিল্প যে অদক্ষ শ্রমিককে দিয়ে এ' কাজ করানো যাবে না। চুক্তি বা কনট্র্যাক্ট দিয়েও এ' কাজ করা যায় না।

বাড়ীর মেয়েরা এ' কাজে হাত লাগান না। চোড়িদার মুখোস শিল্পের ক্ষেত্রে এ' এক অভিনব ব্যাপার। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে গ্রামে একটি শিল্প মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট মানে পেঁছাতে পেরেছে এবং যার দ্বারা গ্রামের সবার ভরণ-পোষণ হচ্ছে—সে শিল্পে গ্রামের সকলেই যার যা' সাধ্য তা' করেন। শান্তিপুরের তাঁত শিল্প, মুর্শিদাবাদের জিৎপুর গ্রামে শঙ্খ শিল্প, কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি পাড়ার মৃৎশিল্প কিংবা কলকাতায় কুমারটুলী পাড়ার মৃৎশিল্প, মেদিনীপুরে ট্যাংরাখালি গ্রামে পটশিল্প—সর্বত্রই এই একই প্রথা। বাড়ীর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাই হাতে হাত দিয়ে কাজ করছেন। চোড়িদার ছো মুখোসের ক্ষেত্রে তা' নয়।

এখানে শিশু বা কম বয়সী বালকরা শুধু মুখোস সাজাতে হাত লাগায়। কিন্তু বয়স্ক নারী—এ কাজে এগিয়ে আসেন না।

সারাদিনে দুটো মুখোস তৈরী, হল তাও হেলপার-এর সাহায্য দিয়ে, বালকদের সাহায্য নিয়ে। তার বিনিময়ে জুটবে মাত্র কুড়িটি টাকা—তাও রোজ নয়।

সিজনের সময়টা বাদ দিয়ে অন্য সময়ের কথা ভাবলে এই আর্থিক সংকট বেশী করে চোখে পড়বে। তখন পুরুলিয়া শহর থেকে ক্যালকাটা ড্রেস হাউস, নাগ ড্রেস হাউস, বেঙ্গল ড্রেস হাউস প্রভৃতি দোকানের মালিকেরা এখানে এসে প্রায় অর্ধমূল্যে এদের মুখোস নিয়ে চলে যান, এবং এরাও তা করতে বাধ্য হয়। কেননা তখন 'অফ সিজন'—বিক্রী বন্ধ। 'এঁরা' তবু দয়া করে নিয়ে যাচ্ছেন, তাই ঐ বে-টাইমে অনিল সূত্রধরদের পেটের ভাত টান পড়ছে না।

অর্ধমূল্যে মুখোস বিক্রীর ব্যাপারটা ইদানীং যেন বেশী হচ্ছে—দু' চার বছর আগেও এটা এত ব্যাপক ভাবে হত না। কম দামে কেনাই ভাল—সম্ভবতঃ এই যুক্তিই কাজ করে পুরুলিয়ায় ঐ ড্রেস হাউসের মালিকের মনে। ফলে এইসব

শিল্পীদের নাভিশ্বাস উঠছে ক্রমাগত।

একদা ওয়ার্ল্ড লুথারেন সার্ভিস বা স্থানীয় ভাষায় লুথার কোম্পানী এদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চেয়েছিল আর্থিক উন্নয়ন ঘটানোর ব্যাপারে। কেননা সে সময়ে লুথাররা এ অঞ্চলে সমাজ কল্যাণমূলক অনেক কাজ করে অধিবাসীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক চোড়িদার শিল্পীরা তাদের সঙ্গে শর্তে মিলতে পারেনি। কেননা লুথারেন কোম্পানী তাদের মাল বিক্রী বা বাণিজ্যের দিকটা তত ভাবেনি। তারা পুঁজি দিয়ে এদের ব্যবসা আরো উন্নত করতে চেয়েছিল। কিন্তু এদের প্রধান সমস্যা শিল্প উৎপাদন নয়, সুষ্ঠু বিপণন—যার জন্য তারা এখনও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

পুরুলিয়া বা মানভূম অঞ্চল একদা বিহারের অন্তর্গত ছিল—সেই পটভূমিতেই এখানে মুখোস শিল্পের বিকাশ হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে মুখোস তৈরীর কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য আজো এরা কলকাতার উপর নির্ভরশীল—অন্ততঃ পুরুলিয়ার মুখোস ব্যবসায়ীরা সে কথাই জানালেন। তাদের কাছ থেকেই অনিল-কাশীনাথরা তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল নিয়ে আসেন। এমন কি কিরাত মুখোসের জন্য ময়ূরের পালক—সেটা পুরুলিয়ায় পাওয়া গেলেও দামে সস্তা বলে কলকাতা থেকেই নিয়ে আসা হয়।

যেহেতু পুরুলিয়া জেলায় ছো-নাচ পার্টির সংখ্যা অগুণতি, তাই যারা নিতান্তই গ্রামের এবং গ্রাম্য রীতি-নীতি মানতে ভালবাসেন—তারা গ্রহণ করেন ঐতিহ্যাশ্রয়ী মুখোস। কিন্তু যারা একটু আলোকপ্রাপ্ত—তাদের মনস্তুষ্টির জন্যই মুখোস শিল্পীকে হতে হয় আধুনিক।

কিন্তু মুখোস গ্রামের এটাই সব কথা নয়।

এই আর্থিক-বাণিজ্যিক জীবনের পিছনে এদেরও একটা সামাজিক জীবন আছে। চোড়িদার বৃহত্তর গ্রামীন জীবনের পটভূমিতে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সে জীবনও বেশ বৈচিত্র্যময়।

একে অধিকাংশ মুখোস শিল্পীরই রাস্তার ধারে ঘর এবং বাস আসা-যাওয়ার সংখ্যাও আঙ্গুলে গোনা, তাই অধিকাংশ কারিগরই রাস্তার উপরটাকেই মুখোস শুকানো বা রং করার প্রাথমিক কাজের জন্য ব্যবহার করেন। বাড়ীর সামনের দিকেই দোকান ঘর; সেখানেই প্রকৃত কাজ-কর্ম হয়। প্রায় প্রত্যেকের দোকান ঘরেই একটা চেয়ার ও মাটিতে বিছানো মাদুর-সতরঞ্জি থাকেই—বিশেষতঃ মরশুমের সময়ে তো বটেই। তখন মাল চেনা-চিনি, দর হাঁকাহাকি সব ঐ ঘরে বসেই হয়।

এ গ্রামের অধিবাসীদের বর্ণগত বিন্যাসও বেশ বৈচিত্র্যময়। এখানে আছে ভট্ট ব্রাহ্মণ—তারা ব্যব্যসা ও দোকানদারী করে। তাছাড়া ভূমিজ, ডোম, বামুন প্রভৃতিও আছে। তিন ঘর গাঙ্গুলী আছে—কৃষি কাজ তাদের জীবিকা।

শিক্ষার প্রসার ইতিমধ্যে বেশ এগিয়েছে। অনিল সূত্রধরের হিসেবে নাকি

ছো একটি লোকনৃত্য। এই নৃত্যের নামকরণ নিয়ে পণ্ডিত বর্গের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। নামকরণ সমস্যা দূর হলে দেখা যাবে, এটি প্রধানতঃ এক বীররসের নৃত্য; প্রধান উপাদান হল যুদ্ধ জাতীয় উপকরণ। অবশ্য সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যুদ্ধের সম্বন্ধ বহুকালের। বাংলার লোকনৃত্য ভাণ্ডারে যে সকল প্রকরণ প্রচলিত আছে, তার মধ্যে বীরত্ব প্রকাশের স্থান তত দেখা যায় না। বীরভূমের লালমাটিতে একদা রায়বেঁশে, পাইক প্রভৃতি নৃত্যের প্রচলন ছিল, আজ যার চর্চা হচ্ছে বেশ পরিশীলিত ভঙ্গীতে—আলোচ্য ছো নাচের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ততটা বোধহয় না। পূর্বোক্ত যুদ্ধগুলি যদি হয় বীরনৃত্যের ব্যবসায়িক প্রকরণ, তবে ছো-কে বলা চলে তার নান্দনিক প্রকরণ। ছো যদি হয় রামায়ণ মহাভারতীয় সাহিত্যভিত্তিক, তবে রায়বেঁশে ইত্যাদি হল জনজীবন ভিত্তিক। তার সঙ্গে রমণীয়তা অপেক্ষা প্রাত্যহিক জীবনের সম্পর্কটা বড় নিকট। শুধু এইটুকুই নয়, ছো নৃত্য বঙ্গীয় লোকনৃত্য-ভাণ্ডারে এসেছে অতি সাম্প্রতিককালে। কেননা দীর্ঘদিন ধরেই তা রাঢ়বঙ্গের পশ্চিমতম প্রান্ত দেশের মানভূম সংস্কৃতির সঙ্গে হয়ত ছিল। যেহেতু মানভূমের কিয়দংশ এখন বঙ্গসংস্কৃতির অন্তর্গত তাই এই নৃত্য এসেছে আমাদের গোচরে। এভাবেই দিনে দিনে বিস্তৃত হচ্ছে বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গন।

আরো যেসব কারণে এই নৃত্য নিজেকে বিশিষ্ট করে তুলেছে, তা হল এর বিচিত্র পরিবেশন ভঙ্গী। যে বীররসের বিষয় নিয়ে এই নৃত্যের—তথা নৃত্যনাট্যের শরীর গড়ে ওঠে, তার সঙ্গে অন্যান্য প্রচলিত নৃত্য পদ্ধতিগুলির কোনই সাদৃশ্য নেই। অর্থাৎ 'যুদ্ধ'-ও যে একটি নৃত্যনাট্যের বিষয় হয়ে উঠতে পারে, তা এর পূর্বে বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে তত সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়নি বলেই ছো সে কারণে এত বিশিষ্ট। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের নায়িকা চিত্রাঙ্গদাও এখানে অনেক পিছনে পড়ে থাকে।

তদুপরি এই বিশিষ্ট লোকনাট্যের তথা নৃত্যনাট্যের যে আকর্ষণীয় বেশভূষা দেখা যায়, তাও একে অনন্য করে তুলেছে। প্রচলিত বঙ্গীয় লোকনৃত্য সমূহে সাজপোষাকের এত সমারোহ দেখা যায় না। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, এই লোক-নৃত্যটি প্রকৃত পক্ষে নৃত্যনাট্য বা গীতিময় নৃত্যনাট্য। 'নাট্য' শব্দটি থাকার জন্য এর মধ্যে কাহিনী+নাট্যদ্বন্দ্ব+বেশভূষার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে এই বিচিত্র লোকনাট্যের আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যায়—১, রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধমূলক কাহিনীগুলি ছো নাচের জন্য নির্বাচিত হয় এবং ২, এটি আগাগোড়া একটি মুখোস নাট্য—যে মুখোস-নির্মাণ নিজেও একটি বিশিষ্ট লোকশিল্প। এই মুখোসনির্মাণ শিল্পীদের জগৎও কম বৈচিত্র্যময় নয়! ছো-এর আজ বিশ্বজোড়া খ্যাতির পিছনে তাই মুখোস নির্মাণ কারীদের কথাও মনে আসে। প্রচলিত অন্য বীররসের নৃত্যের সঙ্গে ছো নৃত্যের এটাই প্রধান পার্থক্য। পাইকান রায়বেঁশে নৃত্যের পেশীবহুল পুরুষতা ছো নৃত্যে এক রোমাণ্টিক পেলবতায় পরিবর্তিত হয়েছে এই মুখোসের জন্যই।

শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেদের ২৫ শতাংশ হল ম্যাট্রিক পাশ—কথাটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে সূত্রধর—অর্থাৎ মুখোস পরিবারের যারা ম্যাট্রিক পাশ করেছেন, তাদের মধ্যে অমল দত্ত—যিনি বর্তমানে পুরুলিয়া সরকারের বনবিভাগে এবং পশুপতি সূত্রধর—যিনি সরকারের ম্যালেরিয়া বিভাগে চাকরী করেন—তাদের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আরো কিছু ম্যাট্রিক পাশ আছে—যারা কিছুদিন আগেও সরকার থেকে বেকার ভাতা পেত।

সবার জন্য সব প্রতিমাই তৈরী করে এরা—তবে নিজেদের ঘরের দেবতা হল বিশ্বকর্মা—পাঁজির দিন মিললেই পুজো হয় ফি বৎসর। বিশ্বকর্মা এদের প্রত্যেকেরই উপাস্য, তবে প্রত্যেকে পৃথকভাবে পুজো করে না। প্রতি তিন-চার ঘর মিলিয়ে একটা পুজো হয়। এঁদের ধর্ম-বিশ্বাস বড় অদ্ভুত। এঁরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নন অথচ ছো-নাচ নাকি আদিবাসীদেরই এবং এঁরা তারই মুখোস তৈরী করে জীবিকা অর্জন করেন। কিন্তু সত্যই ছো-নাচ আদিবাসী সমাজের কিনা—এ নিয়ে সমাজেও দ্বন্দ্ব আছে।

তারপর হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় দেবতায় বিশ্বাস করেন এঁরা—যদিও বৃহত্তম উৎসব দুর্গাপুজো উৎযাপন করেন নিতান্তই নমো নমো করে; কিন্তু সেই সঙ্গে আদিবাসী সমাজের দেবতাতেও ভক্তি আছে। তাই বড় ঠাকুর মারাংবুরু-র থানে মাঘের ৩ তারিখে গ্রামের সব ভূমিজদের সঙ্গে এঁরাও সমবেত হন। এই ঠাকুরের পুজো গ্রামের উত্তর দিকে হয় সকাল বেলা। ঐ ঠাকুরকেই বিকালে দক্ষিণদিকে নিয়ে পুজো হয়—তখন নাম হয় ডুরকুরা বুরু। এই পুজো ভূমিজদেরই, তবে সবাই পয়সা দিয়ে সাহায্য করে। দেবতার কোন মূর্তি নেই—শুধু একখণ্ড পাথর।

পুরুত ঠাকুরকে বলে লায়া—ইনি ব্রাহ্মণ নন, ভূমিজ সমাজেরই একজন। বর্তমান পুরুতের নাম সর্দার লায়া। আগের পুরুতের নাম ছিল গাদি লায়া।

ভূমিজদের আর এক উৎসব হল গ্রাম পুজো। একটি শাল গাছকে পুজো করা হয়—তাহলে গ্রামের রোগব্যাধি কম হয়। পুজোটা ভূমিজদের হলেও অন্যরা সবাই এতে সাহায্য করে এবং অংশ নেয়। এটা হয় ফাল্গুন মাসে—কেননা বসন্তের প্রকোপটা হয় তখনই বেশী।

আর এক দেবতা হল ষষ্ঠী ঠাকুর ইনি এক প্রাচীন বট গাছ। পুজার দেবতা বলে সদাই সিঁদুর চর্চিত। সন্তান জন্মের পর পাঁচ দিনের মাথায় প্রসূতি, ধাত্রী ও শিশু একসঙ্গে আসে গ্রামের ষষ্ঠীতলায়। চিঁড়া-বাতাসা ভোগ দিয়ে পুজা দেয়। পুজোর পরে সবাই প্রসাদের ভাগ নেয়।

ওদের পুজোর থানগুলো একটু অদ্ভুত স্থানে। বাঁধানো পাকা সড়কের পাশে নির্মীয়মান মন্দিরের বারান্দা থেকে দূরে ধান ক্ষেত পেরিয়ে প্রান্তরের মধ্যে দেখা যাবে। চোখে পড়বে শুধু একটা বাঁধানো প্রাকৃতিক চত্বর—যেন হঠাৎ মাটি ঠেলে উপরে উঠেছে, তার ধারে একটা গাছ। এটাই হল দেবতা।

এই দেবতাকেই পুজো দেয় স্থানীয় নারী সমাজ। পুরুষদের জীবিকার সঙ্গে

তারা সহযোগিতা করতে পারে না, কারণ তাতে আস্থা কম। রুজি-রোজগারের কোন অভাব মেটে না তাতে। কিন্তু গ্রামীন দেবতার প্রতি তাদের আস্থা আছে বলেই, সেখানে ভক্তির প্রাচুর্যও আছে।

সৌজন্যবোধ এদের এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। কিংবা বলা যায় শহুরে নিয়মে এক নতুন ধরনের সৌজন্যবোধ গড়ে উঠেছে। তাই বেশীক্ষণ তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে চাইলে তারা হয়তো এক পেয়ালা চা-এর প্রস্তাবে দিয়ে বসতে পারে। তবে নিজেদের সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ করতে তাদের ক্লান্তি নেই। অবশ্য তার মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত অপ্রয়োজনীয় অ-তথ্যও থাকবে—এ কথা বলাই বাহুল্য।

কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে জানা গেল পুরুলিয়া শহরের মুখোস ব্যবসায়ীরা কিছুদিন আগেও এখান থেকেই মুখের ছাঁচ অর্থাৎ অর্ধসমাপ্ত মুখোসগুলি কিনে নিয়ে যেতো—ওখানে নিয়ে গিয়ে নিজের মত সাজিয়ে নিয়ে বিক্রী করত। এখন সে নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম হয়েছে। শহরেই অনেকে বসে বসে তৈরি করে নিচ্ছে এ' সব মুখোস। সে সব মুখোসের মান যে অত্যন্ত নিকৃষ্ট – সে কথা জানাতে ভুলবেন না এরা।

মুখোস বাজারের মন্দা রুখবার জন্য অফ-সীজনে এরা যাত্রার পোষাক নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছেন ইদানীং। পোষাক অর্থে অলংকরন সামগ্রী। এগুলিও শিল্পকর্ম এবং এদের জীবিকার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। তবে এ কাজ করেন তারা পেটের দায়ে, মন ভর না মোটেই।

আর দেখা পাওয়া গেল নির্মল সূত্রধরের—অপূর্ব তার পট অংকনের ক্ষমতা। তবে প্রথাগত পটের চর্চা তার অভ্যাস নয়। আধুনিক ক্যালেন্ডারের পৌরাণিক কাহিনীর ছবিই তার আদর্শ। মনে থাকবে বৃদ্ধ সতীশ সূত্রধরকে—একদা সূক্ষ্ম কাঠের কাজ করে সরকারী প্রশংসাপত্র পেয়েছিলেন। কাঠের পালংকে এত সুন্দর ফুলকারী নকশা—সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায়।

এই সব তথ্য সংগ্রহ করতে করতেই ঘণ্টা আড়াই সময় কেটে যাবে। বাসষ্টপেজে এসে দাঁড়াতেই হয়তো সকালের সেই 'ব্রজপুর' বাসটা এসে দাঁড়াবে। সঙ্গে সঙ্গে ওতে উঠে পড়া ভাল—কে জানে পরবর্তী বাস আবার কখন আসবে!

কতদিন আগেকার কথা এসব। সেই সব লোকগুলো এখন কী অবস্থায় আছে কে জানে! ছো মুখোসের আজ বিশ্বজোড়া খ্যাতি। কলকাতায় এ নিয়ে কত হৈ চৈ হয়। সরকারী পর্যায়ে কত ওয়ার্কশপ-সেমিনার হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কত আলোচনা হয়—আজ তা সবার পরিচিত এক সাধারণ বস্তু!

কিন্তু আমি সেদিন যা দেখেছিলাম, যেভাবে দেখেছিলাম—আজকের কোন লোক-সংস্কৃতি প্রেমিক কি সেভাবে আর সে গ্রামকে খুঁজে পাবেন! □

লোকউৎসব পালনের বা প্রবর্তনের উৎস
যে কোন সমীক্ষকের কাছেই এক
ভিন্নধর্মী আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে।
লোকসমাজের এই বিশেষ প্রকরণটি একাধারে অনেক
প্রকরণের যৌথরূপ হয়ে উঠতে পারে।
নিতান্তই দেব-দেবী ছাড়াও
কোন বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ
অতীত ঘটনা তার অন্যতম।
পরিযায়ী প্রবৃত্তির ফলে তার প্রচলন হওয়া
লোকসংস্কৃতির প্রসারের নিয়মে খুবই যুক্তিপূর্ণ।
কোন প্রশাসনিক বা সামাজিক বিরোধকে
স্থায়ীভাবে মীমাংসার জন্য
লোকউৎসব প্রবর্তন—এই কারণটিও কখনও বা কার্যকরী।
কিন্তু লোকউৎসবের সামাজিক তাৎপর্য বিচারে
এটাই কখনও শেষ কথা হতে পারে না।

লোকসাহিত্য-৪

প্রকৃতপক্ষে বিনোদনের জন্য উৎসব—
তা একটা সূত্র ধরে প্রবর্তিত
হয়ে গেলেই লোকজীবনের সঙ্গে তা ধীরে ধীরে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।
সুরু হয় তাকে কেন্দ্র করে মাহাত্ম্য প্রচার, গীত রচনা,
নাট্যাভিনয়, ছড়া-কাব্য ইত্যাদি হরেক বিনোদন।
এই ভাবেই কালের নিয়মে সেই
লোকউৎসব যত প্রাচীনতা অর্জন করে
ততই তার মধ্যে মিশ্রিত হয়
নানা ধরনের কিম্বদন্তী। সেই কিম্বদন্তীর—
সেই সঙ্গে জড়িত নানা সংস্কার লোকাচার প্রথা।
তার সত্যাসত্য, তার বিশ্বাসযোগ্যতা, তার প্রমাণসিদ্ধতা—
এগুলি তখন কোন বিবেচ্য বিষয় হয় না।
যে লোকউৎসব যত বেশী কিম্বদন্তীপূর্ণ—তা তত জনপ্রিয়।
এ ভাবেই পুষ্ট হচ্ছে লোকসাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটি।

রাবণ-কাটা রথ

এবার যাবো লালমাটির দেশ বাঁকুড়ার উৎসব দেখতে।

বাঁকুড়া জেলায় শহরের অতি নিকটে ওন্দা থানার অন্তর্গত তপোবন গ্রামের রাবণ-কাটা রথের মেলা এমনই এক অনুষ্ঠান। যেহেতু এটি রাবণ-বিষয়ক অনুষ্ঠান তাই এর সঙ্গে রাম-সীতার পূজাও প্রচলিত আছে - এবং সেটাই হল প্রধান অনুষ্ঠান।

এই গ্রামে উৎসবটির যে রূপ দেখা যায়। তাতে রামের গুরুত্ব আছে, রথটির গুরুত্ব আছে, কিন্তু অনুপস্থিত শুধু রাবণের মূর্তি। তাই স্থানীয় অঞ্চলে এটি একটি রথযাত্রা উৎসব মাত্র।

রথযাত্রা প্রসঙ্গে জগন্নাথের উৎসব হলেই এদেশে রথ উৎসবের প্রাসঙ্গিক নানা বৈচিত্র্যের কথা বলতেই হয়।

জগন্নাথ ছাড়া এদেশে আর যে দেবতা রথ বাহিত হন—তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে তারাপদ সাঁতরা প্রণীত 'বাংলার দারু ভাস্কর্য' গ্রন্থ হতে উধৃত হল ঃ

১. বাল্য রঘুনাথের রথ—দ. বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়া ২ রাধা গোবিন্দের রথ—গোপালনগর। বনগাঁ। ২৪ প, ৩. লক্ষ্মীনারায়ণের রথ—মাধবপুর। ওন্দা। বাঁকুড়া ৪. গোপীনাথের রথ—পাঁচমুড়া। তালডংরা। বাঁকুড়া ৫. ধর্মরাজের রথ—ভড়া (জৈষ্ঠ্যমাস)। বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়া ৬. বাউলদের রথ—বাঁকাদহ। বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়া ৭. মদনমোহন দেবের রথ—হরিশংকরপুর। ডোমকল। মুর্শিদাবাদ ৮ শুদ্ধভক্তি নিকেতনের রথ—কেশিয়াড়ী (চৈত্র-পূর্ণিমা) কেশিয়াড়ী। মেদিনীপুর ৯. মেদিনীপুর জেলায় নানা উপলক্ষে রথ বাহিত হয়। এমন কি পৌষ সংক্রান্তিতেও।

রাম-সীতার পূজা উপলক্ষে আলোচ্য গ্রামটিতে রথ যাত্রাউৎসব হয়—এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সেই সূত্রে বলতে হয়, ইদানীং কালে বহু লোকশ্রুতিবিদ যেমন বলছেন রামকথা প্রকৃত পক্ষে এ দেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত লোককথা মাত্র—মহাকবি বাল্মীকী সেগুলি একত্রে গ্রথিত করে কাব্যের রূপ দিয়েছিলেন—এ কথা বোধহয় বিশ্বাস করাই ভাল। নচেৎ কোথায় অযোধ্যা আর কোথায় বাঁকুড়ার ওন্দা গ্রাম। কারণ যেরূপ বলতে হয়—

এ গ্রামের নাম তপোবন। গ্রামের একটি অংশের নাম একদা ছিল নন্দন কানন—এখন তা নদীতে লুপ্ত হয়ে গেছে। লোকশ্রুতি হল সীতাকে দ্বিতীয়বার যে বনবাসে পাঠানো হয়—তা এখানেই। এখানেই সীতার দুই পুত্র লব-কুশ জন্মগ্রহণ করে। লক্ষ্মণ সীতাকে নদীর ওপর পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

এ গ্রামে রামপূজার এতই প্রাধান্য যে, দুর্গাপূজার ধুমধাম তেমন হয় না। রাম-সীতার সংকীর্তন হয়। রামায়ণ পাঠের আসর হয়—তবে সম্বৎসর হয় না।

কিন্তু বিশুদ্ধ রামভক্ত বলে কোন গোষ্ঠী এখানে নেই। অথচ 'রাবণ-কাটা রথ উৎসব' বহু প্রাচীন কালের এবং রাম-সীতার মন্দিরটিও তদ্রূপ। তা সত্ত্বেও কেন যে এখানে একটি রামভক্ত জনগোষ্ঠি গড়ে উঠল না বা তা সম্প্রসারিত হল না—এটা চিন্তার ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে এই রামসীতার মন্দিরের নির্মান ইতিহাসটা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হয়। কেননা এই মন্দির ও উৎসব সম্বন্ধে যে অজস্র কিম্বদণ্ডী ছড়ানো এটি তার মধ্যে অন্যতম।

অতীতে এই মন্দিরটি বর্তমান স্থানে ছিল না। এখন এটি লোকালয়ের বাইরে অপেক্ষাকৃত নির্জনস্থানে অবস্থিত, তখন ছিল গ্রামের মধ্যে। একদা কোত্থেকে রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী নামে এক সন্ন্যাসী এ গ্রামে আসেন এবং নদীর ধারে একটি নিরিবিলি স্থানে আশ্রম করে বসে। তিনিই এই মন্দিরের আদি নির্মাতা।

জনশ্রুতি হল, লোকজন কুলি-কামিন জুটিয়ে এনে তিনি মন্দিরের কাজ সুরু করে দিয়ে বেরিয়ে যেতেন বাইরে—ভিক্ষায়। সারাদিন ভিক্ষা করে যা পেতেন তা নিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এসে ঐ সব মজুরদের পারিশ্রমিক দিতেন। এই ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে মন্দিরের নির্মাণকার্য চলতে থাকে। একদা সেই সন্ন্যাসী ভিক্ষা অর্থাৎ সংগ্রহ করতে করতে বহু দূরবর্ত্তী গ্রামে চলে যান এবং ফিরতে অন্যান্য দিনের থেকে অনেক দেরী হয়ে যায়। তিনি মনে মনে অনুতপ্ত হন যে মজুররা তাদের পারিশ্রমিক না পেয়ে হয়তো রেগে গেছে বা বাড়ী চলে গেছে।

কিন্তু তিনি ফিরে এসে শোনেন মজুররা বলছে—সন্ন্যাসী ঠিক যথাসময়েই এসে তাদের সকলকে প্রাপ্য-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ দেবতা নিজে সন্ন্যাসীর মূর্তি ধরে ছলনা করে গেছে। এই ঘটনা তার পরেও ঘটতেই থাকে। সন্ন্যাসীকে অর্থ-সংগ্রহের জন্য ক্রমে আরো দূরবর্তী গ্রামে যেতে হল। তিনি যথারীতি সন্ধ্যা-কালে অর্থ নিয়ে ফিরে এসে শোনেন, শ্রমিকরা কেউ অভুক্ত নেই।

গ্রামের সকল মানুষ তখন এই মন্দিরের মাহাত্ম্য বুঝল। এবং বুঝল স্বয়ং রামচন্দ্র নিজে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করাচ্ছেন। এই অলৌকিক কথা ধীরে ধীরে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ল।

সে মন্দির আজ আর নেই। সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক কারণে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। পরিবর্তে আজকের মন্দিরটি পরবর্ত্তীকালে নির্মাতা হয়েছে।

মন্দির নির্মানের এই অলৌকিকতার পরিপ্রেক্ষিতে রাম-সীতার মন্দিরের বাৎসরিক পূজো এবং রাবণ-কাটা রথ যাত্রা উৎসবের বিবরণ আলোচনা করা প্রয়োজন।

স্থানীয় গ্রামাঞ্চলে একটি বড় উৎসব—তার নাম রাবণ কাটা রথ। উৎসবটি বিজয়া দশমীর দিন থেকে সুরু হয়। উৎসবটি যখন প্রবর্তিত হয় তখন সেটি চলত তিন দিন ধরে। কিন্তু উৎসবের ঘটা বাড়তে বাড়তে আজ তা আট দিনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তপোবন গ্রামে বর্তমানে যে রাম-সীতার মন্দিরটি আছে, তার বিবরণ হল—

রামায়ণের রাবণ বঙ্গ তথা ভারতীয় সমাজে চিরদিনই নেতিবাচক চরিত্ররূপে গৃহীত হয়েছে। মূর্তিমান অমঙ্গল রূপে তার এই ইমেজ তৈরীটা শুধু যে কৃত্তিবাস করে গেছেন তা নয়—এ দেশের প্রচলিত রীতি-নীতি সংস্কারও তার জন্য অনেকাংশে দায়ী। মাইকেল মধুসূদনই বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম—যিনি রাবণকে কিঞ্চিৎ সুবিচার করেছিলেন, তাও বিদেশী সাহিত্য পাঠের পরে—কিন্তু সে রাবণকে নিয়েও সমালোচক মহলে অনেক ঝড় উঠেছিল।

তাছাড়া মুখের কথায় রাবণের সিঁড়ি, রাবণের গুষ্টি, রাবণের চিতা প্রভৃতি শব্দগুচ্ছগুলি আমাদের বার বার রাবণ চরিত্রের একটি বিশেষ দিককেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। বাংলার প্রবাদ-ভাণ্ডার অনুসন্ধান করলে এমনতর বেশ কিছু প্রবাদ পাওয়া যাবে—যার নায়ক হলেন স্বয়ং রাবণ। বলা বাহুল্য যে, তার বিপরীতে রাম বিষয়ক প্রবাদ অবশ্য—সংখ্যায় অনেক বেশী।

রাবণ এ দেশে অশুভ শক্তির সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে, যার দ্বারা রাবণকে কেন্দ্র করে উৎসব করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন, তারাই পেয়েছেন বাহবা। এ বিষয়ে শ্রীরামচন্দ্রের স্থান অবশ্যই ভিন্নমেরুকে। তাই রাবণ হয়ে উঠেছে লোকাচারের অঙ্গ বিশেষ, কখনও বা লোকোৎসবের কেন্দ্রীয় চরিত্রও। এ বিষয়ে সর্বভারতীয় পরিসংখ্যানটা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ।

লোকউৎসবের ক্ষেত্রে রামচন্দ্রকে নিয়ে কী পরিমাণ হৈ-চৈ হয়, তার কোন বিশদ পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও—রাবণ যে লোকমানসে একটি স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে, বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাবণ বিষয়ক লোকউৎসবগুলি সমীক্ষা করলেই বোঝা যায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বলতেই হবে যে, রাবণকেন্দ্রিক উৎসব পরোক্ষে রাম ও রাবণ—এই উভয় চরিত্রেরই একপ্রকার জনপ্রিয়তাকে সূচিত করে। কেননা রাবণ-কেন্দ্রিক উৎসবের মুখ্য প্রবণতা হল—রাবণ স্মরণ নয়, রাবণ উৎখাত/বা প্রকারান্তরে শ্রীরামচন্দ্রকে স্থায়ী ও ইতিবাচক ব্যক্তিরূপে স্থাপন করা। তাই রাম-রাবণের এই দ্বন্দ্ব মহাকাব্যের সীমানা ছেড়ে আমাদের লোকউৎসবের প্রাঙ্গণে এক বিশেষ অর্থ নিয়ে দাঁড়ায়।

সর্বভারতীয় চিত্রের লোকউৎসবের সঙ্গেও রাবণের বেশ জনপ্রিয়তা আছে। এ বিষয়ে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র রামলীলা অনুষ্ঠানের কথা আসতেই পারে। রামযাত্রার দল লোকনাট্যের বিভিন্ন শাখায় রামের সঙ্গে রাবণও যে সমপরিমাণে গৃহীত হয়েছে—এ কথাও সবার জানা। এমন কী বঙ্গীয় পটুয়া সমাজও রাবণকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারেনি। শুভাশুভের দ্বন্দ্বের জন্যই যে তাকে প্রয়োজন। অবশ্য রাবণকে প্রায় অলক্ষ্মীর দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করলেও, তার প্রকৃত গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করেন না।

দৈর্ঘ্য-প্রস্থে মন্দিরটি প্রায় ১২ ফুট করে বর্গাকৃতির এবং উচ্চতায় আনুমানিক ১৫ ফুট। মন্দিরটি একতলা। মন্দির সংলগ্ন জমিটি চারিপাশে প্রাচীর-দেওয়া প্রাঙ্গনে দু'একটি গাছ আছে, গোড়াটি বাঁধানো। মন্দিরের প্রধান দ্বারের সামনে একটি নাতিবৃহৎ নাটমন্দির আছে।

পুরোহিত মহাশয়ের বিবরণ অনুযায়ী, এখন থেকে ৭৯ বৎসর আগে মন্দিরটির প্রথম সংস্কার হয়। তারপর সাম্প্রতিক কালে হয় একবার। সাম্প্রতিক সংস্কারের ফলে মন্দিরটির পুরাতন শ্রী একেবারেই অবলুপ্ত হয়েছে। পরিবর্তে এসেছে খুব স্থূল শিল্প কাজ। মন্দিরের বর্গাকৃতি ছাদের চারিটি কোণে চারিটি সাপের মূর্তি আছে—এটি আধুনিক কালের সংযোজন। যে সন্ন্যাসীর উৎসাহে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তার নাম নাকি এই মন্দির গাত্রের কোন অংশে খোদিত আছে—কিন্তু সাধারণভাবে সেটা চোখে পড়ে না।

অতীতে এই মন্দিরে আড়াই কেজি ওজনের আটধাতুর রাম-লক্ষ্মণ-সীতার মূর্তি ছিল। সেই মূর্তি চুরি যাওয়ার পর পিতলের মূর্তি পুরী থেকে আনা হয়। পরে সেটিও চুরি হয়ে যায়। বর্তমান পাথরের মূর্তিটি উত্তর প্রদেশ থেকে আনা হয়। তবে সেই অতীতে রাম-সীতার সঙ্গে যে পাথরের হনুমান-মূর্তি ছিল—তা আজও আছে।

যে রথটি বর্তমানে প্রচলিত আছে ঃ তার আদিরূপ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সেটি বলে ;

কোন এক দম্পতি পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দেখার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়েছিল। তারপর তারা স্বপ্ন দেখেন রামচন্দ্রকে। তিনি বলছেন—'তোদের পুরী যাবার দরকার নেই। এই গ্রামেই যদি তোরা রথ দেখতে চাস, তবে অমুক তারিখে রাত্রে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে যাবি। দেখবি নদীর জলে একটা বড় গাছ ভেসে আসবে। রামচন্দ্রের নাম করে জলে নেমে পড়বি। দেখবি গাছটি তোদের হাতের কাছে চলে আসবে। তোরা সেই গাছ থেকে কাঠের রথ তৈরী করিয়ে বিজয়া দশমীর দিন থেকে আমার মন্দিরে চালাবি। তাহলেই তোদের জগন্নাথের রথদর্শন হবে।'

কাঠের রথকে পিতলের রথে পরিণত করার কৃতিত্ব কুলদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের। একদা জমি-জমা সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি মামলা করেছিলেন। তখন রামচন্দ্রের কাছে মানসিক করেন যে যদি তিনি এই মামলায় জয়লাভ করেন তাহলে কাঠের রথের পরিবর্তে পিতলের রথ গড়িয়ে দেবেন। ঘটনাচক্রে তিনি মামলায় জয়লাভ করেন এবং তখন এই পিতলের রথ তৈরী হয়।

মন্দিরের প্রকৃত রক্ষাকর্তা হ'ল এক দুধে খরিস সাপ। এ সম্বন্ধে জনশ্রুতি হল, সেই দুধে খরিস সাপটি রামচন্দ্রের মন্দির থেকে বুড়া শিবের মন্দির পর্যন্ত চলাচল করত। বুড়া শিবের মন্দিরটি আলোচ্য রাম-সীতার মন্দিরের একটু দূরে অবস্থিত। সেটি বর্তমানে পরিত্যক্ত না হলেও অযত্ন রক্ষিত। ঐ দুধে খরিস সাপকে কখনও দেখা গেছে যে রামচন্দ্রের সিংহাসনে পাক দিয়ে ফণা তুলে বসে আছে।

আবার কখনও বা পূজারত পুরোহিতের গা থেকে নেমে আসছে—এ দৃশ্য এ গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিরা দেখেছেন। এসব ঘটনা মাত্র পঞ্চাশ বৎসর আগেকার।

রাম-সীতার মন্দিরটি একতলা। তাই গ্রামে একটিও দোতলা বাড়ী নেই। লোকেরা বিশ্বাস করে যে তাদের বাড়ী যদি দেবগৃহ অপেক্ষা উঁচু হয়, তবে তাতে অমঙ্গল হবে। তাই আজ পর্যন্ত এই গ্রামাঞ্চলে একতলার অধিক পাকা বাড়ী কেউ নির্মাণ করেন না।

প্রথমে রথযাত্রা উৎসবটা চলত তিনদিন ধরে। কিন্তু বর্তমানে তাঁর স্থিতি হল আটদিন। এর কৃতিত্ব বিষ্ণুপুরের রাজাদের তথা মদনমোহনের। কেননা একদা বিষ্ণুপুরের 'মদনমোহন' ঠাকুরকে আনা হয় এখানকার রামসীতার মন্দিরে। সেই মাহাত্ম্যে মেলার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় ও মেলায়ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। বিষ্ণুপুরের মদনমোহনকে নিয়ে একটা কিম্বদন্তী আছে।

মেলা শেষ হয়ে যাবার পর বিষ্ণুপুরের রাজা মনস্থ করেছিলেন যে মদনমোহনের সঙ্গে তিনি রামচন্দ্রকেও বিষ্ণুপুরে নিয়ে যাবেন। সেই পরিকল্পনা করে রাম-চন্দ্রের সিংহাসন সমেত রাম-সীতা লক্ষ্মণের মূর্তি তিনি হাতির পিঠে চাপিয়ে-ছিলেন। কিন্তু হনুমানজীকে তুলতে পারা গেল না। অগত্যা হাতী তার শুঁড় দিয়ে চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। তখন বিষ্ণুপুরের রাজা গ্রামবাসীদের বলে-ছিলেন যে রামচন্দ্রের বিষ্ণুপুরে যাবার ইচ্ছা নেই—তাই তিনি এভাবে অমত করছেন। সুতরাং তিনি তপোবনেই থাকুন। কাজে কাজেই হাতীর পিঠ থেকে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের মূর্তি নামিয়ে আবার মন্দিরে স্থাপন করা হয়।

বিজয়া দশমীর দিন বিকালে গ্রামের রথঘর থেকে রথকে বার করে মন্দিরের সামনে আনা হয়। তারপর প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে এবং হনুমানজীকে রথের উপর বসিয়ে মন্দির থেকে কিছুদূরে রথ টেনে যাওয়া হয়। ভক্তরা যথারীতি রথের রশি স্পর্শ করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পরে রথটি আবার মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই ভাবে রথ টানা হয় প্রতিদিনই।

শেষ দিনে অর্থাৎ অষ্টম দিনে রথকে মন্দির থেকে টেনে রথঘরের সামনে নিয়ে আসা হয়। রথ থেকে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার ও হনুমানজীর মূর্তিকে নামিয়ে কোলে করে মন্দিরে পুনঃস্থাপন করা হয়। রথ পড়ে থাকে রথঘরের সামনে পরের দিন সকালে সেটা আবার রথঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

শেষ চারদিন মেলায় বেশ ভীড় হয়। পাশাপাশি বা দূরের গ্রাম থেকেও লোক সমাগম হয়। এ গ্রামে একটা সংকীর্তনের দল আছে—তারা এই আটদিন মন্দির প্রাঙ্গণে রাম-গান করে।

মেলার তৃতীয় দিন দুপুরে পাশাপাশি সব গ্রামের লোককে, যারা মন্দিরে আসে—সকলকে বসিয়ে পেট ভরে রামচন্দ্রের প্রসাদ খাওয়ানো হয়। এ সময়ে লোকের বড় ভীড় হয়। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকের ও সরকারী পক্ষের কিছু লোক নেই

ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে। কয়েকশো লোককে খাওয়ানোর জন্য মন্দির প্রাঙ্গনে বিশাল বিশাল উনান তৈরী হয়। মন্দিরের পিছনের অংশটা এ জন্য ভাণ্ডার রূপে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ খিচুড়ি, তরকারী, পায়েস, চাটনী, মিষ্টি দিয়েই সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়। খরচ বহন করেন গ্রামবাসীরা ও বাইরের চাঁদা। গ্রামটি বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন হওয়ায় এ ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

রথটি বর্তমানে হতশ্রী হয়ে পড়েছে। পিতলের পাতগুলি খুলে যাচ্ছে। নীচের দিকে দু'এক জায়গায় তা লেগে আছে বলে অনেক কষ্ঠে রথের প্রাচীন-রূপটি বুঝে নিতে হয়। তার রথের কাঠামোটি লোহার তৈরী ও রীতিমত ভারি বলে তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে বলে মনে হয়। উচ্চতার প্রায় ১২-১৩ ফুট এবং দৈর্ঘে-প্রস্থে ৬ ফুট করে। তিনটি তলায় বিভক্ত—উপরের তলায় থাকেন দেবতা। তবে সামগ্রিক ভাবে রথটি নিতান্তই আটপৌরে—উল্লেখ করার মত বিশেষ কিছু নেই। অতীতে এর গায়ে অনেক নকশা-অলংকরণ ছিল, আজ সব স্মৃতি হয়ে গেছে। তবে উৎসবের দিনে যখন আবার রথটিকে ভাল ভাবে সাজানো হয়, তখন এর কিছুটা সৌন্দর্য বাড়ে—কিন্তু সে তো বৎসরের কয়েকটা দিন মাত্র।

এই রথটির সাধারণ নাম 'রাবণ কাটা রথ'। এই নামকরণের ব্যাখ্যা হল, রামচন্দ্র অকাল-বোধন অনুষ্ঠানের পর দেবীর আশীর্বাদ দিয়ে এই রথে করে রাবণকে বধ করতে বা কাটতে গেছিলেন।

তপোবন গ্রামের রথোৎসবের সঙ্গে রাম-সীতার মন্দির ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকায় উভয় বিষয়েই এখানে অসংখ্য কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেবমূর্তি, মন্দিরের পুরোহিত, ও হনুমানজী সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী। তার দু' একটি এখানে বর্ণিত হল।

রথোৎসবের সময় প্রতিদিন সন্ধ্যায় আরতি হয়। তখন প্রতিদিন হনুমানজী বামুন মা'র মাথায় ভর করেন। বর্তমানে এই বামুন মা-ই মন্দিরের পুরোহিত। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তিনিই রামচন্দ্রের পূজারীর পদ গ্রহণ করেন। তিনি অশিক্ষিতা অতি সাধারণ নারী। সাধারণ লোকের মনে এটাই প্রশ্ন যে তিনি অশিক্ষিতা হয়েও কি করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। এ বিষয়ে কিম্বদন্তী হল, পূর্বতন পূজারী ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ বর্তমান বামুন-মা যখন মন্দিরের ভার গ্রহণ করলেন—তখন স্বয়ং হনুমানজী প্রতিদিন রাত্রে সন্ন্যাসীর বেশে তাঁর গৃহে গিয়ে তাকে পূজার মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। পূর্বতন পুরোহিতের নাম স্বর্গীয় রজনী চক্রবর্ত্তী। কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়—এ সম্বন্ধে স্থানীয় কিম্বদন্তী হল—

কোন এক গ্রামে এক অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করার জন্য তিনি গেছিলেন। অশুচি বস্ত্রেই তিনি ফিরেছিলেন—কারণ ঐ বাড়ীতে সংক্রামক রোগী ছিল। তিনি মনে করেন রাত্রি হয়ে গেছে, রামচন্দ্রের পূজা সেরেই বাড়ী যাই। তাই কাজ সংক্ষেপ করার জন্য পূজার নিয়ম লংঘন করে তিনি ঐ ভাবেই মন্দিরে প্রবেশ করেন

তার কাছে তিনটে দেশালাই কাঠি ছিল। কিন্তু একে একে তিনটি কাঠিই নষ্ট হয়ে গেল—প্রদীপ জ্বলল না। তিনি ঐ অন্ধকারেই কোনমতে পূজা সেরে ঘরে ফিরলেন। তারপরেই অসুস্থ হলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

হনুমানজী সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী হল, একদা বামুন-মার বসন্ত হয়। তখন হনুমানজী প্রতিদিন রাত্রে বামুন-মার বাড়ী গিয়ে তাঁকে 'ঝাড়ফুঁক' করে আসতেন। এই ভাবে কয়েকদিন করার পর বামুন-মা সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এক বছর বর্ষার সময়ে নদী স্ফীত হয়, বন্যার আশংকা দেখা দেয়। গ্রামবাসীরা সবাই রামচন্দ্রের মন্দিরে এসে আশ্রয় ভিক্ষার জন্য দেবতার কাছে ধর্না দেয়। মন্দির ব্যতীত সমগ্র গ্রাম তখন জলমগ্ন। পরে দেখা যায়, বন্যার জল কমতে সুরু করেছে। জল কমলে পরে গ্রামবাসীরা যে যার নিজের গৃহে ফিরে আসে।

পরের দিন পূজারী পূজা করতে এসে দেখেন, যে হনুমানজীর সর্বাঙ্গে কর্দমলিপ্ত। ঐ নদীর কোন এক স্থানে একটা উঁচু বাঁধ ছিল। হনুমানজী স্বয়ং ঐ বাঁধ ভেঙে দেন। ফলে জল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও গ্রামটি জলমুক্ত হয়। তাই হনুমানজীর গায়ে কাদা লেগে ছিল।

প্রতি রবিবার হনুমানজীকে স্নান করানো হয়। স্নানের জলকে বলা হয় 'মগরার জল'। গ্রামবাসী ও সমবেত ভক্তরা নিজের মঙ্গলের আশায় ভক্তি ভরে সেই মগরার জল পান করে থাকেন।

পূজায় অবহেলা কী হলে পরিণতি হয়, তার একটি বিবরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে আরেকটি জনশ্রুতি হল ঃ

একদা এক দম্পতি বিবাহের পর মন্দিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেবতাকে প্রণাম করতে ভুলে যায়। পরে কিছুদূর যাবার পর পাত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তাদের মনে পড়ে যে মন্দিরে প্রণাম করতে তারা ভুলে গেছিল। মন্দিরের মাটি আনবার জন্য তারা একজন লোক পাঠায়। দূত মন্দিরে এসে দেখে যে মন্দিরের দরজায় সেই দুধে খরিস সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সে মন্দিরের মাটি সংগ্রহ করতে গেলেই সাপ তাকে ছোবল মারতে যায়। যতবার সে মাটি নিতে প্রবৃত্ত হয়, ততবার একই কাণ্ড ঘটে। এইভাবে অনেকক্ষণ সময় অতিবাহিত হবার পর সে কিছুটা মাটি মন্দিরের দরজার সামনে থেকে নখের ডগায় করে নিয়ে যেতে পারে। ঐ মাটিটা পাত্রের মুখে ঠেকানো মাত্র পাত্র সুস্থ হয়ে ওঠে।

সপ্তাহে দুইদিন পাথর বাটিতে করে দুধ ও কলা মন্দিরের মধ্যে সাপের খাদ্য—এটিও জনশ্রুতি হিসাবে রেখে দেওয়া হত। বর্ত্তমানে এই প্রথা প্রচলিত আছে কিনা—তা জানা নেই।

সাপের ব্যাপারে আরো নানা কাহিনী ঐ স্থানে প্রচলিত আছে। তার সঙ্গে এই রাবণ-কাটা-রথ উৎসবের বা রাম-সীতার মন্দিরের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। কিন্তু—রথ রামসীতার মন্দির এবং শিবমন্দির—এই তিনটিই এমন পরস্পর

নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত যে, এইসব কিম্বদন্তী খুব সহজেই পরস্পর সন্নিবদ্ধ হয়ে গেছে। রামসীতার মন্দির, বুড়ো খরিস সাপ ও শিবমন্দির নিয়ে এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় একটি কিম্বদন্তী হল—

গ্রামে যে বুড়ো শিবের মন্দির আছে, সেই মন্দিরের পূজা করতেন স্থানীয় ঘোষাল বংশের লোকেরা। শোনা যায়, ঘোষাল পুরোহিত প্রতিদিন পূজার পর এই শিবমন্দির থেকে একটা করে মুদ্রা পেতেন। এইভাবে তার সংসার চলত। কিন্তু তার মনে জাগল লোভ। একদিন তিনি লাঠি দিয়ে বুড়ো-শিবের মাথায় আঘাত করলেন। বললেনঃ 'একটা করে আর সংসার চলে না। আরো বেশী করে টাকা দাও। আঘাত করার পর থেকে তার দৈনন্দিন টাকা পাওয়াটাও বন্ধ হয়ে গেল এবং অল্প দিনের মধ্যেই এক দুরারোগ ব্যাধিতে ঘোষাল পুরোহিত মারা গেলেন। এ জন্য বুড়ো শিবের মন্দিরকে অনেকে বলত টাঁকশালী—কারণ এখানে টাকা পাওয়া যেত। কেউ কেউ নাকি টাকা ছড়ানো আছে—দেখতে পেয়েছিল। এই বিশ্বাসটা অবশ্য ঘোষাল পুরোহিতের মৃত্যুর পর প্রচারিত হয়েছিল।

অতিরিক্ত লোভের ফলে ঘোষাল মশায়ের মত এক জেলেরও ঐ অবস্থা হয়েছিল। সে মাছ ধরতে যাবার সময়ে দেখে মন্দিরের মধ্যে অনেক টাকা পড়ে আছে। সে লোভেয় বশীভূত হয়ে সব টাকা তার মাছ ধরার খালুইয়ের মধ্যে ভরে নেয়। বাড়ী এসে দেখে, তার খালুইয়ে টাকার পরিবর্তে সাপ ভর্তি।

মন্দিরের দেব-মূর্তি অপহরণ সংক্রান্ত একটি কিম্বদন্তী হল প্রথমে মন্দিরে যে আড়াই কেজি ওজনের অষ্টধাতুর রাম-লক্ষ্মণ-সীতার মূর্তি ছিল, চোরেরা তা চুরি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। পরে কোন এক সময়ে চোরেরা সেই মূর্তি চুরি করে—কিন্তু তপোবন গ্রামের সীমা পার হতে পারে না। কারণ তারা সীমান্ত অতিক্রম করার পূর্বেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। পরে সেই চোরেরা ভক্তি ভরে রামচন্দ্রকে উপাসনা করে তাকে তুষ্ট করে—তখন তারা দৃষ্টি ফিরে পায়।

পরবর্তীকালে আর একবার দেবমূর্তি অপহরণের ঘটনা ঘটে। সেবারে চোরেরা মূর্তিটি অপহরণ করে ও সেটি বিক্রী করবার পূর্বে আগুনে গলিয়ে ফেলে। যে স্যাকরা ঐ মূর্ত্তি গলাবার কাজ করেছিল, ঘটনার কয়েক দিন পরে সে সমূলে নির্বংশ হয়ে যায়।

মন্দির এরপর মূর্ত্তি-শূন্য হয়ে পড়লে তখন পুরী থেকে পিতলের মূর্ত্তি এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। দুর্ভাগ্যের কথা, সেটিও এক সময়ে চুরি হয়ে যায়। এর পর দীর্ঘদিন এখানে কোন দেব-বিগ্রহ ছিল না, শুধু পট পূজা হত। বর্তমানে যে পাথরের রাম-সীতা মূর্ত্তিটি এখানে আছে—তা সাম্প্রতিক কালের।

মন্দিরের পুরোহিত বা বামুন-মা সম্বন্ধে আর একটি কিম্বদন্তী হলঃ সন্ধ্যা আরতির সময়ে হনুমানজী যখন বামুন-মার মাথায় ভর করেন, তখন বামুন-মা'র 'ঝাপান' এসেছে বলা হয়। কথাটা পূর্ব-প্রচলিত 'ভর' হওয়া-র সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। সেই সময়ে যে ভক্ত বামুন মা-কে তার মনের সুপ্ত বাসনার কথা জিজ্ঞাসা

করে, তিনি তার সেই সুপ্ত বাসনা পূর্ণ হবে কি হবে না—তা বলে দিতেন।

এইসব কিম্বদন্তী নিয়েই এই রথযাত্রার মাহাত্ম্য, রাম-সীতার মাহাত্ম্য ও পুরোহিতের মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়েছে। লোকনায়ক রূপে রামচন্দ্রের খ্যাতি সারা ভারতেই। শব্দটির বহুবিধ ব্যবহারই তার প্রমাণ।

আলোচ্য উৎসবটি যে গ্রামে হয়, তার সঙ্গে রামনামের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলেও 'তপোবন' শব্দটি দিয়ে তার ইঙ্গিত বোঝানো হয়েছে। এ গ্রামের একটি অংশেই যে একদা পুরান-প্রসিদ্ধ নন্দনকানন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—এ কথাও পূর্বে বলা হয়েছে।

স্থান-নাম হিসেবে রামচন্দ্র এদেশে একটি অতি জনপ্রিয় নাম। বিশেষতঃ বাংলাদেশে রামপুর, রামডাঙ্গা, রামনগর, রামদহ, রামতলা, ইত্যাদি হাজারো নাম খুবই প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে কলকাতা শহরের একটি অংশ রামবাগান এবং কলকাতার অনতিদূরে শ্রীরামপুরের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রী অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাংলার গ্রামের নাম' গ্রন্থে জেলাওয়ারী 'রাম' যুক্ত গ্রামের নামের তালিকা আছে।

বিস্ময়ের বিষয় হল, রামচন্দ্রের এত জনপ্রিয়তা শুধু এই গ্রামটিতেই সীমাবদ্ধ নয়। বাঁকুড়া জেলায় ওন্দা থানায় কিন্তু রাম বা রামবাচক গ্রাম-নামের সংখ্যা একটু বেশীই। তার মধ্যে রঘুনাথপুর নামক দুটি গ্রাম এবং রামার গ্রাম—এগুলি খুবই নিকটে, প্রায় এক মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। এই থানাতেই আছে রামার চুন পুরান, রামকৃষ্ণপুর, রামনগর, রামপুর, রামসাগর। সবচেয়ে উল্লেযোগ্য হল, এই থানাতেই আছে অঙ্গদপুর গ্রাম।

সংলগ্ন বাঁকুড়া থানাতেও আছে রঘুনাথপুর, রামডিহি, রামজীবনপুর, রামপুর, রামনগর প্রভৃতি গ্রাম এবং সংলগ্ন বড়জোড়া থানায় আছে রঘুনাথপুর, রামচন্দ্রপুর, রামহরিপুর, সীতারামপুর প্রভৃতি। এই সব নামকরণ দেখে যদি কেউ এই গ্রামে রামচন্দ্রের জনপ্রিয়তার কারণ বা উৎস অনুসন্ধান করতে চান—তবে তাতে আশ্চর্যের ব্যাপার নেই কিছু।

সম্ভবত এই জন্যই এ গ্রামে রথযাত্রাটি জগন্নাথদেবের জন্য হয় না, হয় রামায়ণের রাবণের স্মরণে। এমন কি বাঙ্গালীর সেরা উৎসব দুর্গোৎসব ও হয় না এ গ্রামে—হয় রামচন্দ্রের উৎসব।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন মনে জাগে যে, যে রাবণকে কেন্দ্র করে এই রাবণ-কাটা রথ বা রথযাত্রা—সেই রাবণের কিন্তু কোন প্রাধান্যই নেই এই উৎসবে। মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে রাবণ কাটা উৎসব বা বিষ্ণুপুরে রাবণবধ উৎসবে কিন্তু মূলতঃ রাবণেরই প্রধান্য—সেখানে রামচন্দ্র প্রায় নেপথ্যেই থাকেন। তপোবন গ্রামের ক্ষেত্রে তার প্রায় বিপরীত। ফলে রামের বিপরীত শক্তিরূপে রাবণের অস্তিত্বটা নিছকই কল্পনায় থেকে যায়। কেননা, যার নামে উৎসব, তারই কোন মূর্ত্তি নেই।

এই উৎসব সম্বন্ধে আরো কিছু চিন্তা করবার আছে। বহুদিনের পুরাতন

এই লোকউৎসব সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হল—রথ, উৎসবের প্রাচীনতা, রাবণ বিষয়ক উৎসব। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে 'বাংলার দারুভাস্কর্য' গ্রন্থে তারাপদ সাঁতরা মহাশয় 'রথ' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে কাঠের বা ধাতুর নির্মিত রথ কোথায় আছে যে সম্বন্ধে সঠিকই আলোচনা করেছেন ও তালিকা প্রণয়ন করেছেন। সেখানে রথযাত্রার বৈশিষ্ট্য নিয়েও আলোচনা হয়েছে—এ 'কথা এই প্রবন্ধে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য রথটির সম্বন্ধে সেখানে কোন উল্লেখ নেই। যদিও এই রথটির প্রায় একশ' বৎসর হয়ে এলো।

দ্বিতীয়তঃ লোকনৃত্য ও লোকসংস্কৃতিবিদ মণিবর্ধন মহাশয় তার 'বাংলার লোকনৃত্য ও গীতি-বৈচিত্র্য, গ্রন্থে এ দেশের হরেক রকম লোকগীতি, লোকউৎসব ও লোকনৃত্যের সন্ধান দিয়েছেন। বিষ্ণুপুরের রাবণ-বধ উৎসব ও খড়গপুরের রাবণ-কাটা উৎসবের তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু সেখানেও এই রাবণ-কাটা উৎসবের কোন উল্লেখ নেই—যদিও এই অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি নির্বাচিত স্থানেই মাত্র হয়।

তৃতীয়তঃ পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক পর্য্যালোচনার ক্ষেত্রে বিনয় ঘোষের 'পশ্চিম-বঙ্গের সাংস্কৃতি' গ্রন্থটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য অনেক স্থানের মত বাঁকুড়া জেলার নানা বিষয়ের উল্লেখযোগ্য আলোচনা আছে এখানে। কিন্তু এই প্রাচীন উৎসবটির সম্বন্ধে সেই গ্রন্থে কোন তথ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

চতুর্থতঃ সবচেয়ে বেশী হতাশা সৃষ্টি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বন ও মেলা' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডটি। এ দেশের মেলা ও পূজা-পার্বন সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলি সবই ছিল ব্যক্তিগত একক প্রচেষ্টার ফসল। ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী নির্বাচন সেখানে একটি বড় প্রশ্ন ছিল। সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত এই গ্রন্থমালায় প্রতিটি জেলার থানা-ওয়ারী মেলা ও পার্বনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার অন্যান্য অনেক উৎসব সম্বন্ধে সেখানে উল্লেখ থাকলেও এই উৎসব সেখানে নিতান্তই অপাংক্তেয় হয়েছে।

কেউই যখন এটিকে তেমন উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেন না—তখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে সত্যই কি এই রাবণ-কাটা রথ, রাম সীতার মন্দির ও মেলা—এগুলির কোন গুরুত্বই নেই? আগে আট দিন ধরে যখন মেলা চলত, তখন খোদ বাঁকুড়া শহর থেকেই তো কত লোক যান সেখানে। এ ছাড়া তপোবন গ্রামের সংলগ্ন অঞ্চলগুলির কথা না হয় বাদ দেওয়াই গেল। এত হৈ চৈ মনোহারী দোকান, নানান গ্রাম্য বিনোদন ব্যবস্থা—এসব কিছুই কি পর্যবেক্ষকদের নিকট তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়নি? মনে রাখতে হবে, বাঁকুড়ার বিখ্যাত সোনাতপল মন্দির এই গ্রামের পাশেই অবস্থিত। সে হিসাবেও তো এই গ্রাম বা আলোচ্য উৎসব বহুল প্রচারিত হতে পারে।

কিন্তু ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের এক সংবাদপত্রে এই তপোবন গ্রামের উৎসব সম্বন্ধে যে

সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, তা হল ঃ 'শহর বাঁকুড়া হইতে পূর্বদিকে অনুমান দেড় ক্রোশ অন্তরে দারুকেশ্বর নদী তীরে তপোবন নামে এক স্থান প্রসিদ্ধ আছে। সেখানে প্রতি বৎসর বিজয়া দশমীর দিনে রঘুনাথ দেবের রথ হইয়া থাকে। তাহাতে অনেক লোক যাত্রা হয়...' ইত্যাদি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে এই সংবাদটি সংকলন করেছিলেন বলে এতদিন পরের এই গ্রাম ও পূজার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কিন্তু জানা গেল।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে উক্ত সংবাদে এই উৎসবকে বলা হয়েছে 'রঘুনাথদেবের রথ' —এবং বর্তমানে বলা হয় 'রাবণ কাটা রথ'। কিভাবে এই নামকরণটি পরিবর্তিত হল এবং রামের জায়গায় রাবণ চিহ্নিত হলেন এটিও একটি অনুসন্ধানের ব্যাপার, যদিও দুটি শব্দের মূল অর্থ এক, কিন্তু লোকপ্রিয়তার ক্ষেত্রে তার মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট।

আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—আর কোন মেলা-মন্দির-দেবতাকে ঘিরে বোধহয় এত কিম্বদন্তী রচিত হয়নি। মেলা-মন্দির-দেবতাকে নিয়ে উপরে যে সব কাহিনী বিবৃত হয়েছে, বিশ্লেষণ করলে তা থেকে নিম্নোক্ত রূপ ও সংখ্যার কিম্বদন্তী পাওয়া যাবে—

১. 'তপোবন' গ্রাম-নাম বিষয়ক, ২. মন্দির নির্মানের কিম্বদন্তী, ৩ রথ চালানো বিষয়ক, ৪ দুধে খরিস সাপ বিষয়ক, ৫. বিষ্ণুপুরের মদনমোহন দেবতার কাহিনী, ৬. হনুমানজী ও বামুন-মা বিষয়ক, ৭. পূজারীর রহস্যময় মৃত্যু বিষয়ক, ৮. হনুমান ও 'ঝাঁড়ফুঁক বিষয়ক. ৯. হনুমান ও নদীর বন্যা বিষয়ক, ১০. নববিবাহিত দম্পতির কাহিনী, ১১. পুরোহিতের লোভের পরিণাম, ১২. টাকার পরিবর্তে সাপের কাহিনী, ১৩. মূর্তি চুরির ঘটনা ঃ প্রথমবার ১৪. মূর্তি চুরির ঘটনা—দ্বিতীয়বার, ১৫. হনুমানজী ও বামুন মা-র 'ভর'।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে তিনটি সূত্র ধরে এই প্রবন্ধের যাবতীয় বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে—একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, একজন অবসর প্রাপ্ত সরকারী চাকুরে এবং ওই মন্দিরের পুরোহিত-এর মাধ্যমে প্রতিবারেই কিম্বদন্তীর সংখ্যা ও রূপ কিছু না কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে যদি বিবরণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা করা হোত—তবে বোধহয় এই কিম্বদন্তীর রূপ ও সংখ্যা আরও পরিবর্তিত হত।

উপসংহারে তাই বলা যেতে পারে, কোন সমাজ বিজ্ঞানী এই মেলার বা দেবতার বা রথের বা সর্বোপরি উৎসবের কথা উল্লেখ না করলেও কিম্বদন্তীর আশ্রয়েই বাঁকুড়ার ওন্দা থানার তপোবন গ্রামের এই রাবণ-কাটা-রথ উৎসব আরো কিম্বদন্তী আশ্রিত হয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে। নবযুগে কিম্বদন্তী যত কম নির্মিত বা প্রচারিত হবে, প্রাচীন কালের কিম্বদন্তীগুলিই তত বেশী পরিচিত হয়ে ভক্তমনে মোহিনীমায়া বিস্তার করবে। ☐

'জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে
তিন বিধাতা নিয়ে—'
কথাটা পুরোপুরি বোধহয় সত্য নয়।
কেননা বিয়ে পর্বটা পুরোপুরি বিধাতা নিয়ন্ত্রিত নয়,
তার অনেকাংশ মানুষ নিয়ন্ত্রিত।
তাই জন্মের সময়ে বা মৃত্যুর সময়ের
সমস্ত ক্রিয়া-কলাপগুলি
বিধাতার হাতে ছেড়ে দিলেও,
বিবাহ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় মানুষ বোধহয়
পুরোপুরি বিধাতার হাতে তুলে দিতে চায় না।
তাই তাকে কেন্দ্র করে সে
গড়ে তোলে নানা রকম আচার-বিশ্বাস-প্রথা-সংস্কার।
তার কিছু প্রয়োজনীয়, কিছু বা অপ্রয়োজনীয়।
কিন্তু এক সময়ে দেখা যায় অপ্রয়োজনীও হয়ে পড়েছে প্রয়োজনীয়।

লোকপ্রথা-৪

'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান'-এর
দেশ এই ভারত তথা বঙ্গ তথা
এই বঙ্গের বিচিত্র লোকচার।
একমাত্র এই বিবাহকে কেন্দ্র করেই বোধহয়
সবচেয়ে বেশী লোকাচার পালিত হয়—
কেননা এর আনন্দ তাৎপর্য প্রভৃতি যাদের কেন্দ্র করে হয়,
তারা প্রত্যেকই প্রাপ্ত বয়স্ক—
শিশু বা জরা কবলিত নয়।
তাই বিবাহ নামক সেই মানুষ উৎসবের
ক্ষণ-মুহূর্তটিকে দীর্ঘায়িত করার জন্য
গড়ে তোলে নানা ক্রিয়া-পদ্ধতি-লোকচার-প্রথা।
যত মত তত পথ।
এত লোকাচার তথা লোকপ্রথা—
তাই সহজেই 'এর' লোকচার মিলে যায় 'ওর' অনুষ্ঠানেও।

বেলেডাঙ্গার বিয়ে বাড়ি

সমস্ত ঘটনাটাই খালেদের ইচ্ছাতেই হয়েছিল।

ওর বিয়ের বোধ হয় তিনদিন আগে ও আমাকে টেনে নিয়ে গেছিল করিমপুরে। করিমপুরে ঠিক নয়। তার নিকটবর্তী থানারপাড়ায়। এই স্থানটি জংলীপীরের থান ও মেলার জন্য প্রসিদ্ধ।

সে কথা যাক—আমাকে এত আগে আনা হল কেন, তার উত্তরে ও প্রথমে কোন কৈফিয়ৎ দেয়নি। শুধু ওর স্কুলের জমীর মাষ্টারকে আমার পাশে পাশে রেখে দিয়েছিল। জমীরের বাড়ী এই গ্রামেই। খালেদ আর জমীর একই স্কুলে মাষ্টারি করে—এ সব আমার জানা কথা।

বিয়ে বাড়ীর মরশুমে জমীরের মত সঙ্গী পেলে যে আমার মোটেই একা-একা লাগবে না—তা জানত খালেদ। তাই এই ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়া আর একটা কারণও ছিল বোধহয়। কেননা জমীর ছিল সংসারী। জমীর বেশ ভাল বক্তা। জমীর নিজের সমাজের সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি খানিকটা বোঝে। জমীর স্থানীয় অন্যান্য মাষ্টারদের চেয়ে বহির্জগতের সঙ্গে বেশি পরিচিত। জমীর মাষ্টারী করলেও এখনও নানা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পড়াশোনার চর্চা করে।

জমীরের সঙ্গে পুনঃপরিচয় শেষ হতেই খালেদ তো কোথায় যেন চলে গেল। ওর ধরণ ধারণ দেখে মনে হল 'যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই।

'একবার উঁকি মেরে দেখবেন একি ?'

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় আধশোয়া হয়ে একপ্রকার বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। কলকাতা থেকে করিমপুর পেরিয়ে এই থানারপাড়া—অনেকখানি পথ। পথে কতবার গাড়ী বদল। মনের উৎসাহ দিয়ে তো শরীরের ক্লান্তি ঢাকা যায় না!

'আচ্ছা, কারা এত গান করছে ? ওরা কেউ বিশ্রাম করবে না দুপুরে ? ওদের সবার নাওয়া খাওয়া হয়েছে তো ?' পর পর প্রশ্নগুলো করে গেলাম বিছানায় চুপচাপ শুয়ে—বোধহয় কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েই।

'গান চলছে একমাস ধরে।' ছোট্ট করে বলল জমীর।

'সেকি! ওরা এত গান জানে ? আমি আধশোয়া হয়ে বসি বিছানায়। কি এমন ব্যাপার যে খালেদের বাড়ীতে একমাস ধরে গান চলছে ? আর কারই বা এত সময় আছে যে—বসে বসে গান শুনছে ? শ্রোতাই বা কারা ? ভাবতে ভাবতে আমি এবার বিছানায় উঠে বসেছি।

'খালেদের বিয়ে না। ওর বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হবার পর থেকেই দু বাড়ীতেই —জমীর বাধা পেল আমার কথাতেই ঃ দু' বাড়ীতেই মানে ? খালেদদের তাহলে সবশুদ্ধ কটা বাড়ী ?'

'আহা সে কথা নয়। দু বাড়ী মানে ছেলে পক্ষ মেয়ে পক্ষ।' নিতান্ত নিরুত্তেজ

'কণ্ঠে বলল জমির—যাবেন নাকি শুনতে ?'

আগ্রহ হচ্ছিল মনে মনে। কিন্তু এখানে এসে পর্যন্ত এদের বাড়ীতে যা যা দেখছি, তাতে খালেদের 'বিয়েতে মেয়েদের বিয়ের গান শোনা, কোন পুরুষ মানুষের পক্ষে বোধহয় সম্ভব নয়। বিশেষতঃ সে যদি বহিরাগত হয় তো আরো সমস্যা। এত কথা তো জমীরকে আর বলা যায় না। তাই ওর সঙ্গে কথা বলা কমিয়ে দু' 'কান খাড়া করে বসে রইলাম—যেন এই তৈরী-হওয়া নীরবতায় কানে আসে দু 'চারটে গানের কলি। এবং তাতে সফল হলাম শেষ পর্যন্ত। অনেক কষ্ট করে গোটা দুই-তিন পংক্তি উদ্ধার করতে পারলাম সে গানের ঃ

'গাড়ী কিন্যা দিবা বলি গাড়ী কিন্যা দিল না
তোমার সাথে আমি আর শ্বশুর বাড়ী যাব না
ট্যাক্সী করে কেশনগরে বায়োস্কোপে গেলে না
তোমার সাথে আমি আর শ্বশুর বাড়ী যাবো না'

সত্যি বলবে কি, সাধারণ লোকগীতির মত এসব আনুষ্ঠানিক গানও যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে যেতে পারে—এ জানা এই প্রথম হ'ল আমার। শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে যাইনি একথা ঠিক, গানগুলি নিতান্তই বালিকা মনের প্রকাশ। তার সঙ্গে না আছে বিয়ের সম্বন্ধ, না আছে বিবাহিত জীবনের প্রকাশ। কিন্তু মনে হয় এ জাতীয় গান যেন পূর্বে কোথায় শুনেছি।

আসলে আমার যে নানা রকম ক্যাসেট সংগ্রহের বাতিক আছে—তা তো জমীর জানে না। হয়তো তারই মধ্যে কোন একটিতে—

কখন যে জমীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল জানি না, তবে ঘরে পুনরায় প্রবেশের সময়ে দরজার কপাটটা দু'হাট করে খুলে যেতেই অন্দর-মহল থেকে গানের আওয়াজ এবারে বেশ সজোরে আমার কানে ঢুকল। আমার তন্ময়তা দেখে জমীর বলল ঃ 'চলুন তবে ভিতর বাড়িতে যাওয়া যাক।'

বুঝলাম, জমীর একটু আগে ভিতর বাড়িতে গিয়ে এ সবের ব্যবস্থা করে এসেছে। আমার তাহলে কোন সংকোচের কারণ নেই।

কিন্তু ভিতর আঙিনায় এসে আর এক চিত্র দেখা গেল। দুকানে গান শুনলেও চোখে পড়ল এক মাঝমির ধরনের বালিকাদের সমষ্টির। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামছে। দ্বিপ্রহরের ভোজনের পর বিশ্রাম নেওয়ার যে পদ্ধতি দেখলাম একটি বাড়ীর প্রাক-বিবাহ মরশুমে, তা হল ঃ

আট-দশ-বারো বয়সের বালিকা-কিশোরী যে যেমন পারে বিবাহের নানা গান তো করছেই, যার মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনার সরল-সুরেলা উপস্থাপন আছে, পিতা-মাতাকে ছেড়ে যাবার বেদনা আছে, কিছু আধ্যাত্মিক ভাবের কথাও। কিন্তু এ সবের সঙ্গে যে কাজ তারা করছে যৌথ ভাবে তা হল, 'নেই কাজ তো খই বাছ' প্রবাদটির সার্থক রূপায়ন।

থাল পর্ব ॥ সাধারণতঃ বড় একটি খণ্ডা নামক পাত্রে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য সাজানো হয়। তাতে পাঁচ রকম মিষ্টান্ন ফল, টক, নোনতা, ঝাল, তার সঙ্গে একটি আস্ত মুরগী ভাজা। সাধারণতঃ এটি নিকট আত্মীয়ের বাড়ি থেকে আসে। যেমন, খালা (মাসি), বোট বা ফুফু (পিসি) মামা প্রভৃতি। একান্ত না এলে বাড়ীতেই তৈরী করতে হয়। এটি বেশ ব্যয় বহুল—বর্তমান বাজারে অন্ততঃ পাঁচ-সাতশ টাকার ব্যাপার। এটি উভয় গৃহেই পালিত হয়। এবং যথাকালে তা পাত্রাপাত্রীর সামনে রাখা হয়। সমবেত অতিথি, প্রতিবেশী, গৃহজন তা থেকে একটু একটু করে পাত্র-পাত্রীকে খাইয়ে দেন। তারপর টাকা দেন তাদের সাধ্যমত। কেউ কেউ স্বর্ণদ্রব্যও দেন। 'বিবাহ পরবর্ত্তী মধু চল্লিশা'-র খরচ উঠে আসে এতে—বর্তমান যুবকদের এই মতামত। পাত্রীর বাড়ীতে হলে 'সোমদে কুটুম' বা সম্বন্ধ কুটুম্বদের ডাকা হয়। তারাও এসে থাল খাইয়ে বরকর্তার পাঠানো স্বর্ণদ্রব্য দিয়ে কনের মুখ দেখেন। এ ভাবে থাল খাওয়ানো পর্ব শেষ হয়—আবার সুরু হয় রাত অবধি গান গাওয়ার পালা।

দস্তুরখানা ॥ মুসলিম জনসমাজে প্রচলিত অতিথেয়তার একটি উপকরণ হল দস্তুরখানা। গৃহের জামাই কিংবা খুব ঘনিষ্ঠ কুটুম ছাড়া অন্যান্য অতিথিদের ক্ষেত্রেও তা ব্যবহার করা হয়। বিবাহের প্রধান ভোজন পর্বের আগে যে কোন জায়গার বরপক্ষের লোকদের সাদরে আপ্যায়ন করার জন্য মাদুরের ওপর আসন পেতে তার ওপর বিছিয়ে দেওয়া হয় দস্তুরখানা। তার ওপর ভোজ্য দ্রব্যের উপকরণ সাজিয়ে দেওয়া হয়। এটি সাধারণতঃ ৪'—৪½' আয়তাকার একটি শিল্প কাজ যুক্ত কাপড়। মেয়েদের তৈরী সুন্দর সেলাই কর্মের নমুনা। নক্সীকাঁথার মতই শিল্পসৌন্দর্য যুক্ত। এতে কখনও সেলাইয়ের মাধ্যমে লেখা থাকে 'ধীরে ধীরে খান 'কিম্বা 'আবার আসবেন' ইত্যাদি। ইদানীং এসব উঠে যাচ্ছে, পরিবর্তে এসেছে নকশা ছাপা পলিথিন টেবিলক্লথ।

চিলিমচি ॥ খাবার আগে এবং পরে হাতমুখ ধোওয়ার পাত্র। এটি ছোট বড় বিভিন্ন আয়তনের হয়। তৈরী হয় পিতল বা অ্যালুমিনিয়ামের, গায়ে নকশা কাটা কারুকার্য থাকে। এতে ২-৪ লিটার অবধি জল ফেলা যায়। সে কারণে এর উপরের দিকটা বেশ প্রশস্ত রাখা হয়, যেন ব্যবহৃত জল বাইরে না পড়ে। তাই চিলিমচির উপরের মুখটা ১৬-২০ ইঞ্চি পর্যন্ত ব্যাসযুক্ত হয়। এখন কেবল অভিজাত গৃহেই এর ব্যবহার দেখা যায়।

দোলারবিবি ॥ পাত্র পক্ষের সঙ্গে যে সব নানা বয়সী মহিলা কনের বাড়ীতে আসেন, তাদের বলে দোলারবিবি। মহিলারা কনের বাড়ীতে এসে পেঁছালে তাদের একটি গৃহে বা কনের বাড়ীর কোন অন্দরে বসানোর ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ বৌদি ও ভগ্নী সম্বন্ধীয় মহিলারা দোলারবিবি হন। সেখানেই তাদের বিশ্রাম ও ভোজন করানো হয়।

কথাটি বিশদ করি এবার।

এ সমাজে একটি বিয়ে মানে, একটি পাড়ার লোকউৎসব। একথাটি এখনও সব গ্রামের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় খই তৈরী হয়। অতিথি অন্যান্য সকলকে আপ্যায়ন করার জন্য মুড়কী এবং ঐ জাতীয় খাদ্য প্রস্তুতে তা কাজে লাগবে। খইয়ের গায়ে ধান লেগে থাকে—তা বেছে না পরিষ্কার করলে খইয়ের কোন কাজে ব্যবহার করা যায় না। সেজন্য চাই অখণ্ড অবসর ও সুলভ শ্রম। বিয়ের মরশুমে বাড়ীর বালিকারা একাজ করে আনন্দে। কাজ করে, গান করে, ঘরে আনন্দের কোলাহল করে—এমনকি তাতে পাড়ার অল্পবয়সী বৌরাও যোগ দেয়। আর তখনই বুঝতে পারা যায় 'নেই কাজ তো খই বাছ' কথাটির প্রকৃত অর্থ কী।

খালেদের বিয়ে দেখতে কী না জানা হচ্ছে!

রাতে—অনেক রাতে খালেদের সঙ্গে দেখা হল। জমীর তখন নিজের বাড়ী চলে গেছে। সারাদিন পরে খালেদকে পাওয়া গেল—একা। মনে হয়, ওর বিয়ের ব্যাপারেই ওকে বোধহয় একটু বেশী খাটতে হচ্ছে। অর্থাৎ ওর বিয়ে সম্বন্ধে কিছুতেই বলা যাবে না যে 'যার বিয়ে তার খোঁজ নেই'—ইত্যাদি।

সারাদিন আমি কি ভাবে সময় কাটালাম, সঙ্গী হিসাবে জমীর বেশ মনোমত হয়েছে কিনা—ইত্যাদি সংবাদ নেবার পর ও প্রশ্ন করে: 'আপনাদের আইবুড়ো ভাত অনুষ্ঠান হয় তো?

'হয়ই তো—তোমাদেরও হয় নাকি?'

'জমীর কিছু বলেনি আপনাকে?' উল্টে আমাকেই প্রশ্ন করে খালেদ। অবশ্য ও সেদিন এখানে ছিল না। তবে বলতে পারত তো—নিজের বিয়েটা তো দেখেছে। যা হোক, ওর কাছ থেকে এ বিষয়ে যা জানা গেল, তা সংক্ষেপে হল: গত পরশুদিন ওর আইবুড়ো ভাত হয়ে গেছে। ওরা অবশ্য বলে আইবুড়ো ক্ষীর। সন্ধ্যাবেলায় পাত্রকে বাড়ীর প্রাঙ্গনে সতরঞ্চে বসানো হয়, আশেপাশে থাকে গৃহ পরিজনবর্গ। সে তখন সর্বসমক্ষে ক্ষীর খায় এবং প্রথা মতে ঐ দিনই তার শেষ আইবুড়ো খাওয়া হল। সমবেত বালক-বালিকার দল,—তারাও যে যেমন পরে তাতে অংশ নেয়। এ অনুষ্ঠান ঠিক ঐ দিনে পাত্রীর গৃহেও হয়েছে—একই ভাবে।

খালেদের ঘুম জড়ানো কণ্ঠে প্রশ্ন এল: 'ক্ষীরপিঠা কেমন খেলেন?'

'এটাও তো তোমার বিয়ের নাম করেই?'

'ঐ হল আর কি! একটা নাম করে হয়—সবাই তাতে ভাগ বসায়।'

খালেদ ঘুমিয়ে পড়ে—ওর কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। আমার মনে পড়ল আজ আমি এ বাড়িতে একটু বেলা করে প্রবেশ করেছি। তাই সকালের একটা অনুষ্ঠান দেখা হয়নি। সেটা হল ক্ষীরপিঠার পরবর্তী অনুষ্ঠান। বিবাহ প্রথার এ পর্বটা জমীর আমাকে বলেছিল, আমি যতটা সম্ভব মনে রেখেছিলাম। কিন্তু

রাতের এই নির্জনতায় মনে হল, পরে হয়তো ভুলে যাবো। তাই খালেদের ঘুম বাঁচিয়ে টেবিল ল্যাম্প জেলে ডাইরী খাতায় যা লিখলাম তা হল :

'বিবাহের ঠিক আগের দিন ক্ষীরপিঠা। সেদিন সকালের দিকে গায়ে হলুদ মাখানো হয়—পিঁড়িতে বসিয়ে, অন্ততঃ এক ঘণ্টা ধরে! এই পর্বেও বধূরা পাত্র-পাত্রীকে ঘিরে হলুদ মাখাতে মাখাতে গায়ে হলুদের গীত গায়। অবশেষে ঐ হলুদ বিবাহের পাত্রাপাত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সকলেরই হলুদ মাখামাখিতে পরিণত হয়। কখনও বা হলুদের বিনিময়ে আবীর রং, কালি দিয়ে হাতের কাছে যাকে পাবে তাকে রাঙিয়ে দেওয়া হয়। খুশীর জোয়ারে কারো কিছু বলার উপায় থাকে না। তারপর ছেলে-বুড়ো সকলেই খই-বাতাসা-মিষ্টান্ন সহযোগে জলযোগ সারে। আত্মীয় কুটুম মোটামুটি যারা আসার তারা এ সময়ের মধ্যেই এসে যায়।'

এদের বিবাহ পদ্ধতির 'থাল খাওয়ানো' পর্বটা আমার বেশ আকর্ষণীয় মনে হল। যেটুকু দেখেছি এবং শুনেছি, তা লিখে রাখা দরকার। রাত এখনও অনেক বাকী, একটু পরে ঘুমালেও চলবে। খালেদ ঘুমাচ্ছে ঘুমাক। আমি পুনরায় কলম খুলি :

'প্রকৃতপক্ষে ক্ষীরপিঠা থেকেই সূত্রপাত হয় এই পর্বের। ইতিমধ্যে আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশীরা এসে গেছেন গৃহে। এটি পাত্রের বাড়ী বলে পাত্রকে তারা ধুতি, প্যান্টপিস, পাঞ্জাবী পিস প্রভৃতি উপহার পাঠাচ্ছেন, সঙ্গে থাকে মিষ্টির প্যাকেট। এই পদ্ধতির নাম ক্ষীরপিঠা পাঠানো। যে এসব নিয়ে আসে (অনেক ক্ষেত্রে মেয়ের বাড়ী থেকে) তাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।' এই থাল পর্বের সবটা এখানে লেখা যাবে না, পরে বিশদ করার চেষ্টা করব।

আজ খালেদের বিয়ে।

রাত পোয়াতেই মনের মধ্যে অনেকগুলি রঙিন ছড়ায় মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। ও কখন শয্যা ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়েছে মনে নেই। আমার ঘুমাতে যে একটু রাত হয়েছিল, তা হয়তো ও টের পেয়েছিল কাল রাতেই। তাই ভোরে উঠে আমাকে কোন ভাবে না জাগিয়ে ও নিজের কাজে বেরিয়ে গেছে।

বিয়ে করতে যাবার ব্যাপারে একবার মনে পড়ল মহীউদ্দীনের কথা। তার কথা একবার বলেছি মহরম মেলার সময়ে। সে বলেছিল : 'আমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে মাথায় পাগড়ী কোমরে তরোয়াল নিয়ে বীরের মত বিয়ে করতে যাবো।' তখন তার বয়স ছিল তেইশ-চব্বিশ। লম্বা সুঠাম ফর্সা রাজপুত্রের মত চেহারা। ওর সেই বিবাহ আমার দেখা হয়নি।

তার কতকাল পরে পেলাম খালেদের বিয়ের নিমন্ত্রণ। ও বলেছে : 'আমি যাবো দশ বাইকের বরযাত্রী নিয়ে—তার সামনে থাকবে আরো বাইক।' ওর এই সর্বনাশা পরিকল্পনায় আমি অন্তরে ভীত হয়ে উঠছিলাম। অনুরোধ করেছিলাম এই প্ল্যান পাল্টাবার জন্য, কিন্তু ও বারবার অভয় দিয়েছিল আমাকে। এমনকি ওর 'দশ-

বাইকের' বরযাত্রী বাহিনী—তারাও দেখলাম আমার এ আশংকা একেবারে উড়িয়েই দিল। এরই নাম তারুণ্য, এরই নাম বিয়ের উৎসব!

জমীর বলল: 'ওসব বলবেন না। আমাদের এখানে এটাই রেওয়াজ। বর প্রকাশ্যে বেশ বীরের মত সবার সামনে দিয়ে কনের বাড়ীতে উঠবে। মেয়ে পক্ষ সবাই দেখবে তাকে—তাতেই নাকি বরের সম্মান বেশী।'

কিছু নির্বাচিত ব্যক্তির জন্য একটি মোটর ও সর্বসাধারণের জন্য ছিল একটি মিনিবাস। সংখ্যায় সর্বসাকুল্যে কত—তা বলতে পারব না। এবং মিনিবাসটিতে নানা বয়সী মহিলারা, সেখানেও সেটি চারদিকে পর্দা-ঘেরা ছিল কি না—তা আমার দেখা হয়নি। কতজন বরযাত্রী যাচ্ছেন কনে বাড়ী—তা আগেই মোটামুটি জানানো হয়।

দোলার বিবিরা তো ভিতরের বাড়ীতে গিয়ে বসলেন—তাদের সেখানেও বিশ্রাম ও ভোজন হবে। আমাদের জন্য বাড়ীর সামনে একটি প্যাণ্ডেল হয়েছিল—চেয়ার সাজানো ছিল। তবে সেটি ছিল নিতান্তই ওয়েটিং রুম। আর তাদের ভাষায় বিয়ের মজলিস। এখানেই আমাদের সরবৎ দিয়ে প্রাথমিক আপ্যায়ন। সরবতের প্রকার বিভিন্ন—এর জন্য গ্লাস প্রতি ১-১০ টাকা অবধি খরচ হয়।

খালেদের শ্বশুর মশাই মনে হল মোটামটি সঙ্গতিসম্পন্ন। স্থানটি বেলডাঙ্গা শহরাঞ্চল থেকে কিঞ্চিৎ দূরে—বলা যায় সহর সংলগ্ন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। তাই বেলডাঙ্গায় যখন পথের খোঁজ করা হল—সবাই এক ডাকে সাড়া দিল। আমার মনে হল, সারা বেলডাঙ্গা বোধহয় জেনে গেছে আজ খালেদের বিয়ে।

রেজাউল সাহেব এ অঞ্চলের বেশ গণ্য মান্য লোক—ধীরে ধীরে তা টের পেলাম। মোটরে আমার পাশেই সহযাত্রী ছিল জমীর। জমীর এ অঞ্চলে আগে হয়তো বহুবার এসেছে—না, কোন আত্মীয়তার সূত্রে নয়। বেলডাঙ্গার এই সব গ্রামে ছেলে মেয়ে উভয় সমাজেই শিক্ষা-সংস্কৃতির হারটা বেশী। তাই এখানকার অনেক মেয়ে কাছাকাছি অঞ্চলে কনে হয়ে গেছে বাইরের শিক্ষিত মহলে। সেই সূত্রেই বন্ধু-বান্ধবের প্রয়োজনে ওর যাতায়াত আছে এখানে।

রেজাউল সাহেবের দোতলার বাড়ীর উপর তলায় আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হল। আমাদের জন্য খাবার হয়েছিল লুচি, তরকারী—তার সঙ্গে বেলডাঙ্গার কী এক বিখ্যাত মিষ্টান্ন। জমীর বললে: 'যদি আরো আগে সকাল করে আসতাম, তবে জুটতো আরো এক প্রস্থ নাস্তা—তাহলে সেটা হত সেমাই জাতীয় কোন খাদ্য—মিষ্টান্ন তো আছেই। আর মধ্যাহ্ন ভোজে অন্য সব কিছুর সঙ্গে যে—'

'বিসমিল্লা' ধ্বনি দিয়ে আধুনিক দস্তুরখানা পেতে আমাদের নাস্তা সুরু হল। বরবাবুও বসেছেন এই মজলিসেই—তবে একটি পৃথক বিশেষ সুসজ্জিত আসনে, একটু দূরে তার প্রিয় বয়স্যদের সঙ্গে। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে নবাবের মত বসে আছেন তিনি।

ভিতরে ভিতরে উসখুস করছিলাম, তাহলে বিবাহ নামক অনুষ্ঠানটা হবে কখন? নাস্তার পর গল্প, তারপর সময় গড়াবে, তারপর ভোজন—তাহলে?

জমীর জানালে এ সবের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। তবে এদের ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে দুপুরের ভোজের আগেই বিয়ে পড়ানো হবে। বিয়ে পড়ানোর শাড়ী অর্থাৎ যে কাপড় পরে মেয়ের বিয়ে হবে—সেটি নাকি সকালে এসে পেঁছেছে এখানে দূত মাধ্যমে। সঙ্গে অবশ্যই 'তত্ত্ব' জাতীয় প্রচুর সামগ্রী ছিল—তার তালিকা এখানে দিলাম না। কনে এবারে সেই বিয়ের শাড়ীতে সজ্জিত হয়ে বিয়ে পড়ানো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

পাত্রী এখন আছেন মূলগৃহ সলগ্ন অপর এক কক্ষে—বন্ধ দরজায় অধিবাসিনী হয়ে। তাকে বরপক্ষের কেউই দেখতে পাবে না। সঙ্গে আছে পাত্রীর সখীরা ও দু'চারজন বয়স্ক স্ত্রীলোক।

'আপনাকে বোধহয় উকিল করা হবে এইবার,—জমীর আমার কানের কাছে মুখ এনে প্রায় ফিসফিস করে বলল। আমি বললাম: 'আমাকে দিয়ে এ সব কাজ কেন করাচ্ছে এরা? আমি কী বুঝি এসবের। আমি তো শুধু একটি মুসলমান সমাজের বিয়ে দেখতে এসেছি। তার সঙ্গে এটা তো বাড়তি।'

জমীরের কথা শেষ হবার পূর্বেই দেখি খালেদের পরিবারের এক গ্রাম সম্বন্ধীয় চাচা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আবেদন করলেন এই বিয়ের আসরে পাত্র পক্ষের উকিল হবার জন্য। সঙ্গে অবশ্য আরো দুজন থাকবেন এবং মেয়ের পক্ষেরও দুজন।

খালেদের বিয়েতে এসে এ দায়িত্ব নিতে হবে ভাবিনি। বিবাহ নামক এই জটিল কর্ম কি আমার মাধ্যমে সমাধা হতে পারে? ওদের এই প্রস্তাবে আমি সত্যই ঘাবড়ে গেলাম। আমার ঘাড়ে-গলায় ঘাম দেখা দিল। জমীরের সঙ্গে আমার সে জাতীয় বয়স্য-সুলভ সম্বন্ধ নয়। তবু এ মুহূর্তে ও মুচকে হেসে পরিবেশ লঘু করবার জন্য ওর পকেটের রুমাল দিয়ে আমার ঘাম মুছিয়ে দিযে বলল, 'আপনি এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন বলুন তো?'

'ঘাবড়াবো না? যদি কিছু এদিক-ওদিকে হয়ে যায়। উকিলদের কাজ যে—'

'মোটেই কোন কঠিন ব্যাপার নয়। আমরা তো আপনার সঙ্গে আছি। মেয়ে পক্ষকে বলা হবে তুমি অমুক গ্রামের অমুক বাবুর ছেলেকে এত টাকার দেনমোহরে বিয়ে করতে রাজী আছো কি? তারপরে তার উত্তরটা শুনে আপনি ছেলে পক্ষকে জানিয়ে দেবেন—তাহলেই হল।'

'তাহলেই হল? আর যদি বলে বসে! 'না, রাজী নই'—তাহলে?'

আমার কথায় জমীর তো হেসেই বাঁচে না। কৌতুক কণ্ঠে বলল, এটা একটা প্রথা মাত্র। আপনাকে পরে সব বলব!'

এরপর ওর একান্ত সংলাপে জানলাম, এখানে এই বিয়ের আসরে খালেদ আমাকে এনেছে একদিকে যেমন একটি অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দিতে অপরদিকে আমাকে দিয়ে পাত্রপক্ষের ওকালতি করাতে। কেননা তার দৃষ্টিতে আমি

নাকি এই আসরে একজন নামী ব্যক্তি।

খালেদ আমার ছাত্র। তাই এই শুভ কাজে আর কোন আপত্তি করিনি।

এর পরের দৃশ্যটা হল ঃ আমাকে সামনে রেখে আরো তিন-চার জন লোক এগিয়ে চলেছে কনের বন্ধ ঘরের দিকে। তাদের মধ্যে কনেপক্ষ ও বরপক্ষ উভয়ের প্রতিনিধি আছে। জমীর এখন আমার পাশে নেই। তাই মনে এক প্রকার অস্বস্তি বোধ করলাম। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমার দ্বারা—

বন্ধ দরজার সামনে তখন কৌতূহলী ব্যক্তিদের ভীড—সবার কাছেই এই প্রথার নিয়ম জানা। তারা বহুবার এসব দেখেছে। তবু বিয়ে বাড়ীর ব্যাপার!

কে যেন দরজায় টোকা দিলেন। ভিতর থেকে দরজা খোলা হল। আমাদের উকিল বাহিনীর একজন, যিনি আমার ঠিক পিছনেই ছিলেন, বললেন ঃ 'আপনি ভিতরে ঢুকে মেয়েকে প্রশ্ন করুন—ঐ যেমন শিখিয়ে দিলাম।'

ভদ্রলোক তো এই বলে খালাস—আর আমি ঐ ঘরে ঢুকে বেজায় বেকায়দায় পড়ে গেলাম। ঘর ভর্তি নানা বয়সী মেয়ে। তাদের কোনটি যে আজকের পাত্রী তা চিনব আমি কি করে! আমার দেহটা তখনও ঘরের চৌকাঠেই দাঁড়িয়ে আছে। পিছনের ভদ্রলোক—কানের গোড়ায় ফিসফিস করে প্রশ্নের সমাধানও করলেন।

আমাকে যা বলতে হবে, তা একটি কাগজে লিখে দিয়েছিলেন খালেদের চাচা। আমি সেইটি খুলে পাঠ করলাম একবার তাদের সামনে। কিন্তু ঘরের মধ্যে মৌমাছির চাকের মত এত গুনগুন ধ্বনি যে কনের উত্তরটা শোনাই হল না। আমার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কনের মতামত নিয়ে পেঁছে দিতে হবে পাত্রের কাছে। কনের উত্তরই যদি শুনতে না পেলাম, তবে কি করে পাত্রের কাছে কনের উত্তর নিয়ে হাজির হব!

যাহোক তিনবারের চেষ্টায় কনের ঘাড় নাড়া দেখে আমার পেছনের ভদ্রলোক বললেন যে ঃ 'ঐ তো কবুল করেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমারও যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সেই ভদ্রলোক উপস্থিত মেয়ে মহলে সেটি একবার চেঁচিয়ে বললেন যে মেয়ে পাত্রপক্ষের ঐ বক্তব্যে সায় দিয়েছে। তার অল্পক্ষণেই ফিরে এলাম বিয়ের আসরে। তারা যেন উৎকণ্ঠার মধ্যে এতক্ষণ বসেছিলেন—আমাদের ফিরে আসতে দেরী হচ্ছে দেখে। খালেদ অবশ্য বেশ 'ডোণ্ট কেয়ার' ভাব নিয়েই বসে আছে নিজের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে।

অবশ্য খালেদ কত টাকার দেনমোহরের চুক্তি করল ওর নববধূর সঙ্গে, সেটা আমার মুখ দিয়েই যদিও উচ্চারিত হয়েছিল, তবু আজ আমার সেটা মনে নেই। তবে হাফেজ সাহেব বরপক্ষের সামনে কনের কবুল করার ব্যাপারটা বিধিসম্মত ভাবে প্রচার করার পর অনুরূপ ভাবে বরপক্ষেও কবুল করতে হল! সেটা অবশ্য এই মজলিসে বসেই করা হল।

এটা সাঙ্গ হবার পর বিবাহ সম্পর্কিত খোৎবা পাঠ করা হল—করলেন হাফেজ সাহেব। তিনি এই বিবাহের পুরোহিত। অবশেষে মোনাজাত করে ঈশ্বরের কাছে

তাদের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে এই সভা শেষ হল। সকলে মিলে দু হাত তুলে সমস্বরে বললাম : 'আল্লা হো আমিন।'

তবে এখানেই কাজ শেষ নয়, পাকা খাতায় লেখাপড়া করার কাজ ঠিক কখন হয়েছিল, তা স্মরণ করতে পারছি না—কেননা সেখানে আমাকেও স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। আজও খালেদের বিয়েতে আমার স্বাক্ষর রয়েছে—একথা ভাবলে মনে একটা অন্য রকম অনুভূতি আসে।

সবশেষে বর পক্ষ একটা মাঝারি ব্যাগ থেকে প্রায় ৫।৭ কেজি বাতাসা বের করে সবার হাতে হাতে বিলিয়ে দিলেন। উপস্থিত সকলেই এই শুভ কাজে এভাবে মিষ্টি মুখ করলেন।

একটা বিষয় বলে রাখা ভাল যে, প্রয়োজনে যিনি বিয়ে পড়ান, তিনি সাধারণত মসজিদের ইমাম কিংবা পাড়ার কোন হাফেজ, মৌলানা কিংবা কোন বর্ষীয়ান সম্মানীয় পারহেজগার ব্যক্তি হতে পারেন—অন্য সমাজের 'পুরোহিত' জাতীয় নির্দিষ্ট কেউ না হতেও পারেন। যার এ বিষয় জ্ঞান আছে, অতীত অভিজ্ঞতা আছে—তিনিই এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিতে পারেন। এদিক দিয়ে ইসলামে বেশ একটা উদারতা আছে।

শুভ কাজ প্রাথমিক ভাবে শেষ হতেই বরপক্ষের একটি ছোকরা কোথা থেকে যেন এগিয়ে এল। বেশ হিরো-হিরো চেহারা—সে সবাইকে রঙীন কাগজে ছাপা বিয়ের পদ্য বিলি করল। এই বিয়ের পদ্যে কী থাকে তা আমার জানা—তাই আপাততঃ পকেটে রেখে দিই।

কিন্তু আসল কাজটাই যে বাকী।

ভূরিভোজের ব্যাপারটা না হয় নাই লিখলাম, কেননা বিবাহের ভোজ খাওয়ার অভিজ্ঞতা তো কারোরই কম হয়নি। তবে ভোজন পর্বের পর একটু দিবা নিদ্রা — মানে গা এলিয়ে বিশ্রাম নেবার পরের দু'একটা ঘটনা বলে এই বিচিত্র প্রতিবেদন শেষ করা যায়।

বিকালের একটি পর্ব হল দুধ পান্তো। কথাটার মানে তখনও জানা হয়নি তবে দেখলাম, মেয়েপক্ষ খালেদকে নিয়ে গেল কনের গৃহের প্রাঙ্গনে। প্রাঙ্গন না থাকলে বারান্দায় নিয়ে যেতো। সেখানে খালেদকে ডানদিকে ও পাত্রীকে বামদিকে বসিয়ে সুরু হবে দুধ-পান্তো পর্ব। পাত্রীর গুরুজন স্থানীয়রা ও বয়োজ্যেষ্ঠ্য মহিলারা সাধারণত এই দুধপান্তো করে থাকেন। শব্দটা পরে জেনেছি দুধ এবং পান্তাভাতের মিশ্রণে দুধপান্তো। এ জাতীয় অনুষ্ঠান আগে কোথাও দেখতে হয়নি। তাই এটা একটু বিশদ করি।

পান্তাভাত এবং দুধ বড় বাটিতে নিয়ে পাত্র পাত্রীর সামনে বসে হাত ধুয়ে এবং পাত্র পাত্রীর হাত ধুইয়ে দিয়ে বর-কনে উভয়ের ডান হাতের কনিষ্ঠা এবং অনামিকা একত্র করে ধরে তা দিয়ে যতটুকু দুধ-ভাত ওঠে তা পাত্র পাত্রীর মুখে দেয়

এবং পাত্রী পাত্রের মুখে তুলে দেয়। পরে সেই মুখের ভাত উল্লিখিত মহিলা তাঁর আঁচলের খুঁটে উভয়ের মুখে ধরে ভাতগুলি বার করে বর-কনের মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নেওয়া হয়। তারপর সেই ভাত ফেলে দেওয়া হয়। এর দ্বারা যে হাত ধুইয়ে দেয়, তার কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটে বরকর্তার কাছ থেকে।

সমস্ত ব্যাপারটা দেখে মনে হল—এটি একটি বিশুদ্ধ লোকাচার। এর মাধ্যমে বর কনেকে পরস্পরের নিকটে আনা হয় এবং এই গৃহে তাদের অবস্থান একটু সহজ করা হয়। অর্থপ্রাপ্তিটা সেই লোকাচারেরই অংশ। আমাদের সমাজে শয্যাতুলুনী নামক একটি লোকচারের সঙ্গেও অর্থপ্রাপ্তির কথা আছে।

এরপর এ বিয়ে বাড়ীতে নানা স্থানে নানা প্রকার রঙ্গ রসিকতার পালা সুরু হল—আমি এখানে দর্শক মাত্র। তার একটা হল, গরম ভাতে চার-পাঁচটি ডিমের অমলেট উপরে রেখে বরকে এক হাতে অতবড় অমলেটটি চেপে ধরতে বলা হয় এবং কনেকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অংশ কেড়ে খেতে বলা হল।

আমি সাগ্রহে তাকিয়ে আছি এর পরবর্তী অংশ দেখবার জন্য। কেননা আজ এইমাত্র যে মেয়েটি এক গৃহের বধূতে পরিণত হল, সে কী অত সহজে সবার মাঝে সরল হতে পারে!

আর একটি লোকাচার হল, পানসুপারী। বরকনের হাত উপর উপর রেখে কন্যাপক্ষের কোন বর্ষীয়সী রমণী উভয়ের প্রতি কিছু আশীর্বাদ দান করেন, তাদের ভবিষ্যৎ জীবন মধুর হওয়ার কথা বলেন, পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার কথা বলেন। সেখানে উপস্থিত কনের বান্ধবীরাও এ জাতীয় ছোট খাটো কিছু লোকাচার পালন করেন।

সব শেষে রোদন পর্ব – এ' প্রথা আমাদের সবার জানা।

সূর্য গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ, সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে। এবারে বোধহয় আমাদের পুনঃযাত্রার জন্য উদ্যোগ করা প্রয়োজন। জমীর বললে: 'আপনি এখানে এখন মানী ব্যক্তি হয়ে গেছেন। সবাইকে এবার একটু নাড়া দিল। নচেৎ কেউ গা করবে না।'

তারপর কখন যে সবার সঙ্গে ফেরার গাড়ীতে উঠে বসেছি, সে খেয়াল নেই বিয়ে বাড়ীর নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরাতন সঞ্চিত এ' জাতীয় অভিজ্ঞতার কিছুই যেন মিলছে না। খালেদের বিয়েতে এসে এ যেন এক অন্য জগৎ দেখা হল। না, জমীরকেও সে কথা বলিনি। তবে সে বোধহয় আমার হাব-ভাবে তা বুঝতে পেরেছিল।

তারপরে কেটে গেছে কতদিন।

কতজনের কাছ থেকে কত যে বিয়ের পদ্য সংগ্রহ করেছি—তার ইয়ত্তা নেই। দুই সমাজের বিয়ের লাল-নীল কাগজে ছাপা পদ্যে কত সে মিল! এদের পদ্যের চাচী, ওদের পদ্যে কাকী, এদের পদ্যে দাদী, ওদের পদ্যে দিদা···

কানে ভাসে এখনও সেই সব বালিকা-কিশোরীদের সরল হৃদয়ের কামনা-

বাসনা জড়িত অনুপম বিয়ের গান। কত সহজ তাদের কথা আর সুর। যে আগ্রহ সেই বিয়ের আসরে তৈরী হয়েছিল, নিজের ঠিকানায় ফিরে এসেও তা মনের গ্রহনে সুপ্ত ছিল।

তাই সুযোগ পেলেই শিয়ালদহ স্টেশনের উড়াল পুলের নীচে থেকে সংগ্রহ করেছি এক-দুই-তিন—কত না বিয়ের গান। এ সব গান রেকর্ড হয়ে এসেছে মুর্শিদাবাদের নানা গ্রামাঞ্চল থেকে—এসেছে কলকাতার বাজারে। অবসর সময়ে সে সব গান শুনে মনে মনে যেন আর একবার খালেদের বিয়েতে হাজির হই। মানোয়ারাকে আমি চিনি না, বিলকিসকেও না! তাদের গানই এখন আমার স্মৃতি-সম্বল। হোক না তা ক্যাসেটের গান।

আর মনে পড়ে সেই সৌম্যকান্তি অধ্যাপক ড. শক্তিনাথ ঝা-এর কথা! তিনিই তো প্রথম আমাকে এ ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলেছিলেন—সেই যেবারে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শাসন গ্রামে বৈশাখী মেলা দেখতে গেছিলাম অরুনকে সঙ্গে নিয়ে। সে মেলা দর্শনের কথা আজ অবধি কাউকে জানানোর সুযোগ পাইনি।

আমার এই প্রতিবেদন কি কোনদিন তাঁর নজরে পড়বে?

ইতিমধ্যেই মুসলমান সমাজের বিয়েতে মেয়েদের গীত বিষয়ে তাঁর গ্রন্থটিও আমার সংগ্রহে এসেছে। তিনিই প্রথম যিনি এ বিষয়ে আমাদের হাতে ধরে দেখালেন। মুসলমান সমাজের সংস্কৃতির প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীটা একেবারেই অন্য রকম।

কে জানে কেন, এতদিন ধরে 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর' জাতীয় কোন গ্রন্থেই এর বিবরণ পাইনি। জানি না কতদিন পরে এ বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণা বা তথ্য সংকলিত হবে। □

লোকবিনোদনে নারীকেন্দ্রিক যতগুলি জীবিকা পদ্ধতি
প্রচলিত আছে,
তার মধ্যে নর্তকী অথবা
পেশাদার রূপোপজীবিনী হল অন্যতম।
এদের নানা রূপ নানা নাম, নানা দেশে নানা ভাবে তার অবস্থান।
কলকাতার 'বাবু কালচারে' এক সময়ে 'রক্ষিতা'
পালন ছিল আভিজাত্যের প্রতীক।
সে বুলবুলির লড়াই, বিড়ালের বিয়ে বা রক্ষিতা পোষণ—
সবই গেছে কালের কপোলতলে।
এর বাইরেও নারীকে ব্যবহার করা হয়
লোকবিনোদনে এমন অনেক প্রকরণে বা মাধ্যমে
যা সারা ভারতে তো নয়ই, এই বঙ্গ-
সংস্কৃতিতেই তা এক দুর্লভ সংযোজন।
তাদের আর এক নাম 'নাচনী'।

লোকনৃত্য-৩

নৃত্য-গীত অথবা রসিক,
কে তার একান্ত আপন—এটাই
যখন স্থির করতে পারে না
মানভূমের ক্ষয়িষ্ণু বাবু কালচারের
কোন অভিশাপ-জর্জরিত নারী, তখন তাকে অবধারিত
ভাবে এগিয়ে যেতে হয়
মনোরঞ্জনী নাচনী পেশার দিকে।
এক সময়ে মানভূম ও সংলগ্ন বিহার অঞ্চলে
এই কালচারের উদ্ভব হলেও, তার ভগ্নাংশ
আজও অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে
পুরুলিয়ার অন্তে-প্রত্যন্তে দূর-দুর্গম নানা স্থানে।
শুধু মেলা বা উৎসবে নয়,
রাতের পর রাত নয়নমোহিনী জনরঞ্জনী নৃত্যে-পোষাকে
এই সব নাচনী হয়তো খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে 'মিউজিয়াম স্পেসিমেন'।

বিন্দুবালা নাচনী ও আমরা ক'জন

'বিন্দুবালা দেবী এসেছেন এই এতক্ষণে ?'

গান্ধীরাম মাহাতো বললে কথাটা আমাদের জন্য—প্রায় একটা ঘোষণার মত। তবে সেটা আধা বাঙ্গালি ভাষায়। কেননা বিশুদ্ধ আঞ্চলিক ভাষায় ঐ কথা বললে পাছে আমরা না বুঝি—তাই এই কৌশল।

গান্ধীরামের সঙ্গে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের বেশ কাজ-চলছে-গোছের হৃদ্যতা হয়েছে এখানে। এখানে মানে ড. সুখেন্দু বিশ্বাসের 'দি রয়্যাল ছৌ ড্যান্স অ্যাকাডেমি' নামক সংস্থায়। এই সংস্থার ছড়ানো বিস্তৃত অঙ্গনে অনেকগুলি থাকবার জায়গা। প্রায়ই নাকি দেশী-বিদেশী লোকসংস্কৃতিপ্রেমী এখানে আসে মানভূমি সংস্কৃতির রূপ অনুধাবন করতে।

কথাটা মিথ্যা নয়। ডাক্তার বাবু এখন আর ডাক্তারী করেন না বোধহয়—তবে মানভূমি সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে তিনি প্রায় নিবেদিত প্রাণ। বলরামপুরে এই প্রতিষ্ঠানের বা ট্রেনিং সেণ্টারের নাম যাই হোক না কেন, সাধারণ লোকের কাছে এটি 'মিশন' নামেই পরিচিত।

এই মিশনে ছৌ নাচ ট্রেনিং-এর ভাল বন্দোবস্ত আছে। ছেলেরা বাল্য বয়স থেকেই এখানে তা রপ্ত করতে সুরু করে। তাদের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে—বয়স ১৬ বছরের নীচেই প্রায় সকলের। তাদের খোলা মাঠের নীচে জীবন্ত নৃত্য দেখার সুযোগ হয়েছে আমাদের। দীর্ঘক্ষণ কাছে বসিয়ে তাদের সাক্ষাৎ নেওয়া হয়েছে। দেখা হয়েছে নাটুয়া নাচ। তার স্বরূপ সম্বন্ধে অনেকেরই ভুল ভেঙ্গেছে।

একেকটি অনুষ্ঠান হয়েছে—তারপর গান্ধীরাম আমাদের কাছে শিক্ষকের মত করে শুনিয়েছে এদের মৌলিকত্ব পেশাদারীত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে। উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে বেশ কিছু তত্ত্ব কথাও যে তার দখলে আছে—তাও জানা গেছে তখন। তার বলার ভঙ্গীটা বেশ বিচিত্র। যখন সে স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে, তখন তাদের মত করে বলে মানভূমি ভাষায় এবং তার ব্যাখ্যা যখন করে আমাদের সামনে—তখন আমাদের ভাষায়।

আসলে গান্ধীরাম হল যথার্থই 'সন অব দ্য সয়েল'—তাই এখানকার সংস্কৃতির ঐতিহ্য সবই যেন তার কণ্ঠস্থ। আমাদের মত বিদ্যার্জনে আগ্রহী ব্যক্তি পেয়ে সে-ও যেন পরম পুলকিত।

এই স্বল্প পরিচয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের এই সব ছাত্র ছাত্রীদের প্রকৃত চাহিদা কি—তা তার জানা হয়ে গেছে। তারা এখানে এসেছে তাদের কোর্সের ফিল্ড স্টাডিতে কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে। কিন্তু বর্তমানে সবাই যেন ছাত্র হয়ে গেছে। গান্ধীরাম এখন প্রকৃত শিক্ষকের মতই ক্লাস ডেমনস্ট্রেশন নিচ্ছে—প্র্যাকটিক্যাল সহ।

যা যা দেখা বা শোনা হল এদের তার তত্ত্বকথা হয়তো সবই জানা ছিল তাদের। তবে নিজের চোখে বা কানে এখানে যেভাবে তার সঙ্গে পরিচয় হল—তার মূল্য যে অনেক—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৫৬ কি ১৯৬৭ কিংবা ১৯৭৫ অথবা ১৯৮৯ কিংবা ১৯৯২ সালে লেখা বইয়ে তারা এতদিন যে তথ্য পেয়েছে, আজ এখানে এসে ১৯৯৮ সালের প্রখর গ্রীষ্মে, তার অনেকগুলিই আজ এখানে উন্মুক্ত প্রান্তরে বসে যেন মিলানো যাচ্ছে না—তাও তারা বুঝেছে।

এবং সেটাই তারা অবসর মত তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে বুঝে নিচ্ছে—উপযুক্ত অর্থ-সামাজিক নৃতাত্ত্বিক কারণ সহ।

'বিন্দুবালা দেবী এসেছেন এই এতক্ষণে।'

কথাটায় যেন চমক ভাঙল তাদের। সুখেন ডাক্তারের এই মিশন কম্পাউন্ডে পা দেবার পর থেকেই নাচনী নাচের কথা শোনা যাচ্ছিল প্রায় প্রতি ঘণ্টায়। ছো নৃত্য সম্বন্ধে এখন শহরের লোকেদের কিঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু মানভূমের নিতান্তই স্বল্পজ্ঞাত নাচনী নাচ এখন কেন, কোনদিনই বোধহয় শহর বা তার উপকণ্ঠে পেঁছাবে না।

তাই বলরামপুরের মত পুরুলিয়া জেলার এক তাৎপর্য পূর্ণ কিন্তু অ-নগর যুক্ত অঞ্চলে যদি নাচনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তবে সে তো ভাগ্যের কথা।

গান্ধীরাম বলেছিল আমাদের ঃ 'আজকাল এরা আর এই পেশায় থাকছে না। দু' একজন যা আছে—বয়স হয়ে গেছে। তবু কেউ যদি আসে আমাদের মিশনে, তবে প্রশ্ন করে যা যা জানবার জেনে নেবেন। শুধু একটি অনুরোধ, তাদের রসিকের নাম তাদের মুখে জানতে চাইবেন না। আর তার অতীত নিয়ে অত ঘাটাঘাটি করবেন না। এতে তারা বড় বিব্রত হয়। তারা তাদের বর্ত্তমান নিয়েই খুসী' —এটাই যেন তার বক্তব্য।

সেই নাচনী—যার নাম পরে জেনেছিলাম বিন্দুবালা দেবী, সে এখন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে।

অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। শুধু আমি নয়, ঐ সব ছাত্র-ছাত্রী আর তাদের অধ্যাপকরা পর্যন্ত। নাচনীকে কিভাবে আদর-সমাদর করতে হয়, তা তাদের জানা নেই বলে কয়েকটা মুহূর্ত যেন নীরব হয়ে রইল সেই চালাঘরটায়।

সে দাঁড়িয়ে ছিল, চারিদিক খোলা চালাঘরের ভিতরে নীচের সাধারণ জমিতে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে সবটাই বোঝা যাচ্ছিল। তার বয়স পঞ্চাশও হতে পারে পঞ্চাশ বা ষাটও হতে পারে। তবে চুলে মোটেই পাক ধরেনি। চুলগুলি মানভূমের চলন অনুযায়ী পরিপাটি করে সাজানো—নিতান্ত ঘরোয়া ধরণে। সে যে আমাদের এখানে এসেছে আমন্ত্রিত হয়ে—তার জন্য অতিরিক্ত কোন সাজসজ্জা নেই তার।

তার পরণে একটা অতি আটপৌরে ঘরোয়া-ভঙ্গীতে পরা শাড়ী, তার নীচে অতি মলিন সায়া দেখা যায় খানিকটা। উর্ধাঙ্গে অনুরূপ অতি আটপৌরে একটি

জীর্ণ ব্লাউজ। অন্তর্বাস সে ব্যবহার করে কি না একথা ভাবতে তখন ইচ্ছাই হয়নি।

হাতে একটা ভাঙ্গা ছাতি—পুরুষদের ছাতি। তবে শাঁখা জাতীয় অলংকার ছিল বোধহয় হাতে। সোনা রূপা নয়, বোধহয় কাঁসার কিছু ছিল একটা।

এই হল বিন্দুবালা দেবী। তাকে আমরা, শহুরে লোকেরা দেবী বলি—মানভূমের লোকেরা সরাসরি নাচনীই বলে বোধহয়।

আর সবাই এই বিচিত্র নারীর দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, এই চেহারা আর বয়স নিয়ে সে নাচনী হয় কেমন করে! অবশ্য বিন্দুবালার ঠোঁটের হাসিতে এক অন্য ধরণের ভাব ছিল। তা সচরাচর ঐ বয়সী স্ত্রীলোকদের মুখে থাকে না।

বিন্দুবালা দাঁড়িয়ে আছে এতগুলি শহুরে যুবক-যুবতীর সামনে, তাদের মাষ্টার মশাইদের সামনে। তার মধ্যে কোন অস্বস্তি নেই, নেই কোন আড়ষ্টতা। সে যেন এভাবে সবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে অতি অভ্যস্ত।

অবশ্যই সত্য একথা। রাতের আসরে উজ্জ্বল আলোর সামনে সাজগোজ করে পুরুষদের সঙ্গীত-নৃত্যে মনোরঞ্জন যার পেশা—সে কেন এই দিনমানে কতগুলি শহুরে যুবক যুবতীর সামনে আড়ষ্ট বোধ করবে? হতে পারে আজ তার যৌবন গেছে—কিন্তু এখনও এই ভাঙ্গা শরীরে সে আসর কাঁপিয়ে দিতে পারে। হাততালিতে আসার গরম করে দিতে পারে, আর পারে তার রসিকের মন ভরিয়ে দিতে।

গান্ধীরাম তার মতো করে বলল: 'এসেছিস যখন তখন উঠে পড় আসরে। বাবুরা তোর জন্য তখন থেকে বসে আছে। একটু নাচ-গান দেখিয়ে যা বাবুদের।'

আমার দুঃখ হল, মানভূমি ভাষা বলতে তো পারছিই না, বুঝতেও পারি না ভাল মত। তবু গান্ধীরাম যখন আছে, তখন সেই হবে আমাদের দোভাষী—অন্ততঃ আজকের এই তথাকথিত আসরের মত। 'আসর' শব্দটা উচ্চারণ করে মনে মনে নিজেই যেন কেমন সংকুচিত হয়ে উঠি।

বিন্দুবালা তখনও দাঁড়িয়ে আছে নীচে—তার চারপাশে রয়্যাল ছো ড্যান্স এ্যাকাডেমীর ছোকরাগুলো, এমন কি বালকগুলি পর্যন্ত যেন ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এরা সব মানভূমের ছেলে—এলাকার আচার-রীতি মোটামুটি জানা। তাদের যে বয়স, তাতে তাদের নাচনীর নাচ দেখার সময় এখনও আসেনি। আজ এই তথাকথিত আসরে যদি ঘটনাচক্রে বিন্দুবালা এসেই গেছে, তবে সবার অগোচরে তার নাচ-গান শোনা যাবে একটু।

বিন্দুবালা এ দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত। তবে রাতের আসরে এসব কান্ড হয় না। এইসব ছোকরাদের দেখে তার মনে কী অভিপ্রায় হল কে জানে। একটু স্নেহসুলভ ধমকে সে মিশনের ছেলেগুলোকে বলল: 'যা সব ঘরে। দেখছিস কি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।'

কিছু ছেলে শুনল—চলে গেল। বাকীরা, যারা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, তারা হয়তো এক নিষিদ্ধ নেশার স্বাদ নিতে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

গান্ধীরাম সব দেখছে। সে জানে তার কথায় ঐ উঠতি ছোকরাগুলি সরবে

না। তারও তো একদিন ঐ বয়স ছিল। সে-ও হয়তো রাতের অন্ধকারে নাচনী নাচ দেখার সুযোগ পেতে চেয়েছিল। তবু মুখে ধমক ছিল ঐ ছোকরাগুলিকে। তখন বিন্দুবালা বেশ নিষ্ঠুভাবে বলল তাদের: 'কী মজা দেখতে এসেছিল তোরা—তোদের মায়ের নাচনী গান দেখতে!'

কথাগুলি কি নিষ্ঠুর?

হ্যাঁ। কেননা ঐ উঠতি ছোঁড়াগুলি তাদের মায়ের বয়সী কোন স্ত্রীলোকের সর্বসমক্ষে এহেন আচরণ দেখুক 'তা কোন স্ত্রীলোকই মেনে নিতে পারে না। ভাগ্যদোষে কপাল গুণে সে নাচনী। তাই বলে নিজের সন্তান তুল্য ছেলেদের সামনে?

ঐ শেষ কথাতে কাজ হল। ছেলেগুলি এবারে সব চলে গেল।

এখন বিন্দুবালা আমাদের সামনে একটি সাধারণ টিনের চেয়ারে বসে। সমবেত ছাত্রছাত্রী এগিয়ে এল তার ছবি নিতে, তার ইণ্টারভ্যু নিতে। বিন্দুবালা জানে এ সব, বহুবার তাকে এভাবে লোকসমক্ষে আসতে হয়েছে।

তাই একটি ছাত্রী যখন তাকে প্রশ্ন করে: 'আপনার নামই তো বিন্দুবালা দেবী?'

বিন্দুবালা স্মিত হেসে চেয়ারে বসা দু'হাত দু'পায়ের ওপর নিজের ডানবাহু মেলে ধরে বলে, 'বিন্দুবালা নাচনী।' বলে ডান হাতটায় ইঙ্গিত করে। দেখি, যেখানে উল্কি কাটা স্থায়ী নাম আছে তার। কী জানি মনে হল হয়তো তার রসিকের নামও থাকতে পারে সেখানে। কে যেন একজন ওদের মধ্যে ওর ডানহাতের উল্কীটারও ছবি নিল একটা।

এই বিন্দুবালাই একদিন রাতের আসরে মনমোহিনী নৃত্য করতো মনমোহিনী সাজে। সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী প্রথার শেষ অবক্ষয়ের ধারা সর্বাঙ্গে বহন করে আজ এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে! মানভূমের তুসু গান শুনেছি, শুনেছি ভাদু গানও। তার ঝুমুর গানের রস বৈচিত্র্য নিয়েছি অন্তরে। কিন্তু বিন্দুবালার নাচনী গানের সারবস্তু কি তার থেকেও ভিন্নতর?

গান্ধীরাম কোথায় যেন চলে গেছে ইতিমধ্যে। এখন শুধু আমরা ক'জন এই চারচালার আসরে।

সমাগত ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রশ্নগুলি নিয়ে উৎসুক হয়ে বসে আছে। ক্যামেরার পর্ব আপাততঃ শেষ, এবারে। চলে এসেছে—সামনে টেপ যন্ত্র। বিন্দুবালা তাতে অস্বস্তিতে পড়েনি—সে এসবে বেশ অভ্যস্ত।

মাত্র কদিন আগে একটি পুরাতন সংবাদ পত্রে নাচনী গানের রঙীন প্রবন্ধ থেকে এই সমাজ বা নারীজাতি সম্বন্ধে এক ভিন্নধর্মী ধারণা হয়েছিল। তা থেকে নাচনী সমাজ যে মোটামুটি সচ্ছল জীবনযাত্রা করে, তার ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। কিন্তু পুরুলিয়া জেলার এই প্রত্যন্ত গ্রামে যে একজন বয়স্কা বিগতযৌবনা নাচনী—তাকে দেখে তাদের সম্বন্ধে মন অন্য কথা ভাবতে চাইল।

প্রসঙ্গ কথা

পুরুলিয়ার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে রাঢ় বঙ্গ বা বদ্বীপবঙ্গের তেমন কোন সাদৃশ্য নেই। এই জেলার তথ্য অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দীর্ঘদিন ধরেই নিকটস্থ বিহার রাজ্যের সঙ্গে যেন এক সুরে বাঁধা। অবশ্য এ জেলার ভাদু-টুসু-ঝুমুর যেমন বাংলার লোকগীতি ভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছে—যার সঙ্গে সন্নিহিত বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের এক আত্মীয়তা দেখা যায়।

তবে যে কটি কারণে এ জেলার এক স্বাতন্ত্র্য তৈরী হয়েছে তা যদি একবাক্যে হয় ছৌ নাচ, তবে তার সঙ্গে বোধহয় আর একটা শব্দ আসবে—'নাচনী নাচ।' দুটিই নৃত্য - তবে দু রকমের। প্রথমটির সঙ্গে জড়িত পুরাণ কাহিনী, দ্বিতীয়টার সঙ্গে ঝুমুর ও সমগোত্রিয় আদিরসকেন্দ্রিক গীত।

অথচ মানভূম সাংস্কৃতির ঐকনিষ্ঠ গবেষক কিন্তু নাচনী সমাজ ও সঙ্গীত সম্বন্ধে অন্য ধারণা পোষণ করেন। একদা সম্ভ্রান্ত মহলে ঝুমুর গানের সঙ্গে নাচনীদের প্রাণের যোগ দিল। রসিকের কথা তখন অতটা প্রাধান্য পেত না। সঙ্গীত নৃত্য পটিয়াসী নারী রূপে তারা শুধু অভিজাত সমাজেই নয়, সাধারণ সমাজেও ছিল সসম্মানে গৃহীত।

উড়িষ্যার দেবদাসী নৃত্যের কথা সর্বজনবিদিত—সেই দেবদাসীরাও আজ যেমন বিলুপ্তির পথে, তেমনি নাচনী সম্প্রদায়ও। তবে দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রথমটি কিঞ্চিৎ সম্মানজনক স্থানে আছে। অভিজাত সমাজের বাঈনাচের সঙ্গে এর তুলনা করা যাবে না। জলসা ঘরের ঝাড়লণ্ঠনের নীচে যে নৃত্যগীত—তার থেকেও এরা বহু দূরে। শুধু শরীর ও কণ্ঠকে সম্বল করে একদল ক্ষুধার্ত জনগণকে প্রকাশ্যে মনোরঞ্জন করাই তাদের পেশা—স্থূল ভাষায় এটাই তাদের জীবন ধারা।

যে সমাজ তারা সৃষ্টি করেছে রসিক প্রথার মধ্য দিয়ে তার ভালমন্দ নিয়ে তারা ভাবতে পারে না। আবহমানকাল ধরে রসিকের অধীনে থেকে থেকে এটাই তাদের একমাত্র চরম প্রাপ্তি বলে মনে হয়েছে। কত নারীকে যে এ জন্য পদস্খলনের পথে নিয়ে যাওয়া হয় তার কথাও প্রকাশিত হয় নাচনী সম্প্রদায়ভিত্তিক গল্প-উপন্যাসে। আপাত-মনোরঞ্জনী কিন্তু চরম অসম্মানের এই নাচনী জীবন সম্বন্ধে আজকের লোকসংস্কৃতিবিদ হয়তো সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা করতে পারবেন—কিন্তু এই কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করা কবে সম্ভব হবে—তা তিনি জানেন না।

জীবন ধারণের এ এমনই এক প্রথা, যার অন্তিমে হল সেই নাচনী হবে চিরকালের জন্য সমাজচ্যুতা, জুটবে না নিজের সংসার বা সম্মান এবং মৃত্যুর পরে তার দেহ হবে শিয়াল-কুকুরের খাদ্য। পুরানো সামন্ততান্ত্রিক প্রথার এই শেষ ক্ষয়িকু প্রকরণটিকে কিন্তু আজও টিকিয়ে রাখার এক আপ্রাণ চেষ্টা চলছে সমাজের চোরাবালির প্রবাহে—যার কথা জানেন তদঞ্চলের শিক্ষিত শহুরেমনস্কা ব্যক্তিরাও।

এখনও আমার ব্যাগে আছে 'ছত্রাক' পত্রিকার ১৯৯৭ সালের শারদ সংখ্যাধি। দু দিন আগে যখন পুরুলিয়া শহরে 'ছত্রাক' পত্রিকার সম্পাদক সুবোধ বসু রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম, তখন তিনি ঐ পত্রিকার একটি কপি দিয়েছিলেন আমাকে। বলেছিলেন 'এতে দেখবেন, নাচনীকে নিয়ে লেখা একটা উপন্যাস আছে। লিখেছে স্থানীয় লোকই।'

আর যেটা বলেননি তা হল, বাইরে থেকে সব তথ্য সংগ্রহ করে সে উপন্যাস লেখা নয়। যারা 'সন অব দ্য সয়েল' এ বিষয়ে তারাই সবচেয়ে ভাল লিখতে পারবে।

তাহলে কি তিনি বলতে চাইলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের 'রসিক' উপন্যাসটির কথা? আমি বিশেষজ্ঞ নই আর তাছাড়া এখন এসব তুলনামূলক পাঠের সময়ও নয়। স্বস্থানে ফিরি, তারপর সব ভেবেচিন্তে দেখা যাবে। তবে নিমাই ভট্টাচার্যের 'নাচনী' নামে যে বেতার নাটক শুনেছিলুম একদা, তার মধ্যে নাচনী সমাজের কোন পরিচয়ই তেমন ভাবে পাওয়া যাবে না—নিতান্তই একটা মামুলী সামাজিক উপন্যাস মাত্র।

এখন আমার বা আমাদের প্রধান কাজ হল, বিন্দুবালাকে প্রশ্ন করে তার ও তাদের সমাজ সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া। আজ তাদের জীবন কীভাবে কাটছে, পুরোনো দিনের প্রথা-সংস্কার আজও কি তাদের মধ্যে সে রকমই আছে, তার নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন—সেই সঙ্গে আর্থিক প্রসঙ্গ—এই সব তথ্য।

ইতিমধ্যে সমাগত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ দেখলাম তার সঙ্গে বেশ কথাবার্তা সুরু করে দিয়েছে। লক্ষ্য করি এক বয়স্ক অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা এই প্রশ্নোত্তর আসর থেকে কিছুক্ষণ পরে উঠে গেলেন—কী জানি কেন।

আরো কিছুক্ষণ পরে দু'চার জন ছাত্রী উঠে গেল—আরো দু'জন। আমার কানটা খোলা যতটা না তার চেয়ে বেশী মনটা।

বিন্দুবালার গল্প শুনছিলাম। ওর নিজের ভাষা বলবার ক্ষমতা নেই আমার —তাই নিজের ভাষাতেই তার বক্তব্য সাজিয়ে লিখি।

'ঐ বয়সেই চোখে রং লাল। লালদার গান শুনতাম আর মনে মনে ভাবতাম, কবে তার মত গাইতে পারব। ওর ঝুমুর গানের তখন অল্প অল্প নাম হচ্ছে। আসরে ছোট ছোট বায়না যাচ্ছে, তখন ওর নাচনী ছিল সাবিত্রী। তার থেকে মাত্র ক'বছর বড়ো ছিল লালদা।'

লালদা ওর বর্তমানের রসিকের নাম। তার পুরো নাম বলল বিন্দুবালা— তাতে নাকি রসিককে অসম্মান করা হয়। শুনে আমদের আরো প্রশ্ন জেগে উঠল।

'লালদাকে আমি স্বামী ভাবেই দেখি। তার ঘরে স্ত্রী-পুত্র পরিবার আছে। আমাকে সে কিন্তু স্ত্রী বলে গণ্য করে না। পড়ে থাকি তার সংসারের এক কোণে— তা বলে অসম্মান করে না। রোজগার করে যা আনি, তা থেকে খেতে পরতে তো পাই। আমার আর নিজের জীবন কি। রসিককে নিয়েই তো আমার জীবন।

আমি তো তবু আছি ভাল। আর ঐ—'

তার কথা অর্ধসমাপ্ত রয়ে গেল অন্যদের প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে। আমরাও আর তত উৎসাহ দেখালাম না এ বিষয়ে। কিন্তু সব জেনেও কেন সে এই নাচনীর জীবিকায় চলে এল, তার উত্তরে যা বলল—

'ঐ যে বললাম, কিশোরী বয়সে মনে যদি একবার কোন ঝুমরিয়ার গান শুনে মনে লাগে, তবে তার আর ঘরে থাকা হয় না। আমার মা-বাপ আমাকে ঢের বুঝিয়েছিল—আমি পারলাম না ফিরে আসতে। তখন মনের মানুষের কাছে থাকবার জন্য নাচনী না হয়ে যে উপায় নেই। তারপর চলল নাচ-গান শেখার পালা। ঐ রসিকই তার সব বন্দোবস্ত করে দিল। আমাকে পুরো নাচনী করে তুলবার জন্য ও কি কম করেছে! তাই না আজ আমার এত নাম।

বিন্দুবালার মানসিক তৃপ্তি দেখে আমার শহুরে মন আঘাত পেল। ঘর ছেড়েছে, নিজ পরিবারে পরিত্যক্ত হয়েছে, একটি পুরুষের কাছে আশ্রিতা হয়ে গেছে হয়তো সেখানে একপ্রকার গঞ্জনাও আছে। শুধু খাওয়া পরার সমস্যাটা মিটেছে—তাতেই সে কত তৃপ্ত! অথচ তারই রোজগারে বলতে গেলে রসিকের সংসার প্রতি-পালন হচ্ছে।

'তাহলে রসিক কি করে? তার নিজের রোজগার কি?'

আমার প্রশ্নের ভাষাটা সে ঠিক ভাবে নিল না। একটু যেন অসন্তুষ্ট হয়ে উত্তর দিল: 'তার জন্যই তো আমার সব। সেই তো গাঁয়ে-গঞ্জের আসরে আমাকে নিয়ে যায়। তারই জন্য রোজগারপাতি চলছে। আজ না হয় তার বয়স পড়ে গেছে, কিন্তু তার নাম তো সবাই জানে। আমি নাচনী কোন রসিকের—তাতেই তো আমার দর। রসিক না থাকলে আমায় চিনবে কে!'

বিন্দুবালার প্রতিটি বক্তব্যে পরতে পরতে বিস্ময়—অন্ততঃ আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে। ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই এখন উঠে চলে গেছে আসর থেকে। তারা ঠিক এ জাতীয় স্ত্রীলোককে বোধহয় মেনে নিতে পারছে না—তাদের শহুরে মন আর শহুরে সংস্কৃতির সঙ্গে যেন কিছুতেই মেলাতে পারছে না বিন্দুবালাকে। কেন যে এরা আসে এই সব শিক্ষামূলক ভ্রমণে। তবু যত অস্বস্তিই হোক, বিন্দুবালার সব কাহিনী যে শুনে যেতেই হবে।

অবশেষে সেই প্রশ্নটা বেরিয়ে এল আমার অন্তর থেকে: 'ভাল লাগে এ ভাবে বেঁচে থাকতে?' আমার প্রশ্নে ও উত্তেজিত হল না। আবার বলি: 'মেয়ে হয়ে জন্মেছো, অথচ দেখো মেয়েরা তোমার থেকে কতদূরে সরে গেছে!'

বিন্দুবালা নীরব আছে এখন। অন্য ছাত্রছাত্রীরা তার উত্তর শুনবার অপেক্ষায় নিঃশব্দ। মাথা নীচু করে সে বলল: 'আমার মেয়ে তো আমাকে ফেলে দেয় না।'

চমকে উঠি আমরা সবাই, বিন্দুবালার মেয়ে! ওর তো বিয়েই হয়নি। প্রৌঢ় প্রায় উত্তীর্ণ বিন্দুবালার-ঠোঁটে এক অদ্ভুত করুন হাসি ছিল: 'রসিকেরই, আমি যে

তার মা। আমি নাচনী বটে, তবে কামিনীর মা। কামিনীকে তো আর নাচনী হতে হবে না!'

বড় অবাক লাগে! সে নিজে তার জীবিকা নিয়ে অনুশোচনা করে না। সে নিজে কিন্তু কন্যাকে এই জীবিকায় আনতে চায় না! এ কী অদ্ভুত দ্বন্দ্ব তার মনে? সে মেয়ে তাহলে এখন কোথায়? তার প্রতি নজর পড়েনি গ্রামের মাতব্বরদের? যারা এই নাচনী কালচার বাঁচিয়ে রেখেছে, তারাই তো সব বিন্দুবালার মেয়ে কামিনীদের নাচনী বানায়। আর রসিকরা তো সে জন্য মুখিয়েই থাকে।

'মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। তার বিয়ে দিয়েছি। জামাইয়ের একটা ছোট দোকান করে দিয়েছি। এই তো কদিন আগে মেয়ে-জামাইয়ের কাছ থেকে ঘুরে এলাম বিজয়ার দিন। আমাকে খুব খাতির করে ওরা।'

একটা পরিতৃপ্তির সুর এখন বিন্দুবালার কণ্ঠে। কণ্ঠই যেন আকাশের পাখীর মত ডানা মেলে উড়তে উড়তে কথা বলছে আমাদের সামনে। ওকে বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। ওর মনের ইচ্ছা পূরণের এ আশা ও যদি আমাদের বলে আনন্দ পায় পাক। আমরা যা শুনি গাছের পাতা শুনবে, গরু ছাগল শুনবে। এভাবে ধীরে ধীরে ও এক নতুন জীবনের দিকে এগোবে—তারপর একদিন হয়তো পূর্ণ মানুষ হবার পথে এগোবে।

'তোমার মেয়ে-জামাই তোমাকে নাচ করতে দেয় এখনও?'

'না, তারা আর পছন্দ করে না এ সব। তারা অনেকবার নিষেধ করেছে, কিন্তু আমি বাবু বিশেষ বিশেষ দিনটায় আর থাকতে পারি না। মকরের দিনগুলোয় আমার সর্বশরীর যেন কাঁপন লাগে। আমার রসিক ঝুমুর তাকানো মাত্র সব চলে যায় রাতের আসরে। অত আলো, লোক, মালা, টাকা—আমি ঘরে থাকতে পারি না।' বিন্দুবালার কণ্ঠ এখন যেন পাপস্বীকারের মত স্বগতোক্তি বলে মনে হয়।

ক্ষণেক থেমে আবার বলে: 'ছেড়ে দিয়ে কী করি? বাবুর সমাজ আমাকে নিবে না। মেয়ের বাড়ীতে তাঁর হেঁসেলে আমাকে ঢুকতে দেবে না। তাদের ঠাকুর-পূজায় আমার কোন কাজ নেই। আমার হাতের ছোঁয়া কেউ খাবে না।' বিন্দুবালার সব কথা এখন বোঝা যাচ্ছে না। এখানে উপস্থিত এখন মাত্র তিনটি ছাত্র। ছাত্রীরা কখন যেন সবাই উঠে চলে গেছে। একটি পূর্ণ বয়স্ক নারীর এ হেন নিষ্ঠুর স্বীকারোক্তি—বোধহয় তাদেরও অসহ্য লাগছে।

'বড় দুঃখের জীবন আমাদের বাবু—বড় পাপের জীবন।' ওর কণ্ঠে এক প্রবল বন্যার আভাস। আমরা সেই চরম মুহূর্তটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সবাই। কোথায় গিয়ে আমাদের এই সাক্ষাৎকার থামানো উচিত, তা যেন কেউ বুঝেও বুঝতে পারছি না।'

'আমাদের রোগ বালাই হতে নাই। আমাদের অন্তরের দুঃখ বলে কিছু নাই। রসিক যদি লাথি মেরে তাড়ায়, তো ভিক্ষে করে খেতে হবে। আমার টাকায় তার সংসার চলবে, আর আমাকেই—

একটু থামল বিন্দুবালা। তাকে কোন প্রশ্ন করতে ভুলে গেছি আমরা। আমরা শহুরে শিক্ষিত, নাচনীর জীবন কাহিনীর গল্পটা আমরা পূর্ণ করে উঠতে পারব—আমাদের সে কল্পনা শক্তি আছে। তারপর সেই তথ্য দিয়ে এক রোমান্টিক গল্প লিখতে পারি। বেশ জীবনধর্মী গল্প হবে সেটা। আর আমাদের মধ্যেই কেউ হয়তো এ নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধি পাবে।

'বিন্দুবালা, তোমার বাকী জীবন ভালভাবে কাটুক। কাগজে তোমার ছবি দেখেছি আমরা। তুমি তোমার মেয়ে-জামাইয়ের কাছে গিয়ে থাকো, হয়তো শান্তি পাবে। তারপর নাতি-নাতনীকে নিয়ে বাকী জীবনটা সুখে সংসার করে মৃত্যুর পরে চিতায় উঠবে।'

শুনে উচ্চরবে হেসে উঠল বিন্দুবালা—প্রায় পাগলের মত। চিতায় উঠবে কথাটা শুনে এতক্ষণের নীরব নাচনী বিন্দুবালা যেন স্বরূপে উদ্ভাসিত হল আমাদের সামনে। চেয়ার থেকে ঝটিতি উঠে পরণের বিবর্ণ শাড়ীটা গাছ-কোমর করে নিয়ে বগলের ছাতিটা বিচিত্র ভঙ্গীতে ধরে অদ্ভুত নাচের ভঙ্গীতে সে ঝুমুর-সুরে গাইল ঃ

মরদ আমার পাঁয়ে দাঁড় দিয়া টান্যেরে
ফেল্যে দেয় গো বাপু টাঁড় ভাগাড়ে।
শকুনি আর শেয়াল খাবে আমারে।

একি সুর!

এই কি তবে নাচনী নাচের ঝুমুর। এ ঝুমুর কে বেঁধেছে—এর রসিক কে কথাগুলির অর্থ কি? আমাদের বই পড়া বিদ্যা এখন আর কোন কাজে লাগছে না। 'এ গান ঝুমুর নয়। এ গান বেঁধেছে ও নিজে।'

কানের কাছে পেলাম গান্ধীরাম মাহাতোর গলা! বিন্দুবালার এই আজব গান শুনে ও ছুটে এসেছে কোথা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তাকিয়ে দেখি, রয়্যাল ছো-ড্যান্স অ্যাকাডেমির সেই ছেলে ছোকরাগুলির দু'চারজন আবার যেন জুটে গেল। বোধকরি জীবনে তারা এমন আজব ঝুমুর গান শোনে নি—তাই।

ঐ তিনটি চরণ কত সুর বিন্যাসে কত অঙ্গ ভঙ্গীতে কত বিচিত্র মুদ্রায় আমাদের তুলে ধরল বিন্দুবালা। ঐ গান সে কোনদিন গায়নি, ঐ নাচ যে কোনদিন নাচেনি। তাছাড়া সে তো ঝুমুরিয়া নয়, নাচনী। তার রসিক তো কোনদিন এমনতর ঝুমুর বেঁধে হাঁকাবে না ঃ 'আমার স্বামী আমার মৃতদেহের পায়ে দাঁড় দিয়ে টানতে টানতে টাঁড় ভাগাড়ে এনে ফেলে দিল। শকুন শেয়ালে তার সৎকার করবে।

গান্ধীরাম বলেছিল, এটাই নাকি শেষ পরিণতি হয় নাচনীদের। মরে গেলেও তার দেহ সমাজের চোখে থাকে অছুত। কে তাকে চিতায় তুলবে বা সমাধি দেবে!

এখন নাকি কোন কোন অভাগিনী চিতার আগুন পাচ্ছে। ☐

লোকসংস্কৃতি চর্চায়
লোকশিল্পই বোধহয় একমাত্র
প্রকরণ—যা সরাসরি অর্থনীতির
সঙ্গে যুক্ত। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের
যাবতীয় ঘটনার সঙ্গে
যুক্ত হয়ে যাচ্ছে লোকশিল্পের নানাবিধ প্রকরণ।
সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত
প্রতিটি প্রহরে লোকজীবন আবর্তিত হচ্ছে লোকশিল্পের
নানা প্রকরণের মধ্য দিয়ে। তার পারিবারিক জীবন,
তার সামাজিক জীবন, তার ধর্মীয় জীবন, তার অর্থনৈতিক
জীবনই শুধু নয়,
এমন কি তার মানসিক বিনোদনেও ঠাঁই
করে নিয়েছে লোকশিল্প। তার ঘর-গেরস্থালি
তার কৃষিকর্ম, তার গৃহনির্মাণ, তার তৈজসপত্র, তার বসনভূষণ

লোকশিল্প-৫

তার বিনোদন—সব, সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে
লোকশিল্পের নানা নিদর্শনে।
কিন্তু গ্রামীণ জীবনযাত্রার প্রাণকেন্দ্রে
একান্ত চালিকাশক্তি রূপে সুপ্ত আছে তার ধর্ম চেতনা—
আর, ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত লোকবিনোদন।
তাই লোকবিনোদনের নানা মাধ্যমে জড়িয়ে গেছে
লোকশিল্পের নানা প্রকরণও। জীবনে বেঁচে
থাকার জন্য অতি
প্রয়োজনীয় বস্তুও যেমন লোকশিল্প-নির্ভর,
তেমনই নিতান্তই আনন্দ-উপকরণ নির্মাণেও
তাই লোকশিল্পের ও লোকশিল্পীর দ্বারস্থ হতে হয়।
অপচয়ের আনন্দের জন্য লোক-
শিল্পীর হাতেই তৈরী হয় তাই আতসবাজীর নানা বৈশিষ্ট্য।
এই অপ্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় করে তোলে লোকশিল্পই।

আনুখালের আতসবাজি

আনুখালের নাম কেউই তেমন জানে না।

আমিও জানতাম না, শুধু সহকর্মী বন্ধুর কথায় তা জানা গেল। সে গ্রামের কোন ঐতিহ্যের কথা কেউ আমায় কখনই শোনায় নি। তবু, বন্ধুর আত্মীয় আছেন সেখানে এবং তারা বাইরের মানুষজনের আসা-যাওয়া পছন্দ তারা করেন—একথা জানতে পেরে আনুখালের পথে পা বাড়িয়ে ছিলাম।

বন্ধু আমাকে চেনেন, আমার স্বভাব জানেন। তিনি আরও জানেন যে, কোন গ্রামেই যাই না কেন, সেখান থেকে ভাল লাগার মত কিছু খুঁজে বার করে নিতে আমার কোন অসুবিধা হবে না—যদি সেই গ্রামবাসীদের কিঞ্চিৎ সহযোগিতা পাই।

এভাবেই লাভবান হয়েছি অনেকবার। অনেক অদেখা বস্তু হয়ে গেছে নিতান্তই আকস্মিক ভাবে। এবারেরও হয়তো হবে তাই।

কালনা ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে স্ট্যান্ডে এসে বৈদ্যনাথপুরগামী বাসে মাত্র আধঘণ্টা গেলেই নামতে হবে গোদা বা গোবিন্দবাটি ষ্টপেজে। তার আগের ষ্টপেজ হল নেপাকুলি। এখান দিয়েও আলোচ্য গ্রামে যাওয়া যেতে পারে। তবে দূরত্ব হয় হাঁটাপথে প্রায় তিন মাইলের মত। পরিবর্তে পরবর্তী ষ্টপেজে নামলে মোটামুটি মাইল দেড়েক হাঁটলেই গ্রামটিতে পেঁছানো যায়।

হাটতলার মধ্য দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে গেছে—লাল সুরকী বিছানো রাস্তা আনুখালের দিকে। পর পর কয়েকটি গ্রাম পেরিয়ে যেতে হবে আনুখাল। মনে নেই সে সব গ্রামের নাম। তবে আনুখাল গ্রামের নাম সবাই জানে। অতি প্রাচীন কালের বসতি কেন্দ্র রূপে এর বেশ খ্যাতি আছে।

অবশ্য আনুখাল সম্বন্ধে তার চেয়েও যেটা বেশী উল্লেখযোগ্য তা হল, এ গ্রামে আছে বহুদিনের প্রাচীন জয়দুর্গার মন্দির। সে জন্যই আশেপাশের বহুগ্রামের লোকের কাছে এ গ্রামের নাম পরিচিত। তাই নতুন কোন পাঠক বাসষ্টপেজে নেমে আনুখালের জয়দুর্গা মন্দিরের নিশানা জেনে নিয়েও এ গ্রামে সহজেই চলে আসতে পারবেন।

পুরাবস্তু রূপেও এ মন্দিরটি দেখতে আসা যায়, কারণ এর প্রাচীনত্বের প্রমাণ মিলবে অতীতের ধ্বংসস্তূপ ও ছড়িয়ে থাকা ইঁট-পাথরের মধ্যেই। তা থেকে মন্দিরের অতীত ঐশ্বর্য সহজেই অনুমান করে নিতে পারা যায়। পুরানো কয়েকটি থাম এখনও তার স্মৃতিবহন করে দাঁড়িয়ে আছে। আর মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথের সামনে বিশাল পুকুরটির ঘাটে দাঁড়ালে, এই মন্দিরের সৌন্দর্যটা ভাল ভাবে পরিমাপ করা যায়।

যে প্রসঙ্গে পাঠককে এই আনুখাল গ্রামে মানসভ্রমণে নিয়ে আশা হচ্ছে, তার সঙ্গে এই মন্দিরের খুবই নিকট সম্বন্ধ। তাই আতসবাজির আলোচনার পূর্বে এই মন্দির সম্বন্ধে কিছু তথ্য নিবেদন করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান প্রতিবেদককেও ঐ

একই পদ্ধতিতে মন্দির কাহিনী শুনতে শুনতে আতসবাজির প্রসঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

মন্দিরের গড়নটি একেবারেই মন্দিরের মত নয়। তার প্রধান প্রবেশ পথে আছে গণেশের মূর্তি—স্থাপত্যের ভাষায় 'বা-রিলিফ' অথবা নতোন্নত পদ্ধতির মূর্তি। ঐ গ্রামের আর পাঁচটা অভিজাত বাড়ীর মত এই মন্দিরের গায়েও একটি পেণ্ডুলাম-দেওয়া দেওয়াল ঘড়ির কারুকাজ আছে—শুধু স্থাপত্যের নিয়মেই নয়, কালের নিয়মেই আজ তার কাঁটা চিরকালের মত বন্ধ হয়ে গেছে। কোন এক সময়ে এদেশে ঘড়িওয়ালা বাড়ির বেশ চলন হয়েছিল—তার নমুনা স্বরূপ এই মন্দির ও অট্টালিকাগুলি সাধারণ দর্শকের চোখে কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারে।

মন্দির তোরণটি অযত্ন লালিত হলেও, সুমুখেই শিল্পলিপি আছেঃ 'স্বর্গীয় হরলাল মজুমদারের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে তদীয় পত্নীর ব্যয়ে সংস্কৃত হইল। ১৩২৪ সাল।'

আর দু'পা এগিয়ে মন্দিরের দালানে পা দিলে মূল মন্দিরের মধ্যে দেবতার পাদদেশে দেখা যাবে আর এক শিলালিপিঃ 'স্বর্গীয় হরলাল মজুমজারের পত্নী সৌদামিনী দাসী কর্তৃক সংস্কৃত। ১৩১৯। আনুখাল।'

সুতরাং এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে প্রথমে মূল মন্দিরটি সংস্কার করা হয়। তাঁর পাঁচ বৎসর পরে তার সংস্কারের কাজে হাত দেওয়ার হয়। উভয় কাজই করেছিলেন তাঁর স্ত্রী। তবে তোরণটি তাঁর স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেও মন্দিরটির সম্বন্ধে সে রকম কোন মনোভাব প্রকাশ পায়নি। সম্ভবতঃ অর্থাভাব ঘটিত কারণেই দুটি সংস্কার কার্য একই সময়ে হয়নি। এই সংস্কার যদি পরেও কয়েকবার হয়, তবে আজ হয়তো মন্দির ও তার পারিপার্শ্বিক অন্য চেহারায় বিরাজ করত। স্থানীয় মতে মন্দিরের বয়স অনুমানিক ৩০০ বৎসর।

মন্দিরে আছেন অষ্টধাতুর মা দুর্গার মূর্তি। মূর্তি এর আগে কয়েকবার অপহৃত হয়েছে। প্রতিবারই নতুন করে অষ্টধাতুর মূর্তি তৈরী করিয়ে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বলা প্রয়োজন যে, প্রতিবারই তার মূর্তি আয়তনে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়েছে। বর্ত্তমান মূর্ত্তিটি উচ্চতায় ১২—১৪" ইঞ্চি পরিমিত।

এই দেবী মাহাত্ম্যের কথা প্রতিটি গ্রামবাসীই যদি সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকেন। নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে পূজার্চনাও হয় প্রতিদিন, তাতে গ্রামবাসীর অংশগ্রহণও বিশেষ ভাবে দেখা যায়। কেউ কেউ আবার মন্দিরের শংখ-ঘণ্টাধ্বনি শুনে ঘড়ির কাজ চালিয়ে নেন।

এই মন্দিরেই প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে খুব সমরোহের সঙ্গে জয়দুর্গার পূজা হয়। বলিদান হোম-যজ্ঞ, দরিদ্র ভোজন ইত্যাদি ছাড়াও এই উৎসব আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠে আতসবাজির জৌলুষে। চৈত্রমাসেয় শেষ তিনদিন এই গ্রাম উৎসাহে-আনন্দে মেতে ওঠে। স্থানীয় প্রথানুযায়ী প্রথম দিনে ফল, দ্বিতীয় দিন নীল ও তৃতীয় দিনে চড়ক অনুষ্ঠান হয়।

প্রসঙ্গ কথা

সেকালের বড়লোকেরা উৎসব-অনুষ্ঠানে বাজি-পটকা পুড়িয়ে আনন্দোৎসব করত। বিয়ে বাড়ীতে তো বটেই। অন্যত্র নানা অনুষ্ঠানেই এ জাতীয় আনন্দ অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম প্যাঁচা থেকে আরম্ভ করে একালের বিমল মিত্রের উপন্যাসেও তার বিবরণ পাওয়া যায়।

এইসব বিবরণ থেকে একটি সত্য প্রথমেই মনে আসে যে, বাঙালী খুব উৎসব প্রিয় জাতি। তাই কোন একটি কারণ ঘটলেই সে সেই সুযোগে আনন্দ করে নেয়। ব্যক্তিগত জীবনের দারিদ্র্য বা অনটন এক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই নয়। আনন্দ উপভোগ করার মত মনও তার আছে। নিজেকে তার অংশীদার ব'লে ভাবতে মনে কুণ্ঠা বোধ হয় না।

দ্বিতীয় কথাটি হল বাঙালীর অব্যক্ত অনেক শিল্প-প্রতিভার মত তার আর একটি সৃজন ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে আতসবাজী তৈরীর মধ্য দিয়ে। নিজেদের বিজ্ঞান সম্মত কল্পনা শক্তিকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করে নানা মনোহারী আতসবাজি নির্মাণে তাই তার দক্ষতা ও সূক্ষ্মতা এত বেশী। কারুশিল্পের অন্যান্য শাখায় সে যেমন নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে, আতসবাজী নামক ক্ষেত্রে শিল্প উৎপাদনের তার সেই প্রমাণ রেখেছে।

এই সূত্র ধরেই আসে তৃতীয় কথাটি—তা হল, এ দেশীয় ধনী সমাজ অন্যান্য আর পাঁচটা কারুশিল্পের মত এই আতসবাজী নির্মাণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন বলেই এই কারুশিল্পটি যথার্থই শিল্প হয়ে উঠতে পেরেছিল। লক্ষণীয় যে. মৃৎশিল্পের মত ব্যবসায়িক বা গৃহসজ্জার সামগ্রী নয়, শান্তিপুর-ধনেখালি-ফরাসডাঙ্গার তাঁত শিল্পের মত নিছক নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক সামগ্রীও নয়—তা সত্ত্বেও এ দেশের ধনীসমাজ শুধু আনন্দের জন্যই আলোর রোশনাই দেখতে অজস্র অর্থ ব্যয় করে গেছেন।

অবশ্য পরবর্তী কালে সেই সব রাজ-মহারাজা-জমিদার শ্রেণীর বিলুপ্তির পরেও কিন্তু এই প্রথাটির বিলুপ্তি ঘটেনি। যে আনন্দের স্বাদ জনসাধারণ সেদিন তাদের দৌলতে ভোগ করেছিল, তা ধরে রাখার একান্ত চেষ্টা করেছে এ কালেও। তার প্রমাণ এখনও মাঝে মাঝেই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিদ্যুৎ ঝলকের মতই দেখা যায়। সেদিন যা ছিল ধনী সমাজের ব্যাপার, তাদের যোগ্যতা বা খেয়ালীপনার প্রকাশ। আজ তা হয়েছে মধ্যবিত্তের সম্পত্তি বা জনগণের আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

এই আতসবাজি নির্মাতারা কিন্তু পুরোপুরি এই পেশা নির্ভর নয়। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ উপলক্ষ নিয়ে এরা আবির্ভূত হয় সমাজে –তাদের চলতি নাম কোথাও কোথাও 'মালি'। অন্যান্য সময়ে তারা ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকে। এখানে যে গ্রামের কথা বলা হল, তারা অবশ্য কেউই পেশাদার নয়, নিতান্তই সৌখীন। তবে এদের বাণিজ্যিক-সমীক্ষা নিয়েও আজকের পত্র-পত্রিকা বেশ মুখর-এ কথাও প্রসঙ্গতঃ নিবেদন করা যেতে পারে।

বাংলা পাঁজি অনুসারে প্রতি বৎসরেই মাসগুলিতে দিন কম-বেশী হয়। তবে উৎসব যাপন হয়। তারিখ দিয়ে নয়,—চৈত্রের শেষ তিন দিন ধরে। সে হিসাবে ১৩৯২ বঙ্গাব্দের অনুষ্ঠান হবে ২৯, ৩০, ৩১শে চৈত্র—কেননা এ বৎসর মাস শেষ হচ্ছে ৩১শে।

বর্ষ শেষ উপলক্ষে এই সময়টিতে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামেই কোন না কোন এবং কিছু না কিছু অনুষ্ঠান হয়ই। এ প্রসঙ্গে এই কথাটাই মনে হতে পারে, সুপরিচিত গাজন তার মধ্যে একটি। নদীয়া-মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান বীরভূমের গ্রামে গ্রামে বোলান গান বা যাত্রা তারই এক অভিব্যক্তি। চড়ক-বানফোঁড়া তো আছেই। এ ছাড়া সং-এর আনন্দও হয় কোথাও কোথাও। আনুখাল গ্রামের জয়দুর্গা পুজা উপলক্ষে এই উৎসব-সমারোহ সেই একই পংক্তিভুক্ত হতে পারে।

ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপের বাইরে এই আতসবাজীর আনন্দ এখানে এতই পরিচিত যে, স্থানীয় গ্রামগুলিতেও তা সমারোহের সঙ্গে বিশেষতঃ প্রথম দুদিন বেশী করে তার আড়ম্বর হয়। এ গ্রামের বর্ত্তমানে শহরবাসী, নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসী, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজন—সকলেই এর অংশীদার হয়ে পড়ে এই দু'দিনে। শুধু তাই নয়, কাজে-কর্মে, আচার-প্রথায় যারা এ গ্রামে বাইরে থেকে আসেন দু' একদিনের জন্য,—তাদের প্রত্যেককেই এঁরা অনুরোধ করেন ঐ দিনগুলিতে এ' গ্রামে একবার পদার্পণের জন্য।

আনুখাল গ্রামের আতসবাজির সমারোহ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের পূর্বে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির কথা একটু বলা প্রয়োজন। নিকটবর্তী বালিয়া যার (স্থানীয় নাম বেলে) ও বাঘনাপাড়া গ্রামে উৎসবের প্রথম দিনে আতসবাজির অনুষ্ঠান হয়। ইসবপুর ও সুলতানপুরে হয় দ্বিতীয় দিনে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় আনুখালে ইসবপুরের লোক এসে আতসবাজির ধুম দেখছে বা এ গ্রামের লোক গিয়ে সুলতানপুর বা বালিয়াতে গিয়ে আনন্দের অংশীদার হচ্ছে। এর মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকলেও, তা অতি প্রচ্ছন্ন। নিছক আনন্দ উপভোগ ও সেই সঙ্গে কোন নতুন কৌশল-প্রকরণ আয়ত্ব করার ইচ্ছাও থাকে। কেননা, আজ পর্যন্ত আতসবাজি নিয়ে কোন প্রতিযোগিতা হতে দেখা যায়নি এই সব অঞ্চলে।

আনুখাল গ্রামের এই বিবরণ দেখে কেউ যেন না মনে করেন যে এই গ্রামের আর্থিক অবস্থা অতি উন্নত বলেই, তারা পুজো-পার্বন উপলক্ষ্যে এই প্রকার অর্থব্যয় বা অপচয় করতে ভালবাসে। এ'কথা ঠিক যে নিকটবর্ত্তী আট-দশ বর্গমাইলের মধ্যে এই গ্রামটি আয়তনে বেশ বড়ই, এবং সে অনুপাতে লোকসংখ্যাও আছে যথেষ্ট।

কিন্তু মাথা পিছু জমির পরিমাণ বা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জমির উৎপাদিকা শক্তি এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। এ গ্রামের অর্থনৈতিক চিত্র এখন ক্রমেই পরিবর্ত্তনের দিকে। চাষের জমির দিকে তারা আর হাত না বাড়িয়ে গ্রামের বাইরে জীবিকার সন্ধানেই বেশী ব্যস্ত। এমন কি বর্ত্তমান প্রজন্মও সেই ভাবেই নিজেদের

তৈরী করছে। এমন অনেক পরিবার আছে, যাদের কর্তারা প্রতি সপ্তাহান্তে কলকাতা বা অন্যান্য কর্মস্থল থেকে বাড়ীতে এসে কাজকর্ম তদারক করে যান।

তা সত্ত্বেও জয়দুর্গার পূজা ও বৎসরান্তে আতসবাজীর ধুম এ গ্রামের গৌরব ও একমাত্র গর্ব।

বারোয়ারী প্রথায় চাঁদা তুলেই এই পর্ব সমাধা হয়। বিভিন্ন পাড়া থেকে চাঁদা তুলে আনে গ্রামের ছেলেরাই। এ গ্রামে মোটামুটি পাড়া হল পাঁচটা—দাসপাড়া, জেলেপাড়া, সাঁওতাল পাড়া, দক্ষিণপাড়া ও বামনপাড়া। প্রতিটি পাড়ায় গড়ে ২০/২১ পরিবার বাস করে। প্রতিটি পরিবার গড়ে ৫০ টাকা করে চাঁদা দেয়। এইভাবে প্রতিটি পাড়া থেকে আসে প্রায় হাজার টাকা করে।

কেবলমাত্র বামনপাড়ায় লোকসংখ্যা কিছুটা কম এবং ওদের আর্থিক যোগ্যতাও নিম্নমুখী। তাই এই পাড়া থেকে চাঁদা আদায় হয় গড়ে ৮০০ টাকা।

প্রসঙ্গত এ গ্রামে সাঁওতালদের বাস দীর্ঘদিনের। হয়তো অতীতে তারা নিজেদের সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করত, কিন্তু আজ যারা এ গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় —তারা বরাবরই দেখে এসেছেন যে, সাঁওতালরা হিন্দু সমাজের যাবতীয় রীতি-নীতিই পালন করছে। তাই এই বাৎসরিক আতসবাজীর অনুষ্ঠানেও তারা নিয়মিত অংশগ্রহণ করে। বৃহত্তর সমাজ আজ সাঁওতাল পরিবারদের তাদের নিজেদের সমাজেরই একটা অংশ বলে মনে করে।

কিন্তু সমগ্র আদায়ীকৃত চাঁদা যে ভাবে ব্যবহৃত হয় তা থেকে এ' গ্রামের লোকেদের আতসবাজী প্রীতির নমুনাটা আরো ভালো বোঝা যাবে। বৎসরান্তিক এই উৎসবের প্রধান খরচ হল তিনটি—বাজনা, দেবী পূজা ও আতসবাজি। নিতান্ত অবিশ্বাস্য হলেও এ কথা সত্য যে ঐ বিপুল পরিমাণ চাঁদার মাত্র ১০০ টাকা ব্যবহৃত হয় বাজনা ও দেবীপূজার জন্য। বাকী টাকা ব্যয় হয় আতসবাজীর জন্য।

এই বাজী পোড়ানো উৎসবটা যে নিছক স্ফূর্তিই এবং অপচয় তা গ্রামবাসীরা ভালো বেশ করেই জানেন। কিন্তু এ গ্রামে অন্যান্য আনন্দ উৎসব তেমন নেই বলে বৎসরে একবার এই উৎসবটা করতে তাদের অসুবিধা হয় না। তাই এটাকে তারা অপচয় বলে মনে করেন না। অপরপক্ষে বলা যেতে পারে, যেহেতু এই প্রথা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত আছে, তাই অন্য দ্বিতীয় কোন প্রথা-আচার আজ পর্যন্ত এ গ্রামে প্রবেশাধিকার পায়নি। তাই আতসবাজির ধুমটাই তাদের অনাড়ম্বর জীবনে বরাবর প্রাধান্য পেয়ে এসেছে।

ইতিপূর্বে সংলগ্ন যে সব গ্রামের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও আর্থিক চিত্রটি প্রায় অনুরূপ। তবে আলোচ্য গ্রামটি এ' ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতিমান হয়েছে। উৎসবের ধুমধাম বা আতসবাজীর প্রকার-প্রকরণেও এ গ্রাম দীর্ঘদিন ধরেই বিশিষ্ট হয়ে আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রামের বাজি তৈরীর কৌশলের কথা বর্ণনা করা যেতে পারে।

যেহেতু আনন্দখাল কখনই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই বাজী তৈরী করে না, তাই ভাল জিনিষ দিয়ে তৈরীর জন্য বরাবরই চেষ্টা করে আসছে। এতে খরচ একটু বেশী পড়ে বটে, তবে উৎপাদিত দ্রব্যটি হয় উৎকৃষ্ট মানের।

আনন্দখালের নিকটবর্ত্তী শহর কালনা—কিন্তু গ্রামের বিশিষ্ট কারিগর সন্তোষ দাসের মতে, সেখানে ভালো কাঁচামাল পাওয়া যায় না। তাই কলকাতা থেকেই সে সব নিয়ে আসা হয়। খরচ বেশী হলেও, আখেরে তা নাকি পুষিয়ে যায়।

যারা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাজি তৈরী করে তাদের বলে মালি। এই গ্রামের কারিগরদের ক্ষেত্রে এই শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না—কেননা এরা সকলেই বিশুদ্ধ চাষী। এছাড়া আছে জেলে বা ধীবর সম্প্রদায়। যেহেতু আতসবাজি এদের জীবিকা নয়, এক ধরণের শিল্পচর্চা—তাই সেটিকে উৎকৃষ্ট পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য এদের যে নিষ্ঠা, তা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ' প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য হল ঃ

এ গ্রামে তুবড়ী তৈরীর ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। শহরাঞ্চলে সচরাচর প্রচলিত 'এক ছটাকী' তুবড়ির কথা এ' গ্রামে কেউ জানে না। পরিবর্তে তারা জন্মাবধি দেখে এসেছে দশসেরী আধমণি তুবড়ির বহর ও বাহার। এগুলির খোল হয় মাটির বিরাট জলের কলসীর মত। খোলের নীচের দিক—যেখান দিয়ে মসলা ঢোকানো হয়—তার আয়তন হয় প্রায় ৫" – ৬" ব্যাস। ওপরে যেখানে আগুন ধরানো হয়, সেই ছিদ্রটি হয় প্রায় আধুলির মত। শহরাঞ্চলে প্রচলিত যে কোন তুবড়ীর সঙ্গে এই দশসেরী, আধমণি তুবড়ীর আয়তনটি এ প্রসঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

তুবড়ীর খোল এ গ্রামে তৈরী হয় না। তার দুটি কারণ—এ, গ্রামে কুমোর নেই। এ ছাড়া ঐ খোল তৈরীর উপযুক্ত মাটিও নেই। খোলকে ব'লে খোলা। নিকটবর্তী গ্রাম হল সিঙ্গারকোন, সেই গ্রামের খ্যাতি আছে এই খোলা তৈরীর। শুধু আনন্দখাল নয়—আশেপাশের সমস্ত গ্রাম এখান থেকে প্রয়োজনীয় খোল সংগ্রহ করে।

একটি আধমনি তুবড়ী তৈরী করতে যা যা লাগে, তা এখানে বলা হল। এ মাপটি দিয়েছেন ঐ গ্রামের বিশিষ্ট উৎসাহী কারিগর সন্তোষ দাস, তাঁর সম্বন্ধে যথাসময়ে বিশদ করে বলা হবে। সেই হিসাবটি হল ঃ

১, সোরা ঃ ছয় কিলোগ্রাম

২, রলা গন্ধক ঃ এক কিলোগ্রাম আড়াইশো গ্রাম

৩, ইস্পাত ঃ বারো কিলোগ্রাম

(অথবা, লোহাচুর ঃ তিন কিলোগ্রাম)

৪, কাঠকয়লা ঃ দুই কিলোগ্রাম

একমাত্র কাঠকয়লাই স্থানীয় কাঁচামাল রূপে পূর্ব হতেই সংগ্রহ করা হয়। সাধারণতঃ আকন্দ মনসা প্রভৃতি গাছের কাঠে কাঠ কয়লা তৈরী হয়। সেজন্য এই গ্রামে ঐ দুই প্রকার গাছ কেউ অযথা কেটে নষ্ট করে না। যতখানি পারে সংরক্ষণ

করে রাখে। কাঠকয়লা তৈরীর পদ্ধতিও বেশ দক্ষতাপূর্ণ। কাঠগুলি ছোট ছোট টুকরা করে কুঁচিয়ে আগুন দিয়ে মাটিতে গর্ত করে রেখে দেওয়া হয়। গর্তের ওপরে ঢাকা দেওয়া হয় কাঁচা তালপাতা—তার ওপরে মাটি দিয়ে গর্তটি বায়ুরোধক (Air tight) করে দেওয়া হয়। আনুমানিক দেড়দিন পরে তুলে নিলে ভাল কাঠকয়লা পাওয়া যায়। আগুন ধরে গেলে কাঠের টুকরা কয়লায় পরিণত হতে পারে না—ছাই হয়ে যায়।

অন্যান্য উপকরণগুলির প্রস্তুতের জন্য যথেষ্ট কম সময় ও দক্ষতা প্রয়োজন। সোরা, গন্ধক ও কাঠকয়লাকে তুবড়ীতে ব্যবহারের আগে তিনপ্রস্থ গুঁড়া করতে হয়—প্রথমে জাঁতায় পিষে, পরে ঢেঁকিতে কুটে ও সবশেষে চালুনিতে ছেঁকে। অবশেষে রোদে শুকিয়ে নিলে তবে তা ব্যবহারের উপযোগী হয়। এ' ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তবে সে রকম কোন দুর্ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেনি।

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। সবই প্রায় খোলা বাজারে পাওয়া যায়। শুধু পটাশ সংগ্রহে একটু অসুবিধা আছে, কেননা এর জন্য লাগে সরকারী অনুমোদন। কখনও বা এটার জন্য তাদের বেশী দাম দিয়েও সংগ্রহ করতে হয়। তবে দীর্ঘদিন ধরে এ' গ্রামে এই কাজ চলছে বলে কি ভাবে তা সংগ্রহ করতে হয়, তার জটিল পদ্ধতিও ওদের কাছে সহজ হয়ে গেছে।

এ' গ্রামে তৈরী হওয়া আর একটি জনপ্রিয় বাজি হল গোলা। এটি তৈরীর জন্য দুটি উল্লেখযোগ্য কাঁচামাল হল: এক নম্বর চিল কাগজ এবং এক নম্বর চন্দনগরের সরু সুতুলি। এ' দুটি জিনিষ উৎকৃষ্ট না হ'লে গোলাবাজির চমৎকারীত্বই নাকি নষ্ট! এ' বাজি তৈরী হয় নারকেলের মালায়।

যে সমস্ত বাজী তৈরীতে এই গ্রামের কারিগররা সিদ্ধহস্ত তার কয়েকটি নাম দেওয়া হল এখানে—বোম, গোলা, আসমান গোলা, হাউই, তুবড়ি, চরকি, রংমশলা, মালা, কদমঝাড়, দালান, গুলোর মালা প্রভৃতি।

শুধু এই গ্রামেই নয় পূর্বোক্ত গ্রামগুলিতেও এগুলি বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে তৈরী। কিন্তু জনপ্রিয়তার বিচারে সবাই যে সমান, তা নয়। এ' ব্যাপারে মালা-র স্থান সর্বাগ্রে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী হল যথাক্রমে দালান ও তুবড়ি। অবশ্য তুবড়ির মধ্যে একমাত্র আধমণি তুবড়িই এ'দের যথেষ্ট প্রিয়—সেটা জ্বলতে পারে একটানা দশ বারো মিনিট পর্যন্ত।

এই বিচিত্র বাজি-পটকা যাদের হাত দিয়ে প্রতি বৎসর নির্মিত হচ্ছে, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সুকুমার লোকশিল্পটি আজও সগৌরবে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে, তাদের সম্বন্ধে কিছু না বললে আনুখালের আতসবাজির বৃত্তান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

দীর্ঘদিন ধরেই এই কারিগরী দক্ষতা অর্জন করেছে এই গ্রাম। পুরানো দিনের শিল্পীদের কথা এখনও গ্রামবাসীদের মুখে শোনা যায়। এ প্রসঙ্গে জেলে-

পাড়ার জগৎপতি হালদার ও দক্ষিণপাড়ায় কায়স্থ বাড়ির কালীচরণ ঘোষের নাম এখনও প্রবীণ ব্যক্তিরা মনে রেখেছেন। শুধু এঁরাই নন, ব্রাহ্মণ পাড়ার আর দু'-জন ব্যক্তিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁরা হলেন ফকির চক্রবর্তী ও দিবাকর চৌধুরী। এঁরা মৃত, তবে এঁদের বংশধররা বেঁচে আছেন। তাদের কেউ কেউ এই আতসবাজি তৈরীতে ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলে মনে হয়।

জীবিত কারিগরদের মধ্যে বৃদ্ধ কালীপদ হাজরা ও তার ছেলে সাধন হাজরা এখন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তম হালদার পেশায় জেলে, কিন্তু দক্ষ কারিগর। এ গ্রামের আর দু'জন শিল্পী হলেন বলাই চৌধুরী ও তারাপদ মণ্ডল।

সাঁওতাল পাড়ার অধিবাসীরাও যে আজ এদের সঙ্গেই হাত মিলিয়ে জীবনযাপন করছেন, তা' পূর্বেই বলা হয়েছে। এদের মধ্যে কানাই হাঁসদা বেশ আতসবাজি তৈরী করছেন। দাসপাড়ার দু'জন ব্যক্তি হলেন শিবপ্রসাদ দাস ও সন্তোষ দাস।

শেষোক্ত জন এক বিচিত্র ব্যক্তি। এমন বাজী-পাগল লোক সত্যই দেখা যায় না। একদা স্কুল কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন, ছিলেন পোষ্টমাষ্টারও। কিন্তু এখন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে পুরোদস্তুর অবসর জীবন যাপন করছেন। সারা বৎসর ধরে তাঁর একটিই মাত্র কাজ—বাজির প্রস্তুতি পর্ব এগিয়ে রাখা। কদম ঝাড়ের জন্য লম্বা সোজা বাঁশ সংগ্রহ করে রাখেন আগে থেকেই এবং তা সযত্নে রেখে দেন নিজের ঘরে যেন কেউ তা নষ্ট করতে না পারে। তাঁর ঘরে গেলে দেখা যাবে, অসংখ্য নানা আকৃতির নারকেলের মালা—এগুলি তিনি সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছেন গোলা তৈরীর জন্য। উৎসবের সময় কোথায় খুঁজে বেড়াবেন, তাই সারা বছর ধরে সংগ্রহ করে যান।

তাঁর আর একটা প্রিয় কাজ হল, আকন্দ ও মনসা গাছের তদারকি করা—অর্থাৎ যেন কেউ নষ্ট বা অপচয় না করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। গ্রামের কোথায় কোথায় আকন্দ ও মনসা গাছ আছে—তা' তাঁর নখদর্পণে।

বাইরের কোন লোক তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করতে গেলে তিনি সযত্নে তাকে তাঁর বৈঠকখানায় বসিয়ে সবিস্তারে সব বলেন—তবে তাঁর কথায় হতাশা নেই একেবারে। তিনি একবারও মনে করেন না যে, এই সুকুমার গ্রাম্য শিল্পটি এই গ্রাম থেকে অর্থনৈতিক বা অন্য কোন কারণে একদিন বন্ধ হয়ে যাবে।

এই আতসবাজির অনুষ্ঠানের অন্যতম অংশীদার হল এ গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়—যারা দীর্ঘদিন ধরেই বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে আছে। চৈত্র সংক্রান্তির আনন্দ তাই তাদেরও আনন্দ হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গতঃ আতসবাজি তৈরীই এই সুন্দর সুকুমার লোকশিল্পের শেষ কথা নয়। ঠিক ভাবে এই বাজি পুড়াতে (বা চলতি কথায় ফুটাতে) না পারলে তার কোন সৌন্দর্যই নেই। তাই যারা বাজি তৈরী করে, তাদের দ্বিতীয় এবং অন্যতম প্রধান কাজ হল সেগুলিকে অনুষ্ঠানের দিন যথাযথ ভাবে প্রদর্শন করা। এ' কাজ তারা

ছাড়া আর কেউ পারে না। বিশেষ করে খোলা, মালা তুবড়ি, কদমঝাড় প্রভৃতি কয়েকটি বাজি পোড়ানোতে রীতিমত দক্ষতা প্রয়োজন হয়।

একটি আধমণি তুবড়ি পোড়াতে হলে মাটির নীচে গর্ত করা হয় ঐ তুবড়ির খোলের মাপে, মুখটি সামান্য বেরিয়ে থাকে মাটি থেকে। তারপর তুবড়ির উপরের আধুলি পরিমাণ স্থানে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এটি করার কারণ হল, আর পাঁচটা সাধারণ তুবড়ির মত খোলা মাটিতে বসিয়ে রাখলে, এটি ফেটে যেতে পারে এবং— তাতে সমুহ উদ্যোগটাই নষ্ট হয়। অগ্নিসংযোগের পর খোলের মধ্যে যে গ্যাসীয় উত্তাপ চাপ সৃষ্টি করে, সে জন্য অনেক সময়েই খোল ফেটে যায়। সেইজন্যই সতর্কতা স্বরূপ মাটির নীচে খোলাটিকে বসানো হয়।

কদমঝাড় বাজিও একটি বৃক্ষ সদৃশ বাঁশে বিভিন্ন স্থানে বাখারি দিয়ে কৃত্রিম শাখা প্রশাখা তৈরী করে তাতে ছোট ছোট 'কদম' বাজি পূর্বেই বেঁধে দিতে হয়। এই বেঁধে দেওয়াটি খুব কৌশলে করা হয় – যেন প্রথম কদমটিতে আগুন লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে তা ঠিকমত জ্বলে ওঠে এবং জ্বলন শেষ হলেই তার আগুন থেকেই আর একটি নিকটবর্তী কদমে আগুন লাগে। এই ভাবে পর্যায়ক্রমে সব কটি কদমে আলোর ফুল ঝরে ঝরে এক বিচিত্র বদম ঝাড় তৈরী করে।

নিকষ রাতের কালো আঁধারে আনুখাল গ্রামের দীঘির পাড় তখন লোকে লোকে ভর্ত্তি হয়ে যায়। তারা সবাই যে এ গ্রামের তা নয়—আর কেউ তা নিয়ে খোঁজও করে না। সকলের দৃষ্টি তখন উদার অনন্ত কালো আকাশে। যে আকাশে ফুটে যাচ্ছে একের পর এক আতসবাজির কত বিচিত্র রোসনাই। ফুলের মালা শেষ হ'ল তো দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল হাউই। আবার কোথাও বা নামছে মালা থেকে কৃত্রিম প্যারাসুট—আরো কত কী!

এসব আমার বহু পূর্বকালের স্মৃতি। তাই এই প্রতিবেদনে সময়, দূরত্ব ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দে হয়তো কিছুটা গোলমাল থাকতে পারে।

আনুখালের আতসবাজি দেখার আগে ও পরে এ প্রসঙ্গে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক গ্রামের নাম ওঠে। এখন এই বিবরণী লিপিবদ্ধ করার সময়ে এতদিন পরে সে সব গ্রামের বা অনুষ্ঠানের কথাও মনে পড়ছে। বর্ধমানেরই আর এক গ্রামে নববর্ষে উৎসবের দিন কিভাবে আতসবাজির ঐশ্বর্য দেখেছিলাম—সে কথাও মনে পড়ে।

মনে পড়ে খুব বাল্যকালে যখন শহর কলকাতার উপকণ্ঠে বেহালা পেরিয়ে সখেরবাজার অঞ্চলে কাদার ডলাসের অক্সফোর্ড মিশন ছিল—সেখানেও বড়দিনের রাত্রে এক সমৃদ্ধ আতসবাজি পুড়াবার দৃশ্য দেখেছি—এসব পাঁচের দশকের শেষের দিনের ঘটনা—মিশন এখনও আছে, কিন্তু সে সব আর হয় না সেখানে।

একবার পাটুলী গ্রামে গিয়ে পড়েছিলাম—কী ভাবে যেন। এই অঞ্চলটির আতসবাজি তৈরীতে সুনাম বহুদিনের। তারা নাকি তাদের তৈরী আতসবাজি বিদেশেও রপ্তানী করে। শহর কলকাতার বহু অনুষ্ঠানেই পাটুলীর বাজি পটকা

আসে। পাটুলীতে এখন এটি এক বিশিষ্ট লোকশিল্পে পরিণত হয়েছে। এত বিবিধ উপলক্ষে তারা আতসবাজি পুড়িয়ে এসেছেন যে, আজ তারাও বোধহয় বলতে পারবেন না কবে কোন উপলক্ষে সে সব কাজ করে এসেছেন।

আরো মনে পড়ে সুন্দরবনের রায়দীঘি অঞ্চলে নববর্ষ'র প্রথম দিনেই কী একটা উপলক্ষে বাজি পুড়ানো দেখেছি। সে সব প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে'র কথা। সেগুলি তৈরী করত ঐ অঞ্চলের কারিগররাই।

আর একবার কাটোয়া শহরের অনতিদূরে মোস্তাফাপুর গ্রামে মাদার পীরের মেলায় যে আতসবাজীর উৎসব দেখেছিলাম—তার কথা মনে পড়ছে। এখানে পাটুলির শিল্পীদের ডেকে নিয়ে আসা হয় বাজী তৈরীর জন্য। মুসলমান সমাজের স্মরণীয় শ্রদ্ধেয় হলেন মাদার পীর। তাঁকে কেন্দ্র করে যে আনন্দোৎসব হয়, তাতে আতসবাজীর এই রমরমার জন্যই – লোক সমাগম হয় প্রচুর—তাদের মধ্যেই একদা আমার মত হয়তো অনেকেরই নাম ছিল।

এদের কথা ভাবতে ভাবতে মনে বেশ কিছু চিন্তা দানা বাঁধল। প্রথমতঃ একটি নির্দিষ্ট কারিগর শ্রেণী এগুলি তৈরী করে যাদের সাধারণতঃ বলা হয় মালি। তারা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে আতসবাজি প্রদর্শন করে আসেন। দ্বিতীয়তঃ এই কারিগরদের এটাই হল প্রধান পেশা—অর্থাৎ তারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতেই এই কাজ করে থাকে। তাই তাদের প্রচার সুনাম ইত্যাদি বহুদূর বিস্তৃত হয়। তৃতীয়তঃ, যে স্থানে এই অনুষ্ঠান হয়, সেই স্থানের জনগণের সঙ্গে তাদের কোন সামাজিক সম্বন্ধ থাকে না। নিতান্ত অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক চুক্তি অনুযায়ীই এই আনন্দ দান পর্ব সমাধা হয়।

ফিরতি পথে এসব কথা মনে হলেও, আর একটা সত্য কথা না বললেও বোধহয় নয়। এত উদ্যোগ আয়োজন, দক্ষতা, পরিশ্রম সব শেষ হয়ে যায় মাত্র কয়েক ঘণ্টায় —তবুও এটা বোধহয় অপচয় নয়। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই অর্থ দিয়ে ওরা যে আনন্দ দিল আমাদের—তাই দিয়েই চলবে আগামী একটি বৎসর। এই সুখ-স্মৃতি নিয়ে ওরা বৈশাখের রোদে, শ্রাবণের জলে, অঘ্রাণের সোনালী ক্ষেতে চাষ করতে করতে পৌষ সংক্রান্তিতে পেঁছাবে—এই আনন্দই তাদের সে প্রাণশক্তি দেয়।

নিজেদের তৈরী শিল্পগৌরব আর ঐতিহ্যকে তাই তারা এ ভাবেই বাঁচিয়ে রাখতে চায় এবং হয়তো তা পারবেও।

এভাবেই লাভবান হয়েছি অনেকবার। অনেক অদেখা বস্তু দেখা হয়ে গেছে নিতান্তই আকস্মিক ভাবে। এবারেও হবে হয়তো তাই।

কিন্তু তারপরেও সংবাদ থাকে আতসবাজী প্রেমিকদের জন্য। অনেকেই হয়তো মনে ভাবেন, আতসবাজী পুড়িয়ে এই আনন্দটা বোধহয় একান্তই একটি বাবু কালচার। কথাটা ঠিক নয়। শহুরে বাবু কালচারে তার কী রূপ ও প্রকাশ, তা আমরা দেখেছি বিস্তর লিখিত সাহিত্যে—হয়তো রবীন্দ্রনাথের গল্পেও।

সংবাদপত্রে তো বাজী পুড়িয়ে আনন্দ করার সংবাদও ইদানীং ছাপা হয়—না, এদেশে বা ভারতে নয়, খোদ আমেরিকা মহাদেশেও। অর্থাৎ এই আনন্দ সর্বত্রগামী এবং সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই এতে এক ধরনের আনন্দ পান।

আজ বাজী পটকার বাজার খুব রমরমা। দক্ষিণ ভারতে তার স্থায়ী কারখানা আছে। মনে পড়ছে কল্যাণী শহরের নিকটে গ্রাম কাঁচরাপাড়া অঞ্চলেও একটি ছোট বাজী কারখানা দেখেছিলাম একদা। সুতরাং লোকশিল্প আজ একটি বিশিষ্ট শিল্পে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার জন্য যে আনুখালের আতসবাজি বা তার জৌলুষ ম্লান হয়ে যাবে—তা যেন কেউ না ভাবেন। □

লোকউৎসবের নানা রূপ।
প্রত্যেকেই পেতে চায় স্বাতন্ত্র্য,
পূর্বসূরীদের থেকে হয়ে উঠতে চায় আরো বেশী অভিনব।
তাই চৈত্র সংক্রান্তির প্রচলিত গাজন উৎসব
এ বঙ্গের নানা স্থানে নানা রূপে রূপায়িত হয়ে উঠে।
গাজনের নানাবিধ লোকাচারের সঙ্গে
সমান্তরালে চলে আরো নানা আনন্দানুষ্ঠান।
সে অনুষ্ঠানে থাকে
উদার লোকগীতি, বৈচিত্র্যময় লোকনৃত্য এবং
অনুপম নাট্যানুশীলন।
গ্রাম বাংলার তিন মহান সম্পদ
গাজনের পটভূমিতে যেন মিলে মিশে এক হয়ে যায়।
এ যেন একই সঙ্গে চলেছে
বর্ষবিদায়ের আর বর্ষবোধনের গান।

লোকনাট্য-২

আলকাপ, দুখে যাত্রা, মনসা যাত্রা পালাটিয়া গান—
তারপরেও শেষ হয় না নাট্যানুষ্ঠানের।
তাই চৈত্র সংক্রান্তির খর রোদে
গ্রামের তথাকথিত অন্ত্যজ সমাজ কোন বিশেষ দেব-দেবী নয়,
নিজের মনের মত করে গড়ে
তোলে এক অভিনব নাট্যানুষ্ঠান।
এই অনুষ্ঠানে
নেই কোন দেবতার ভিক্ষা
নেই কোন শাস্ত্রীয় ধর্মভাবের জাগরণ,
নেই কোন তথাকথিত ব্রতাচার সংস্কার।
নিজেদের মানসিক সম্পদের সীমানার মধ্যে থেকে
নিজেদের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে তারা
যা বিলিয়ে দেয় নৃত্য-গীত-অভিনয়ের মধ্যে—
তার নাম বোলান

সাইকেলের পিছনে আমাকে জোর করে তুলল মহীউদ্দিন।

অনভ্যস্ত ভাবে বসে অতি কষ্টে তার সঙ্গে গ্রামের মেঠো পথ ভেঙ্গে চলতে হল। এ ধরনের সাইকেল যাত্রাকে আমি সাধারণতঃ এড়িয়ে চলি। কিন্তু মহীউদ্দিন যে সংবাদ এনে দিয়েছিল, তাতে এই পদ্ধতি অবলম্বন না করে আমার আর তেজনগর যাওয়া হত না।

তেজনগরে আমাদের যাওয়া হবে বা তেজনগরে গেলে আমার কিছু উপকার হবে—এ কথা ও আমাকে কালকে রাতেও বলেনি। বলেছিল, অমুক গ্রামে গেলে আমিনুর সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে বোলান গান সম্বন্ধে অনেক কথা হবে। সুতরাং সেই ভরসা নিয়ে নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই তার সঙ্গে সাইকেল যাত্রায় বেরোতে বাধ্য হয়েছি।

গ্রামের পাড়া ছেড়ে যখন আখ ক্ষেতের মধ্য দিয়ে সাইকেল যাত্রা শুরু হল, তখন আমরা টের পেলাম লোকসংস্কৃতির তথ্য অনুসন্ধান কী কঠিন ব্যাপার। দুপাশে আখের পাতা মাঝে মাঝেই গায়ে এসে পড়ে আর চটি পরা পায়ে তার ধারালো পাতার দাগ চামড়ায় রেখে যায়। চাকার নীচে উবড়া-খেবড়া মাটি। যে ব্যাপারে আমি একেবারেই অজ্ঞ, আজ তথ্য সংগ্রহের খাতির সেই ব্যাপারেই এভাবে মাঠে নামতে হয়েছে।

খাতাপত্র নিয়ে কোথায় যাচ্ছি জানি না।

মহীউদ্দিন খুব আন্তরিক আমার এ কাজের প্রতি। ও যতটা পারে আমাকে আরাম দেবার চেষ্টা করছে। নিকটে পলাশীগ্রামে ওর বাড়ী। বার্নিয়ার এক স্কুলে শিক্ষকতা করে। আমি বোলান বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছি শুনে ও আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছে এবং বলেছিল ওদের গ্রামে এলে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে, যারা বোলান গানের সঙ্গে এখনও প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত।

ওরা অবশ্য বোলান গানই বলে—তাছাড়া গ্রামের লোকে যাত্রা জাতীয় যে কোন অনুষ্ঠানকেও গান বলে। কেন বলে সেটা বলতে গেলে আমার এই বোলান যাত্রার কথা বলা যাবে না।

এই সব করতে করতে এ-পথ ও-পথ দিয়ে কীভাবে ও যেন আমাকে এনে ফেলল একটা পীচ রাস্তার ওপর। দম নিয়ে বলল—'এই এসে গেলাম তেজনগর। এখানেই দেখা করতে হবে তরণীর সঙ্গে—।' তরণী নাকি একাধারে গায়ক ও রচয়িতা, জীবিকায় হল ব্যবসায়ী। কিন্তু মহীউদ্দিন আমাকে বলেছিল যে এই লোকটি হল গ্র্যাজুয়েট।

শুনেই আমি চমকে উঠেছিলাম। যোগান দলের সঙ্গে কোন কলেজের পাশ করা ছেলে থাকতে পারে, তা আমার মাথাতেই আসেনি।

তারপর যখন তার দোকানে তুলল আমাকে, তখন দেখলাম—না, তরুণীকে সহজেই আর পাঁচজন থেকে পৃথক করা যায়। দোকানে মাল বিক্রী করছিল। দেখে মনে হল, ঠিক দোকানী-দোকানী নয়। গায়ে বেশ ধোপ দুরস্ত জামা—মনে হল, আগে থেকে ও বোধ হয় জানতো আমাদের আসার কথা। এবং পরে দেখলাম, সেটাই ঠিক।

সাইকেলে ওকে দেখেই এবং পিছনে আমার মত অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে সে সবই অনুমান করে নিল। মুহূর্তে দোকানের আলো-আঁধারী ঘরের থেকে বেরিয়ে বাইরের বাঁশের মাচায় চলে এল। আমাদের উভয়কে প্রাথমিক সম্ভাষণ জানিয়ে—হ্যাঁ, চা-ও খাইয়েছিল। তারপর আর কিছু এটা-সেটা করার পর আসল কথায় চলে এলাম। কেন না, আত্মীয়তা করতে তো আসিনি, এসেছি তথ্য সংগ্রহ করতে। সুতরাং এর পরের পর্বটা হল প্রশ্ন-উত্তর জাতীয় এবং তা থেকেই আমাকে নির্যাস বের করে গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে হবে। সেগুলি এবারে সে-ভাবেই সাজিয়ে দিই। উৎপত্তি-বৃদ্ধি-বিকাশ-প্রবণতা—কী নয়!

চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে এদেশের নানাস্থানে নানা প্রথা পালন করা হয়ে থাকে। একদিকে যেমন সন্ন্যাস গ্রহণের মত সংসারিক ত্যাগ স্বীকারের পালা, অপর দিকে তেমনি আছে বান-ফোঁড়া, জিভ ফোঁড়া, আগুন-খেলা ইত্যাদির মত কঠোর শারীরিক নির্যাতনের দ্বারা পুণ্য অর্জনের চেষ্টা। এই ত্যাগ ও কৃচ্ছ সাধনার অপর প্রান্তে বিরাজ করছে এক আনন্দময় অভিব্যক্তি।

সন্ন্যাস গ্রহণ বা উপরোক্ত নানা প্রকার রীতি-প্রথা যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থাৎ ব্যক্তির মানসিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল—আনন্দময় অনুষ্ঠানগুলি কিন্তু তার বিপরীত। সমস্ত গোষ্ঠীকে নিয়েই তার প্রকাশ। এই দ্বিতীয় ধারায় প্রকরণে সমগ্র গ্রামই তাই দেশ-কাল-পাত্র ভেদ একাত্ম হয়ে যায়।

এ ধরণের একটি আনন্দময় অনুষ্ঠান হ'ল বোলান গান। এই অনুষ্ঠান বেশ প্রাচীন হলেও আঞ্চলিক। তবে যে অঞ্চলে এর উদ্ভব, বিস্তার ও জনপ্রিয়তা—আর্থ-সামাজিক বিচারে তা দীর্ঘদিন ধরেই একটি তাৎপর্য পূর্ণ অঞ্চল বলে বিবেচিত হওয়ায় বোলান গানের উদ্ভব, বৃদ্ধি, বিকাশ ও তদুপরি প্রকারে এ যাবৎ কাল কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি। সম্ভবতঃ এই কারণেই তা অতি সহজেই ধীরে ধীরে বিবর্তনের দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছে।

যে যে অঞ্চলে বর্ষশেষের এই লোকানুষ্ঠানটি প্রতি বছর গাজনের সময় নিয়মিত ভাবে সংঘটিত হয়ে চলেছে, মানচিত্রের নিরিখে তা প্রধানতঃ চারটি জেলায় সীমাবদ্ধ—নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার পরস্পর সন্নিহিত গ্রাম। বিশদ বিবরণে বলা যায় – নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ তেহট্ট কৃষ্ণগঞ্জ থানার গ্রামাঞ্চল সংলগ্ন বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার উত্তরাংশের গ্রামাঞ্চল সংলগ্ন বীরভূম জেলার লাভপুর নানুর প্রভৃতি থানার গ্রামাঞ্চল এবং সংলগ্ন মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণাংশের ভরতপুর, খড়গ্রাম, বরঞা প্রভৃতি থানার গ্রামাঞ্চলে বোলানগান অতি-মাত্রায় জনপ্রিয়।

শাসক গোষ্ঠীর মাধ্যমে যখন যে সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে রাঢ়ের উর্বর পলিমাটিতে তার একটি বীজ থেকে গিয়েছে এবং যথাসময়ে তা বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাই সহজ সরল ভাবের লোকনৃত্য, ভয়াল বীভৎস রসের লোকনৃত্য —সবই এই অঞ্চলে বিকশিত হয়েছে। ব্যঙ্গ-কৌতুকে, নৃত্য-গীতে, পাঁচালী-অভিনয়ে বোলান গান হয়ে উঠেছে এক বিচিত্র লোকানুষ্ঠান।

দীর্ঘদিন ধরে অনুষ্ঠানটি পালিত হতে হতে যে যার মত এর রূপারোপ করেছেন। তাই পালাগানের অঞ্চলে তৈরী হয়েছে পালা বোলান, কেউ বা সামান্য ভিন্ন পথে স্বাতন্ত্র অর্জনের জন্য করেছেন ডাক বোলান কিংবা সাঁওতেলে বোলান।

বোলানের আদিরূপ কী ছিল এবং বর্তমানের রূপায়ন তা থেকে কতটা বিচ্যুত হয়েছে—এ নিয়ে আজ লোকসংস্কৃতিবিদদের মনে প্রশ্ন জেগেছে। অনুরূপ ভাবে আগামী দিনে তার পরিবর্তন কোনদিকে যাবে—এ কথা ভেবেও কেউ কেউ চিন্তিত।

অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তবে একথা সত্য যে, আমার তথ্যসংগ্রহের তৎপরতা দেখে তরণী বা মহীউদ্দীন দুজনেই বেশ অবাক হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, তরণীর অনেক কথা আছে। সে আমাকে জানাতে পারে অনেক তথ্য, শুধু প্রয়োজন তার সময়ের। প্রশ্নগুলি দিয়ে গেলাম, যাবার সময়ে নেব।

তরণী বি. এ. পাশ, এখন একটা মুদির দোকানের মালিক হয়েছে। পাড়ায় বেশ প্রতিপত্তি আছে। তবে তার দুটি উত্তর আমাদের বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল—অন্ততঃ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। সে সময়টা ছিল ১৯৮৫—৮৬ সাল নাগাদ। আমি তাকে প্রথম প্রশ্ন করেছিলাম: 'বোলান গানকে আর কোন ভাবে ব্যবহার করা যায়?' উত্তরে সে জানিয়েছিল: 'আমি মনে করি মিটিং করে বা জমায়েত করে লোক সমক্ষে কোন রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক বা শিক্ষামূলক বিষয় সহজে বোলান গানের দ্বারা লোকের মনে পেঁছে দেওয়া যায়।'

এবং যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় বোলান গানের আর্থিক সম্ভাবনার কথা, তখন সে জানিয়ে ছিল, এতে খরচ প্রচুর সেই তুলনায় আয় সামান্য। ৩—৩½ ঘণ্টা গান করার পর পারিশ্রমিক মাত্র ৫, ১০, ২০ টাকা থেকে আরম্ভ করে ৬০, ৭০ ৮০ কি বড় জোর ১০০ টাকা মাত্র।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বার চা-মুড়ি হয়ে গেছিল। দোকানে দু-চার জন খদ্দের ভিড় করেছিল। সুতরাং তার ব্যস্ততার জন্য এবার আমাদের স্থান ত্যাগ করা উচিত। ওকে বরং একটা প্রশ্নপত্র দিয়ে যাই।

তরণী তার কথা রেখেছিল। সেদিন ফিরতি পথে মহীউদ্দীনের সঙ্গে যখন পুনরায় তার দোকানের সামনে দিয়ে ফিরছিলাম তখন ঐ প্রশ্নপত্রের উত্তর আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল—চলমান সাইকেলেই। দু'হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে ছিল আমার এই পরিশ্রমের বহর দেখে। বোলান গান নিয়ে এসব ভাবনা চিন্তা করছি বলে সে বোধ হয় বেশ খুশীই হয়েছিল, নচেৎ আমার জন্য অতটা পরিশ্রম সে করবে কেন?

লিখেছিল আমাকে মানিক দে নারাণপুর থেকে। নারাণপুর গ্রামটা নদীয়া জেলার কালীগঞ্জে। ওদের গ্রাম নদীর ধারেই—নদীর ওপারে মৌগ্রাম হল বর্ধমান জেলা। নদীর এপার-ওপার দুপারেই হল বোলান গানের অঞ্চল।

চোত-গাজনের সময়ে গ্রাম-বাংলার যে সব অঞ্চল বোলান গানে মেতে ওঠে, তার মধ্যে নদীয়া—বর্ধমান—বীরভূম—মুর্শিদাবাদ এই চারটি জেলার সংযোগস্থলগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কে জানে, সাংস্কৃতিক পরিব্রাজন বলে কিছু আছে কিনা, নচেৎ ঐ সব জেলার অন্যত্র এটি তেমন বিকশিত হয়নি—শুধু সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে আজও এর জনপ্রিয়তা দেখা যায়।

মানিকের চিঠিতে আরও সংবাদ ছিল অর্থাৎ কবে যেন তাদের গ্রামে বোলান বসবে। সেই সময় বুঝেই যাওয়া ওদের গ্রামে, চৈত্রের সেই খর রোদে। গ্রামে

ঢোকার সময়েই লোকেরা তাকিয়ে ছিল আমার দিকে—নতুন লোক দেখলেই তারা এ ভাবে তাকিয়ে দেখে। শুধিয়ে ছিল কাদের বাড়ী—সবই বলতে হয়েছিল। তখন আগ্রহ করেই তারা আমাকে মানিকদের বাড়ী নিয়ে গেছিল। তারা যেন জানতো যে আমি আজ আসব নারাণপুরে।

কে জানে, মানিক কি করেছিল এসব নিয়ে, তবে টের পেলাম রাতের বেলায়। মানিক বলেই দিয়েছিল, সন্ধ্যে থেকেই ছেলে ছোকরারা মহড়া দেয় দল নিয়ে বেরোবার জন্য। যেই অন্ধকার গাঢ় হয়, তখনই শুরু হয়ে যায় বোলানদারদের কাজকর্ম। এ গাঁয়ের দল এখানে গান করে চলল পাশের গাঁয়ের দিকে। পাশের গ্রামের দল এ গ্রামে গেয়ে আবার ভিন্ন গ্রামে চলে গেল। এভাবে দলগুলি এক এক রাতে সাত আটটা গ্রাম ঘুরে এসে ভোর বেলায় নতুন সূর্যের আলো গায়ে মেখে ক্লান্ত ঢুলুনি দেহে নিজের গ্র্যমের দিকে এগোয়। পথে দেখা হয় তাদের কত চেনা মুখের সঙ্গে। সামাজিক আদান-প্রদান, গানের ভাল মন্দ সবই আলোচনা হয়। গানের আসরের বাইরেও এ যেন এক মধুর সামাজিক মিলন।

এরা জানে কোন গ্রামের কোথায় শিব মন্দির বা বাবুদের পাকা উঠোন। যত-টুকু ঠাঁই হোক না কেন, সেখানেই নেচে গেয়ে অভিনয় করে "পতিতের ভগবান" বা "হিংসার বলি" জাতীয় বোলান। গেয়ে সবাইকে মাত করে চলে যাবে অন্য গ্রামে। শত অনুরোধেও আর থাকবে না সেখানে। পয়সা কড়ি ভাল-মন্দ যা দেবে দাও—নইলে আটকে রেখ না! এই তো একটাই রাত। যত গ্রামে ঘোরা যাবে ততই আনন্দ, প্রচার, প্রতিষ্ঠা! তারপর তো সারা বছর এদের কেউ মনেও রাখবে না।

এ সব কথা আমায় বোলান গানের আসরে বসেই শুনিয়েছিল মানিক। আর ওর পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল স্বাধীন ঘোষ—দুধের ব্যবসা করে। সে হল একজন বোলানদার। দল আছে, প্রয়োজনে গান বাঁধতেও পারে। আশে পাশের অনেক গাঁয়ে তার যাতায়াত আছে।

স্বাধীন ঘোষের বৌ এর সঙ্গে পরে দেখা হয়েছিল। দেখলাম—স্বামীর এই অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও গুণের জন্য সে-ও বেশ গরবিনী।

তা, হবে নাই বা কেন। গ্রামের বাবুরা তো আর এসব নাচে-গানে আসে না। এ সব যে ছোট লোকদের ব্যাপার! তবে তারা শুনে পয়সা কড়ি দেয়। সেকালে নাকি মেডেল-টেডেলও দিত। তারা এও জানে যে, বাবুরা তাদের দলে আসতে না পারলেও, মনে মনে তাদের এইসব নাচ গানকে যথেষ্ট সমর্থন করে, হয়তো সম্মানও। নইলে পয়সা-কড়ি দেয় কেন?

স্বাধীন ঘোষ বেশ সপ্রতিভ এবং নিজের ওজন বোঝে। এখন যে সে গ্রামে একজন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি তা সে জানে। আমি যে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, সম্ভবতঃ সেটাও তার জানা। তবে আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণই করল।

মূল পালা হয়ে যাবার পর রং পাঁচালী ধরল যখন ছেলেরা, তখন তাকে পাশে টেনে এনে বসাই—সঙ্গে মানিকও ছিল। আমার অনুমতি নিয়ে একটা বিড়ি ধরাতে চাইল ও—ধরালো। এই অবসরে তার সঙ্গে বেশ কিছু কথাবার্তা হল, সবই বোলান বিষয়ে ঃ

অন্য সময় কি করেন ?—চাষ-বাসই তো প্রধান। তবে বছরের এই সময়টা এসব গান না করলে ভাল লাগে না।

কতদিন বোলান গাইছেন ?—আট-নয় বৎসর হয়ে গেল। মাঝে তিন বছর বাদ ছিল। ১৩৮৩-তে শিবের বিয়ে, ১৩৮৪-তে বিরজা শ্রীকৃষ্ণ, ১৩৮৫-তে জটিলা উপাখ্যান, ১৩৮৬-তে গৌরলীলা, ১৩৮৭-তে সীতার অগ্নি পরীক্ষা। তারপর ১৩৯১-এ পতিতের ভগবান।

গাজনের সময় কতদিন ধরে গান করেন ;—কোন ঠিক নেই। দু তিন দিন তো বটেই। কেউ যদি বলে গাইতে, তবে তার পরেও গেয়ে দিয়ে আসি – ফেরাই না।

আশে পাশে কত দূর গেছেন গাইতে ?—সব গ্রামেই গেছি। দু' একবার কালীগঞ্জেও গেছি। তবে দলের সংখ্যা তো এখন অনেক বেড়ে গেছে, তাই অন্য কথা ভাবতে হয়।

আপনার দলের পালা লেখে কে ?—বরাবর অনাদি মণ্ডলের কাছ থেকে নিই। আগে নিতাম ওর বাবার কাছ থেকে।

আপনাদের গ্রামের মহাদেব ঘোষের কাছ থেকে নেন না কেন ?—উনি বড় বেশী ব্যস্ত মানুষ, তাছাড়া বয়সও কম হল না। ওকেও তো ফি বছর অনেকগুলো পালা লিখতে হয়।

বোলান ছাড়া আর কি করেন ?—ইদানীং কবিগান গাইতে সুরু করেছি অল্প অল্প করে। তাতে অর্ডার পাই বেশী, সারা বছর গাওয়া যায়।

নিজে বোলান লিখতে চেষ্টা করেন না কেন ?—এত শক্তি নেই আমার। তবে ইদানীং কবিগানের জন্য শাস্ত্র পড়তে হচ্ছে বলে বেশ বুঝতে পারছি। যাকে তাকে দিয়ে কি বোলান লেখা হয় ?

বোলান গাইতে ভাল লাগে ?—তা নিশ্চয় ভাল লাগে। তবে, গ্রামের লোক না চাইলে এ জিনিষ আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে।

কখনও কোন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন ?—নিইনি, তবে ইচ্ছা আছে, একদিন নাম দেবই।

অনেক কিছু শুনলাম। স্বাধীন ঘোষের সাদাসিধে উত্তর থেকে বোলান গান সম্বন্ধে বেশ কয়েকটা তথ্য সংগ্রহ করা গেল। আরও কিছু লোকের নাম ঠিকানাও সংগ্রহ করলাম তার থেকে। এবারে যদি সম্ভব না-ও হয়, পরের বছর সে চেষ্টা একবার করা যেতে পারে। তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে এটাই যা অসুবিধা। অনুষ্ঠানটি

প্রায় একই দিনে সর্বত্র হয়। সুতরাং এক বছরে একটা অঞ্চলই সমীক্ষা করা সম্ভব। এবং পরের বৎসরের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই!

তবে এটা বুঝতে পারছি, নৃত্য-গীত-অভিনয় এই তিনটে কলাশিল্প জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। অভিনয়টাই যদিও প্রধান আকর্ষণ, গান ও নৃত্য তার পরিপূরক। বন্দনা অংশ গীত প্রধান, বোলান অংশ অভিনয় ও গান প্রধান—অনেকটা যাত্রার মতই এবং রং পাঁচালী অংশ গান ও নৃত্য প্রধান।

তথ্য হিসাবে আরো যা সংগৃহীত হল, তা হল—এ গ্রামে প্রধানতঃ ডাক বোলান গানের প্রচলন আছে। কখনও বা সাঁওতেলে বোলান ছিট্‌কে এসে পড়ে এ গাঁয়ে—অন্য কোন গ্রাম থেকে। মানিক দে ও স্বাধীন ঘোষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ডাক বোলান সম্বন্ধে আমার ধারণা হল—সে বোলান গানে অংশগ্রহণকারীরা বন্দনা, পালা, পাঁচালী ও রং পাচালীর মাধ্যমে বোলান গায়।

নদীয়া জেলাতেই এটা বেশী জনপ্রিয়। এদের গান গাওয়ার ভঙ্গী হল দলবদ্ধ হয়ে ও উচ্চ গলায়!

কথাগুলো নেহাৎ মিথ্যে নয়। কেননা ওদের পালা গান তো নিজের কানে শুনলাম ও দেখলাম। সুতরাং এ ধরণের আর দুচারটা প্রোগ্রাম দেখলে হয়তো একটা কিছু সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

যে গ্রামটায়—মানে নারাণপুরে বসে এ সব কাজ করছিলাম তা মূলতঃ ঘোষ প্রধান। এ ছাড়া কৈবত্য ও মাহিষ্যও আছে বেশ কয়েক ঘর—এ হিসেব হল যারা বোলান গায় তাদের সমাজের। এ গান তো বাবুদের নয়, তাই গ্রামের বাবুদের পরিসংখ্যান নিয়ে লাভ নেই। এবং এরাও সে ধরণের খোঁজ-খবর দিতে আগ্রহী নয় দেখলাম। পরদিন যখন নারাণপুর ছেড়ে বেরিয়ে আসছি, মাণিকের সঙ্গে নদীর ধারে—যাবো নৌকায় ওপারে মৌগ্রামে বর্ধমনের গ্রামে, তখন স্বাধীন ঘোষের বাড়ীর পাশ দিয়ে আসতে হয়েছিল। মানিক হাঁক দিল। স্বাধীন তখন নেই, পরিচিত কণ্ঠ পেয়ে তার বৌ বেরিয়ে এল। মানিকের পাশে আমাকে দেখে এক গলা ঘোমটা টেনে দিল। তার মধ্যে থেকেই আওয়াজ এল, আমাকে ঘরেব ভিতর গিয়ে বসবার জন্য।

স্বাধীন ঘোষের বৌ আজ খুব প্রীত। তার স্বামীর বোলান গান শোনার জন্য বাইরে থেকে লোক এসেছে, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়েছে বই লেখার জন্য। এ গ্রামের ক'জন লোকের সে সৌভাগ্য হয়েছে! হোক সে ঘোষের বউ, কিন্তু গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনে স্বাধীন ঘোষের গুরুত্বটা বুঝি সে'ও বোঝে আজ। সেই আনন্দে সে তাই আজ তৃপ্ত!

এবার যেতে হবে সীতাহাটি। সে গ্রাম কোথায় তা আমার জানা নেই। সেখানে আমাকে নিয়ে যাবার দায়িত্ব শম্ভুর। শম্ভু মানে শম্ভু দফাদার, স্থানীয় ইস্কুলের এম. এ, বিটি পাশ মাষ্টার।

মাষ্টারের পরিচয়টা ভালো। যখন সে মাষ্টারী করত না, শুধু লেখাপড়া

করত তখনও সে বোলান গান গাইতে অভ্যস্ত ছিল তবে নাচত কিনা তা আমাকে বলেনি। আমাকে এ সম্বন্ধ তথ্য সরবরাহ করতে তার অসীম আগ্রহ, তার বাবার থেকেই সে এটা পেয়েছে বংশানুক্রমিক।

শম্ভুনাথের বাবা হলেন রামকিংকর দফাদার। এককালে এঁর খুব নামডাক ছিল। জীবিকায় বা সামাজিক পরিচয়ে সম্পন্ন কৃষিজীবী হলে কী হবে, বোলান রচনায় ছিলেন ওস্তাদ। কতদিন পূর্বের কথা এসব। তখনই তার বেশ বয়স হয়েছিল—আজ এতদিন পরেও বেঁচে আছেন কি না জানি না। তবে বোলানের মরশুমে তার ঘরে যে কবার ছিলাম, তাতেই বুঝেছিলাম, এই মানুষটির সে সময়ে কি প্রচন্ড চাহিদা বেড়ে যায়।

সেই শম্ভুই বলল বর্ষশেষের তপ্ত দ্বিপ্রহরে সীতাহাটি যাবার কথাটা—না বলে উপায় নেই। কেননা, যেতে হবে তথ্য সংগ্রহের কাজে। সেখানে গেলে দেখা হবে অনেকগুলি বোলান দলের সঙ্গে। অনেক রকম বোলান গানের সঙ্গে। ওর প্রস্তাব শুনেই প্রশ্ন করেছিলাম ঃ

'কেন মৌগ্রামেও তো অনেক বোলানদল আছে! এপার-ওপার মিলিয়ে অনেক দলও আসে—তাদের দিয়ে তো আমার কাজ চলতে পারে?'

আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টিকে এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিল শম্ভু দফাদার ঃ 'তাহলে উঠুন এবারে ঝোলা-খাতা হাতে করে।'

ঠিক কোন কোন পথ বেয়ে শম্ভুর সঙ্গে সঙ্গে পথ হেঁটে শেষ পর্যন্ত সীতাহাটি এসে পৌঁছিলাম—সে আমার আজ মনে নেই। তবে মনে আছে বর্ষশেষের সেই খররোদে মাঠের পর মাঠ গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে পেরিয়ে—বোধহয় খুব সামান্য পথই সাইকেলে ভ্যানে যেতে পেরেছিলাম।

তবে শম্ভুদের গ্রামটা, মানে মৌগ্রাম যে বোলান গানের বিষয়ে খুবই খ্যাতি-সম্পন্ন এবং প্রাচীন, তা বোধহয় আগে বলা হয়নি। গ্রামটার অবস্থান গঙ্গার তীরে, তবে যেতে হয় অন্যপথে। শিয়ালদহ থেকে সালারগামী ট্রেনে সালারে নেমে কিছুটা পায়ে হেঁটে তারপর সাইকেল-ভ্যান ধরে কিছুটা গিয়ে—শেষে আরেকটু হাঁটা পথে এলে মৌগ্রাম। পথে পড়বে কাগ্রাম, যেখানে জগদ্ধাত্রী পূজার বেশ নাম আছে।

'আচ্ছা, এত লোক যে নানা পথ দিয়ে সীতাহাটির দিকে চলেছে—তার কারণ কি?' মাথার উপরে সকাল দশটার খরা কিরণ। তবু এভাবে কথা বলতে বলতে গেলে একটু অন্যমনস্ক থাকার জন্যই এ সব কথা বলি শম্ভুর সঙ্গে।

'গ্রামটি যে উদ্ধারনপুরের নিকটেই।' বলল শম্ভু ঃ 'ঐ যেটার নাম লোকমুখে হয়েছে উদ্দানপুর।'

মনে পড়ল বটে কাল থেকে সে উদ্দানপুর নামটা উচ্চারণ করছে অনেকবার। সেটাই যে উদ্ধারণপুরের সংক্ষিপ্ত নাম, তা কি করে বুঝব!

'তা, ঐ যে সব লোকজন আসছে অন্য সব পথ দিয়ে—তারা কি সীতাহাটির যাত্রী?' সত্যিই কিন্তু চলন্ত ভ্যান থেকে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম অন্ততঃ চার পাঁচ দিক থেকে বোলান, মিছিল পদযাত্রী—ইত্যাদি বেশ সমারোহ সহকারে এগোচ্ছে। এরা কেউ প্রয়োজনীয় কাজে নয়, নিছক উৎসবে আনন্দে যাচ্ছে—এটা বুঝতে আমার আরো সময় লেগেছিল।

রোদ ওদের কাছে রোদ নয়। সবাই যেন এক খেলায় বিভোর। সে হল সীতাহাটির বোলান। ওরা কে কোন দিক থেকে আসছে, তার একটা হদিশ পেলাম শম্ভুর কাছ থেকে। মোট আটটা দিক থেকে বোলান দল এসে সমবেত হয় সীতাহাটিতে। যে সব গ্রাম সীতাহাটির কাছাকাছি, তাদের কম পথ পরিক্রমা করতে হয়। যারা আসে দূর থেকে, তাদের হয় বেশী পরিশ্রম। ব্যাপারটা লিখে দাঁড়ালে এ রকম দাঁড়াবে:

১) প্রথম পথ: কাগ্রাম-মৌগ্রাম-কল্যানপুর-বিষ্ণুপুর-শিলুড়ী-নলিয়াপুর-সীতাহাটি। ২) দ্বিতীয় পথ: দক্ষিণখণ্ড-সোনারন্দি-গঙ্গাটিকুরী-উদ্ধারণপুর-সীতাহাটি। ৩) তৃতীয় পথ: শিবলুন-গঙ্গাটিকুরী-উদ্ধারণপুর-সীতাহাটি। ৪) চতুর্থ পথ: বৈদ্যপুর-টেঁয়া-তালিবপুর-কাগ্রাম-মৌগ্রাম-কল্যাণপুর-বিকুপুর-শিলুড়ী-নলিয়াপুর-সীতাহাটি। ৫) পঞ্চম পথ: ঝামটপুর-কেউগুড়ি-নলিয়াপুর-সীতাহাটি। ৬) ষষ্ঠ পথ: মাতুয়া-তালিবপুর তারপর ৪ নং পথ ধরে সীতাহাটি। ৭) সপ্তম পথ: ঘনশ্যামপুর-সালার কাগ্রাম তারপর ৪নং পথ ধরে সীতাহাটি। ৮) অষ্টম পথ: প্রসাদপুর-ঘনশ্যামপুর-সালার তারপর ৭ নং পথ ধরে সীতাহাটি।

বক্তৃতা থামালো শম্ভুনাথ। মনে মনে ভেবে দেখলাম এক নম্বর, চার নম্বর, ছয় নম্বর, সাত ও আট নম্বরের পথের যাত্রীদের কত দূর দূর থেকে হেঁটে আসতে হয় সীতাহাটি। সে তুলনায় আমাদের পরিক্রমণের পথ তো কত সামান্যই!

সীতাহাটি তখন লোকে লোকারণ্য। ঠিক কোন স্থানটিতে দাঁড়িয়ে এই উৎসবটা একটু দেখব – তা ঠিক করতেই দু' তিনবার ধাক্কা খেলাম।

আসলে সীতাহাটিতে আসার মূল উদ্দেশ্য হল পোড়ো বোলানের দল পর্যবেক্ষণ করা। ঐ বোলানটি সব জায়গায় তত হয় না। ডাক বোলান, পালাবন্দীর চর্চা প্রায় সর্বত্র। কিন্তু পোড়ো বোলানের উপস্থাপন শিল্পীদের সাজ-সজ্জা, ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদির জন্য অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছে জনপ্রিয়। তার মধ্যে নামকরা হল জ্ঞানদাস—শম্ভুনাথ তাকে চেনে।

তার সামনে এনে কোন মতে দাঁড় করিয়ে দিল আমাকে—অনেক ভীড় ঠেলে। কিন্তু তার তখন যে 'মুড'—তা বীভৎস। উৎকট 'ডাকিনীবেশী' সজ্জা আর নেশার গন্ধ – কথা বলার মত মনই হল না। তবে একটা ছবি নিতে পারা গেছিল। এসব উৎকট মেকআপ নাকি হয় কাটোয়ায় সাজঘরে।

মুখে মড়ার মাথা, উত্তাল নাচ, নারী বেশ, বীভৎস সাজ-সজ্জা। সেই ফোটোটাই আজ যেন স্মৃতির সম্বল। জানি না পরে জ্ঞানদাসের এ সব কথা মনে থাকবে কি না। ▭

লোকজীবন চর্যা লোকজীবন চর্চা
ও লোকসংস্কৃতির তথ্য অনুসন্ধান—
শব্দগুলি যদি যথার্থই পরস্পরের খুব
নিকটবর্তী হয়,
তবে লোকজীবন সম্বন্ধে একটি সঠিক
দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠার পক্ষে তা হবে সহায়ক।
বস্তুতঃ লোকজীবনের সীমানা নির্দেশ করার ধৃষ্টতা কারোর নেই,
লোকসংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচিত কটি
প্রসঙ্গ নিয়ে তাকে ভ্রমণ কাহিনীর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণের একটি
প্রয়াস এখানে গৃহীত হয়েছে মাত্র।
জীবনের যে বহুতর স্তর, বহুতর মুখ, বহুতর রঙ—
তার খুব অল্পই প্রতিভাত হতে পারে এ জাতীয় প্রচেষ্টায়।
তবে লোকজীবনের সঠিক সংজ্ঞা জানা থাকলে
লোকসংস্কৃতির সঙ্গে তার মেলবন্ধন করা খুব সহজ হয়।

লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবন

শুধু আর্থ-সামাজিক কাঠামো নয়,
যে বৃহৎ প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক কাঠামোয়
জনসমাজের জীবনচক্র ঘূর্ণিত হয়—তার অভিব্যক্তি
কী গ্রাম কী শহর—সর্বত্র মূলতঃ প্রায় এক।
এই দুই শ্রেণীর জীবনযাত্রায়
স্পষ্টতই দুটি শ্রেণীভেদ থাকলেও,
মানুষই যেখানে প্রধান
সেখানে তাদের মধ্যে একটি অন্তর্লীন
সাদৃশ্য থাকতে বাধ্য।
শুধুমাত্র দেখবার চশমার কাঁচটা প্রয়োজন মত পাল্টে নিলে
শহর ও গ্রামের লোকজীবনের যে সরল সূত্র,
লোকসংস্কৃতিকর্মীর ক্ষেত্রে তা আরও সরল বলে মনে হবে।
কেননা, পর্যটক বা লোকসংস্কৃতিকর্মী
—দুজনেই প্রায় একই পথে যাতায়াত করেন।

উপসংহারের পরিবর্তে

জীবন বা জীবনধারা যেখানে স্পষ্টতই আর্থিক নিয়মের দ্বারা দুটি স্থূল বিভাগে বিভক্ত, তখন লোকসংস্কৃতি চর্চার সীমানা কতদূর—এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিতে পারে। কিন্তু লোকসংস্কৃতি চর্চা যখন জীবন নির্ভর তথা গোষ্ঠীবদ্ধ মানবসমাজ নির্ভর—তখন তার সঙ্গে যে 'লোকজীবন' শব্দটির একটি আত্মিক সাযুজ্য আছে—এ কথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল। এ জীবন নিত্যকার আটপৌরে জীবন নয়। এ জীবন মানব সভ্যতার উন্নতির ইতিহাসে প্রতিদিন একটি একটি করে, ইঁট গেঁথে গেঁথে আপনার যথার্থ স্তর নির্মাণ করছে।

সামাজিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণে লোকজীবনের প্রকাশ বিবিধ—এ সত্য বহু-স্বীকৃত। গ্রাম ও শহরের সুস্পষ্ট সীমানায় দুটি পৃথক লোকজীবন সমান্তরাল ভাবে আপন বৈশিষ্ট্যেই চিহ্নিত। এখানে লোক অর্থে সাধারণ মানুষ—যারা সর্বদাই সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ। গ্রাম বা শহর এখানে বিবেচ্য নয়। যে কোন জনসমাজকে যদি তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়, তবে মধ্যবর্তী স্তরটিই হয় সংখ্যা গরিষ্ঠ—এটি হয় প্রধানতঃ সামাজিক-আর্থিক কাঠামো অনুসরণে।

গ্রামীন জীবন পর্যবেক্ষণের জন্য যে দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন, শহুরে জীবনের জন্য তা প্রয়োগ করা যায় না। তবে উভয় জীবনের চলমানতার মধ্যে একটি সমান্তরাল তুলনীয় ধারা দেখতে পাওয়া যায়। এখানেও সেই মূল কারণগুলির কথাই প্রধান বিবেচ্য। বৃহৎ বা উদার অর্থে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি তার সমাজ, পরিবেশ ও ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যাবতীয় অভিব্যক্তিকেই লোকজীবনের পর্যবেক্ষণীয় বিষয় বলে মনে করা যেতে পারে।

তাই সুদূর ইরান ভ্রমণ করার পর ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর 'ইরান ভ্রমণ' গ্রন্থের ভূমিকায়ঃ '...এই অনুসন্ধানের ফলে আমি লক্ষ্য করেছি, মধ্যযুগে যখন পারস্যের রোমান্টিক সাহিত্য বাংলাদেশে প্রচার লাভ করেছিল, সেই সময়ে পারস্যের লোকসংস্কৃতির উপকরণও বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল।...উত্তর বাংলার লোকনাট্য আলকাপের সঙ্গে পার্সী যাত্রার সাদৃশ্য আছে বলেও আমি অনুমান করেছি। তবে পাঠকের বিচারের জন্য তা আমি উপস্থিত করেছি, কোনো কিছুই চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিনি।'

দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিশ্লেষণী-চেতনা ও স্বচ্ছতা থাকলে লোকজীবন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লোকসংস্কৃতির সকল অভিব্যক্তিকেই পরিমাপ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতির আশ্রয়ে লোকজীবন পর্যবেক্ষণের অপর নাম হতে পারে, তবে ক্ষেত্রানুসন্ধান। লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি—এই শব্দ দুটির পারস্পরিক সম্বন্ধটুকু নির্ণয় করতে পারলেই—এর দ্বারা বাঞ্ছিত ফল লাভ হতে পারে। কেননা এরা পরস্পর-নির্ভর এবং একে অন্যের পরিপূরক।

পর্যবেক্ষক যদি সমীক্ষিত অঞ্চলের অধিবাসী হন, তবে তার দৃষ্টিতে যে ভঙ্গী থাকবে, তিনি যদি বহিরাগত হন, তবে তার দৃষ্টি হবে ভিন্নধর্মী। একটি নির্দিষ্ট জনসমাজের সকল অভিব্যক্তিই বহিরাগতের পক্ষে হবে অভিনব এবং যথাসম্ভব নিরপেক্ষ। কিন্তু তিনি যদি সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন, তবে তার দৃষ্টিকোণ হয়তো ততটা নিরপেক্ষ না হতেও পারে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা, যথার্থতা, গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি শব্দগুলি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। কেননা পর্যবেক্ষক যে দৃষ্টিতে দেখবেন বা অন্যদের দেখাবেন, তারই ভিত্তিতে নির্মিত হবে পরবর্তী পদক্ষেপ। এভাবে সকল তথ্য একত্রে সংগৃহীত হলে তবেই তা থেকে নির্মিত হতে পারে কোন এক বা একাধিক বিশেষ তত্ত্ব।

বক্তব্যটি রবীন্দ্রনাথের 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থের একটি সাধারণ উধৃতি দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। বহিরাগতের দৃষ্টিভঙ্গীর নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে তিনি ঐ গ্রন্থের আট নং পত্রে কথা প্রসঙ্গে আত্মপরিচয় দিয়েছেন…'কিন্তু এ জাহাজেও আমি বিদেশী : একজন য়ুরোপীয়ের পক্ষেও আমি যা, একজন জাপানির পক্ষে, আমি তাই'—এবং তারপরেই তার বক্তব্য : 'এ জাহাজে চড়ে অবধি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কাপ্তেনের কাপ্তেনিটা কিছুমাত্র লক্ষ্য গোচর নয়, একেবারেই সহজ মানুষ। যাঁরা তার নিম্নতর কর্মচারী, তাঁদের সঙ্গে তাঁর কর্মের সম্বন্ধ এবং দূরত্ব আছে, কিন্তু যাত্রীদের সঙ্গে কিছুমাত্র নেই। ঘোরতর ঝড় ঝাপটের মধ্যেও তাঁর ঘরে গেছি, দিব্যি সহজ ভাব। কথায়-বার্তায় ব্যবহারে তার সঙ্গে আমাদের যে জমে গিয়েছে সে কাপ্তেন হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবে।'

এই যে দৃষ্টিভঙ্গী, এটি অবশ্যই বহিরাগতের এবং অবশ্যই নিরপেক্ষ। উধৃতিটি লোকসংস্কৃতি বিষয়ক না হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর নিরপেক্ষতার জন্যই এটি এখানে উধৃত হল। আলেখ্য প্রসঙ্গে তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশ বা সমাজ-দর্শনের ক্ষেত্রে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করতে পারলে তবেই সেই সংগৃহীত তথ্য পরবর্তীকালে নির্দ্বিধায় তত্ত্বগঠনের কাজে ব্যবহার করা যায়। তখন পর্যটক বা পর্যটনের কাহিনী এক নতুন মাত্রা পায়। কেননা পর্যটকও তো এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই দেশ ভ্রমণ করেন। ভ্রমণ কাহিনী রচনার পূর্ণাঙ্গতা সাধনের জন্য তাকে যে সকল বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়, তার মধ্যে জনসমাজ তথা লোকজীবন যে অন্যতম, তা বলাই বাহুল্য।

এ প্রসঙ্গে বাংলাসাহিত্যে আজ অবধি যে সকল সার্থক ভ্রমণগ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলির কথা চিন্তা করা যেতে পারে। সাম্প্রতিককালে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বা শংকু মহারাজ এই সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয়, শ্রদ্ধেয় ও স্মরণীয় নাম। তাদের রচিত ভ্রমণ সাহিত্য একাধারে ভ্রমণ সাহিত্য ও মানব সমাজ দর্শন—যার অন্যতম হল লোকজীবন তথা লোকসংস্কৃতির নানা তথ্য প্রদান। আদর্শ ভ্রমণকাহিনী যে নিছক ব্যক্তিগত জীবন ছাড়িয়ে নতুন সমাজ নতুন মানুষ নতুন জীবন সম্বন্ধে বেশী আগ্রহী হবেন ও পাঠককে আগ্রহী করে তুলবেন—এটাই স্বীকৃত সত্য। এই কাজ

করার জন্য তিনি যে সব বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করেন, তার অন্যতম প্রধান হল লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক তথ্যানুসন্ধান। এখানে শংকু মহারাজের 'মায়াময় মেঘালয়' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া হল :

'লেখকের দুর্নিবার ভ্রমণ পিপাসা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ক্রমাগত তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। আর তাঁর নিরলস ভ্রাম্যমানতার অমূল্য অভিজ্ঞতার রত্নরাজিকে সাজিয়ে তুলেছেন গ্রন্থভাণ্ডার—উপহার দিয়েছেন ভ্রমণ সাহিত্যের এক চিরন্তন সম্পদ। ...বইটি পড়ার সময়ে কেবলই পথ আর স্থানের বিবরণ নয়, সেই সঙ্গে মানুষের মহাকাব্য, যাঁদের মাঝে আমরা খুঁজে পাই জাতীয় সংহতি ও বিশ্বমানবতার মেলবন্ধন। 'লেখকের কথায়—যে সংহতিকে আজ আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি, তা ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের এদেশের পথে পথে, সাধারণ মানুষের মাঝে এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও ভাষা মানুষে মানুষে মহামিলনের কোন অন্তরায় নয়।'

সুতরাং পর্যটকের এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর কথা এখানে গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—যার সঙ্গে লোকসংস্কৃতিকর্মীর এক গভীর সাদৃশ্য আছে। ক্ষেত্রকর্মানুসন্ধানের মাধ্যমে লোকজীবনের যে সব তথ্য তিনি তুলে আনছেন, পরে তাকেই নৃতত্ত্বের শৃংখলে বেঁধে তিনিও ঐ সত্য প্রতিপাদন করবেন—তবে ভিন্ন পথে। বিশ্বমানবতার আদর্শ যে বিশ্বে নেই, যার সূত্রপাত এক জনপদে বা জনসমাজে বা লোকজীবনে—এই সিদ্ধান্তে যতক্ষণ না লোকসংস্কৃতিকর্মী আসতে পারছেন ততক্ষণই হয়তো তিনি নিরন্তর ক্ষেত্রানুসন্ধান করে চলবেন। উপরোক্ত গ্রন্থ সমালোচনার পরবর্তী অংশে আছে :

'এই পাহাড়ি অঞ্চলের সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন, কোথাও দরিদ্র মানুষজনের মনের যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে শুধু লেখক কেন পাঠককেও বিস্মিত হতে হয়। যাওয়ার পথে সম্মোহক প্রকৃতি। এখানকার ইতিহাস মানুষজন—তাদের সুখে দুঃখ, ভাল-মন্দ, আশা-আকাঙ্খার কড়চা লেখকের দক্ষ হাতের আঁচড়ে সুন্দর প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে। লেখকের সংবেদনশীলতা অন্যান্য ভ্রমণকাহিনী থেকে এটিকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে।' সমালোচক অন্যত্র বলেছেন :

'এছাড়া পরিব্রাজকের যেটা বিশেষ গুণ তা হল তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও তথ্যগত কৌতূহল—যে কোনও বিষয়ে ; ইতিহাস-সংস্কৃতি, অর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, কৃষি ব্যবস্থা, ধর্মীয় ইতিহাস, আচার-আচরণ, ন্যায়নীতি। '...পরিভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে লেখক ঐতিহাসিক, লৌকিক এবং অলৌকিক কাহিনী এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে বইটি পাঠকের কাছে কখনও একঘেয়ে মনে হবে না।' [সমালোচক : প্রণবানন্দ যশ।

উধৃতি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও, লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনের সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পাঠককে ভ্রমণের পটভূমিতে আলোকপাত করতে পারে। ভ্রমণকাহিনীর পূর্ণাঙ্গতার জন্য লেখককেও কখনও কখনও পরোক্ষ প্রতিবেদনের সাদৃশ্য নিতে হয়। নচেৎ একটি নির্দিষ্ট ও সীমিত সময়ের ভ্রমণে এত তথ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব। সেই

কাজে তাকে সহযোগিতা করেন অন্যান্য অনেক বিশেষজ্ঞ। বিশেষজ্ঞের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সংগৃহীত তথ্যাপঞ্জীও তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেন তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর তথা ভ্রমণগ্রন্থের পূর্ণতার জন্য।

লোকজীবনের জগৎ বিশাল। সামান্য কটি লোকবিনোদন, লোকউৎসব, লোকপ্রথা ইত্যাদি দিয়ে তার পরিধি সীমিত করা যায় না। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পর্বই তাই হতে পারে অভিজ্ঞ সমীক্ষকদের চোখে এক একটি পৃথক অধ্যায়। স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিটি অধ্যায়ের তথ্য সংকলিত হলে তবেই হতে পারে সমগ্রের যোগফলে এক অখণ্ড লোকজীবনের রূপায়ন। সে কাজ শ্রম-সময়-ব্যয় সাধ্য। তাই পর্যটক যতটা সংগ্রহ করেন, তা থেকেও প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করেন লোক-সংস্কৃতি কর্মী। আবার কখনও বা পর্যটকই হয়ে ওঠেন নিজের অজান্তে এক লোকসংস্কৃতি কর্মী।

লোকসংস্কৃতির একটি তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তে গঠনের জন্য লোকসংস্কৃতি কর্মীকে কতবার পর্যটন করতে হয়—কেউ জানে না। তার পর্যটনের ফলশ্রুতি সম্পূর্ণ সমাপ্ত হলেও তিনি ভ্রমণকারীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে প্রতিবেদন রচনা করলে তা এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে উপাদেয় হতে পারে। অপরপক্ষে প্রকৃত পর্যটকের প্রতিটি ভ্রমণই হয়ে উঠতে পারে এক একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণ কাহিনী। এই পাওয়ার আনন্দ আর না-পাওয়ার বেদনাকে হৃদয়ে ধারণ করেই প্রতিটি লোকসংস্কৃতি কর্মীকে লোকজীবনের তত্ত্ব অন্বেষণে কতবার যে দেশ দেশান্তরে ছুটে বেড়াতে হয়—তা কেউ জানে না। তার তত্ত্বগুলি বিচার করেন বিশেষজ্ঞ, তথ্যগুলি আনন্দ দেয় যে কোন পর্যটক-পাঠককে। লোকসংস্কৃতি চর্চায় লোকজীবনের তথ্যান্বেষণে তাই এই কাহিনীগুলিরও এক প্রকার গুরুত্ব আছে বলে মনে হয়।

সংকলিত প্রতিবেদনগুলি সবই সাম্প্রতিককালের নয়, তা মূল রচনাতেই বলা হয়েছে। যেগুলি লুপ্তপ্রায় সেগুলিকে পুরাতন দিনের অস্পষ্ট স্মৃতিচারণ বলা ভাল —কেননা আজ সে সব গ্রামে অনুরূপ তথ্য অনুসন্ধান করতে গেলে অনেকেই হয়তো ব্যর্থকাম হবেন। বিশেষতঃ রায়দীঘি অঞ্চলের নববর্ষ উৎসবের অনুষ্ঠান, বাবুইজোড় গ্রামে পোড়ামাটির হাতী-ঘোড়া শিল্পের সন্ধান, তমলুকে পটিদারের গৃহ, বিন্দুবালা নাচনীর কথা? আনুখাল গ্রামের আতসবাজীর কথা বা বোলান গানের নানা কথা—এ সব কাহিনী কিন্তু ইতিমধ্যে হয় বিবর্তিত হয়ে গেছে, নয়তো লুপ্তই হয়ে গেছে।

এর কারণটা হল, সমীক্ষিত অঞ্চলগুলিতে যানবাহনের প্রসার, গণমাধ্যমের যথেষ্ট উন্নতি,—ফলে রুচির পরিবর্তন। পটশিল্পের বর্তমান অবস্থা ও পটুয়াদের সাম্প্রতিক সংবাদ সম্বন্ধে প্রায়ই নানা সেমিনার-ওয়ার্কশপে আলোচনা হয়—কেননা ক্ষয়িষ্ণু এই শিল্পধারা সম্বন্ধে শহর-গ্রাম সকলের এক প্রকার দুর্বলতা ইদানীং অনুভব করা যায়।

তার রূপ বা গঠন পূর্বে যা ছিল, বর্তমানে তা নেই এবং আগামীতে তা দ্রুত বিবর্তিত হবে এবং সে কথা এখন সম্পূর্ণ সত্য।

টেরাকোটা বা পাথরের টেরাকোটা—যা সমীক্ষাকালে 'ফুলপাথর' বলে অভিহিত হয়েছে—তার বিলুপ্তি সম্বন্ধে দুঃখিত হবার কিছুই নেই। কেননা এই বিচিত্র মৃৎশিল্পটি কোন্ রহস্যময় কারণে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল—তা নিয়ে এ যাবৎ অনেকেই চিন্তা ব্যয় করেছেন। তবে 'ফুলপাথরের টেরাকোটা' যে সত্যই এক অভিনব ব্যতিক্রমী শিল্প পদ্ধতি এবং তার অবলুপ্তি যে সত্যই দুঃখের—তা স্বীকার করতেই হবে। অন্ততঃ এ ধরনের 'টেরাকোটা' যে বেঁচে থাকে দীর্ঘদিন এবং তাই এটির প্রচলন থাকলে ভাল হত—এটা মনে হবেই।

অনুরূপ ভাবে বিয়ে বাড়ীর নানা কাহিনীও আগামী দিনে আর এভাবে দেখা যাবে না – তা-ও নিশ্চিত। অবশ্য, এখানে যে ভাবে তা চিত্রিত হয়েছে—তাও যে ১৫।২০ বৎসর পূর্বে এই প্রকারই ছিল, তা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। পুতুল নাচের ক্ষেত্রেও এই বিবর্তনের সূত্র কার্যকরী হবে। বাইরের জগতে পরিবর্তন যত দ্রুত আসে, গ্রাম্য জীবনযাত্রায় তা আসে ধীর গতিতে—এটা সবাই জানেন। শহরে সংস্কৃতির পরিবর্তন একটা জায়গায় এসে স্থির হলে, তা যেন 'চুঁইয়ে যাওয়া পদ্ধতি' অনুসারে ধীরে ধীরে লোকসংস্কৃতিতে প্রবেশ করে। অপর পক্ষে, গ্রাম্যসংস্কৃতির নানা প্রকরণই যে ধীরে ধীরে শহর-সংস্কৃতি গ্রহণ করছে—এই সতর্ক উল্লেখ এখানে অবশ্যই করা প্রয়োজন। যামিনী রায়ের চিত্রাংকন পদ্ধতি থেকে শান্তিনিকেতনী আল্পনা, নাটকে লোকনাটকের-আঙ্গিক ও লোকবিনোদনের নানা প্রকরণ ব্যবহার প্রভৃতি তারই প্রমাণ। এ ভাবেই গ্রহণ-বর্জন ও বর্জন-গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে চলতে চলতে দুটি আপাত-পৃথক সংস্কৃতির ধারা যেন এক বিচিত্র ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে বরাবর—হয়তো অনন্তকাল।□

উপসংহারের পরেও
তবু যেন থেকে যায় কিছু কথা—
যা এত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও দীর্ঘায়িত বর্ণনা দিয়েও
হয়তো পূরণ করা যায় না।
কি সেই কথা,
যা এখনও বলার জন্য আছে বাকী ?
এবং তারপরে আর কী ?
যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা এখানে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় করা হয়েছে,
এই বিচিত্র বঙ্গের গ্রাম-গ্রামান্তরে গিয়ে,
সে অভিজ্ঞতা এই সমীক্ষকেরই প্রথম নয়—
আগেও হয়েছে অনেকের।
তার অনেক কথাই লেখা হয়েছে অতীতে—নানা গ্রন্থে।
অর্থাৎ সে সব অভিজ্ঞতার একবার নথিকরণ যেন হয়েই আছে
নানা চোখে নানা ছাঁদে।

পরিপূরক

বর্তমান সমীক্ষক যেন
তারই এক নবীকরণ করলেন এখানে,
প্রায় পুরাতন ধারাতেই।
যুগ পাল্টাচ্ছে, সময় বদলাচ্ছে,
বেড়ে গেছে সময়ের ফাঁক আর পার্থক্য।
উদ্দেশ্য আর দৃষ্টিভঙ্গী আর উপযোগিতা—
ঘটনা ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে প্রতি আগামী কালই।
তথ্য-প্রমাণ-সিদ্ধান্তও সংজ্ঞা পাল্টাচ্ছে।
নতুনকে পুরাতন দিয়ে
সমর্থন করতে হচ্ছে বা তার বিপরীতটাও।
কেউই সম্পূর্ণ নয়, সবাই সবাইয়ের উপর নির্ভরশীল।
উপসংহারেই সব শেষ হয় না,
তা হয়ে ওঠে যেন আরেক চিন্তার ভূমিকা-সূত্র।
সবাই যেন সবাইয়ের একপ্রকার পরিপূরক।

উৎসবের সং বৈচিত্র্য

...আজ এ সময় বীরকৃষ্ণ দাঁর গদিতে বড় ধূম—অধ্যক্ষেরা একত্র হয়ে কোন্ কোন্ রকম সং হবে, কুমোরকে তারই নমুনো দেখাবেন ; কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের করবে ; দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত।

...এদিকে বারোইয়ারি তলায় সং গড়া শেষ হয়েছে। এক মাস মহাভারতের কথা হচ্ছিলো, কাল তাও শেষ হবে ; কথক বেদীর উপর বসে বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের মত ও বলিদানের মহিষের মত মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে রসিকতার একশেষ কচ্চেন।...বাজে লোকের মধ্যে দু একজন আপনার আপনার কর্তৃত্ব দ্যাখাবার জন্যে 'তফাৎ তফাৎ' কচ্চে, অনেকে গোছালো গোছের মেয়েমানুষ দেখে সঙের তরজমা করে বোঝাচ্চেন ! সংগুলি বর্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারতের মত, বুঝিয়ে না দিলে মর্ম গ্রহণ করা ভার !

কোথাও ভীষ্ম শরশয্যায় পড়েছেন—অর্জুন পাতালে বান মেরে ভোগবতীর জল তুলে খাওয়াচ্চেন। জ্ঞাতির পরাক্রম দেখে দুর্যোধন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছেন। সঙেদের মুখের ছাঁচ ও পোষাক সকলেরই এক রকম, কেবল ভীষ্ম দুদের মত সাদা, অর্জুন ডেমাটিনের মত কালো ও দুর্যোধন গ্রীন !

কোথাও নবরত্নের সভা—বিক্রমাদিত্য বত্রিশ পুতুলের সিংহাসনের উপর আফিসের দালালের মত। পোশাক করে বসে আছেন। কালিদাস, ঘটকর্পর, বরাহমিহির প্রভৃতি নবরত্নেরা চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—রত্নদের সকলেরই এক রকমের ধুতি, চাদর ও টিকি ; হঠাৎ দেখ্‌লে বোধহয় যেন এক দল অগ্রদানী ক্রিয়াবাড়ী ঢোকবার জন্য দরওয়ানের উপাসনা কচ্চে !

কোথাও শ্রীমন্ত দক্ষিণ মশানে চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতীর স্তব কচ্চেন, কোটালরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে—শ্রীমন্তের মাথায় শালের শামলা, হাফ ইংরিজি গোছের চাপকান ও পায়জামা পরা ; ঠিক যেন একজন হাইকোর্টের প্লিডার প্লিড কচ্চেন !

এক জায়গায় রাজসূয় যজ্ঞ হচ্চে, দেশ দেশান্তরের রাজারা চারদিকে ঘিরে বসেচেন—মধ্যে ট্যানা পরা হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে বসে হোম কচ্চেন, রাজাদের পোষাক ও চেহারা দেখলে হঠাৎ বোধহয় যেন, এক দল দরওয়ান স্যাকরার দোকানে পাহারা দিচ্চে !

কোনখানে রাম রাজা হয়েচেন—বিভীষণ, জাম্বুবান, হনুমান ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা সহুরে মুচ্ছুদ্দী বাবুদের মত পোষাক পরে চারদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছাতা ধরেচেন—শত্রুঘ্ন ও ভরত চামর কচ্চেন—রামের বাঁ দিকে সীতে দেবী ; সীতের ট্যাড়চা সাড়ী, ঝাঁপটা ও ফিরিঙ্গি খোঁপার বেহদ্দ বাহার বেরিয়েচে !...

['হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) হইতে উধৃত। পৃ. ২৬—২৬]

পরিপূরক ঃ ২ ॥ 'বাবুইজোড়ের হাতী-ঘোড়া' ॥ পৃ. ১৭—২৬

'শিল্প ও শিল্পী সমাজ'

এ জাতীয় হাতী ঘোড়া অল্পবিস্তর তৈরী হয় অন্যত্রও। কেননা ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য এবং অনুন্নত পরিবহনের জন্য স্থানীয় কুম্ভকার সম্প্রদায়কেই গ্রামের চাহিদা পূরণ করতে হয়। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া ছাড়াও মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ার মুরুলু গ্রামেও এর নির্মাণ হয়ে থাকে। তবে সর্বত্রই তা নিজ নিজ শিল্প সুষমায় বিশিষ্ট।

আবার এ সব কথা বাবুইজোড়ের শিল্পীরা জানে কি না জানি না, তবে পাঁচমুড়ার কথা তারা জানে। তা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই, নেই কোন হীনমন্যতাবোধ। প্রত্যেকেই ডিজাইনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলার পক্ষপাতি।

এদের আর এক গোষ্ঠী রাজনগরের কেওটাবাঁধ অঞ্চলে গিয়ে বসতি সুরু করায় সেখানেও বর্তমানে এই ধারার কাজ সুরু হয়েছে, তবে তাদেরটা একটু পৃথক ধরনের—একটু বেশী নকশাদার, রং করা হয়। কিন্তু মূলধনের অভাবে অত সৌখীন কাজ করে তাদের পেট ভরে না।

বাবুইজোড়ের অপর এক জামাতা অন্ডালের নিকটে কুমারডিহি গ্রামে থাকেন—সেখানেও এ জাতীয় কাজ অল্প অল্প হয়। তাছাড়া ঐতিহ্য অনুযায়ী ছেলে ভুলানো পুতুল তৈরীতেও সে অঞ্চলের সুনাম আছে।

এই হাতী ঘোড়া প্রতীকের যেগুলি ছোট আকারের—তার প্রচলন আছে পুরুলিয়া জেল্যর পুঞ্চা থানার নির্ভরপুর গ্রামে। সেখানে পৌষ সংক্রান্তিতে লৌকিক দেবী ব্যাঁইড়ার পূজায়, মকর পূজো ও ফাগুনের পূজায় এর ব্যবহার হয়। বাবুইজোড় থেকে দু মাইল দূরে বিহারের পাঁচজোড়া গ্রামে হয় ধর্মরাজের পূজো। সেখানেও দেবতা রূপে এই প্রতীকের ব্যবহার আছে। পূর্বোক্ত রাজনগরের গ্রামে ধীবর সম্প্রদায় শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে মনসা পূজা করে, তখন প্রয়োজন হয় বড় ঘোড়ার। অবশ্য মনসা পূজায় হাতীর মূর্তির প্রচলন আছে। অতীতে ইসলাম পূজা বলে একটি অনুষ্ঠানে বড় হাতীর ব্যবহার হত।

কিন্তু শুধু এ বঙ্গেই নয়, সংলগ্ন বিহারের সাঁওতাল পরগণার কোন কোন অঞ্চলে এই প্রতীকচিহ্ন ব্যবহার হয়। রাজমহলের দিকে যতই যাওয়া যায় ততই এর ব্যবহার চোখে পড়ে। এই অঞ্চলের মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহগুলি অধিকাংশই খাপরা ঢাকা ঢালু ছাদ। বিশেষ কোন উৎসব অনুষ্ঠান হলে তারা ছাদের কার্নিসে একটা অথবা একসারে হাতি বানিয়ে সাজিয়ে রাখে। তার মাথায় জ্বলে প্রদীপ—প্রদীপটা কিন্তু পৃথক ভাবে সংযুক্ত নয়। হাতীর মাথাটিকেই বিশেষ কৌশলে প্রদীপে পরিণত করা হয়। অন্ধকার রাত্রে প্রজ্জ্বলিত একসার প্রদীপ দূর থেকে দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। সে সময়ে কোন বহিরাগত ব্যক্তিও এই অঞ্চলে গেলে বুঝতে পারেন যে এখানে একটি শুভ কাজ হচ্ছে। ধীরে ধীরে এ প্রদীপ নিভে যায়, হাতীগুলি থেকে যায় ছাদেই। তারপর প্রাকৃতিক কারণে একদিন ভেঙ্গে পড়ে।